সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

উপন্যাসসমগ্র

শিরাজী
উপন্যাসসমগ্র

শিরাজী উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

ক্যাবকো

©

প্রকাশক

প্রচ্ছদ
কে. এম. মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ : ঢাকা বইমেলা ২০০০ ইং

ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী তারটিয়া টাংগাইল থেকে প্রকাশিত এবং
ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী তারটিয়া টাংগাইল থেকে মুদ্রিত :

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা

একমাত্র পরিবেশক : ঠিকানা
বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট নীচতলা) ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১ ১১ ৮৪ ৮

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালী লেখকগণের যত্ন এবং চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ ভারতের সর্বপ্রধান ভাষায় পরিণত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ যত সামান্যই হউক, কিন্তু উপন্যাস এবং নাটক-নভেলে বাংলা ভাষা আজ ভারাক্রান্ত। আর সেই সমস্ত গ্রন্থের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে মুসলমানের অলীক কলঙ্ক, কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। উপন্যাসগুলি মোস্‌লেম বিদ্বেষের অনলকুণ্ড। সে অনলকুণ্ডে বিরাট-কীর্তি, বিপুল-যশা, সিংহতেজা মুসলমান জাতির গোলাম হইতে সম্রাট নবাব এবং বেগম ও শাহজাদীগণ পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! বাঙ্গালীদিগের পূর্বপুরুষগণ অবলুণ্ঠিত মস্তকে যাঁহাদের পদধূলি শিরে ধারণা করিয়া ধন্য হইয়াছিল, নিখিল জগৎ যে মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র-প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় এবং বীর্য-মহিমায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল—হায়! আজ সেই বিশ্বপূজ্য মুসলমান, বাঙ্গালী লেখকদিগের অপার কৃপায় অতি ঘৃণিত পিশাচ এবং অস্পৃশ্য কাম-কুক্কুররূপে চিত্রিত এবং বর্ণিত! হায়! যে নূরজাহান, রেজিয়া সোলতানা, জেবুন্নেছা, জাহানারা, মমতাজ মহল, দৌলতুন্নেসা প্রভৃতি বেগম ও শাহজাদী-গণের পুণ্যপ্রতিভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের নামকরণেও পুণ্য সঞ্চার হয়, হায়! সেই সব বিদূষী পূতচরিত্রা সম্মানিতা মহিলা-দিগকেও যার-পর-নাই হীন চরিত্রা এবং হিন্দু-প্রেমোন্মাদিনী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে! এ অত্যাচার, এ অবিচার একেবারেই অসহ্য! এ যন্ত্রণা একেবারেই মর্মন্তুদ!

ইহা ঐতিহাসিক ধ্রুবসত্য যে, মুসলমানদিগকে পৃথিবীর সকল জাতিই কন্যাদান করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, কিন্তু মুসলমান কখনও অমুসলমান বা কাফেরকে কন্যাদান করেন নাই। যে সমস্ত আরব, তুর্কী, ইরাণী এবং পাঠান ও মোগল ভারতবর্ষে বিজয়ী বেশে তরবারি হস্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই সপত্নীক আসিয়াছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে হিন্দু ললনার পাণিপীড়ন করিতে হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ হইলেও পরে মুসলমান বিজয়ের পরে ভারতের হিন্দু-

মুসলমানে গভীর শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বত্রই অনুবিরত হিন্দু-মোসলেমে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। "রাজপুতেরা মুসলমানের মাতুল কুল"—ইহা আজিও প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে। ফলতঃ তদানীন্তন হিন্দু রাজরাজড়ারা পর্যন্ত মুসলমানকে কন্যাদান করা অগৌরব বলিয়া আদৌ বোধ করেন নাই। বাদশাহ্‌দিগের জীবনী এবং ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু নরপতিরা বাদশাহ্‌ নবাব এবং বিজয়ী বীরদিগকে স্বেচ্ছায় উপঢৌকন স্বরূপও কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আর ইহা ভারতবর্ষের অতীব প্রাচীন প্রথা।

কিন্তু আধুনিক নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকেরা কল্পনায় ইহাকে জাতীয় কলঙ্ক মনে করিয়া নিদারুণ রোষাবেশে অতুল গৌরবান্বিতা পুণ্য-শ্লোকা মুসলমান মহিলাগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হিন্দু নায়কের প্রেমোন্মাদিনী-রূপে চিত্রিত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন! কার্যতঃ যাহা কখনও ঘটে নাই, কল্পনায় তাঁহারা লেখনী পরিচালনা করিয়া সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে একেবারে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই এই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং মর্মবিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বগুড়ার অধিবেশনে আমি অতি তীব্র এবং যুক্তিসঙ্গত তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলাম। দেশের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য, হিন্দু-মুসলমানের সখ্য ও সদ্ভাবের জন্য হিন্দু সুধীমণ্ডলের নিকট মুসলমান চরিত্রকে কুৎসিত না করিবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার সে অনুরোধ বিফল হইয়াছে! বাঙ্গালার ছাপাখানা হইতে আজও শতধারে বর্ষার প্লাবনের ন্যায় রাশি রাশি হলাহলপূর্ণ নাটক-নভেল বাহির হইয়া ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অন্যদিকে আবার কলিকাতা এবং মফঃস্বলের শত শত স্থানে যাত্রা ও থিয়েটারের এই সমস্ত অলীক কলঙ্ক-কুৎসা-পরিপূর্ণ ঘটনার অভিনয় হইয়া মুসলমান ছাত্র ও সাধারণ লোকের মনে হীনতা ও নীচতার বীজ বপন করিয়া মুসলমানের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার মূলে এমন নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতেছে যে, তাহাতে মুসলমানদের উন্নতি বা জাতীয় কল্যাণের

আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে।

বীর্যবান মহাপরাক্রান্ত শত্রুর সহস্র সহস্র তোপ-বন্দুকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত হইলে যে ক্ষতি না হইত, দুর্বল বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র লেখনী সঞ্চালনে তাহার অধিক ক্ষতি হইতেছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী লেখকের এই কাপুরুষোচিত হীন আক্রমণে শিক্ষিত মুসলমানদের অন্তঃকরণে যে সংক্ষোভ ও ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহার পরিণামও অতীব মারাত্মক। এ বিদ্বেষ যেরূপ দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতেছে, তাহার ফল উভয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরবগানে বিভোর হইয়া কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনীয় পরিচালনায় দারুণ অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় "রায়-নন্দিনী" রচনা করিয়াছি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহাই অতীতের স্বাভাবিক চিত্র। মুসলমানের চরিত্রবল, মহত্ত্ব এবং স্বজাতি-প্রেমের উন্মাদনা সকল জাতি অপেক্ষা বেশি ছিল, ইহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা সহস্র বৎসর পর্যন্ত মুসলমান কখনও নিখিল ধরণীর একচ্ছত্র অধিপতি, ধর্মগুরু ও সভ্যতার শিক্ষক-রূপে বিরাজ করিতে পারিতেন না। আজও বিশ্ববক্ষ হইতে তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাবের জ্যোতিঃ নিবিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালীদিগের রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা নিদারুণ মর্মজ্বালা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উপন্যাস পাঠে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পক্ষান্তরে আশা করি, বাঙ্গালী লেখকগণ তাঁহাদের মোসলেম কুৎসাপূর্ণ জঘন্য উপন্যাসগুলির পরিবর্তন করিয়া সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীর্যপুষ্ট গৌরববিমণ্ডিত আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন। নতুবা তাঁহাদের চৈতন্য উৎপাদনের জন্য আবার ঐসলামিক তেজঃদীপ্ত অপরাজেয় বজ্রমুখ লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইবে।

সৈয়দ সিরাজী

বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

২০শে ফাল্গুন, ১৩২২ সন

শিরাজী সাহেবের অপ্রকাশিত স্বহস্ত-লিখিত 'জাহানারা' উপন্যাসের
পাণ্ডুলিপির প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

জাহানারা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচি

রায়-নন্দিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্দিরে

যখন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দুর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইস্‌লামের অর্ধচন্দ্র-শোভিনী বিজয়-পতাকা গর্ব-ভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল,—যখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রখর প্রভায় বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল,—যখন মুসলমানের লোক-চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়-ভেরী, জলদমন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল—যখন মুসলমানের শক্তি-মহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্যে ভারত-ভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল—যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ-কাকলীর সঙ্গে, মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয়-মহিমার আনন্দসংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল—যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল—

যখন ব্রহ্মতেজঃ-সন্দীপ্ত দরবেশদিগের সাধনায় ইস্‌লামের একত্ববাদ ও সাম্যের নির্মল কৌমুদীরাশি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী-ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল—যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব-উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল---যখন উত্তরে শ্যাম-কাননাবৃত গগন-বিচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি তাহার গম্ভীর মেঘ-নির্ঘোষে ও চপলা-বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তার ভারত-সমুদ্র অনন্ত কলকল্লোলে ও অনন্ত-তরঙ্গ বাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান-পরম্পরার বিশুভ্র-যশোগাথা কীর্তন করিতেছিল, ---যখন পৌরাণিক বংশমর্যাদাভিমানী চন্দ্র, সূর্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শক, রাজপুত, জাঠ গোত্রীয় অসংখ্য জাতি, মহিমান্বিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ-বিদলনকারী চরণতলে ভূনত-জানু ও বিনত-মস্তক হইতে কুণ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল---যখন নগরীকুলসম্রাজ্ঞী বিপুল বীর্য ও ঐশ্বর্যশালিনী

দিল্লীর তখতে অধ্যবসায়ের অবতার প্রথিত-যশা আকবরশাহ্ উপবেশন করিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন যখন বীরপুরুষ দায়ুদ খাঁ, সুজলা-সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য-উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরব-স্পর্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন - সেই সময়ে একদিন বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা দশমীতে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শ্রীপুর ও খিজিরপুরের মধ্যবর্তী রাস্তার এক চটিতে কতকগুলি রক্ষীসহ একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাল্কীখানা বিবিধ কারুকার্যে অতি চমৎকাররূপে সজ্জিত। পাল্কীর উপরে ঝালরযুক্ত জরীর চাদর শোভা পাইতেছে। পাল্কীর সঙ্গে দুইজন মশালচী। তাহাদের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড মশাল কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকাররাশি অপসারিত এবং সেই বৃক্ষ-সমাকীর্ণ চটির বহুস্থান আলোকিত করিয়া শাঁ শাঁ করিয়া জ্বলিতেছিল। বারজন রক্ষী, আটজন বেহারা এবং তদ্ব্যতীত তিনজন ভারী ও একজন সম্ভ্রান্ত যুবক পাল্কীর সঙ্গে ছিল। রক্ষী বারজনের মধ্যে তিনজনের হস্তে বন্দুক, পাঁচজনের হস্তে রামদা এবং চারিজনের হস্তে তেল-চুক্‌চুকে রূপা দিয়া গাঁট-বাঁধা বাঁশের পাকা লাঠি। সকলেই পদাতি; কেবল সম্ভ্রান্ত যুবকটি একটি বলিষ্ঠ অশ্বের আরোহী। যুবকের গায়ে পিরহান, পরিধানে ধুতি, মস্তকে একটি জরীর টুপী, কটীতে চাদরের দৃঢ় বেষ্টনী, পায়ে দিল্লীর সুন্দর নাগরা জুতা। যুবকের কটীতে একখানি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র তরবারি দুলিতেছিল। যুবকের বয়স অন্যূন বিংশতি বর্ষ। চেহারা বেশ কমনীয় ও পুষ্ট; গঠন দোহারা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ মাংসল সেরূপ পেশীযুক্ত নহে। যুবক যে সম্ভ্রান্ত বংশের, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বেহারারা চটির একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী ঘন পত্রযুক্ত বটবৃক্ষের মূলে পাল্কী নামাইয়া কাঁধের গামছা দিয়া দুই চারিবার হাওয়া খাইয়া গাছের নিকটেই ঘুরিতে লাগিল। যুবকটি ঘোড়া হইতে নামিয়া একটি রক্ষীর কোমরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র বিড়িদান হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারী করিতে লাগিল। একজন রক্ষী একটি আমগাছের চারার সহিত ঘোড়াটিকে আট্‌কাইয়া রাখিল। ভারীরা ভার নামাইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর তামাক সাজিয়া সকলেই তামাক খাইতে লাগিল। একটি রক্ষী ভার হইতে একটি ভাল কাল-মিশ্‌মিশে নারিকেলী হুঁকা বাহির করিয়া একটু ভাল তামাক যুবককে সাজিয়া দিল। যুবক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ছাড়িতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে বট গাছের তলা হুক্কার সুমধুর গুড়্ গুড়্ ধ্বনিতে ও কুণ্ডলীকৃত ধূমে সজাগ স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসের নির্মেঘ আকাশ, স্থির প্রশান্ত সাগরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। অসংখ্য সমুজ্জ্বল নক্ষত্র নীলাকাশে, নীল সরোবরে হীরক-পদ্মের ন্যায় দীপিয়া দীপিয়া জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকার, তাহার আলোকে অনেকটা তরল বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাস নিরুদ্ধ। উচ্চশির বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত কাঁপিতেছে

না। বেজায় গরম! অত্যন্ত শীতল-রক্ত ব্যক্তির গা দিয়াও দরদর ধারায় ঘাম ছুটিয়াছে। চটির পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার অপর দিকস্থ সবুজ জঙ্গলে অসংখ্য জোনাকী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অথবা প্রেমিক-কবিচিত্তের মধুময়ী কল্পনা-বিলাসের ন্যায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া এক চিত্তবিনোদন নয়ন-মোহন শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। দূরে একটি উন্নত আমগাছের শাখায় বসিয়া একটি পাপিয়া তাহার সুমধুর স্বরলহরীতে নীরব-নিথর পবন-সাগরে একটি অমৃতের ধারা ছুটাইয়া দিতেছিল। সেই স্বরের অমৃত-প্রবাহ, কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে—দূরে—অতি সুদূরে—নীলাকাশের কোলে মিশাইয়া যাইতেছিল। কিছু পরে দূরবর্তী গ্রামের বংশকুঞ্জের মধ্যে আরও একটি পাপিয়া, আম্রশাখায় উপবিষ্ট পাপিয়াটির প্রত্যুত্তরচ্ছলে গাহিতে লাগিল। উহা স্বপ্নরাজ্যের সাগর-পারস্থ বীণাধ্বনির ন্যায় মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার সেই ঝঙ্কারও কাঁপিয়া কাঁপিয়া শ্রুতি-মূলে প্রেম-স্মৃতি জাগাইতেছিল। সকলের তামাকু সেবন শেষ হইলে যুবকটি বলিল, "শিবু, আর দেরী করা সঙ্গত নয়। পাল্কী উঠাও। সাদুল্লাপুর এখনও প্রায় দু'ক্রোশ। অনেক রাত্রি হচ্ছে, স্বর্ণের বোধ হয় ক্ষুধাও লেগেছে।" শিবনাথ বলিল,—"কর্তা! আমরা এতক্ষণ সাদুল্লাপুরের ঘাটে যেয়ে পহুঁছতাম; কেবল ঘাট-মাঝির দোষেই এত বিলম্ব হল। বেটা অমনতর ভাঙ্গা নৌকায় খেয়া দেয় যে, আমার তো দেখেই ভয় করে। যাবার সময় ঐ নৌকায় কিছুতেই পার হব না।"

যুবক ঃ যাবার সময় ভাল নৌকা না পেলে বেটার হাড্ডী চূর করে দিব। আজ ভাঙ্গা নৌকার জন্য ক্রমে ক্রমে পার হতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে।

এমন সময় পাল্কীর দ্বার খুলিবার খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল। যুবক মুখ ফিরাইয়া পাল্কীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি স্বর্ণ! বড় গরম বোধ হচ্ছে? বাইরে বেরুবি?"

পাল্কীর ভিতর হইতে মধুর ঝঙ্কারে উত্তর হইল, "হাঁ দাদা! বড় গরম! সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে গেছে। পাল্কীর ভিতরে বসে বসে হাত-পা একেবারে লেগে গেছে।"

যুবক ঃ শিবু! পাল্কীর দরজা খুলে দাও। আর একখানি গালিচা ঐ ঘাসের উপর বিছিয়ে দাও। স্বর্ণ একটু বাইরে শরীর ঠাণ্ডা করুক। বড় গরম পড়েছে। স্বর্ণ একটু ঠাণ্ডা হলে তোমার পাল্কী উঠাও।

শিবনাথ যুবকের আদেশ মত ভার হইতে একখানি গালিচা লইয়া গাছ হইতে একটু দূরে খোলা আকাশের নীচে, যেখানে খানিকটা জায়গা ঘাসে ঢাকা ছিল, সেইখানে বিছাইয়া দিল। তারপর পাল্কীর দরজা খুলিয়া ডাকিল, "দিদি ঠাকরুণ! বাইরে আসুন। বিছানা পেতেছি।"

সহসা পাল্কীর ভিতর হইতে বহুমূল্য পীতবর্ণ বাণারসী শাড়ী-পরিহিতা, রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্কৃতা এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা অপূর্ব ষোড়শী সুন্দরী বহির্গত

হইল। তাহার রূপের প্রভায় মশালের উজ্জ্বল আলোকও যেন কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া পড়িল। তাহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত রক্তকমল-সদৃশ পাদ-বিচুম্বী মঞ্জীর-শিঞ্জনে মেদিনী পুলকে শিহরিতা হইল। তাহার বিশাল নেত্রের মাধুর্যময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দৃষ্টি-পথবর্তী দূরব্যাপী অন্ধকার তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার নিঃশ্বাসে বায়ুতে মনোহর মৃদু কম্পন পরিস্ফুট হইল।

যুবতী যখন পাল্কীর ভিতর হইতে নির্গত হইল, তখন মনে হইল, যেন পুষ্পকুন্তলা রক্তাম্বরা বিচিত্রবর্ণশোভী-অম্বুদাঞ্চলা বিশ্ববিনোদনী হাস্যময়ী উষাদেবী পূর্বাকাশের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক ধরণীবক্ষে নবজীবনের পুলক-প্রবাহ সঞ্চারের নিমিত্ত, নীলিম প্রশান্ত সাগরের শ্যামতটে আবির্ভূত হইলেন। যুবতী এমনি সুন্দরী! এমনি বিনোদিনী!! এবং এমনি মাধুর্যময়ী!!! যুবতী ধীরে ধীরে যাইয়া গালিচার উপর উপবেশন করিল। যুবতীর রূপের ছটায় সে জায়গাটা যেন নিতান্তই বিশোভিত হইয়া উঠিল। যুবতীর অঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট আতরের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া চটিটাকে আমোদিত করিয়া তুলিল। যুবতী সেখানে বসিয়া তাম্বুল-করঙ্ক হইতে তাম্বুল লইয়া কয়েকটি যুবককে দিয়া নিজেও দুই একটি চর্বণ করিতে লাগিল। চটিতে লোকজন তখন কেহ ছিল না। একখানা বাংলা ঘরে একটি মুদি দোকান। তাহাতে একজন মুদি ও একটি ছোকরা মাত্র ছিল। গরমের জন্য ছোকরাকে ঘরে রাখিয়া মুদি বাহিরে আসিয়া গাছের নিকটে খড়ম পায়ে গামছা কাঁধে দাঁড়াইয়া বেহারা ও রক্ষীদিগের হাবভাব কৌতূহলভরে দেখিতেছিল। যেখানে চটি, তাহার নিকটেই প্রকৃতি দেবীর সুবিশাল শ্যামচ্ছত্ররূপ কয়েকটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে একটি বড় হাট বসিয়া থাকে। হাটের দক্ষিণ পার্শ্বেই একখানি বৃহৎ ঘর। তার চারিদিকে মাটির দেয়াল। যে কেহ রাত্রিকালে এখানে আশ্রয় লইতে পারে। মুদির দোকানে চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ী, গুড়, হাঁড়ি, খড়ি সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা হইলে রান্না করিয়া খাইয়া থাকিতে পারা যায়।

নিকটে একটা বড় ইঁদারা আছে। মুদি কেবল গরমের জন্যই বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নহে। অনেক লোক দেখিয়া সে আজ অনেক চাল, ডাল, হাঁড়ি, খড়ি বিক্রয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে যখন বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বিক্রমপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা কেদার রায়ের লোকজন তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া শ্রীপুর হইতে সাদুল্লাপুরে যাইতেছে, তখন তাহার উচ্ছ্বসিত মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। পাছে রাজার লোকেরা তাহার দোকান হইতে জিনিষপত্র বা লুটিয়া লয়!

যুবক রাস্তার ধারে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারী করিতেছিল। বেহারা, রক্ষী ও ভারীরা গাছের তলায় তামাকু সেবন এবং নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতেছিল। পশ্চিমদিক হইতে সহসা একটু ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হইয়া

যুবকের বাবরী চুল দোলাইয়া গেল। যুবক পশ্চিমদিকে তাকাইয়া দেখিল, একখণ্ড কাল মেঘ গগন-প্রান্তে মাথা তুলিয়া দৈত্যের মত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতেছে। মেঘের চেহারায় বুঝা যাইতেছিল যে, উহা ঝটিকা-গর্ভ।

যুবক মেঘ দেখিয়া একটু ব্যস্ত কণ্ঠে বলিল,—"শিবু! পশ্চিমে মেঘ করেছে! সকালে পাল্কী তোল।" মেঘের কথা শুনিয়া সকলে গাছের নীচ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই একখানা মেঘ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। শিবু মেঘ দেখিয়া যুবকের উদ্দেশ্যে বলিল,—"দাদা মশায়! মেঘ তো খুব বেড়ে চলেছে। পাল্কী এখন চটিতে রাখা যাক্। মেঘটা দেখেই যাওয়া যাবে।"

যুবক ঃ "মেঘ আসতে আসতে আমরা অনেক দূর যেতে পারব। যেরূপ হাওয়া দিচ্ছে, তাতে মেঘখানা উড়েও যেতে পারে।" বলিতে বলিতে হাওয়া একটু জোরেই বহিতে লাগিল এবং মেঘের উপরের অংশটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলে অনুমান করিল যে, মেঘ আর জমাট বাঁধিতে পারিবে না।

একটু হাওয়া ব্যতীত আর কোনও আশঙ্কা নাই। তখন বেহারারা "জয় কালী" বলিয়া পাল্কী কাঁধে তুলিয়া "হেঁই হেঁই" করিতে করিতে সাদুল্লাপুরের দিকে ছুটিল। শীতল বাতাসে তাহাদের বড় স্ফূর্তি বোধ হইতেছিল। দুইটি মশাল অগ্র ও পশ্চাতে বায়ু-প্রবাহে শাঁ শাঁ করিয়া তীব্র শিখা বিস্তারপূর্বক অন্ধকার নাশ করিতেছিল। কিন্তু কয়েক রশি যাইবার পরেই কড়্ কড়্ গড়্ গড়্ করিয়া মেঘ একবার ডাকিয়া উঠিল এবং তারপর মুহূর্তেই সমুদ্রের প্রমত্ত প্লাবনের ন্যায় আকাশ-রূপ বেলাভূমি যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দিগ্মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত হইল। মাথার উপরে ক্রুদ্ধ মেঘের স্তর ক্রমাগতই গড়াইতে ও গর্জন করিতে লাগিল। পবন হুঙ্কার দিয়া চতুষ্পার্শ্বের গাছপালার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে চটাপট বৃষ্টির ফোঁটাও পড়িতে আরম্ভ করিল। যুবক অশ্বারোহণে অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল,— "ওরে, তোরা সকলে আয়! চক্রবর্তীদের শিব-মন্দির সম্মুখেই, রাস্তার ধারে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে।" বেহারা ও সর্দারের তাড়াতাড়ি ছুটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লুণ্ঠন

শিব-মন্দির প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময় চতুর্দিকে "রি-রি-রি-মার-মার" শব্দ উত্থিত হইল। সর্দার ও রক্ষিগণ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পর্তুগীজ ও বাঙ্গালী দস্যুগণ তাহাদের উপর লাঠি ও সড়কি বর্ষণ করিতে লাগিল। বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া, রক্ষীরা অস্ত্র ফেলিয়া, সেই ভীষণ অন্ধকারে

দিগ্বিদিকে বৃক-তাড়িত শৃগালের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে আছাড় পড়িয়া, হোঁচট খাইয়া গাছের বাড়ি খাইয়া যাহারা পলাইল তাহাদেরও অনেকে সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। পাঁচজন প্রহরী, দস্যুদের বিষম প্রহারে প্রাণত্যাগ করিল।

একজন মশালধারী মাঝী আক্রান্ত হইয়া, জ্বলন্ত মশালের আগুনে আততায়ীকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে একজন পর্তুগীজ দস্যু তাহাকে তরবারির ভীষণ আঘাতে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে জখম হইল! দূরে অশ্বারোহী যুবকের কণ্ঠ হইতে একবার আর্ত চিৎকার শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু এই ভীষণ দুর্যোগ ও পবনের মাতামাতির হুঙ্কারে সেই আর্ত চিৎকার গ্রামবাসী কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৃষ্টিও যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে পড়িতে লাগিল। যেমন সূচিভেদ্য অন্ধকার, তেমনি মেঘের ঘন ভীষণ গর্জন এবং তুমুল বর্ষণ। মাঝে মাঝে চঞ্চলা দামিনীলতা ক্ষণকালের জন্য রূপের লহরী দেখাইয়া করাল ভ্রূভঙ্গীতে এই দুর্যোগের কেবল ভীষণতাই বৃদ্ধি করিতেছিল। দস্যুরাও সেই ভীষণ দুর্যোগে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা পালকীখানা তুলিয়া লইয়া নিকটবর্তী শিব-মন্দিরের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেও বৃষ্টির ঝাপ্টা তাহাদিগকে সিক্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রস্তরের আঘাতে রুদ্ধ দ্বারের তালা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। তারপর চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া মন্দিরের প্রদীপ জ্বালাইল। প্রদীপের আলোকে সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত হইল। মন্দিরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ভিতরের চুণকাম ধব্ ধব্ করিতেছে। একটি কাল প্রস্তরের বেদীর উপরে এক হস্ত অপেক্ষা দীর্ঘ সিন্দুরচর্চিত বিল্বপত্র ও পুষ্প-পরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পার্শ্বে একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা প্রভৃতি পূজার উপকরণ রহিয়াছে। দস্যুদের মধ্যে পনের জন শিবলিঙ্গ দেখিয়া "জয় শিব শঙ্কর বোম ভোলানাথ" বলিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিল। তারপর একজন বলিয়া উঠিল,—"বাবা ভোলানাথ! আজ তোমার আশীর্বাদেই আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এ দারুণ দুর্যোগে তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ।" অবশিষ্ট পাঁচজন পর্তুগীজ দস্যু, তাহারা প্রস্তরের এই বীভৎস লিঙ্গকে ভক্তি করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! তাহারা আরও বিবিধ প্রকারের সুন্দর ও ভীষণ মূর্তির সম্মুখে হিন্দুদিগকে গড় করিতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এমন উর্দ্ধলিঙ্গও যে উপাস্য দেবতা হইতে পারে, ইহা কখনও তাহাদের ধারণা ছিল না। একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের এ লিঙ্গ পূজার মতলব কি আছে?" তখন সেই বাঙ্গালী দস্যুদের মধ্য হইতে একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠকায় উজ্জ্বল-চক্ষু যুবক বলিল,—"গডড্রে! তুমি ক্রেস্তান, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে? লিঙ্গই যে

পরম বন্ধু, লিঙ্গই তো স্রষ্টা, লিঙ্গ হইতেই যে আমরা জন্মিয়াছি। তাই লিঙ্গ পূজা করিতে হয়।"

গডফ্রে ঃ হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ হইটে জন্ম, বেশ কটা আছে। কিন্তু আমি মনে করি, লিঙ্গ পূজা টোমাডের... পক্ষে ভাল হয়। টোমরা পুরুষ মানুষ আছ,...টোমরা শিবের লিঙ্গটা পূজা করিটে যাইবে কেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ পূজা!!

এমন সময় পাল্কীর মধ্যে ফিঁক্‌রিয়ে ফিঁক্‌রিয়ে কাঁদিবার শব্দ শোনা গেল। সেই বলিষ্ঠকায় যুবকটি তখন পাল্কীর দরজা খুলিয়া প্রদীপটা লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! ক্রন্দন করবেন না। ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমরা আপনার কোন অনিষ্ট করবো না। আমরা যশোহরের অধীশ্বর প্রবল-প্রতাপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের লোক। মহারাজ আপনাকে বিবাহ্ করবার জন্য আপনার পিতা রাজা কেদার রায়ের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আপনার পিতা বহু সপত্নীর ভয়ে আপনাকে প্রতাপাদিত্যের করে সমর্পণ কোর্তে রাজি হননি; আপনি অবশ্য তাহা অবগত আছেন। তাই আপনাকে আমরা লুঠে নেওয়ার জন্য এক বৎসর পর্যন্ত সুযোগ অনুসন্ধান করছিলাম। আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি আমাদের মহারাজের সর্বাপেক্ষা পেয়ারের রাণী হবেন। চল্লিশ রাণীর উপরে আপনি আধিপত্য কোর্বেন। আর এরূপ লুঠে নেওয়ায় আপনার পিতার পক্ষে কোন কলঙ্কের কথা নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা দেবীকে মহাপুরুষ অর্জ্জুন হরণ করেছিলেন। তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বরং অনুরাগীই হয়েছিলেন।" এমন সময় দরজায় যুগপৎ ভীষণ পদাঘাত ও বীর কণ্ঠে "কোন্ হ্যায়! দরওয়াজা খোল" শ্রুত হইল। ভীষণ পদাঘাতে দ্বারের ভিতর দিকের হুড়কা ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। সহসা কম্পিত শিখা-প্রদীপের ক্ষীণালোক সেই আগন্তুকের মুখের উপর পড়ায় দস্যুরা কম্পিত হৃদয়ে দেখিল,—এক তেজঃপুঞ্জ-বীরমূর্তি, উলঙ্গ-কৃপাণ-পাণি উষ্ণীষ-শীর্ষ মুসলমান যুবক, রোষ-কষায়িত-লোচনে মন্দির-প্রবেশে উদ্যত। যুবকের প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু হইতে কালানলজ্বালা নির্গত হইতেছে। দস্যুরা মুহূর্তমধ্যে লাঠি তরবারি লইয়া প্রহার-উদ্যত-বাহু হইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিল,—"কে তুমি? তুমি এখানে কেন? পলায়ন কর, এ শিব-মন্দির, এখানে মুসলমানের আশ্রয় নাই।" দস্যুদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই যুবকের ভীষণ তরবারি-আঘাতে একজন দস্যুর বাহু ছিন্ন এবং অপরের স্কন্ধ ভীষণরূপে কাটিয়া গেল। তখন দস্যুগণ প্রমাদ গণিয়া সকলে ভীষণ তেজে এক সঙ্গে তাঁহার উপর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইবার উপক্রম করিল। যুবক কৌশলে দ্বারের বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে তরবারি তুলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আক্রমণোদ্যত-দস্যু-মস্তক দ্বারের ভিতরে আসিবামাত্রই তাঁহার শাণিত কৃপাণের বজ্র প্রহারে ছিন্ন হইতে লাগিল। লাঠি ও

গ্রামের দশজন তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া লুটিয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচজন নিহত এবং সাতজন ভীষণরূপে জখম হইল। রক্তধারা আসিয়া বাহিরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। যুবকের বীর বিক্রম এবং অস্ত্র সঞ্চালনের অমোঘতা দর্শনে অবশিষ্ট পর্তুগীজ ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সকলে বীর যুবকের পদে নিরীহ মেষের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গড়ফ্রে তাহার বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত করিয়া কহিল, "কভি নেহি, আভি হাম খতম করে গা।" সে এই বলিয়া যুবককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। যুবক চকিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। পিস্তলের গুলী মাথার উপর দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল। যুবক পর মুহূর্তে চকিতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রসারিত করে তরবারি আস্ফালন করিলেন। তরবারি নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকায় গড়ফ্রের মস্তকটি গ্রীবাচ্যুত হইয়া পক্ক তালের মত সশব্দে ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া মন্দিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। শিব-মন্দিরে মাত্র একটি দ্বার, সুতরাং দস্যুদিগের পলায়ন করিবার উপায় ছিল না। এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিবারও সুবিধা ছিল না। যুবক দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। দুইজনের বেশী একসঙ্গে দ্বারের ভিতরে পাশাপাশি দাঁড়ান যাইতে পারে না।

যে দ্বারের নিকটবর্তী হইতেছিল, তাহারই মস্তক যুবকের অসি-প্রহারে ভূ-চুম্বন করিতেছিল। দস্যুগণ প্রাণ-ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারে সন্ত্রস্ত অবস্থায় মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ায় সমস্তই ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার—আর অন্ধকার! নিজের শরীর পর্যন্তও দেখা যাইতেছে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যুবক অবিরল বারিধারায় সিক্ত হইতেছিলেন। বৃষ্টি তখনও ঘন ধারায় অবিরাম বর্ষিতেছিল। বাতাস হুঙ্কার দিয়া এক একবার বড় বড় গাছের মাথা দোলাইয়া পাতা উড়াইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। যুবক অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, "দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অন্ধকারের মধ্যে অলক্ষ্যে আসিয়া দস্যুগণ সহসা আক্রমণ করিতে পারে।" এজন্য দরজা টানিয়া বাহির হইতে বন্ধ করায় দস্যুরা আরও ভীত হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র অথবা বৃষ্টি ও দুর্যোগ থামিয়া গেলে আরও লোকজন আসিয়া পড়িতে পারে। তাহারা বন্দী হইলে কেদার রায় যে জীবন্ত প্রোথিত করিবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন দস্যুরা মন্দিরের ভিতর হইতে অতীব করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হুজুর! আমাদিগকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করুন। আমরা নরাধম প্রতাপাদিত্যের প্ররোচনায় বড়ই অন্যায় কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলাম। আমাদের সমুচিত শিক্ষা ও দণ্ড হয়েছে। দোহাই আপনার, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মা কালীর নামে শপথ করছি, জীবনে কদাপি আর এমন কার্যে লিপ্ত হব

না।"

দস্যুদের কাতরোক্তি শুনিয়া বীর যুবক হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে ঝটিকা যেন ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। যুবক বলিলেন, "রে নরাধম পাষণ্ডগণ, তোদের মত কাপুরুষগণকে বধ করে কোন মুসলমান কখনও তাঁর তরবারিকে কলঙ্কিত করেন না। কিন্তু সাবধান! আর কখনও পরস্ত্রী বা কন্যা হরণ-রূপ জঘন্য কার্যে লিপ্ত হস্ না। এখন তোরা মন্দিরের প্রদীপ জ্বেলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে আমার সম্মুখ দিয়ে একে একে বের হয়ে চলে যা। আমি তোদের অভয় দিচ্ছি। খোদা তোদের সুমতি দিন। খোদা সর্বদা জেগে আছেন, ইহা বিশ্বাস করিস। আমি খিজিরপুরের ঈসা খাঁ। বিশেষ কোনও প্রয়োজনে মুরাদপুরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপূর্ব কৌশল! তিনি আমাকে পথ ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছেন। তাই আজ কেদার রায়ের কন্যা পেল এবং তোরা সমুচিত শিক্ষা লাভ ও শাস্তি ভোগ করলি!"

দস্যুরা বারভূঁইয়ার অধিপতি প্রবলপ্রতাপ নবাব ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর নাম শুনিয়া আরও বিস্মিত, চমৎকৃত এবং ভীত হইয়া পড়িল। করুণ কণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হুজুর! আমাদের বেআদবী মাফ করুন! হুজুরকে আমরা চিনতে পারি নাই। হুজুরকে চিনতে পারলে, আমরা তখনই হুজুরের পায় আত্মসমর্পণ করতেম। তা আমাদের মত ছোটলোক হুজুরকে চিন্‌বে কি করে, হুজুর! আমরা এ কাজে প্রথমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। মহাপাতক মনে করে ভীত হয়েছিনু। কিন্তু আমাদের দেশের রাজসভার সেই বড় বামুন ঠাকুর আমাদের সামনে তার লম্বা টিকি নেড়ে তালপাতার কি এক সংহিতা না পুঁথি খুলে বল্লে যে, 'কন্যা চুরি করে বিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এতে কোন পাতক নেই।' তাই আমরা রাজী হয়ে এক বৎসরকালে দাঁও খুঁজে বেড়াচ্ছিনু। আজ সুযোগ পেয়েছিনু! কিন্তু খুব শিক্ষা হল।"

ঈসা খাঁ স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে তেজের সহিত বলিলেন, "সে বামুন ঠাকুর হয়ত শাস্ত্রের কিছু জানে না। শাস্ত্রে এমন পাপ-কথা লেখা থাকে না। যদি থাকে তবে তা শাস্ত্র নয়।"

দস্যু : আজ্ঞে, আমাদের শাস্ত্রে নাকি সেরূপ বিধি আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। অর্জুন আবার ভগবানের ভগ্নী সুভদ্রাকে নাকি হরণ করে বিয়ে করেছিলেন।

ঈসা খাঁ : আরে, সে গর্ভস্রাব ব্রাহ্মণ তোদের ফাঁকি দিয়েছে। সে বেটা দেখছি তোদের শাস্ত্রের মর্ম বোঝে নাই। অথবা টাকার লোভে কূটার্থ করেছে। বর ও কনে যদি উভয়ে উভয়কে নিজ ইচ্ছায় স্বামী-স্ত্রীরূপে বরণ করে থাকে, আর কনের পিতামাতা যদি কনের সেই বিবাহের প্রতিবাদী হয়, তবে সেই কন্যাকে হরণ করে নিলে পাপ হয় না। কিন্তু সে যে প্রাচীন কালের ব্যবস্থা।

দস্যু : "আজ্ঞে এতক্ষণে বুঝনু। হুজুর ঠিক বলেছেন। হুজুর দেখছি সেই বামুন ঠাকুরের চেয়ে আমাদের শাস্ত্র ভাল বুঝেন। হুজুর! আমরা আর এমন পাপকর্ম কখনই করবো না।" দস্যুরা এই বলিয়া প্রদীপ জ্বালাইল এবং অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া কম্পিত পদে বাহির হইল। ঈসা খাঁ প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, পাঁচজন আহত তখনও জীবিত আছে। দরদর ধারায় তাহাদের রক্তস্রাব হইতেছে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থায় প্রাণে বড়ই ক্লেশ বোধ করিলেন। দুঃখে বলিলেন, "হা হতভাগারা! এমন কার্য কেন কোর্তে এসেছিলি!" তৎপরে নিজের বহুমূল্য উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া স্বহস্তে তাহাদের আহত স্থানে পটী বাঁধিয়া দিলেন। দস্যুরা ঈসা খাঁর মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। একজন রাজার যে এতখানি বীরত্বের সহিত এতখানি দয়া থাকিতে পারে, তাহা প্রতাপাদিত্যের মত পাষণ্ড দস্যু-ব্যবসায়ী রাজার রাজ্যবাসী লোকের পক্ষে ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না। ঈসা খাঁ পটী বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন তোরা শীঘ্র শীঘ্র পালা। রাত্রি প্রভাত হলে কেদার রায়ের এলাকায় থাকা নিরাপদ নহে।"

দস্যুরা দ্রুতপদে বর্ষাপ্লাবন-তাড়িত শৃগালের ন্যায় যারপর নাই শোচনীয় অবস্থায় দ্রুতপদে সেই দুর্যোগের মধ্যে প্রস্থান করিল।

ঈসা খাঁ অতঃপর মন্দিরের মধ্যে সেই জলসিক্ত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। প্রদীপের আলোতে দেখিলেন পাঁচ জন পর্তুগীজ দস্যু এবং দুইজন হিন্দু দস্যু নিহত হইয়া বীভৎস অবস্থায় সেই মন্দিরের তলে পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন্দির রক্তে ভাসিতেছে। ঈসা খাঁ সেই সাতটি দেহ লইয়া বাহিরে দূরে রাস্তার পার্শ্বে একটা গর্তে ফেলিয়া দিলেন। তারপর বাহির হইতে অঞ্জলি করিয়া জল সেঁচিয়া মন্দিরের ভিতর যথাসম্ভব ধুইয়া ফেলিলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঈসা খাঁর পদস্পর্শ করিল। তাহার পর হাস্যমুখে বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন।"

ঈসা খাঁ বলিলেন, "সে জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সমস্তই তাঁর কৃপা।"

স্বর্ণ : তা কি আর বলতে আছে। তাঁর কুদরতের সীমা নাই। আমি যে আজ উদ্ধার পাব, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প এঁটে বসেছিলাম; সমস্ত শরীর ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয়ে কাঁপিতে ছিল, হয়ত এতক্ষণ আমি মৃতদেহে পরিণত হতেম। ধন্য খোদাতালা! কবি সত্যই বলেছেন—

কাদেরা কুদরত তু দারী হরচে খাহি আঁকুনী,
মোরদারা তু জানে বখশি, জেন্দারা কে জাঁকুনী।

হে মহিমাময়! ধন্য তোমার মহিমার অদ্ভুত কৌশল! তুমি মুহূর্তে জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত কর।"

ঈসা খাঁ : আচ্ছা, তোমাদের এত রাত হল কেন? সঙ্গে কত লোক ছিল?

স্বর্ণ ঃ প্রথমতঃ মাথাভাঙ্গা নদীর ঘাট পার হতে অনেক বিলম্ব হয়। খেয়া নৌকাখানি ভাঙ্গা ছিল। তারপর হরিশপুরের চটির কাছে এসে গরমের জন্য সকলেই বিশ্রাম করতে থাকে। সঙ্গে আট জন বেহারা, বার জন রক্ষী, তিন জন ভারী, দুই জন মশালচী এবং দাদা ছিলেন।

ঈসা খাঁ ঃ তোমার দাদাও ছিলেন? তিনি কোথায়? তিনি কি ঘোড়ায় ছিলেন?

স্বর্ণ ঃ হাঁ, তিনি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যেতেছিলেন।

ঈসা খাঁ ঃ তাঁকে তো দস্যুরা আক্রমণ করে নাই?

স্বর্ণ ঃ কেমন করে বলব? কয়েকবার তাঁর উচ্চ চীৎকার শুনেছিলাম। সম্ভবতঃ তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে দূরে চলে গিয়েছেন।

ঈসা খাঁ ঃ তোমাদের এতগুলি লোক থাকতে, বিশেষতঃ বার জন রক্ষী, তাহাতে দস্যুরা আক্রমণ করিল কোন্ সাহসে?

স্বর্ণ ঃ আমাদের সকলেই অপ্রস্তুত ও গাফেল ছিল। দস্যু আক্রমণ করবে এ কখনও ভাবি নাই। সর্দার সঙ্গে আনা, কেবল ভড়ঙের জন্য। রক্ষীদের মধ্যে সকলেই চাঁড়াল, পর্তুগীজ ও বাগ্দী। ওরা যতই লম্ফঝম্ফ করুক্ না, হঠাৎ বিপদে পড়লে ওরা একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ওদের পাঁচ জনের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু বন্দুকের নলের উপর লাঠি পড়বামাত্রই বন্দুক ফেলে পালিয়েছে। যা হউক, আপনি আর ভিজে কাপড়ে থাকবেন না, অসুখ কোর্তে পারে। আপনি বড়ই শ্রান্ত হয়েছেন। কাপড় বদলান। পাল্কীর ভিতরে আমার কয়েকখানি শাড়ী আছে।

স্বর্ণময়ী এই বলিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর হইতে কাপড় বাহির করিয়া দিল। ঈসা খাঁর সমস্ত বস্ত্রই ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত শাড়ী দুই ভাঁজ করিয়া তহ্বন্দের মত পরিলেন এবং আর একখানি লইয়া গায়ে দিলেন। স্বর্ণময়ী তাঁহার সিক্ত ইজার, পাগড়ী, চাপকান, কোমর-বন্ধ প্রভৃতি নিংড়াইয়া দেওয়ালের গায়ে শুকাইতে দিল এবং পাল্কীতে যে গালিচাখানা বিছানো ছিল, তাহাই বাহির করিয়া মন্দির-তলে বিছাইয়া দিল। ঈসা খাঁ গালিচায় ফরাগৎ মত বসিয়া একটু আরাম বোধ করিলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কী হইতে পানদানী বাহির করিয়া ঈসা খাঁকে দুইটি পান দিল। ঈসা খাঁ আনমনে পান চিবাইতে লাগিল। স্বর্ণময়ী গালিচার এক প্রান্তে বসিয়া ঈসা খাঁর তেজোজ্জ্বল সুন্দর বদনমণ্ডল পিপাসার্ত নয়নে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল।

বাল্য ও কৈশোরের সেই সুপরিচিত মুখখানায় আজ যেন কি এক মদিরাময় সৌন্দর্য দেখিতে পাইল। তাহার শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর নিকট ঈসা খাঁ আজ যেন কি প্রিয়তম, মিষ্টতম এবং সুন্দরতম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। প্রাণের ভিতরে ঈসা খাঁর জন্য কি এক তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ অনুভব

কাঁদিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী হৃদয়ে অনেকের কথা আলোচনা করিল, অনেকের মূর্তি মানসপটে অঙ্কন করিল, কিন্তু ঈসা খাঁর কাছে সকলেই মলিন হইয়া গেল। ঈসা খাঁর ন্যায় হৃদয়বান সুন্দর বীরপুরুষ, যুবতী আর কাহাকেও পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাইল না। ঈসা খাঁ বাল্যকাল হইতেই তাহাকে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ যেন সে আনন্দ শতগুণে উথলিয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ী ঈসা খাঁর সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিল। কত উজ্জ্বল স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। সেই পাঁচ বৎসর হইল, একদিন স্বর্ণময়ী শ্রীপুরের কৃষ্ণদীঘিতে সাঁতরাইতে গিয়া মাঝখানে ডুবিয়া মরিতেছিল! শত শত লোক পাড়ে দাঁড়াইয়া আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল। ঈসা খাঁ তাহাদের বাটীতে পুণ্যাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কতদিন রাজবাড়ীর ওস্তাদ মৌলানা ফখরউদ্দীনের নিকট নিজামীর সেকান্দর-নামা, জামীর জেলেখা এবং ফেরদৌসীর শাহনামার যে সমস্ত অংশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, ঈসা খাঁ তাহাকে তাহা কত সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই একবার রাজবাড়ীর নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি ভীষণ বাঘ আসিয়া কত লোককে খুন জখম করিতেছিল। বড় বড় শিকারীরাও হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে সাহস পাইতেছিল না। তারপর ঈসা খাঁ আসিয়া সকলের নিষেধ ও ভীতি অগ্রাহ্য করতঃ একদিন প্রাতঃকালে তরবারি-হস্তে যাইয়া বিনা হাতীতে সেই বাঘ একাকী মারিয়া আনিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইত্যাকার বহু সুখ ও আনন্দময় স্মৃতি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল এবং ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয়ের সম্মুখে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও ক্ষমতাশালী হৃদয়বান পুরুষরূপে প্রতিভাত করিল। উষার আলোক যেমন তাহার অপূর্ব যাদুকরী তুলিকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর চক্ষুর সম্মুখে নীলাকাশের নীরদমালাকে বিবিধ বিচিত্র মনঃপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়, তেমনি অতীতের স্মৃতি বর্তমান ঘটনার তুলিকায় বিচিত্র উজ্জ্বল রং ফলাইয়া যুবতীর মানস-চক্ষে ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয়ের প্রিয়তম, সুন্দরতম এবং শেষে আকাঙ্ক্ষিতজনরূপে অঙ্কিত করিল! যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার আপাদমস্তকে কি এক বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। যুবতী এতক্ষণ পর্যন্ত ঈসা খাঁর অনিন্দ্যসুন্দর তেজোদ্দীপ্ত বদনমণ্ডল এবং সুদীর্ঘ কৃষ্ণতারা সমুজ্জ্বল ভাসা ভাসা চক্ষুর সৌন্দর্য-সুধা পান করিতেছিল। কিন্তু আর পারিল না, লজ্জা আসিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষুকে নত করিয়া দিল।

যুবতীর হৃদয়ের উপর দিয়া কত কি চিন্তার তুফান ও ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঈসা খাঁ আনমনে পানই চিবাইতেছেন। পান চিবান শেষ হইলে—ছিবড়া ফেলিয়া যুবক একবার নেত্র ফিরাইয়া যুবতীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "স্বর্ণ! এখন কি করা যায়? বৃষ্টি ও তুফান এখনও তো সমানভাবে চলছে। তুমি পাল্কীর ভিতরে শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে। শেষে অসুখ করতে

পারে। বৃষ্টি থামলে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবো।"

যুবকের আহ্বানে পুনরায় কি যেন একটা তড়িৎ স্রোত যুবতীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। যুবতী গলাধরা-স্বরে বলিল, "আমার ঘুম আসছে না। আপনি অনেক হয়রান হয়েছেন, আপনি বরং ঘুমান।" তারপর একটু থামিয়া যুবতী আবার বলিল, "আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, এখানে এ সময় কেমন করে এলেন?"

যুবক : কেন? সে কথা তুমি এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করছ যে?

যুবতী : আপনাকে পরিশ্রান্ত ভেবেই প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে আপনি যে মুরাদপুরে যাচ্ছিলেন, তখন তা দস্যুদিগকে বলেছিলেন।

যুবক : হাঁ, মুরাদপুরেই যাচ্ছিলেম। সেখানে একটা গ্রামের সীমা নিয়ে, আমার অধীন দুইজন জমিদারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। সেখানে পূর্বেই লোক পাঠিয়েছি। আরো লোক সঙ্গে ছিল। ঝড় উঠে এলে, আমি ভট্টচার্যদের বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য দ্রুতগতিতে অশ্ব চালনা করায় তারা পিছনে পড়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই রাস্তায় এসে পড়ি। মন্দিরের নিকটবর্তী হলে, বহু লোকের কোলাহল শব্দ শুনে ও গবাক্ষের ভিতর দিয়ে গৃহের আলো দেখে এখানে আশ্রয় নেব মনে করে ঘোড়া হতে নামি। এটা যে শিবমন্দির তা অন্ধকারে কিছু টের পাইনি। আমি বৈঠকখানা মনে করেছিলাম। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখবর্তী হইবামাত্রই প্রতাপাদিত্যের লোকেরা তোমাকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে, তা তাদের কথা থেকে বেশ বুঝতে পেলাম। ব্যাপার গুরুতর মনে করে আমি ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি এই সম্মুখের গাছের নীচে রেখে বিদ্যুতালোকে মন্দিরটি একবার বেশ ভাল করে দেখে নিলাম। দেখলাম যে, একটি ব্যতীত মন্দিরের দ্বিতীয় দ্বার নাই। দস্যুদের পালাবার কোন উপায় নাই। তখন দ্বারে পদাঘাত করি।

যুবতী : ধন্য আপনার হৃদয়! ধন্য আপনার সাহস ও বীরত্ব!! আপনি একাই অতগুলি দস্যুকে আক্রমণ করে জয়লাভ করলেন। ভগবান্ আপনার দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল করুন।

যুবক : এ আর বেশী সাহসের বা বীরত্বের কথা কি, স্বর্ণ! দস্যুরা বলশালী হলেও, অন্তরে তারা অত্যন্ত ভীরু। যারা পাপকার্য করে, তারা মানসিক বলশূন্য। বাহিরে তারা যতই আস্ফালন করুক না কেন, ভিতরে অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত। আর তোমাকে বিপদগ্রস্ত দেখে, তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য আমার এমন উত্তেজনা এসে পড়েছিল যে, আমি তখন আমার নিজের কোনও বিপদের বা দস্যুদের সংখ্যার বিষয় আদৌ খেয়াল করি নাই।

যুবতী : আপনি আমাকে দু'বার রক্ষা করলেন।

যুবক : আমি কে, যে রক্ষা করব? খোদা রক্ষা করেছেন। আর দু'বার

কোথায়?

যুবতী : খোদাই রক্ষা করেন সত্য, কিন্তু আপনি তো উপলক্ষ বটেন। দু'বার নয় কেন? এই একবার, আর সেই যে কৃষ্ণদীঘি থেকে; ভুলে গেছেন নাকি?

যুবক : না, ভুলে যাইনি। কিন্তু সেবার আরো লোক তো তোমাকে তুলবার জন্য জলে ঝাঁপ পড়েছিল।

যুবতী : পড়েছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পরে, আপনি তখন আমাকে তুলে নিয়ে দীঘির প্রায় কেনারায় এসেছিলেন। আপনি না তুল্‌লে সেদিন আর এতটুকুতেই ডুবে যেতাম।

যুবক : তুমি যাতে ডুবে না যাও, সেই জন্যই খোদা আমাকে তখন ওখানে রেখেছিলেন। কেন? সে কথা এখন তুল্‌লে যে!

যুবতী : না, এমনি মনে প'ল। তবে আমি যখনি বিপদে পড়ি, তখনই যে খোদা আপনাকে আমার উদ্ধারকর্তা করে পাঠান এ এক চমৎকার রহস্য।

ইহা বলিয়া যুবতী মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের দিকে আনমনে একবার দৃষ্টি করিল এবং মনে মনে কি যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

যুবক : তাঁর সবই রহস্য। তাঁর কোন্ কার্যে রহস্য নাই? তাঁর সবই বিচিত্র। ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

যুবতী : যা হক, আপনি না এলে, উঃ! কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হত! আপনাকে দেখে আমার বড়ই সুখ ও আনন্দ হচ্ছে। আপনার কথা আমরা সর্বদাই স্মরণ করি। এবার পুণ্যাহে কত বিনয় করে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হল; তথাপি এলেন না। আপনি না আসায় পুণ্যাহের আমোদও তেমন হয় নাই। আপনি আসবেন বলেই মালাকরেরা কত ভাল ভাল বাজি তৈয়ার করেছিল। বাবা আপনার জন্য কত দুঃখ প্রকাশ করলেন।

যুবক : কি করবো স্বর্ণ! তোমাদের ওখানে আসতে আমারও খুব আনন্দ ও ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেব্‌লা সাহেবের মৃত্যুর পর হতে বিষয়কর্ম নিয়ে এমনি ফ্যাসাদে পড়েছি যে, একটু ফরাগৎ মত দম ফেলবারও আমার অবসর নাই। সর্বদাই মহালে বিদ্রোহ হচ্ছে। সীমা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই চলছে। দাউদ খাঁর পতনের পরে বাঙ্গালা দেশ কেমন অরাজক হয়ে পড়েছে। এদিকে আকবর শাহ্ সমস্ত বাঙ্গালা এখনও দখল করতে পারেননি।

যুবতী : যাক্, সে সব কথা। আপনার বিবাহের কি হচ্ছে?

যুবক : এখনও বিবাহের কিছু হয়নি। কিছু হলে তোমরা ত জেয়াফতই পেতে। মা মাঝে মাঝে বিবাহের কথা বলেন। তবে আমি এখনও বিবাহ সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ভাবি নাই।

যুবতী : এত বয়স হয়েছে। এখনও বিয়ে করবেন না?

যুবক : তা আর বেশী কি? এই তো সবে পঁচিশে পড়েছি। আমাদের মধ্যে

৩০ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রায় বিয়ে হয় না। হিন্দুদের মত আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই।*

যুবতী : বাল্য-বিবাহটা বড়ই খারাপ!

যুবক : নিশ্চয়ই। তাতে দম্পতির স্বাস্থ্য যে কেবল নষ্ট হয়, তা নয়। তাদের সন্তানেরাও অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণ-জীবী এবং রোগপ্রবণ হয়। যে সব দোষের জন্য তোমাদের হিন্দুরা মুসলমানের অপেক্ষা দুর্বল, সাহসহীন ও ভীরু, তাহার মধ্যে এও একটি প্রধান কারণ।

যুবতী : কিন্তু আপনার এখন বিবাহ করা উচিত।

যুবক : তা দেখা যাবে।

যুবতী : খুব সুন্দরী ও প্রেমিকা দেখে বিয়ে করবেন।

যুবক : সুন্দরী ও প্রেমিকা তো চাই-ই বটে। কিন্তু বিয়ে করলে বলিষ্ঠা ও সাহসিনী দেখেও করা চাই।

যুবতী : কেন?

যুবক : তাহলে সন্তানাদিও বলিষ্ঠ ও বীরভাবাপন্ন হবে।

যুবতী : আপনার ছেলে এমনি বীরপুরুষ হবে। আপনার সাহস ও বীরত্বের চার ভাগের এক ভাগ পেলেই সে ছেলে বাঘ আছড়িয়ে মারবে।

যুবক : কেবল পিতা বীরপুরুষ হলেই হয় না, মাতাও বীর্যবতী ও সাহসিনী হওয়া চাই।

যুবতী : তা'হলে স্ত্রীলোকদিগেরও শারীরিক নানাপ্রকার ব্যায়াম এবং অস্ত্রচালনা-কৌশল শিক্ষা করা চাই।

যুবক : নিশ্চয়ই।

যুবতী : তা'হলে আপনাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও ব্যায়াম-চর্চা করে?

যুবক : হাঁ, সম্ভ্রান্ত বংশের সকল স্ত্রীলোককেই যুদ্ধ শিখ্‌তে হয়। আগে এ প্রথা আরও বেশী ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এসে মুসলমানেরাও কেমন বিলাসী, অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যুবতী : আমি তো একটু তীর ও তরবারি চালনার অভ্যাস করেছি। কিন্তু বাবা ব্যতীত আর সকলেই তার জন্য আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে—বলে যে, "মর্দামী শিখ্‌ছে।"

যুবক : তবে তো আজ দস্যুরা বড় বেঁচে গেছে!

যুবতী : আপনি বিদ্রূপ কচ্ছেন, কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র থাক্‌লে আমি দস্যুদিগের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করতেম।

যুবক : বেশ কথা! আমি শুনে খুশী হ'লেম। এইবার একটা বীর পুরুষ দেখে বিয়ে দিতে হবে। দেখো শেষে কোনো কাপুরুষকে শাদী না কর।

---

* ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান সমাজে বাল্য-বিবাহ অজ্ঞাত ছিল।

যুবকের কথা শুনে যুবতীর গোলাপী গণ্ড লজ্জার আক্রমণে পক্ক বিম্ববৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। যুবতীর গণ্ডে ও চক্ষে লজ্জার আবির্ভাব হইলেও, মনটা কেমন যেন একটা আনন্দ-রসে সিক্ত হইয়া গেল।

এদিকে বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায়, ঈসা খাঁ যুবতীকে বলিলেন, "স্বর্ণ। তুমি এখন শোও। আমি বাইরে যেয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখে আসি।"

যুবক এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেলেন। দেখিলেন মেঘ-বিমুক্ত আকাশ নির্মল নীলিমা ফুটাইয়া তারকা-হারে সজ্জিত হইয়া হাস্য করিতেছে। পূর্বদিকে দশমীর চন্দ্র ক্ষুদ্র একখণ্ড কৃষ্ণ জলদের শিরে চড়িয়া বৃষ্টিস্নাতা পৃথিবীসুন্দরীর পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। নববধূ অতি প্রত্যূষে গোপন স্নানান্তে ঘাট হইতে বাটী ফিরিবার পথে নাথের সহিত দেখা হইলে যেমন লজ্জায় ও হৃদয়-চাপা-আনন্দে ঈষৎ আরক্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সদ্যস্নাতা ধরণীসুন্দরীও তেমনি চন্দ্র দর্শনে আনন্দে স্ফীত-বক্ষা ও প্রফুল্লমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

বৃষ্টি-বিধৌত বৃক্ষের নির্মল শ্যামল পত্রগুলি বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া চাঁদের কিরণে চিকচিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। জোনাকীগুলি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া, চারিদিকের ছোট ছোট গাছপালা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া উড়িয়া বাহার দিয়া ফিরিতেছে। মাঝে মাঝে বাতাস আসিয়া গাছপালার পত্রস্থ জল ঝাড়িয়া মাথা মুছাইয়া দিতেছে। যুবকের শাদা ঘোড়াটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া গা ঝাড়িতেছে। ঈসা খাঁ মন্দিরে ঢুকিয়া নিজের ভিজা ইজার লইয়া ঘোড়াটার গা মুছিয়া দিলেন। পরে তরবারি হস্তে লইয়া যুবতীকে বলিলেন, "তুমি পাল্কীর ভিতরে ঘুমাও, আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি একবার ভট্টাচার্য-বাড়ীতে আমার লোকজনের এবং তোমার দাদার অনুসন্ধান করে আসি।"

ঈসা খাঁ তরবারি হস্তে মন্দির হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দূরে কে একজন অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। যুবক অগ্রসর হইলেন। অশ্বারোহী ঈসা খাঁকে তরবারি-পাণি দেখিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল, "কে ও?" ঈসা খাঁ কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহী কেদার রায়ের পুত্র বিনোদ।

ঈসা খাঁ আনন্দে বলিলেন, "বিনোদ! এস, ভয় নাই, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্বর্ণ ভাল আছে।" সহসা বিশ্বস্ত ও আত্মীয়তার প্রীতিমাখা-কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিনোদ বিস্মিত-অন্তরে ঘোড়া ছুটাইয়া নিকটে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া ঈসা খাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল। ঈসা খাঁ তাহাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। বিনোদ বলিল, "দাদা সাহেব! আপনি এ দুর্যোগে কোথা থেকে?" ঈসা খাঁ তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া মন্দির দেখাইয়া ভট্টাচার্য-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঈসা খাঁ ভট্টাচার্য-বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত লোকজন

ভট্টাচার্য-বাড়ীতে বসিয়া থাকে। বাড়ীর কর্তা রজনী ভট্টাচার্য ঈসা খাঁকে সপরিবারে, পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে দেবতার ন্যায় সম্মান ও সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রজনী ভট্টাচার্যের আগ্রহে, অনুরোধে ও নির্বন্ধে, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ঈসা খাঁ তথায় আহার করেন ও রাত্রি যাপনে সম্মত হইলেন। লোক পাঠাইয়া বিনোদ ও রায়-নন্দিনীকে মন্দির হইতে আনাইলেন। স্বর্ণময়ী অন্তঃপুরে পরমাদরে রমণীদিগের দ্বারা অভ্যর্থিতা হইল। রজনী ভট্টাচার্য একজন জমিদার। তিনি রাজার ন্যায় যত্নে ও আড়ম্বরে ঈসা খাঁ এবং তাঁহার সঙ্গীয় পঞ্চাশ জন লোককে ভোজন করাইলেন।

রজনী প্রভাতে ঈসা খাঁ বেহারা ঠিক করিয়া স্বর্ণময়ীকে সাদুল্লাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর রজনী ভট্টাচার্যের ছেলে ও মেয়েকে ডাকিয়া প্রত্যেকের হস্তে জলপান খাইবার জন্য ১০টি করিয়া মোহর প্রদান করিয়া অশ্বারোহণে মুরাদপুরের দিকে দ্রুত ধাবিত হইলেন। স্বর্ণময়ী পাল্কীর দরজার ফাঁকের মধ্যে দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলিল, ততদূর পর্যন্ত তাহার প্রাণের আরাধ্য মনোমোহন-দেবতার ভুবনোজ্জ্বল অশ্বারূঢ় মূর্তি অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণের পিপাসার সহিত দেখিতে লাগিল। স্বর্ণ দেখিল, যে কোন অপূর্ব সুন্দর স্বর্গীয় দেবতা তাহার হৃদয়-মন চুরি করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার গমন-পথের উপরিস্থ আকাশ, নিম্নস্থ ধরণী এবং দুই পার্শ্বের শ্যামল তরুলতা যেন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যেন আলোকের তরঙ্গ উঠিতেছে। স্বর্ণময়ী দেখিল সত্য সত্যই তাহার প্রিয়তম—সুন্দরতম এবং জগদ্বিমোহন। তারপর যখন ঈসা খাঁ দূর পল্লীর তরুবল্লী-রেখার অন্তরালে মিশাইয়া গেলেন, তখন সুন্দরী বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি প্রত্যাহার করিল। হৃদয় উচ্ছ্বসিত নদীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতসারে বক্ষের কাঁচলীতে পতিত হইল। যুবতী তাড়াতাড়ি পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতরে শুইয়া পড়িল। বাহিরের দৃশ্য দেখবার আর ইচ্ছা হইল না। বেহারারা পাল্কী লইয়া দুই দিকের বিস্তৃত শ্যামায়মান ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া সাদুল্লাপুরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতুলালয়ে

ঈসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলী শ্রীমতী স্বর্ণময়ীকে সাদুল্লাপুর রওয়ানা করিয়া দিয়া মুরাদপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাদুল্লাপুরের জগদানন্দ মিত্র, স্বর্ণময়ীর মাতামহ। তিনি একজন প্রাচীন জমিদার। তাঁহার বয়স প্রায় নব্বই পূর্ণ

হইয়াছে। কিন্তু এখনও বৃদ্ধ বিনা চশমায় প্রদীপের আলোতে কাশীরাম দাসের মহাভারত অনায়াসে পড়িতে পারেন। লোকটির বেশ হাসিখুশী মেজাজ। আজকাল প্রায় ঠাকুর পূজা এবং ছিপে করিয়া পুকুরের মাছ ধরাতেই দিন কাটে।

তাঁহার দুই বয়স্ক পুত্র, বরদাকান্ত ও প্রমদাকান্ত। তাহাদের দুইজনের ঘরেও সাতটি মেয়ে ও পাঁচটি ছেলে জন্মিয়াছে। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমকান্ত, তাহার এক পিসীর সহিত কাশীতে বাস করে। তদ্ব্যতীত আর সকলেই বাড়িতে। সুতরাং বাড়িখানি ছেলেমেয়ের কোলাহলে এবং অট্টহাসিতে বেশ গোলজার। স্বর্ণ এখানে আসিয়া পরম যত্নে ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার মামা ও মামীদের আদরে ও ভালবাসায়, মাতামহ এবং মাতামহীর স্নেহ ও যত্নে বাহিরে সুখানুভব করিলেও প্রাণের ভিতরে কি এক অতৃপ্তি ও শূন্যতা বোধ দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ঈসা খাঁর কথা এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিত না। ঈসা খাঁর বীর্য-তেজঃ-ঝলসিত বীরবপু ও অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডল, তাঁহার সেই মধুবর্ষিণী অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীর ভাষা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। ঈসা খাঁর সুন্দর-কমনীয় বীরমূর্তি তাহার হৃদয়ে এমন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছে যে, যুবতীর চিন্তা ও কল্পনা, হৃদয় ও মন ঈসা খাঁ-ময় হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়কে প্রবোধিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা ও যত্ন করিল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেখিল, ভুলিতে বসিলে স্মৃতি আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ জাগিয়া উঠে। হৃদয়ে যখন প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তখন উহাতে বাধা দিতে গেলে শিলা-প্রতিহত নদীর ন্যায় ভীষণ উচ্ছসিত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া ফেলে। পূর্বের লজ্জা ও সঙ্কোচ একেবারে উড়িয়া যায়। স্বর্ণ যখন সকল বালক-বালিকার মধ্যে বসিয়া নানা প্রকারে তাহাদের আনন্দ বিধান এবং তাহাদের ক্ষণিক কলহের বিচার করিতে বসে, তখন তাহার মানসিক অধীরতা কিছু চাপা পড়ে বটে, কিন্তু আবার একেলাটি বসিলেই প্রাণের আকুলতা দশগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ষার ভরা নদীর মত তাহার মন কি যেন এক চৌম্বক-আকর্ষণে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। হৃদয়ের পরতে পরতে, শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে কি যেন এক পিপাসার তীব্রতা হইতে স্বর্ণময়ী বুঝিতে পারিল, যৌবন কাল কি ভয়ানক! প্রেমের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর বেগশালী! উহা এক মুহূর্তেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলাইয়া প্রেমাস্পদের পদে আত্ম বিকাইয়া বসে। প্রেমাস্পদের মধ্যেই তখন তাহার জীবনের আশা ও নির্ভর, সুখ ও শান্তির সর্বস্ব দেখিতে পায়। রায়-নন্দিনীও দেখিতে পাইল, ঈসা খাঁ-ই তাঁহার জীবনের সর্বস্ব। এক একবার তাঁহাকে পাইবার আশায় হৃদয় আশ্বস্ত হইত, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিরাশায় তাহার অন্তর ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত। স্বর্ণ ভাবিত, "আমি তো তাঁহাকে দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু তিনি যদি তাহা না বুঝেন! অথবা আমি পৌত্তলিক কাফের-কন্যা বলিয়া যদি আমাকে গ্রহণ না করেন। কৈ! তাঁহাকে তো

আমার প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।" আবার ভাবে, "না না, তিনি তো চিরকালই আমাকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন। যাহাকে এতকাল ভালোবাসিয়াছেন, সে যদি এখন তাঁহার আত্মবিক্রয় করে, তবে কি তিনি আনন্দিত হইবেন না? নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।"

"ভালোবাসা প্রেমে ঘনীভূত হইতে কতক্ষণ?" আবার নিরাশা তাহার কর্ণকুহরে গোপনীয়ভাবে বলে, "কি বিশ্বাস! পুরুষের মন!" আবার স্বর্ণকুমারী চঞ্চল-চিত্ত হইয়া উঠে। এইরূপ আশা এবং নিরাশায় স্বর্ণময়ীর জীবন কেমন যেন আনন্দবিহীন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্দশী। সন্ধ্যা বহিয়া গিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণ জলদখণ্ড শ্রেণী বাঁধিয়া হিমালয় পানে ছুটিয়াছে। চতুর্দশীর চন্দ্র এক একবার মেঘের ফাঁক দিয়া নববধূর ন্যায় প্রেম-দৃষ্টিতে সুধাবর্ষণ করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে তখনি মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। জগৎ এক একবার জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেছে, আবার তরল আঁধারে ম্লান হইয়া যাইতেছে। বাতাস এক একবার থাকিয়া থাকিয়া উঁচু গাছের উপর দিয়া পাতাগুলিকে করতালির মত বাজাইয়া বহিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও বাগানের নানাজাতীয় ফল ফুলের গাছের মধ্যে এলোমেলোভাবে বহিয়া যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। ম্লান-কৌমুদী-মাখা পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া শ্রুতি-মধুর তক্ তক্ শব্দে পাড়ে যাইয়া লাগিতেছে। স্বর্ণময়ী এই বাগানের মধ্যস্থ পুষ্করিণীর পরিষ্কার বাঁধা ঘাটে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে বকুলের সুদীর্ঘ মালা গাঁথিতেছে এবং গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার কি যেন মনে ভাবিয়া পুকুরের মৃদু লহরী-লীলার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেছে এবং বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেতিছে! স্বর্ণময়ীর কণ্ঠ যদিও গুন্ গুন্ করিতেছিল এবং চম্পক অঙ্গুলী যদিও বকুলফুলে সূতা পরাইতেছিল, তত্রাচ তাহার মনে যেন কোন্ এক দেশের শোভন আকাশে পথভ্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আজকার চন্দ্রও যেন মেঘ-পটলে লুক্কায়িত, স্বর্ণময়ীর মুখমণ্ডলেরও তেমনি দীপ্তি লাবণ্য অন্তর্হিত। তাহার বদনমণ্ডল যেন কেমন এক প্রকার বিষাদ গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই গাম্ভীর্যের মধ্যেও তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাসে তাহার ললাট-প্রান্তস্থ কেশ-কলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগণ্ড চুম্বন করিতেছিল। মালতীসুন্দরী, স্বর্ণময়ীর মামাতো ভগ্নী। যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার দেহ-লতিকা যেমন পুষ্পিতা, মনও তেমনি সুরভিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ীকে সে আপনার হৃদয়ময় করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণকে সে হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর হইতে ভালোবাসে। স্বর্ণকে ভালোবাসিয়া সে নিজের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মালতী সন্ধ্যা

হইতে বাটীর কোনোও ঘরে স্বর্ণকে খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে বাগানে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ করিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া মালতী দেখিল যে, স্বর্ণ একেলাটি বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে মালা রচনা করিতেছে। সে অনেকক্ষণ স্বর্ণকে খুঁজিয়া পায় নাই, সুতরাং পুকুরপাড়ে স্বর্ণকে পাইয়া একবার তাহার সঙ্গে মজা করিবার লোভ মালতীর মনে অত্যন্ত বলবৎ হইয়া উঠিল। মালতী পশ্চাদ্দিক হইতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। স্বর্ণ তখন ঈসা খাঁর মূর্তিধ্যানে প্রগাঢ় নিবিষ্ট, কাজেই অন্যমনস্কা; মালতীর আগমন টের পাইল না। মালতী হাসিমুখে স্বর্ণময়ীর মালাগাঁথা দেখিতে লাগিল। স্বর্ণ দু'গাছি মালা গাঁথিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল। মালতী তাহা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তুলিয়া আপনার গলায় পরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া বেদম হাসিয়া উঠিল। স্বর্ণ অন্যমনস্কা ছিল, সুতরাং প্রথমে চকমিয়া উঠিল। তারপর মালতীর গলা ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিল। সে হাসি যেন আর থামিতে জানে না। সে বেদম হাসির চোটে সমস্ত বাগান ও পুকুরের জলও যেন অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল। নিকটস্থ বকুল গাছের ডালের ঝোপে একটি কোকিল বোধহয় নিদ্রা যাইতেছিল, শ্রীমতীদ্বয়ের হাসির চোটে আতঙ্কিত হইয়া কুহু কুহু করিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যাইয়া পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে আম্রবৃক্ষে আশ্রয় লইল। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ থামিলে, স্বর্ণ মালতীকে বলিল, "কি লো! তুই এখানে মরতে এসেছিস্ কেন? আমাকে এ একবারে চমকে দিয়েছিস্? আমি তোর বর না কি লো? যে আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাক্‌তে পারিস না।"

মালতী : আমি অই মরতে আসি নাই, তোমাকে ধর্‌তে এসেছি। তোমাকে বর করতে কি আমার অমত? তুমি যদি বর হতে সাহস পাও, তাহলে আমি এখনই তোমাকে বরণ করি। কি বল? তোমার মত বর পেলে কি আর ছাড়ি?

স্বর্ণ : বটে, বরের জন্য দেখছি তুই ক্ষেপে উঠেছিস্। বেশী অস্থির হস না, সবুর কর—মেওয়া ফল্‌বে।

মালতী : তাই তো! আপন স্বপন পরকে দেখাও। বরের জন্য কে ক্ষেপে উঠেছে তা মালা গাঁথাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, আমরা বুঝি কিছু বুঝি না?

স্বর্ণ : কি বুঝিস লো! মালা তো তোর জন্যই গাঁথ্‌ছিলাম।

মালতী : বটে; আমার জন্য না ঈসা খাঁর জন্য?

স্বর্ণ : (কুপিত হইয়া) তুই এমন কথা বল্লি যে, জিব টেনে ছিঁড়ে দেব।

মালতী : কেন, আমি কি বলেছি? রোজই তো তুমি ঈসা খাঁর গল্প কর। তাঁর সাহস, তাঁর বীরত্ব, তাঁর ভালোবাসার কথা তুমিই তো বল।

স্বর্ণ : বেশ তো আমি বলি, তাতে কি হয়েছে? তাঁর বীরত্বের কথা, তাঁর সাহস ও সৌন্দর্যের কথা এবং আমাকে যে তিনি দুই বার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তা আমি এক-শ বার বল্‌বো। তাতে দোষ কি?

মালতী ঃ তবে আমি কি দোষের কথা বলেছি?

স্বর্ণ ঃ তুই মালা দেওয়ার কথা বল্লি কেন?

মালতী ঃ তারি তো অপরাধ! না-পছন্দ হল কিসে?

স্বর্ণ ঃ না-পছন্দ বা অযোগ্যের কথা কে বলেছে?

মালতী ঃ বাঃ! বাঃ! তবেই তো তোমার পছন্দ ও যোগ্য হয়েছে দেখছি। তাই তো আমি মালা দিতে বলছি।

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল, "ওলো! তিনি যে মুসলমান, আর আমি যে হিন্দু।"

মালতী ঃ হলই বা হিন্দু আর মুসলমান। আজকাল তো হিন্দু-মুসলমানে খুবই বিয়ে হচ্ছে।

স্বর্ণ ঃ কোথায় খুব হচ্ছে?

মালতী ঃ কেন? এই তো ভুলুয়ার ফজল গাজীকে রামচন্দ্রপুরের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কন্যা দিয়েছে। বাখরগঞ্জের হাশমতুল্লা চৌধুরীর সঙ্গে বাঁশজোড়ের চক্রবর্তীদের মেয়ে শরৎকুমারীর বিয়ে তো গত পৌষেই হয়েছে। বামন ঠাকুরেরা এখন তো খুবই পাতি দিচ্ছেন। তাঁরা তো বলেছেন, "মুসলমান দেবতার জাতি, তাদের ঘরে মেয়ে দিলে অগৌরব বা অধর্ম নাই।" গত বৎসর সরাইলের জমিদার মথুরাকান্ত মুস্তফী ও আলমপুরের চৌধুরী শাহবাজ খানের মধ্যে কেন্দ্রপাড়া গ্রাম নিয়ে যে তুমুল বিবাদ-বিসম্বাদ হয়, সে বিবাহ মথুরাকান্ত মুস্তফীর কন্যা সরোজ-বাহিনীর সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের পুত্র আবদুল মালেকের বিবাহ দিয়েই তো মিটিয়ে ফেলা হল। বাবা সে বিষয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি।

স্বর্ণ ঃ ওরূপ দুই চারটা ঘটনায় কি আসে যায়?

মালতী ঃ কেন? দুই চারটা কোথায়? বাদশা নবাব ও উজিরদিগকে বড় বড় হিন্দু রাজ-রাজড়া কন্যা দিচ্ছেন।

স্বর্ণ ঃ আরে ওসব রাজ-রাজড়ার ও তাঁদের কন্যাদের কথা ছেড়ে দে। তাঁদের সবই শোভা পায়।

মালতী ঃ (হাততালি) বাঃ! বাঃ! আমিও তো সেই জন্যই ঈসা খাঁকে বরণ করতে বলছি। তুমি যে রাজা কেদার রায়ের কন্যা। তোমারও তো বেশ শোভা পাবে!

স্বর্ণ বড়ই অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইল। সে মনে মনে ভাবিল, আজ এরূপ হচ্ছে কেন? মালতী যে বড়ই জব্দ করতে আরম্ভ করল।

স্বর্ণকে অপ্রতিভ দেখিয়া মালতী বলিল, "তবে এইবার ঈশা খাঁকে মালা দেবে? কেমন?"

স্বর্ণ ঃ তোর বুঝি মুসলমান বিয়ে করতে বড়ই সাধ।

মালতী ঃ আমার সাধ হলেই বা কি? আমি তো রাজকন্যা নই। এ সাধারণ হিন্দু জমিদারের কন্যাকে কোন্ মুসলমান গ্রহণ করবে?

স্বর্ণ ঃ তুই যদি বলিস্ মা হয় আমি তার উপায় দেখি।

মালতী ঃ আগে ভাই তুমি নিজের যোগার দেখ। কথায় বলে, 'মামা! আগে দেখ নিজের ধামা।--'

স্বর্ণ মালতীর কথায় তাহার গালে এক মৃদু ঠোক্না দিতে অগ্রসর হইলে, মালতী নিজের গলা হইতে ফুলমালা লইয়া স্বর্ণের গলায় পরাইয়া দিল এবং চকিতে তাহার গণ্ড চুম্বন করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। স্বর্ণও তাহাকে ধরিবার জন্য বাতাসে আঁচল উড়াইয়া পুকুরের বাগান আলো করিয়া দ্রুত ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পত্র

জ্যৈষ্ঠ মাস গত প্রায়। আষাঢ়ের ১৭ই তারিখে মোহররম উৎসব। সেই মোহররম উৎসবের পরেই স্বর্ণময়ীকে পিত্রালয়ে ফিরিতে হইবে। স্বর্ণময়ী শিবনাথের মুখে আরও সংবাদ পাইল যে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধও পাকাপাকি হইয়াছে। রাজা এখন হইতেই বিবাহের আয়োজনে লিপ্ত। বিশেষ সমারোহ হইবে। শিবু অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্মিতমুখে স্বর্ণকে এই সংবাদ প্রদান করিলেও, বিবাহের কথায় স্বর্ণের বুক যেন ধড়াস্ করিতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন এত সজোরে চলিতে লাগিল যে, স্বর্ণের সন্দেহ হইল পাছে বা অন্যে শ্রবণ করে। স্বর্ণের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল। শিবনাথ ভাবিল, পাত্র বা কিরূপ তাই ভাবিয়া স্বর্ণময়ী চিন্তিত হইয়াছে। সুতরাং সে একটু কাশিয়া লইয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি! আর ভাবতে হবে না, সে পাত্র আমি নিজে দেখেছি। মহারাজও দেখেছেন। তাদের ঘর বেশ বুনিয়াদি। পাত্র দেখতে শুনতে সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর। বয়সও অল্প। তোমার সঙ্গে বেশ মানাবে। সেরূপ সুশ্রী সুন্দর পাত্র আমাদের এ অঞ্চলে আর নাই। তুমি একবার তাকে দেখলেই ভুলে যাবে।" শিবনাথ আনন্দের সহিত তাহাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করিবার জন্য এ সব কথা বলিলেও স্বর্ণের কর্ণে তাহা বিষের মত বোধ হইতে লাগিল। স্বর্ণ চুল বাঁধিবার ছল করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। ঘরে যাইয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। বালিশে সে অনেকক্ষণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। তারপর মুখ ধুইয়া মন স্থির করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করিল। সে বেশ চিন্তা করিয়া দেখিল, ঈসা খাঁ ব্যতীত তাহার প্রাণের একটি বিন্দুও এক মুহূর্তের জন্য কাহাকেও স্থান দিতে

প্রস্তুত নহে। ঈসা খাঁ ব্যতীত তাহার জীবনের কোনও অস্তিত্ব নাই। সে দেখিল ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয় এরূপ ভাবে ধরিয়া বসিয়াছে যে, সমস্ত দেবতা এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হৃদয়ের সিংহাসন হইতে ঈসা খাঁকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ নহে। যুবতী অনেক ভাবিয়া শেষে ঈসা খাঁকে পত্রযোগে আত্মসমর্পণের কথা জানাইবার জন্যই মন স্থির করিল। ভাবী বিপদের গুরুত্ব স্মরণে এবং হৃদয়ের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় লজ্জা দূরীভূত হইল। যুবতী পত্র লিখিয়া তাহা শিবনাথের দ্বারা খিজিরপুরে পাঠাইবার সঙ্কল করিল। বলা বাহুল্য, পত্র পারস্য ভাষায় রচিত হইল। আমরা সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী পারস্য ভাষায় রচিত পত্রের বঙ্গানুবাদ দিতেছি ঃ

পত্র

হে মহানুভব! প্রাণ-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। মানুষ মুখের ভাষা আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু প্রাণের ভাষা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। প্রাণের একটি আবেগ প্রকাশ করিতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা যখন এক নিঃশ্বাসে ফুরাইয়া যায় তখন হে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় দেবতা! এ হৃদয়ের অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাস, অনন্ত দুঃখ-ব্যথা আমি কিরূপে প্রকাশ করিব। তবে আশা আছে, মহৎ ব্যক্তি তর্জনী প্রদর্শনেই চন্দ্র এবং গোলাপের একটি পাপড়িতেই প্রেমিক-হৃদয় দর্শন করেন।

হে নয়নানন্দ! হে আমার জীবনাকাশের প্রভাত-রবি! আমার ত্রুটি ও বে-আদবী মার্জনা করিতে মর্জি হয়। হৃদয়ের নদী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, উহা অন্য নদীতে মিশিতে অক্ষম, উহা সমুদ্র ব্যতীত আর কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিবে না। গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু খিজিরপুরের বুলবুল ব্যতীত আর কাহাকেও সুরভি দান করিবে না। শ্রীপুরে সরোবরে যে কমল ফুটিয়াছে, তাহা খিজিরপুরের দেবতার জন্যই ফুটিয়াছে। চরণ-প্রান্তে স্থান পাইবার অযোগ্য হইলেও তাহার প্রেম-দেবতা তাহাকে যোগ্যতা দান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কমলের অটল বিশ্বাস যে, তাহার দেবতা পরম হৃদয়বান্ ও দয়ালু। এ বিশ্বাস অটুট রাখিতে পাঠান দেবতা কি অগ্রসর হইবেন না? নলিনীকে অনেক বুঝান হইল, সে স্পষ্ট বলিল, "আমি সূর্য ব্যতীত কাহারও পানে তাকাইব না।" চকোরকে অনেক বুঝান হইল, সে ক্ষুদ্র হইলেও গর্বের সহিত বলিল, "চন্দ্র-সুধা ব্যতীত আমি আর কিছুই পান করিব না।" চাতককে অনেক বুঝান হইল, সে বলিল, "আমি জলদের জল ব্যতীত অন্য জল পান করিব না।" প্রেমের নিকট সকলেই পরাস্ত, প্রেম চির-বিজয়ী। অধিনীর তাহাতে দোষ কি?

হে দেবতা!

উন্মাদিনী তাহার হৃদয়ের পাত্রে প্রীতির ফুল সাজাইয়া চরণপ্রান্তে উপস্থিত।

একণে তাহার পূজা গ্রহণ করিলে দুঃখিনীর জন্ম-জীবন সার্থক হইবে। যদি অনাদর করে—ফিরাইয়া দাও তাহাও ভাল, একটি হৃদয় ভস্ম হইয়া অনন্তে মিশিবে, কিন্তু তাহাতে কি দেবতায় কোনও কার্যে দোষ নাই। বৈশাখের মেঘ ইচ্ছা করিলে গোলাপের হৃদয় বজ্রানলে দগ্ধ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে তুষারশীতল সলিল-ধারায় তাহাকে স্নিগ্ধ করিতে পারে। সকলি মেঘের ইচ্ছা।

চরণপ্রান্তের ধূলি-আকাঙ্ক্ষিণী—
শ্রীপুরের মরু-তাপ-দগ্ধ গোলাপ
স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণ পত্র লিখিয়া তাহার একপ্রান্তে মুসলমানী কায়দামতে একটু আতর মাখাইয়া পুরু লেফাফায় বন্ধ করিল। তৎপর স্বহস্তের কারুকার্যযুক্ত এবং নানাপ্রকারের পার্শি বয়েত অঙ্কিত একখানি সুন্দর রেমশী রুমালে তাহা বেশ করিয়া বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিল। শিবনাথ পত্র পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এ কিসের পত্র?" বাড়ীর আরও সকলে, বিশেষতঃ মালতী পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, এ কিসের পত্র? স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঈসা খাঁ আমাকে সেই রাতে দস্যু-হস্ত থেকে উদ্ধার করে প্রাতঃকালে সাদুল্লাপুরে রওয়ানা করবার সময় বলেছিলেন, 'সাদুল্লাপুরে তোমার মঙ্গল মত পহুঁছান-সংবাদ আমাকে জানিও।' এতদিন লোকাভাবে তা জানাতে পারি নাই। বড়ই বিলম্ব হয়েছে। অত বড় লোক, বিশেষতঃ আমাকে যেরূপ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, তাতে কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।"

স্বর্ণের ছোট মামী পার্বতীসুন্দরী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছি! তোমার কোন বিবেচনা নাই। বার ভূঁইয়ার দলপতি ঈসা খাঁ মসনদ আলীর কাছে রাজরাজড়ারা জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাঁকে তুমি এত বিলম্বে মঙ্গল-সংবাদ দিতেছ! তিনি যে তোমাকে মঙ্গল-সংবাদ দিতে বলেছেন, তা তোমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। শিবনাথ এতদিন এখানে নাই বা ছিল, আমাদের বাড়িতে কি অন্য লোকজন ছিল না? রাজার মেয়ে হয়েছ, বুদ্ধিটা একটু গম্ভীর কর। এলে তুমি বৈশাখ মাসে, আর মঙ্গল-সংবাদ দিচ্ছ জ্যৈষ্ঠের শেষে!"

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া বলিল,—"কি জানি মামী, আমার বড় ভুল হয়ে গেছলো, আমি সে জন্যে পত্রে ত্রুটি স্বীকার করেছি।"

স্বর্ণ এই বলিয়া শিবনাথকে বিদায় করিয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, "নবাব বাড়ীর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস যে, 'শ্রীপুরের রাজবাড়ী হতে আসছি।' তাহলে অনায়াসেই নবাবের কাছে যেতে পারবি। পত্রের উত্তর নিয়ে আসা চাই। উত্তর আনলে বখশিশ পাবি।" শিবনাথ উপদিষ্ট হইয়া, ঘাড়ে লাঠি ফেলিয়া কোমরে চাপরাস বাঁধিয়া একরাশি বাবরী চুল ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে খিজিরপুরের দিকে রওয়ানা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খিজিরপুর প্রাসাদে

যথাসময়ে শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর পত্র বহন করিয়া শিবনাথ কৈবর্ত খিজিরপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সূর্য তখন নীল আকাশের গায়ে নানা বর্ণের, নানা রকমের মনোহর মেঘের পট আঁকিয়া পশ্চিম-সাগরে ডুবু ডুবু প্রায়। এক রাত্রির জন্য বিদায় লইতেও সূর্যের মন যেন সরিতেছে না; তাই সবিতৃদেব ডুবিতে ডুবিতেও সতৃষ্ণনয়নে পৃথিবী-সুন্দরীকে সহস্র কিরণ-বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে। খিজিরপুরের নবাব বাটীর বহির্বাটীর তোরণ অতিক্রম করিয়াই শিবনাথ দেখিতে পাইল, অন্যূন এক মাইল লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত প্রকাণ্ড রাজবাটী। শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে সমস্ত বাড়ীটা এমন পরিষ্কার চূণকাম করা ও ধব্‌ধবে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন শ্যামল তৃণতলে রাজহংসের ডিম্ব-শ্রেণী শোভা পাইতেছে। অসংখ্য চূড়া, গুম্বজ ও মিনারের রৌপ্যকলস ও ছত্রে তপনের শেষ স্বর্ণরশ্মি পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বাড়ির সম্মুখে তিনি শত গজ চওড়া এবং দেড় মাইল লম্বা এক স্বচ্ছ-তোয়া দীঘি। সুবিশাল স্বচ্ছ জলরাশিতে অসংখ্য প্রকারের জলজ কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদু মারুত-হিল্লোল-উত্থিত তরঙ্গরাজির সহিত তালে তালে দুলিতেছে। দূর-দূরান্তর ব্যাপিয়া সে এক চমৎকার শোভা। সূর্যের হৈমাভা পড়িয়া পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে। লহরে লহরে কবিত্ব গড়াগড়ি যাইতেছে। অসংখ্য মৎস্য মনের আনন্দে কুর্দন করিতেছে। সরোবরের মধ্যস্থলে এক লৌহ-সেতু দ্বারা উভয় তীর সংযুক্ত। সেতু পার হইয়া আসিয়া সরোবরের তুল্য এক বিরাট রমণীয় পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। এই সুবিশাল উদ্যানে পৃথিবীর সকল দেশের নানা প্রকার পুষ্পের বৃক্ষ, লতাগুল্ম সংগৃহীত হইয়াছিল। বাগানে সহস্র সহস্র পুষ্পস্তবক ফুটিয়া সৌন্দর্যে দিগন্ত আলোকিত এবং সৌরভে গগন পবন আমোদিত করিত। তিন শত ভৃত্য বাগানের মালীর কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই বাগানের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়া পড়িত। মুসলমানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও পুষ্প-প্রিয়তা ঈসা খাঁতে বেশ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। নানা জাতীয় সুকণ্ঠ ও সুন্দর বিহঙ্গ এই চির বসন্ত-সেবিত উদ্যানে বিরাজ করিত। এই উদ্যানের মধ্যেই ষাট গুম্বজী বিরাট মসজিদ। উহা আগাগোড়া রক্তপ্রস্তরে নির্মিত। কেবল ভূমি সবুজ মর্মরের। ভূতল হইতে গুম্বজের শীর্ষ এক শত ফিট উচ্চ। প্রত্যেক গুম্বজের মস্তকে সুবর্ণ-কলস শোভা পাইতেছে। মসজিদের চারি পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরের চারিটি মিনার। প্রত্যেকটির উচ্চতা একশত পঁচিশ ফিট্।

মসজিদ একশত গজ দীর্ঘ এবং আশি গজ প্রশস্ত। সম্মুখের চত্বরে পরিমাণে ইহার দ্বিগুণ। মসজিদের চত্বর ভূমি হইতে পাঁচ হাত উচ্চ। চারিদিক প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। সোপান-শ্রেণীর উপরে সুন্দর টবে ঋতু-পুষ্পজাল ফুটিয়া অপূর্ব বাহার খুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকারের উৎস নানা ভঙ্গিমায় নির্মল জলধারায় উদ্গার করিতেছে। শিবনাথ যাহা দেখিতেছে, তাহা হইতেই আর সহসা আঁখি ফিরাইতে পারিতেছে না। সে পূর্বে কেদার রায়ের বাড়ীকেই পরম রমণীয় ও সুবৃহৎ বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এক্ষণে ঈসা খাঁ উদ্যান ও প্রাসাদ দেখিয়া কেদার রায়ের শ্রীপুরের বাটী তাঁহার নিকট শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শিবনাথ দেখিল, মসজিদে অন্যূন তিন হাজার লোক মগরেবের নামাজ পড়িতেছে। সে সেই বিরাট মসজিদের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া ভক্তিভরে সেজদা করিল।* বাগান পার হইয়া পুনরায় সিংহদ্বার। শিবনাথকে ঈসা খাঁর নামীয় পত্রবাহক দেখিয়া প্রহরী বলিল, "এখানেই দাঁড়াও, নবাব সাহেব নামাজ পড়তে গিয়েছেন, এখনই আসবেন।" এখানে আমরা আমাদের পাঠকগণকে জানাইয়া রাখি যে, ঈসা খাঁকে পূর্ব-বাঙ্গালার সকল লোকেই বার ভূঁইয়ার নবাব বলিয়া আহ্বান করিত। বস্তুতঃপক্ষেও তিনি একজন নবাবের তুল্য লোকই ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চান্ন লক্ষের উপর ছিল। আজকার হিসাবে পাঁচ কোটিরও বেশি। ঈসা খাঁর সাত হাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক, দুইশত রণতরী এবং দেড়শত তোপ ছিল। অশ্বশালায় সাত হাজার অশ্ব এবং হস্তিশালায় পাঁচশত হস্তী সর্বদা মৌজুদ থাকিত। প্রত্যহ পাঁচশত ছাত্র তাঁহার প্রাসাদ হইতে আহার পাইত। একশত পঁচানব্বই জন জমিদার তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি দশ বৎসর কাল অরাজকতার জন্য বাঙ্গালার নবাব সরকারের রাজস্ব দিয়াছিলেন না। তাহাতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা তাঁহার রাজকোষে সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যে দুই হাজার পুষ্করিণী, তিন হাজার ইঁদারা, দুইশত পান্থশালা এবং ষাটটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানদের চিরন্তন প্রথানুসারে এই সমস্ত মাদ্রাসা অবৈতনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পঞ্চাশটি টোলের অধ্যাপকগণের প্রত্যেকে বার্ষিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেন। সেকালের এই একশত টাকা সাহায্য এ-কালের হাজার টাকার তুল্য। তিনি তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে তিনশত মাইলের উপর রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু শিল্পদ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত তোপ, বন্দুক, তলোয়ার, ঘোড়ার জিন এবং কাচের দ্রব্য দিল্লীর বাদশাহী কারখানায় প্রস্তুত ঐ সমস্ত দ্রব্য হইতে নিকৃষ্ট হইতো না।

সেকালের হিন্দুরা মুসলমানের মসজিদ ও দরগাহ্ দেখিলে এই প্রকার সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল।

ঈসা খাঁ নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে ফিরিতেই শিবনাথ কুর্নিশ করিয়া পত্র দিল। ঈসা খাঁ রুমাল খুলিয়াই বুঝিতে পারিলেন, স্বর্ণময়ীর পত্র। পত্রখানি হাতে করিতেই ঈসা খাঁ আপাদমস্তকে কি যেন এক বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। ঈসা খাঁ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। পত্র খুলিয়া উপরের স্তরের লেখা পড়িয়াই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। শিবনাথের খাইবার থাকিবার ভালো বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হিন্দু-অতিথিশালার দারগাকে আদেশ করিয়া গেলেন। শিবনাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থাপিত বীর-পুরুষদের অশ্বারূঢ় প্রস্তর-মূর্তি দেখিতে দেখিতে অতিথিশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি এক প্রহর। ঈসা খাঁ হস্তীদন্ত-নির্মিত একখানি আরাম-কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন। গৃহের মধ্যে একশত ডালবিশিষ্ট ঝাড় জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড কক্ষ, কক্ষের ছাদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের লতাপাতায় সুশোভিত। ছাদের কড়ি, বরগা কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, প্রস্তরের কড়ি বরগা ছাদের সহিত অদ্ভুত কৌশলে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালে সুবৃহৎ দর্পণ, প্রস্তরের নানাবর্ণের ফুল এবং বহুমূল্য চিত্ররাজি শোভা পাইতেছে। সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার কৃপাণপাণি অশ্বারূঢ়া বীর্যবতী মূর্তিখানি অতি চমৎকার শোভা পাইতেছে। রাজিয়া যেমন অতুলনীয়া সুন্দরী তেমনি অসাধারণ সাহসিনী ও তেজস্বিনী। তাঁহার মুখ-চোখ হইতে প্রতিভার আলো যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। আর একটি চিত্রে মহাবীর রোস্তম তরবারির আঘাতে এক ভীষণ আজদাহা সর্পকে বিনাশ করিতেছেন। রোস্তমের অসাধারণ বীরত্ব ও তেজ ছবিতে চমৎকার রূপে ফুটিয়াছে। আর একটি চিত্রে উদ্যান মধ্যে বসিয়া 'মজনূঁ' বীণা বাদন করিতেছেন; দুঃখিনী প্রেমোন্মাদিনী 'লায়লা' সেই মধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। লায়লার দুই চক্ষু বহিয়া তরল মুক্তাধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। উদ্যানের ফুল ও পক্ষীগুলি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে ফরহাদ প্রেমোন্মত্ত চিত্তে পাহাড় কাটিতেছেন। অনবরত দৈহিক পরিশ্রমে ফরহাদের সুকুমার তনু ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শিরী বিষণ্ন চিত্তে করুণনেত্রে দূরস্থ প্রাসাদের ছাদ হইতে তাহাই দর্শন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রিয়তমের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির কি ভুবনমোহন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে!

একখানি চিত্রে একজন দরবেশ স্থায়ীয় লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁহার সহায়তা করিতে আহ্বান করিতেছেন। সমবেত লোকগণ সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ। কিন্তু ষোড়শবর্ষ রয়স্ক এক যুবক স্বর্গীয় দীপ্তিঝলসিত তেজোময়ী মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বাসের কলেমা পাঠ করতঃ অসি উত্তোলনপূর্বক আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছেন। আর একখানি চিত্রে বালক রোস্তম, এক মস্ত শ্বেতহস্তীকে পদাঘাতে বধ করিতেছেন। একখানি চিত্রে রাজ্যচ্যুত ছদ্মবেশী ইরাণেশ্বর জামশেদ, জাবলস্তানের উদ্যানে শিলাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে

জাবলস্তানের অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী রাজকুমারী তাঁহাকেই স্বকীয় আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদ জামসেদ জ্ঞানে সন্দেহ মিটাইবার্থে সম্রাট জামশেদের একখানি চিত্র লইয়া পরম কৌতূহল এবং প্রেমানুরাগ-কুল-নয়নে আড়াল হইতে আকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিতেছেন। চিত্রে কুমারীর এক পার্শ্বে একটি নৃত্যশীল ময়ূর এবং অন্য পার্শ্বে একটি মনোরম মৃগ শোভা পাইতেছে। আর একখানি চিত্রে হরমখানার সুসজ্জিত নিভৃত কক্ষে প্রেম-উন্মাদিনী জোলেখা সুন্দরী পিপাসাতুর চিত্তে ইউসুফের নিকট প্রেম যাচ্ঞা করিতেছেন—আর ধর্মপ্রাণ ইউসুফ ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পরমেশ্বরের ক্রোধের কথা জোলেখাকে জ্ঞান করিতেছেন। উভয়ের মুখে স্বর্গ ও নরকের চিত্র। একখানি চিত্রে মরুনির্বাসিতা হাজেরা বিবি শিশুপুত্র ইসমাইলকে শায়িত রাখিয়া জলের জন্য চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। এদিকে ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি হইতে এক নির্মল উৎসধারা বহির্গত হইতেছে। একজন স্বর্গীয় হুরী ইসমাইলের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহার চোখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। শিশু তাহার মুখপানে অনিমেষ আঁখিতে এমন সরল উদার অথচ কৌতূহলপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে যে, সমস্ত পৃথিবী যেন অমৃত-ধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে! আর একখানি চিত্রে মহামতি সোলেমান তাঁহার রত্নখচিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সুন্দরীকুল-ললাম 'সাবা'র রাজ্ঞী বিল্‌কিস্ রূপের ছটায় দশদিক্ আলো করিয়া আগমন করতঃ কাচনির্মিত মেঝে সরোবর জ্ঞানে একটু বিচলিত হইয়া পার হইবার জন্য পরিধেয় বাস ঈষৎ টানিয়া ধরিয়াছেন। হজরত সোলেমান এবং অন্যান্য পারিষদমণ্ডলী রাজ্ঞীর বুদ্ধিবিভ্রম দেখিয়া স্মিত হাস্য করিতেছেন। লজ্জার সহিত সৌন্দর্য ও অভিমান-গরিমা মিশিয়া রাজ্ঞী বিলকিস্‌কে এক ভুবনমোহন সৌন্দর্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকারের অসংখ্য কবি-চিত্ত-বিনোদন তস্‌বীরে চতুর্দিকের প্রাচীরগাত্রে বেহেশ্‌তের শোভা বিকাশ করিতেছে।

গৃহের মধ্যে আতর গোলাপের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। মেঝের উপর রাশি রাশি গোলাপ শোভা পাইতেছে। এক পার্শ্বে বৃহৎ পালঙ্কের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার উপরে শ্বেত রেশমের মূল্যবান চাদরখানি দীপালোকে ঝলমল করিতেছে। তিন পার্শ্বে কিংখাপের বহুমূল্য তাকিয়া। জরীর কার্য করা সবুজ মখমলে তাহা ঢাকা। বিছানার এক পার্শ্বে শাহনামা, সেকেন্দারনামা এবং কয়েকখানি বহুমূল্য ইতিহাস শোভা পাইতেছে। পুস্তকগুলি সমস্তই মণিখচিত করিয়া সুবর্ণের পুরু পাতে বাঁধা। মণিগুলি দীপালোকে ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে।

এই প্রকারের সুরম্য গৃহতলে বসিয়া একমনে ঈসা খাঁ কি চিন্তা করিতেছেন। ঈসা খাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী ফাতেমা অনেকক্ষণ হইল ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট দাঁড়াইয়া বহিগুলি নাড়াচাড়া করিতেছে, তথাপি ঈসা খাঁর চমক নাই।

ফাতেমা আর কখনও তাহার ভ্রাতার এই প্রকার অন্যমনস্কতা দেখে নাই। অন্যান্য দিবস ফাতেমা আসিতেই ঈসা খাঁ তাহাকে কত প্রকার প্রশ্ন করেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও গভীর ভালবাসা। প্রত্যেক দিন রাত্রেই ঈসা খাঁর পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের শান্তি ও প্রীতি সঞ্চারের জন্য ফাতেমাকে সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে হয়। ফাতেমা অতি সুন্দর রূপে গাহিতে এবং বাজাইতে শিখিয়াছে। আহমদনগরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য করতলব খাঁ তিন বৎসর পর্যন্ত ফাতেমাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছেন। ফাতেমার ধর্ম ও শান্তি-রসাপ্লুত গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ফাতেমা যখন আঙ্গুলে মেজরাফ পরিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে, তখন তারগুলি যেন আপনা আপনি কি এক যাদুবশে নাচিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অতৃপ্ত মদিরাবেশময় ঝঙ্কার দিতে থাকে। ফাতেমা এত দ্রুত অঙ্গুলী চালনায় অভ্যস্ত যে, মনে হয় তাহার অঙ্গুলী স্থির রহিয়াছে। সেতার আপনা আপনি বাজিতেছে। তারপর সেতারের ঝঙ্কার ও মধুবর্ষিণী মূর্চ্ছনার সহিত যখন তার সুধাকণ্ঠ গাহিয়া উঠে, তখন মনে হয় স্বর্গরাজ্য তরল হইয়া ধরাতলে বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ হইল ফাতেমা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভ্রাতার ইঙ্গিত না পাইলে সে কোনো দিন বসে না। বসে না যে, সে শুধু ঈসা খাঁর সুমধুর সম্ভাষণের জন্য—ঈসা খাঁ তাহাকে আদর করিয়া সস্নেহে বসিতে বলিবে বলিয়া। ফাতেমা যখন দেখিল যে, ঈসা খাঁ জানালার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইতেছেন না, তখন একখানি পুস্তকের দ্বারা আর একখানি পুস্তকে আঘাত করিল। আঘাতের শব্দে ঈসা খাঁর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের প্রান্ত-বদ্ধ-দৃষ্টি ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চাহিলেন। দেখিলেন, সমস্ত ঘর ঝাড়ের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। আর সেই গৃহের কার্পেটমণ্ডিত মেঝেতে দাঁড়াইয়া ফাতেমা ঈষৎ বঙ্কিম অবস্থায় তাঁহার শুভ্র শয্যার পার্শ্বে পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার অলকাবলী বিমুক্ত। তাহার বদনমণ্ডল পুণ্যের জ্যোতিঃতে স্নিগ্ধ। দেখিলে মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার রাজ্যে মূর্তিমতী বালিকা প্রতিমা শান্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। ফাতেমার বয়স সবে দ্বাদশ হইলেও এবং এখনও তাহার যৌবনপ্রাপ্তির বিলম্ব থাকিলেও তাহার মুখমণ্ডল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ। সে ভাব অতি নির্মল—অতি পবিত্র—বুঝিবা স্বর্গরাজ্যের উর্ধ্বের। ঈসা খাঁ মুখ তুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "কি গুল, কখন এসেছিস?" পাঠক জানিয়া রাখিবেন, ঈসা খাঁ আদর করিয়া ফাতেমাকে গুল অর্থাৎ ফুল বলিয়া ডাকিতেন।

ফাতেমা : হাঁ মিঞাভাইজান! আপনি আজ একমনে কি ভাবছিলেন? আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

ঈসা খাঁ : তা আমাকে ডাকিস্ নাই কেন? আমি না বল্লে কি বসতেও নেই? আকাশের দিকে চেয়ে মনটা যেন কোন্ দেশে চলে গিয়েছিল। তুই এইবার

সেতার নিয়ে বসে যা।' আজ খুব ভালো বাজাব। মনটা বড় অস্থির।

ফাতেমা তখন সেতার লইয়া একখানি মখমলমণ্ডিত রূপার কুর্সীতে বসিয়া চম্পক-বিনিন্দিত আঙ্গুলে মেজরাফ পরিয়া সেতারের বক্ষ স্পর্শ করিল। সে ললিত-কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সেতারের সুপ্ত তন্ত্রী নাচিয়া উঠিয়া বাজিতে লাগিল। সেতারের মধুর ঝঙ্কারে আলোক-উজ্জ্বল গৃহ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝাড়ের কর্পূর-মিশ্রিত শত মোমবাতির শুভ্র শিখা মৃদু কম্পনে কাঁপিতে লাগিল। সেতারের মনোমদ মধুর তরল ঝঙ্কারে ঈসা খাঁর এক আত্মীয় রমণী এবং আয়েশা খানম সাহেবা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহই এইরূপ হইত। ফাতেমার হাতে সেতার বাজিলে কেহই স্থির থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ ফাতেমার ধর্ম ও ঐশী-প্রেম সম্পর্কীয় গজল শুনিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় আয়েশা খানম সেতার ঝঙ্কার দিলেই আসিতেন। ঈসা খাঁ আয়েশাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চরণ চুম্বন করিলেন এবং একখানি স্বর্ণ বিমণ্ডিত দ্বিরদ-রদ-রচিত বিচিত্র আসনে আম্মাজানকে বসিবার জন্য মখমলের মসনদ পাতিয়া দিলেন। আয়েশা খানম তাঁহার প্রীতিপ্রফুল্লতা-মণ্ডিত শান্ত অথচ গম্ভীর সৌন্দর্যে গৃহ আলোকিত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় আসন গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য রমণীরাও যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিলেন। সুবিশাল পুরী নীরব ও নিঃশব্দ। কেবল আসাদ-মঞ্জিলে (সিংহ-প্রাসাদে) সেতারের মধুর নিক্কণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চতুর্দিকে অমৃত বৃষ্টি ঝরিতেছে। এক গৎ বাজাইবার পর ফাতেমা গজল ধরিল। সে পীযূষ-বর্ষিণী পারস্য ভাষার গজলের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, পারস্য ভাষার অমৃতত্ব ও ছন্দ-ঝঙ্কার বঙ্গানুবাদে কেহ অনুসন্ধান করিবেন না।

সঙ্গীত

"হে শিব সুন্দর! চির মনোহর পরম পুরুষ পরাৎপর!
হে নিখিলশরণ ভুবনরঞ্জন পতিতপাবন ত্রিগুণাকর!
গগনে গগনে পবনে পবনে তোমারি মহিমা ভাসে,
কাননে কাননে কুসুমে কুসুমে তোমারি মাধুরী হাসে।
নদ নদী জল বহে কল কল ঢালিয়া অমিয়-ধারা,
কুঞ্জ কাননে তোমার গায়নে বিহগ আপনা-হারা।
নীল আকাশে তারকা প্রকাশে তোমারি মহিমা রটে,
সবারি মাঝে তুমিই ফুটিছ তুমিই হাসিছ বটে!
(শুধু) আমারি হৃদয় রবে কি আঁধার? তাও কি কখনো হয়,
এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয়।"

ফাতেমা ভাবাবেশে তন্ময় চিত্তে গগন-পবন সুধা-প্লাবিত করিয়া সঙ্গীতটি গাহিল। সে যখন শেষের চরণ ঝঙ্কার দিয়া নিমীলিত নেত্রে গাহিল, "এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয়", তখন তাহার মুখের দৃশ্যে এবং ভাবের আকুলতায় সকলেই কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বালিকা বিশ্রাম করিল। ঘরের ভিতর টানা-পাখা চলিলেও তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। পাখার বাতাসে তাহার মুক্ত অলকাবলী উড়িয়া উড়িয়া দোল খাইতেছে। অথবা উহারা সঙ্গীতরসে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। বালিকা আবার গাহিল—

আজি, প্রভাতে—
বহিয়া কুসুম গন্ধ
সমীর বহিছে মন্দ
প্রাণের কুঞ্জে মৃরজ মন্দ্রে
বাজিছে অযুত ছন্দ।

আজি, কার দরশন আশে
পুলকের হৃদয় ভাসে,
কার প্রেমের বাণী অমিয় ঢালিয়া
মরমে মরমে পশে!

কার ভুবনভুলান ছবি,
যেন প্রভাতের রবি
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে
দেখা দিয়ে যায় ডুবি।

কার অই বাঁশীর স্বরে
পরাণ আকুল করে!
হৃদয়-কুঞ্জে কুসুমপুঞ্জে
কে ডাকিছে মোরে!

আমি চিনেছি ওরে এখন
ও যে জীবনের জীবন
হৃদয়ের ধন নয়নমণি
প্রাণবল্লভ রতন।

ফাতেমা ৩০ মিনিটে তিনবার গাহিয়া এ-সঙ্গীত শেষ করিল। শেষের পদ গাহিবার সময় ঐশী প্রেমের তীব্র উদাসে সকলের বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আয়েশা খানম বেএখতেয়ার হইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। ফাতেমা

যখন গাহিতেছিল তখন মনে হইতেছিল, কোটি স্বর্গ এই বালিকার পুণ্য চরণতলে চুরমার হইয়া যাইতেছে। সকলের মুখমণ্ডল পুণ্যের মহিমায় কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! স্বর্গরাজ্যের এক অমৃত-ঝরণা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। আয়েশা খানম বলিলেন, "ফাতেমা! আর একটি ক্ষুদ্র মোনাজাত (প্রার্থনা) গেয়ে ক্ষান্ত হ'। বড় পরিশ্রম হচ্ছে।"

ফাতেমা বলিল, "না মা! কিছুই পরিশ্রম হয় নাই। আপনি যতক্ষণ বসবেন, আমি ততক্ষণ গাইব।" বালিকার কণ্ঠে আবার বাজিল—

কুঞ্জ সাজিয়ে তোমারি আশে বসিয়ে আছি হে প্রাণধন!
তোমারি চরণ করিয়া শরণ সঁপিয়া দিয়েছি এ দেহ মন।
তোমারি তরে ভক্তি-কুসুমে গেঁথেছি আমি শোভন মালা,
হৃদি-সিংহাসনে বসহ বঁধুয়া আঁধার মানস করিয়ে আলা।
মরমে মরমে হৃদয়ে হৃদয়ে জেগেছে তোমার প্রেমের তৃষা,
(আমি) পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা।

ফাতেমা যখন কিন্নরীকণ্ঠে গাহিল, "আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা" তখন সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন। ফাতেমা এমনি করিয়া সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা-জড়িত ব্যাকুল স্বরে এমন চমৎকার সুরে অপূর্ব ভঙ্গিমার সহিত "আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা" গাহিল যে, সকলে এক সঙ্গে ঐশী প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই প্রাণের ভিতরে সেই পরম সুন্দর পরম পুরুষের তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত থামিবার অর্ধঘন্টা পরে সকলের প্রেমোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইল। কিন্তু তখনও মনে হইতেছিল যেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতের অমৃতায়মান স্বরে বোমবর্ষে স্থির ধীর হইয়া রহিয়াছে। ঈসা খাঁ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আম্মাজান! ফাতেমা কি চমৎকার গায়! আর আজকার সঙ্গীতের বাছাই বা কি মনোহর! ও যখন গায়, তখন আমার মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবী-কুলেশ্বরী জগজ্জননী ফাতেমা জোহরা-ই মর্ত্যে আসিয়া বালিকা মূর্তিতে গাহিতেছেন!"*

আয়েশা : আহা! আজ যদি তোমার কেবলা সাহেব বেঁচে থাকতেন, তা হলে তিনি কি আনন্দই না উপভোগ করেতেন! তবুও আমার বিশ্বাস, ও যখন গায়, তখন তাঁর আত্মা এসে সঙ্গীত-সুধা পান করতে থাকে। ফাতেমা যতদিন আছে, ততদিন আমি এই স্বর্গসুখ অনুভব করছি। কিন্তু তারপর এ সুখ ও পুণ্য ভোগের ভাগ্য হবে না।

** জগজ্জননী বিবি ফাতেমা সঙ্গীতেও পটু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি "কেতাবল অঘানী"তে দ্রষ্টব্য। আরবে প্রাচীন কাল হইতেই নারীদিগের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা প্রসার লাভ করিয়াছিল। ("এবনে খলদুন" দেখুন।)*

ঈসা ঃ কেন মা।

আয়েশা ঃ কেন আর কি? ফাতেমাকে তো আর চিরকাল এখানে রাখতে পারব না। তুমিও তো বিবাহ করবো না যে, বৌমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারবো।

ফাতেমা ঃ কেন মা! আমি চিরকালই আপনার কাছে থাকব।

আয়েশা ঃ (হাস্য করিয়া) হাঁ বাছা! ঐ রকম সকলেই ভাবে বটে' কিন্তু এ জগতে যা ভাবা যায়, তাই ঠিক রাখতে পারা যায় না। তুমি ছেলে মানুষ, সংসার-চক্রের এখনও কিছু জান না।

ফাতেমা ঃ যা হক মা, মিঞাভাইয়ের শাদীর আয়োজন কর।

ঈসা খাঁ ফাতেমার কথায় লজ্জিত হইয়া জননীর অসাক্ষাতে মুঠি তুলিয়া স্মিত মুখে ইঙ্গিতে ফাতেমাকে বলিলেন, "চুপ্"।

আয়েশা ঃ হাঁ মা! আমি শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি।

ফাতেমা ঃ হাঁ, আম্মাজান! কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী নাকি খুব সুন্দরী?

আয়েশা ঃ থাকুক সুন্দরী, তাতে কি হবে?

ফাতেমা ঃ কেন আম্মাজান?

আয়েশা ঃ হিন্দুর মেয়ের আবার সৌন্দর্য!

ফাতেমা ঃ না মা! সে নাকি পাঠানীর মত সুন্দরী!

আয়েশা ঃ হাজার হউক, সে হিন্দুর মেয়ে।

ফাতেমা ঃ সে তো আর হিন্দু থাকছে না, শাদী হলে সে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হবে।

আয়েশা ঃ তা হউক বাছা। তাই বলে আমি প্রতিমাপূজক কাফেরের কোনও কন্যাকে কদাপি ঘরে এনে বংশ কলুষিত করবো না।

ফাতেমা ঃ কেন মা! আজকাল তো অনেক মুসলমানই হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করছে।* হিন্দুর মেয়ে অসভ্য হলেও, মুসলমান-পরিবারে এসে আদব, কায়দা, লেহাজ, তমিজ, তহ্জিব, আখ্লাক সমস্তই শিখে সভ্য হয়ে যায়।

আয়েশা ঃ তা বটে মা। কিন্তু এতে গুরুতর জাতীয় অনিষ্ট হচ্ছে। হিন্দুর নিস্তেজ রক্ত মুসলমানের রক্তে মিশ্রিত হয়ে মুসলমানকে ক্রমশঃ হিন্দুর ন্যায় ভীরু, কাপুরুষ, ঐক্যবিহীন, জড়োপাসক নির্বীর্য নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।

জননীর বাক্যে ঈসা খাঁর হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল। সহসা কুসুমমাল্য-পরিধানোদ্যত ব্যক্তি মাল্যে সর্পের অবস্থিতি দর্শনে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, ঈসা খাঁ তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্বর্ণময়ীকে মানসপ্রতিমা সাজাইবার জন্য

** জগতবিজয়ী মুসলমানেরা প্রায় সকলেই রাজপুতানী বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপর সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠবংশীয় হিন্দু কন্যার পাণিপীড়িত প্রথা খুবই প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে আমাদের মধ্যে নানা, নানী, দাদা, দাদী, মামু প্রভৃতি রাজপুত শব্দ ও হিন্দুয়ানী নানপ্রকারের প্রথা মেয়ে-মহলে এখনও বিরাজমান।*

যে কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা জননী-মুখ হইতে নির্গত বাক্যের বজ্র-নির্ঘাতে যেন চুরমার হইয়া গেল। ঈসা খাঁ একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "আম্মাজান! বাস্তবিকই হিন্দু কন্যার পাণিপীড়ন দোষে ভবিষ্যতে মুসলমানদিগকে অধঃপাতে যেতে হবে বলে মনে হয়।"

আয়েশা ঃ বাছা! এতে মুসলমানের এমন অধঃপতন হবে যে, কালে মুসলমান হিন্দুর ন্যায় কাপুরুষ ও "গোলামের জাতি"তে পরিণত হবে।

ঈসা খাঁ ঃ তবে কথাটা কেউ তলিয়ে দেখছে না কেন?

আয়েশা ঃ দেখবে কে? স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর পর্যন্ত এই পাপে লিপ্ত। হিন্দুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনিই এই প্রথা বিশেষরূপে প্রবর্তন করেছেন। তিনি ভাবছেন, এতে হিন্দুরা প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে বাধিত থাকবে। ফলে কিন্তু বিপরীত ঘটবে। এতে স্পষ্টই ভারত-সম্রাটের সিংহাসনের উপর হিন্দুদের মাতুলত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর সাহস স্পর্ধা দিন দিন বেড়ে যাবে। ভাগিনেয় সম্রাট হলে হিন্দুদের উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ হয়ে উঠবে। এইরূপে দেশের রাজদণ্ড পরিচালনায় হিন্দুর হস্তও নিযুক্ত হবে। অন্যদিকে বংশধরেরা মাতৃরক্তের হীনতাবশতঃ কাপুরুষ, বিলাসী এবং চরিত্রহীন হয়ে পড়বে। আমার মনে হয়, উত্তরকালে এ জন্য ভারতীয় মুসলমানকে বিশেষ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। এরা ভারতের রাজপতাকা স্বহস্তে রক্ষা করতে পারবে না।

ঈসা খাঁ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নীরব রহিলেন। জননীর হিন্দু-কন্যা বিবাহের অনিষ্টকারী মত বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি মনে মনে বিশেষ সঙ্কট গণিলেন।

ফাতেমা ঃ আম্মাজান! তবে আমরা কখনো হিন্দু বউ আনবো না।

আয়েশা ঃ কখনও না, ছিঃ!

এই বলিয়া আয়েশা খানম গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ফাতেমাও বাহির হইয়া গেল। ঈসা খাঁ একাকী বসিয়া ব্যথিতচিত্তে স্বর্ণময়ীর পত্রের কি উত্তর দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঈসা খাঁ অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত অনেক ভাবিলেন—অনেক চিন্তা করিলেন; কিন্তু সে-ভাবনা, সে-চিন্তা অনন্ত সমুদ্রবক্ষে দিকহারা নৌকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। স্বর্ণময়ীর প্রেমপত্রখানি শত বারেরও অধিক পড়িলেন। যৌবনে বিদ্যুদ্দীপ্ত-সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়-আকাশে সৌদামিনীর মত চমকাইতে লাগিল! স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা স্মরণ করিয়া ঈসা খাঁ বড়ই কাতর ও মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, স্বর্ণকে তিনি প্রেমের বাহুতে জড়াইয়া না ধরিলে, স্বর্ণের জীবন ভস্মে পরিণত হইবে। রায়-নন্দিনীর পরিণাম ভাবিয়া তাহার হৃদয়খানি নিজের হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তিনি ব্যতীত স্বর্ণের আর কেহ নাই—কিছু নাই। তিনি ব্যতীত স্বর্ণ অনাথিনী, স্বর্ণ রাজকন্যা হইলেও তিনি

ব্যতীত ভিখারিণী! ঈসা খাঁ শিহরিয়া উঠিলেন! বসিয়া, শুইয়া, দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন—কিন্তু সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। ঈসা খাঁ রায়-নন্দিনীকে যখন মন্দিরে দর্শন করিয়াছিলেন—যখন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন—তখনও স্বর্ণের সৌন্দর্য ও ভাষা তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। কিন্তু সে আনন্দ তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্বর্ণকে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিতেন—বার ভূঁইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ মসনদ আলীকে, কেদার রায় যে পরম আগ্রহে কন্যাদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিতে কৃতার্থতা জ্ঞান করিবেন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; কিন্তু তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। প্রথমতঃ ঈসা খাঁ নিজের বিবাহ সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন না; তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহ করিলে কোন বীর্যবতী বীরাঙ্গনাকেই বিবাহ করিবেন! বীরাঙ্গনা বিবাহের খেয়াল ছিল বলিয়াই, স্বর্ণময়ীকে পরম রূপবতী এবং ফুটন্ত-যৌবনা দর্শন করিলেও কদাপি তাঁহাকে বিবাহ কবিরার কল্পনাও তাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। কারণ, হিন্দু-কন্যাতে বীরত্বের আশা নিম্ববৃক্ষে আম্র ফলের আশা সদৃশ। এজন্য স্বর্ণময়ী তাঁহার নেত্রে গগন-শোভন চিত্ত-বিনোদন তারকার ন্যায় ফুটিয়াছিল, হাসিয়াছিল এবং কিরণ বিতরণও করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্ত-বিকার জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। তারার সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হয়। ছিড়িয়া গলে পরিবার কাহারও আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু স্বর্ণের প্রাণ দিয়া লেখা প্রাণ-ঢালা প্রেমের সৌন্দর্য-মাখা, আত্মোৎসর্গের অটল বিশ্বাস ও অচল নিষ্ঠাপূর্ণ পত্র পাঠে স্বর্ণময়ীর নাক্ষত্রিক সৌন্দর্য তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। তিনি যতই পুনঃ পুনঃ সেই হৃদয়ের লিপি পাঠ করিতে এবং নিজের হৃদয়-মুকুরে স্বর্ণের হৃদয়ের ছবি দেখিতে লাগিলেন, ততই স্বর্ণময়ী তাঁহার নিকট তারকার পরিবর্তে গোলাপে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে স্বর্ণ তাঁহার সম্মুখে মনপ্রাণ-প্রীণন সুরভিপূর্ণ শিশিরসিক্ত, উষালোক-প্রস্ফুটিত অতি মনোহর গরিমাপূর্ণ রক্তাভ লোভনীয় বসরাই গোলাপের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন তিনিও উহাকে আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হায়! ঠিক এমন সময়েই তাঁহার জননী উদ্যানের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, সামান্য বল প্রয়োগেই এ-দ্বার উন্মোচন করিতে পারিতেন। কিন্তু জননীর হিন্দু রমণী বিবাহের যুক্তিসঙ্গত অনিষ্টকারী মত লৌহ-অর্গলের মত সে-দ্বার কঠিনভাবে অবরুদ্ধ করিল। জননীর যুক্তির সারবত্তায় এবং বচনের ওজস্বিতায় ঈসা খাঁর উদ্দাম হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহ, হযরত দায়ুদের সঙ্গীত শ্রবণে উত্তাল তরঙ্গময়ী খরগতি স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ঈসা খাঁ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রায়-নন্দিনীর প্রেমের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাও যা, আর স্বর্ণময়ীর কোমল তরল প্রেমপূরিত-বক্ষে শাণিত বিষদিগ্ধ ছুরিকা

প্রাণটা করিয়া হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করাও তাই। সুতরাং ঈসা খাঁ স্বর্ণের হৃদয়-দানের প্রত্যাখ্যানের কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার বীর-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হায়! জগতে সিংহ-শার্দূল-পরাক্রমী উচ্চণ্ড-প্রতাপ নির্ভীক বীর-হৃদয়ও এমনি করিয়া প্রেমের নিকটে কুণ্ঠিত এবং লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। প্রেমের কি অপরাজেয় বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি! ক্ষুদ্র কীট হইতে বিশ্বস্রষ্টা অনন্তপুরুষ পর্যন্ত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রেমের শাসন কি কঠিন শাসন! প্রেমের আকর্ষণ কি মোহনীয়! আজি যুবতী-প্রেমের মদিরাকর্ষণে ঈসা খাঁর প্রশান্ত চিত্তও নিশাপতি সুধাংশুর কৌমুদী-আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে জননী-প্রেমের কঠিন শাসনে সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াও, আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে তরঙ্গ-বাহু বিস্তার করিতে পারিতেছে না। বেলাভূমি অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, উহা জননী-প্রেমের কঠিন ও অভঙ্গুর পর্বতপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ঈসা খাঁ অনেক গবেষণার পর বুঝিতে পারিলেন যে, জননীকে ধরিয়া বসিতে পারিলেই তাঁহার মত ফিরিবে। কিন্তু তজ্জন্য সুযোগ চাই। সুতরাং ঈসা খাঁ অবশেষে নিখিল-শরণ মঙ্গল-কারণ বিশ্ব-বিধাতার বিপদভঞ্জন চরণে আশ্রয় লইয়া চঞ্চল চিত্ত কতকটা স্থির করিলেন। তৎপর স্বর্ণ-খচিত 'খাস-কাগজে' কস্তুরী-গন্ধ-বাসিত স্বর্ণ-কালিতে স্বর্ণময়ীকে লিখিলেন ঃ

প্রিয়তমে!

আমার অনন্ত স্নেহাশীর্বাদ, প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ এবং মঙ্গল-কামনা জানিবে। তোমার প্রাণ-ঢালা পত্র পাঠে তোমার হৃদয় করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। হে মানসসুন্দরি! বিশ্ব-প্রহ্লাদিনী পুষ্প-কুন্তলা হৈম-কিরীটিনী উষা যেন তাহার গোলাপী করের বিচিত্র তুলিকায় অম্বরমণ্ডল বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত জলদকদম্বে বিভূষিত এবং সমুজ্জ্বল করে, তেমনি, হে আমার হৃদয়-সরোবরের স্বর্ণ-সরোজিনি! তোমার নির্মল স্বর্গীয় প্রেমের বিশ্ব-বিনোদন-কিরণে এ-হৃদয় সুশোভিত এবং পুলকিত হইয়াছে। তোমার বীণা-বাণী-নিন্দিত প্রেম-গুঞ্জরণে হৃদয়-কুসুম—যাহা মুকুলিত ছিল, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

প্রিয়তমা স্বর্ণময়ি!

অনেকদিন হইতেই তোমাকে স্বর্ণময়ী মূর্তির ন্যায় ভালোবাসিতাম। আজ সে স্বর্ণময়ী মূর্তি জীবন্ত ও সরস প্রেমময়ী, প্রীতিময়ী, হৃদয়ময়ী, কল্যাণময়ী অমৃত প্রতিমায় পরিণত। সুতরাং সে মূর্তিকে ধারণা করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে যে আনন্দ ও উল্লাস, তাহা কেবল অনুমেয়। আমি অযোগ্য হইলেও, তুমি যে হৃদয় দান করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। অয়ি মনোরমে! যে হৃদয় শীতের তুষার সম্পাতে সঙ্কুচিত এবং আপনার মধ্যে

আপনি লুক্কায়িত ছিল, তাহা আজ তোমার মৃত-সঞ্জীবনী প্রেম-মলয়া-স্পর্শে প্রসূনপুঞ্জ-মণ্ডিত, কোকিল-কূজন-কুহরিত, নবশষ্পদল শোভিত স্বর্ণ-শ্রী-বিমণ্ডিত বাসন্তী-উদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

অয়ি হৃদয়ময়ি!

আজ হৃদয়ের প্রতি চক্ষু তোমার মোহিনী মূর্তি ধ্যানে নিমিলিত। প্রতি কর্ণ তোমার অমৃত-নিস্যন্দিনী জীবন-সঞ্চারিণী বাণী শ্রবণে উৎকর্ণ। প্রতি নাসারন্ধ্র তোমার কস্তুরী-বিনিন্দিত সুরভি গ্রহণে প্রমোদিত। প্রতি চরণ তোমার প্রেমের কুসুমাবৃত-পথে প্রধাবিত। প্রতি বাহুলতিকা তোমার প্রেমালিঙ্গনে প্রসারিত। প্রতি অণুপরমাণু তোমার দিকে উন্মুখ।

অয়ি কল্যাণি!

এক্ষণে কল্যাণময় প্রভু পরমেশ্বরের কল্যাণ-বারির জন্য প্রতীক্ষা কর। বসন্ত উপস্থিত হইলেই কল্যাণ-বারি বর্ষণ হয় না। বারি-বর্ষণের জন্য, কষ্টকর হইলেও কিঞ্চিৎ নিদাঘ-জ্বালা সহ্য করিতে হয়। হে সুন্দরি! নৌকা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও সজ্জিত হইলেই 'মরকত দ্বীপে' অভিযান করিতে পারে না। অনুকূল বায়ু-প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হে মানসি! উপস্থিত তোমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলাম, প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা অভিনন্দন করিতে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। সে-বাধা করুণাময়ের আশীর্বাদে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করি। তজ্জন্য আমাদের অধীর বা নিরাশ হইবার কিছুই নাই। পিপাসা বাড়িতে থাকুক, শেষে উহা অমৃতপানে পরম তৃপ্তিলাভ করিবে।

সম্মুখে মহররমোৎসবে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

ইতি—
তোমারই
ঈসা
খিজিরপুর—আসাদ-মঞ্জিল।

পত্র শেষ করিয়া ঈসা খাঁ পুনরায় পত্রের এক কোণে বিশেষ করিয়া লিখিলেন :

"হে প্রেমময়ি! ব্যায়াম-চর্চা এবং অস্ত্র-সঞ্চালনে পটুতা লাভ করিতে বিশেষ যত্ন করিবে, ঐ পটুতাই সেই বাধা দূরীকরণে বিশেষ সহায় হইবে।"

অনন্তর পত্রখানি একটি বহুমূল্য আতরের শিশির সহিত ক্ষুদ্র রৌপ্যবাক্সে বন্ধ করিয়া রেশমী রুমালে বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিবনাথকে এক জোড়া উৎকৃষ্ট ধুতি, চাদর এবং একটি সুবর্ণ মুদ্রা বখশিশ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য আজ খুব সকাল সকাল কাছারি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য মন্ত্রণা-গৃহে একখানি রৌপ্য-সিংহাসনে বসিয়াছেন। পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী শ্যামাকান্ত ও অন্যতর সেনাপতি কালিদাস ঢালী মখমলমণ্ডিত উচ্চ ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবিষ্ট। দালানের দরজা বন্ধ। জানালাগুলি কেবল মুক্ত রহিয়াছে। দূরে ফটকের কাছে একজন পর্তুগীজ সিপাহী পাহারা দিতেছে।

তাহার উপর কড়া হুকুম, যেন রাজাদেশ ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মদ্যপানে রক্তবর্ণ। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ এবং অসুরের ন্যায় পেশীসম্পন্ন। চক্ষুর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী অথচ নির্মম। মুখমণ্ডলে বীরত্বের তেজ নাই; কেবল ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান। চেহারায় লাবণ্যের পরিবর্তে তীব্র কামুকতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রতাপাদিত্যের বয়স ৫৫ বৎসর হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। একজন কবিরাজ দিবারাত্র তাঁহাকে কামাগ্নি-সন্দীপন রস, কামেশ্বর মোদক, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ইত্যাদি কামেন্দ্রিয়-উত্তেজক ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানের জন্য একদল গোয়েন্দাও নিযুক্ত আছে। প্রতাপাদিত্য যেমন কামুক, তেমনি নিষ্ঠুর। বঙ্গের সরস কোমল ভূমিতে তাঁহার ন্যায় মহাপাষণ্ড, নৃশংস ও নর-পিশাচ, অতীতে বিজয় সিংহ,* রাজা কংস এবং উত্তর কালে দেবী সিংহ ও নবকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতাপাদিত্য কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন : "কমলাকান্ত! এতদিনে তো বসন্তখুড়োর নিপাত করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে নিয়ে এখনও তো কেউ ফিরল না!"

মন্ত্রী : মহারাজ! আপনি বসন্তপুরে গিয়েছিলেন বলে তত্ত্ব জানাবার সুবিধা হয়নি। স্বর্ণময়ীকে যারা লুঠতে গিয়েছিল, তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রতাপ : কি! অকৃতকার্য হয়ে ফিরল!

মন্ত্রী : আজ্ঞে হাঁ, অকৃতকার্য হয়ে।

** বিজয় সিংহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহল হইতে লিখিতপত্র দেখ। রাজা কংসের ভীষণ অত্যাচার "রিয়াজ-উস্-সালাতিনে" দেখ। দেবী সিংহ এবং রাজা নবকৃষ্ণের লোমহর্ষণ অত্যাচারির বিবরণের জন্য এডমণ্ড বার্কের বক্তৃতা এবং "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী" দেখ।*

প্রতাপ : ডাকো তাদের।

মন্ত্রী তখন তাহাদিগকে ডাকিবার জন্য সিপাহীদের ব্যারাকে লোক পাঠাইলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে রামদাস, রাধাকান্ত, হরি, শিবা, মাধা প্রভৃতি আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া প্রতাপকে দণ্ডবৎ করিল। তৎপরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রতাপ : কেদার রায়ের কন্যা কোথায়?

রাধাকান্ত : মহারাজ! তাকে ঈসা খাঁ ছিনিয়ে নিয়েছে।

প্রতাপ : তোদের ঘাড়ে মাথা থাক্‌তে?

রাধা : আমাদের অবশিষ্ট সকলেই মারা পড়েছে। আমাদের দোষে নেই। অপরাধ মার্জনা করুন।

প্রতাপ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিলেন, "যা, এখনই তোদের একেবারে মার্জনা করছি।" এই বলিয়া জল্লাদের সর্দারকে আদেশ করিলেন যে, "এদের গায়ে আলকাতরা মেখে আগুনে পোড়াও।"

বলা বাহুল্য, পাঁচটি প্রাণী অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবী হইতে উড়িয়া গেল।

প্রতাপ ইহাদিগকে ভস্ম করিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু নিজের নৈশাচিক কামানলে আহুতি দিবার জন্য স্বর্ণময়ীর চিন্তায় চঞ্চল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, "মহারাজ! ব্যস্ত হবেন না। আগামী আষাঢ়ের মহররম-উৎসব উপলক্ষে সৈন্য পাঠিয়ে স্বর্ণময়ীকে লুঠে আনবার জোগাড় করছি।"

সেনাপতি কালিদাস ঢালী বলিল, "এই পরামর্শই ঠিক। মহররম উপলক্ষে সাদুল্লাপুরে মহোৎসব হয়ে থাকে, নানাদেশ হতে লোক-সমাগম হয়। সেই সময় যাত্রীবেশে বহুসৈন্য প্রেরণ করতে পারব। একবার ধরে 'ময়ূরপঙ্খী'তে তুলতে পারলেই হয়। একশ' দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী কারও ধরবার সাধ্য হবে না।"

প্রতাপ : কিন্তু কেদার রায় এক্ষণে খুব সাবধান হয়েছে। স্বর্ণময়ীকে রক্ষা করবার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত রক্ষী রাখবে। সাদুল্লাপুরের মিত্রদের লোকজনের অভাব নাই।

শ্যামা : সেই যা একটু ভাবনা। প্রথমে একটা দাঙ্গা হবে।

প্রতাপ : সে কি দাঙ্গা? সে যে দস্তুরমত যুদ্ধ বাঁধবে। এই তো চর-মুখে শুনলেম যে, সাদুল্লাপুরের মিত্র-বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর রক্ষাকল্পে দুইশ' সিপাহী কেদার রায় পাঠিয়েছেন।

কালিদাস : তা হোক। আমাদের মাহতাব খাঁ সেনাপতি সাহেব যদি যান, তা হলে আমরা দুইশত সিপাহী নিয়েও হাজার লোকের ভিতর হতে কেদার রায়ের কন্যাকে ছিনিয়ে আনতে পারবো।

প্রতাপ : (একটু হাসিয়া) কেন, তুমি একাকী সাহস পাও না কি?

কালি : সাহস পাব না কেন, মহারাজ! কিন্তু জানেন তো, সাবধানের মার নেই। খাঁ সাহেব আমার চেয়ে সাহসী এবং কৌশলী। বিশেষতঃ, সিপাহীরা তাঁর কথায় বিশেষ উৎসাহিত হয়। তিনি সঙ্গে থাকলে কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

প্রতাপ : তবে তাঁকে ডাকান যাক।

কালি : আজ্ঞা হাঁ! তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করতে হচ্ছে।

প্রতাপাদিত্য তখনই সেনাপতি মাহতাব খাঁকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অর্ধ ঘন্টার মধ্যে খাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খাঁ সাহেবের বয়স ত্রিশের উপরে নহে। দেখিতে অত্যন্ত রূপবান ও তেজস্বী। চরিত্র অতি পবিত্র, মূর্তি গম্ভীর অথচ মনোহর। তাঁহার চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় এমন একটা আদব-কায়দা ও আত্মসম্মানের ভাব ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। প্রতাপাদিত্যের মত পাপিষ্ঠ প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রম করিতেন। প্রতাপ, খাঁ সাহেবের সহিত কদাপি কোনও কুপরামর্শ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতে পর্যন্ত সাহস পাইতেন না। তাঁহাকে দেখিলেই মনে লোকে সভ্য-ভব্য হইয়া পড়িত। অথচ তিনি অত্যন্ত মিতভাষী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের আহ্বান বা নিজের বিশেষ গরজ ব্যতীত খাঁ সাহেব কদাপি দরবারে আসিতেন না। ফল কথা, প্রতাপ ও খাঁ সাহেবের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ব্যবহার ছিল না। বিজাতির কাছে কেমন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চাকুরি করিতে হয়, খাঁ সাহেব তাহা ভালোরূপেই জানিতেন।

খাঁ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে কালিদাস সমস্ত কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলেন। খাঁ সাহেব বলিলেন, "পাত্রী কি মহারাজের প্রতি আসক্তা?"

কালি : না, তাহলে কি আর এত গোলযোগ হয়? সেরূপ হলে তো অনায়াসেই কার্যসিদ্ধি হত। তা হলে আর আপনাকে ডাকবার আবশ্যক হত না।

খাঁ : তবে তো এ কার্য বড়ই কলঙ্কের।

কালি : কোন্ পক্ষে?

খাঁ : মহারাজের পক্ষে। তাকে জোর করে আনলে সে কি মহারাজকে শাদী করবে?

কালি : জোর করি শাদী করাব। শাদী না করে বাঁদী করে রাখব।

খাঁ : কাজটা বড়ই ঘৃণিত। এ কাপুরুষের কার্য।

প্রতাপের হৃদয় স্বর্ণময়ীর জন্য উন্মত্ত। সুতরাং খাঁ সাহেবের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় প্রবেশ করিল। আর কেহ হইলে হয়তো প্রতাপ তখনি মাথা কাটিবার আদেশ দিতেন। কিন্তু খাঁ সাহেব ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ বলিয়াই তাহা হইল না। তবুও প্রতাপ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন : "খাঁ সাহেব! আপনাকে ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য ডাকা হয়নি।"

খাঁ ঃ আমিও তা বলছি না। কিন্তু কিসের জন্য ডেকেছেন মহারাজ?

প্রতাপ ঃ স্বর্ণময়ীকে এনে দিতে হবে।

খাঁ ঃ কেমন করে?

প্রতাপ ঃ লুঠ করে।

খাঁ ঃ মহারাজ! মাফ করুন, এমন কার্য ধর্ম সইবে না।

প্রতাপ ঃ আবার ধর্মের কথা?

খাঁ ঃ তবে কি ধর্ম পরিত্যাগ করব?

প্রতাপ ঃ প্রভুর আজ্ঞা পালনই ধর্ম।

খাঁ ঃ অধর্মজনক আজ্ঞাও কি?

প্রতাপ ঃ আজ্ঞা পালন দিয়ে কথা, তাতে আবার ধর্মাধর্ম কি?

খাঁ ঃ মহারাজ! তবে কি আপনি ধর্মাধর্ম মানেন না?

প্রতাপ ঃ প্রতাপাদিত্য অমন ধর্মের মুখে পদাঘাত করে।

খাঁ ঃ তওবা! তওবা!! এমন কথা বলবেন না, মহারাজ! সামান্য প্রভুত্ব পেয়ে আত্মহারা হবেন না। পরকাল আছে—বিচার আছে—জীবনের হিসাব-নিকাশ আছে—দীন্-দুনিয়ার বাদশাহ্ খোদাতালা নিত্য জাগ্রত। তিনি সবই দেখছেন।

প্রতাপ ঃ ওসব কোরান-কেতাবের কথা রেখে দিন। ওটা মুসলমানদেরই শ্রবণযোগ্য। আমি হিন্দু, ও-সব মানি না।

খাঁ ঃ কেন, হিন্দুশাস্ত্রে কি কোরানের উপদেশ নেই?

প্রতাপাদিত্য বড়ই জ্বলিয়া গেলেন। তাঁহার ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। রাগিয়া বলিলেন ঃ "ও-সব শাস্ত্র দরিয়ায় ঢালো। আমার শাস্ত্র স্বর্ণময়ী, আমার ধর্ম স্বর্ণময়ী। আমি তাকেই চাই। যেমন করেই হোক তাকে এনে দিতে হবে।"

খাঁ ঃ মহারাজ! আমি মুসলমান, আমি বীরপুরুষ। তস্করের ন্যায় লুঠে আনতে পারব না। ওটা দস্যুর কার্য। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষের পক্ষেই শোভা পায়।

প্রতাপ ঃ কিন্তু আমার অনুরোধে তা একবারের জন্য করতেই হবে।

খাঁ ঃ মহারাজ, অনুগতকে মাফ করবেন।

প্রতাপ ঃ খাঁ সাহেব! মার্জনা করবার সময় থাকলে, কখনই আপনাকে আহ্বান করতাম না। যেমন করেই হোক স্বর্ণময়ীকে আনতেই হবে। বীরপুরুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক সময় দস্যু-তস্কর সাজতে হয়। তাতে কলঙ্ক নেই। খাঁ সাহেব! আপনি তো সামান্য সেনাপতি, অত বড় অবতার রাক্ষসবিধ্বংসী রামচন্দ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরাপরাধ বালীকে তস্করের ন্যায় হত্যা করেছিলেন। তস্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎকে ছদ্মবেশে কাপুরুষের মত বধ করেছিলেন। বীর-চূড়ামণি অর্জুন নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মকে পরাস্ত করেছিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে পরাস্ত করার জন্য "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" রূপ মিথ্যা কথা বলতে কুণ্ঠিত হননি। পুরাণে এরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে।

স্বর্ণময়ীকে নিয়ে আসতে পারলে আমার প্রাণের দুহিতা অরুণাবতীকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করব। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা হবেন।

খাঁ : মহারাজ' যোড় হস্তে মার্জনা প্রার্থনা করি। সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পেলেও এবং স্বর্গের অপ্সরীরা চরণ-সেবা করলেও মাহতাব খাঁর দ্বারা এ-কাজ সম্পন্ন হওয়ার নহে। অন্য যে পারে করুক।

প্রতাপ : কি! এত বড় আস্পর্ধা? আমি বলছি তোমাকে এ-কাজ করতেই হবে।

খাঁ : মহারাজ! কখনই নয়। আপনার চাকুরি পরিত্যাগ করলাম।

প্রতাপ : সাবধান! ও জিহ্বা এখনই অগ্নিতে দগ্ধ করব, কার সাধ্য নিজ ইচ্ছায় আমার চাকুরী পরিত্যাগ করে! তোমার মত খাঁকে শিক্ষা দিতে প্রতাপের এক নিমেষ সময়ের আবশ্যক।

খাঁ : মহারাজ! আমি আর আপনার ভৃত্য নহি। সুতরাং বিবেচনা করে কথা বলবেন।

প্রতাপাদিত্য এবার জ্বলিয়া উঠিলেন, পা হইতে পাদুকা খুলিয়া মাহতাব খাঁর দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। মহাতাব খাঁ শূন্য-পথেই পাদুকা লুফিয়া লইয়া "কমবখত বে-তমিজ শয়তান" বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে বিষম জোরে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া গেলেন। মাহতাব খাঁর পাদুকা-প্রহারে প্রতাপাদিত্যের নাক-মুখ হইতে দরদর ধারায় রক্ত ছুটিল। সকলে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় হাঁ হাঁ করিয়া খাঁ সাহেবের দিকে রুখিয়া উঠিল। প্রতাপাদিত্য "ছের উতার লাও, ছের উতার লাও" বলিয়া ক্রোধে গর্জিতে লাগিলেন। সেনাপতি সাহেব তখন ভীষণ গর্জনে আকাশ কাঁপাইয়া 'কিছি কা মরণে কা এরাদা হ্যায় তো, আও" বলিয়া কোষ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে তরবারি আকর্ষণ করতঃ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁ সাহেবের প্রদীপ্ত জ্বালাময়ী করালী-মূর্তি ও অগ্নি-জিহ্ব তরবারি দর্শনে সকলের বক্ষের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থামিয়া গেল। মাহতাব খাঁ ধীর-মন্থর গতিতে কৃপাণ-পাণি অবস্থায় ফিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই মুহূর্তেই যশোর ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনোহরপুরে

মাহতাব খাঁ রাগে ও ঘৃণায় যশোর নগর হইতে নৌকা ছাড়িলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যত শীঘ্র যশোরের এলাকার বাহিরে যাইতে পারেন, ততই মঙ্গল। যশোরের বায়ুমণ্ডল যেন তাঁহার কাছে বিষাক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ প্রতাপাদিত্যের লোকজন আসিয়া অনায়াসেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে।

তিনি বীরপুরুষ হইলেও একাকী কি করিতে পারেন! তাঁহাকে ধরিতে পারিলে প্রতাপাদিত্য যে হাত-পা বাঁধিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করিবেন, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি মাল্লাদিগকে খুব দ্রুত নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। খাঁ সাহেব যে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মাঝি-মাল্লারা অবশ্য তাহা জানিত না। তাহাদের জানিবার কথাও ছিল না। তাহারা জানিলে অবশ্য আসিত না। কারণ এইরূপ কার্যে প্রতাপাদিত্য যে তাহাদের শরীরের চর্ম ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ মাখিয়া দিবেন, তাহা তাহারা বেশ জানিত। সেনাপতি কোন দরকারবশতঃ মনোহরপুরে যাইতেছেন বলিয়া মাঝিরা বিশ্বাস করিতেছিল।

মাহতাব খাঁ মনোহরপুরে পঁহুছিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইল। মনোহরপুরে প্রতাপাদিত্যের একখানা বাড়ী ও একটি কাছারি ছিল। এতদ্ব্যতীত সেখানে গোলা ও হাটবাজার দস্তুরমত ছিল। কাছারিতে ১০ জন তবকী অর্থাৎ বন্দুকধারী, ২৫ জন লাঠিয়াল, একজন জমাদার, একজন নায়েব এবং অন্যান্য কর্মচারী ১০/১২ জন ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্ত্রীর সংখ্যা চল্লিশেরও উপর ছিল। এতদ্ব্যতীত উপপত্নীও যথেষ্ট ছিল। মনোহরপুরে চতুর্থ রাণী দুর্গাবতী বাস করিতেছেন। তিনি পূর্বে যশোরের প্রাসাদের অধিবাসিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে সন্তানাদি হওয়ায় তাঁহার যৌবনে ভাঁটা ধরিলে প্রতাপাদিত্যের মন-মধুকর যখন দুর্গাবতীকে কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া মনে করিল, তখন মনোহরপুরের ক্ষুদ্র বাটীতে তাঁহাকে সরাইবার ব্যবস্থা হইল। তদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য আরও একটি কারণে দুর্গাবতীতে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্গাবতী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন, একবার রাগিয়া গেলে তাঁহার জিহ্বার বাক্যানলে সকলকেই দগ্ধ হইতে হইত। তাঁহার জিহ্বা সর্বতোভাবে নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। তাঁহার তীব্র সমালোচনা এবং বিদ্রূপ-বাণে প্রাসাদবাসিনী অন্যান্য রাণীরা অস্থির থাকিতেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকেও অতি সামান্যই গ্রাহ্য করিতেন। দুর্গাবতী তাঁহার পরবর্তী রাণীদিগকে আপনার ক্রীতদাসী অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন। প্রতাপাদিত্য অবশেষে এই দারুণ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে মনোহরপুরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাবতী মনোহরপুরে আসিয়া প্রাসাদের নিত্য ব্যভিচার, অত্যাচার ও হত্যা-দূষিত বিষাক্ত বায়ু হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য বৎসরের কোনও সময় এদিকে আসিলে দুর্গাবতীর মন্দিরে অবশ্যই পদধূলি পড়িত। নতুবা তাঁহাকে একপ্রকার বৈধব্য জীবনই কাটাইতে হইত। এই দুর্গাবতীর সময়েই মাহতাব খাঁ যশোরের রাজপুরীতে প্রবেশ এবং নিজের বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা। যশোরের অন্তঃপুরে তখন দুর্গাবতীর একাধিপত্য। দুর্গাবতীর যৌবনের সুবর্ণ-শৃঙ্খলে প্রতাপাদিত্য তখন দুশ্ছেদ্যভাবে পোষা কুকুরের ন্যায় বাঁধা ছিলেন।

দুর্গাবতী মুখরা ও আধিপত্যপ্রিয়া হইলেও অত্যন্ত বদান্যা ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। লোকের গুণানুকীর্তনে সর্বদাই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠ দেখা যাইত। প্রতাপের কুৎসিৎ ব্যবহারই পরে তাঁহাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছিল। মাহতাব খাঁ রাণীর সৌভাগ্যের দিনে রাণীর হস্ত ও মুখ হইতে অনেক আর্থিক পুরস্কার ও বাচনিক প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়া রাণীকে তিনি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। রাণীও মাহতাবকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রাণীর মনোহরপুর নির্বাসনে এবং তাঁহার আধিপত্য চ্যুতিতে সর্বাপেক্ষা যদি কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে সে মাহতাব খাঁ। রাণীর একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, নাম অরুণাবতী। পুত্র শিশু, পঞ্চম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। নাম অরুণকুমার। অরুণাবতী পূর্ণ যুবতী। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গ, কূলে কূলে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। বক্ষে বক্ষে প্রেমের তরঙ্গ আকুল উচ্ছ্বাসে আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। চোখে মুখে প্রেমের বিদ্যুদ্বীপ্তি স্ফুরিত হইতেছে। প্রাণের পিপাসা বাড়িতে বাড়িতে এখন যেন উহা বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। সুপক্ক আঙ্গুর বা রসাল আম্র যেমন বৃক্ষ-পত্র হইতে ফাট্ ফাট্ হইয়া পড়ে, অরুণাবতীও তেমনি রসবতী হইয়া ফাট্ ফাট্ প্রায়। তাহার হৃষ্ট-পুষ্ট সবল ও সুডৌল দেহে যৌবন পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, রমণী বহুকষ্টে বহু সাধনায় যৌবনের প্রতাপ ও প্রভাকে আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যেন চন্দ্রমার সুবর্ণ কৌমুদীজাল বিম্রাত ভাদ্রের সফেনতোয়া স্রোতস্বতী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া হেলিয়া দুলিয়া আবর্ত রচিয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এত বয়স এবং এত রূপের গৌরব থাকা সত্ত্বেও অরুণাবতীর বিবাহ হয় নাই। বিবাহ না হইবার কারণ পাত্র না জোটা। পাত্র না জুটিবার কারণ প্রতাপাদিত্যের নিদারুণ নৃশংস পৈশাচিক ব্যবহার। কথাটা একটু খুলিয়াই বলিতেছি। ইতঃপূর্বে প্রতাপ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিভাবতীর বিবাহ বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রতাপের নিদ্রাকর্ষণ হইত না। কিন্তু রামচন্দ্র রায় জীবিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য অধিকার করা অসম্ভব। যুদ্ধ করিলে প্রতাপই জিতিবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? রামচন্দ্র রায় বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই পল্টনে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ একদল উৎকৃষ্ট গোলান্দাজ সেনা ছিল। তাহাদের তোপের জন্য প্রতাপাদিত্য ভীত ছিলেন। অগত্যা প্রতাপাদিত্য, জামাতাকে কোন পর্ব উপলক্ষে বিশেষ সমাদর ও ধুম-ধামের সহিত একদা নিমন্ত্রণ করিলেন। রামচন্দ্র রায় শ্বশুরের নিমন্ত্রণ পাইয়া পরমাহ্লাদে যশোরের রাজপুরীতে আগমন করিলেন। প্রতাপাদিত্য গভীর নিশীথকালে জামাতা রামচন্দ্র রায়কে উপাংশু-বধ করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। নরাধম পামর একবারের জন্যও উদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চিন্তা করিলেন না।

কন্যা সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ ঘটনার আভাস পাইয়া স্বামীকে সমস্ত নিবেদন করিল। রামচন্দ্র রায় রাত্রিযোগে কৌশলক্রমে প্রতাপাদিত্যের পুরী হইতে প্রাণ লইয়া কোনওরূপে পলায়ন করিলেন।* এই ঘটনার পরে কোনো রাজা কি জমিদার প্রতাপাদিত্যের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চাহিতেন না। এ-দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহ-ই সাহস করিয়া সুন্দরবনের ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় নররক্ত-লোলুপ প্রতাপের কন্যা বিবাহের প্রস্তাব করিবারও সাহস করিত না। প্রতাপও গর্ব-অহঙ্কারে রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও কন্যা সংপ্রদানের কল্পনাও করিতেন না। কিন্তু এ দিকে কন্যার দেহে যখন যৌবন-জোয়ার খরতর বেগে বহিতে লাগিল, তখন প্রতাপাদিত্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাহতাব খাঁর করে অরুণাবতীকে সমর্পণের বাসনা করিলেন। কারণ মাহতাব খাঁ অপেক্ষা উচ্চদরের পাত্র আর জুটিতেছিল না। কিন্তু মাহতাব খাঁকে সাধিয়া কন্যা দান করিতে প্রতাপের ইচ্ছা ছিল না। কোনো ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিলেন। ঘটনাও জুটিয়া উঠিল। পাঠকগণ পূর্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতাপের দুর্ভাগ্যবশতঃ খাঁ সাহেব স্বর্ণময়ী-হরণে সম্মত হইলেন না।

সে যাহা হউক, মাহতাব খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে পথে মনোহরপুরে অবতরণ করিয়া মাতৃতুল্যা রাণী দুর্গাবতীর আশীর্বাদ লইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। অরুণাবতীকে তিনি ভালোবাসিতেন, কিন্তু সে ভালোবাসায় প্রেমের নেশা প্রবেশ করে নাই। খাঁ সাহেব ঘাটে নৌকা লাগাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে চিনিত ও জানিত। রাণী দুর্গাবতী মাহতাব খাঁকে দেখিয়া আনন্দে পরম পুলকিত হইলেন। অতি শীঘ্র সমাদরে বসাইয়া অরুণাবতীকে জলযোগের যোগাড় করিতে বলিলেন। মাহতাব খাঁ জলযোগের আয়োজন দেখিয়া রাণীকে বলিলেন, "মা! আমার আর জলযোগের সময় নেই। আমাকে এখনই মহারাজের এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। যদি বেঁচে থাকি এবং খোদার মর্জী সুদিন পাই, তখন আবার শ্রীচরণে উপস্থিত হব।" এই বলিয়া রাজার সমস্ত ব্যবহার দুঃখার্ত চিত্তে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রাণীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। ঘটনা শুনিয়া এবং প্রতাপের ক্রোধের কথা ভাবিয়া দুর্গাবতীর প্রাণ যেন শুকাইয়া গেল। রাণী সত্য সত্যই মাহতাব খাঁকে পুত্রের ন্যায় ভালোবাসিতেন। তারপর অরুণাবতীর বিবাহের আশাভরসাও যে মাহতাব খাঁর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিশাইবে, ইহা ভাবিয়া রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। বুকের পঞ্জর যেন ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল! রাণী ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না! এদিকে মাহতাব খাঁর সম্মুখেও কাঁদিতে পারিতেছিলেন না। এরূপ অনেকেই থাকে, যারা অতীব তীব্র সন্তাপেও

* *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বৌঠাকুরাণীর হাট" দেখ।*

লোকের সম্মুখে কাঁদিতে পারে না। রাণীও সেই প্রকৃতির ছিলেন। তিনি উঠিয়া অন্য ঘরে গেলেন। সেই নির্জ্জন গৃহে যাইয়া তাঁহার রুদ্ধপ্রাণের উচ্ছ্বাস একেবারে গুমরিয়া উঠিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। বাস্তবিক রাণী যুগপৎ পুত্র-শোক ও কন্যা-শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অরুণাবতী নানা প্রকার মিষ্টান্ন এবং ফলমূলে স্বর্ণথালা ও রৌপ্যবাটি সাজাইয়া মাহতাব খাঁর সম্মুখে উপস্থিত করিল। মাহতাব খাঁ প্রায় দুই বৎসর পরে অরুণাবতীকে দেখিলেন। দেখিয়া একেবারে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। খাঁ সাহেব যেন সহসা এক স্বপ্নাতীত রাজ্যে উপনীত হইলেন; তিনি দেখিলেন, অরুণাবতীর সর্বাঙ্গ আশাতীতরূপে পরিপুষ্ট। সমস্ত শরীরে যৌবন উথলিয়া পড়িতেছে। কৃতজ্ঞতার ডাগর আঁখিতটে শত শত বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। দেহলতিকা, জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীগন্ধার ন্যায় ফুটিয়া গর্বভরে বৃন্তের উপর ঈষৎ হেলিত অবস্থায় যেন দণ্ডায়মানা। অরুণাবতী যদিও পূর্বে শত শতবার মাহতাব খাঁকে দেখিয়াছে, তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়াছে, তাঁহার সহিত কতদিন নদীতটে ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আজ সে মাহতাব খাঁকে যেমন অপূর্ব সুন্দর সুঠাম রমণীয় কান্তি লোভনীয় পুরুষরূপে দেখিতেছে, পূর্বে সে কখনও তেমনটি দেখে নাই। মাহতাব খাঁই যে তাহার প্রেম-দেবতা হইবেন, তাহার পাণিতেই যে পাণি মিশাইতে হইবে, অরুণাবতী তাহা নানা সূত্রেই বেশ ভাল করিয়া শুনিয়াছিল এবং সেই সূত্রে অরুণাবতীর হৃদয় মাহতাব খাঁর অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অরুণাবতী যখন সেই পরিপূর্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে মাহতাব খাঁকে দেখিতেছিল—তখন খাঁ সাহেব যে তাহার চক্ষে অদ্বিতীয় পুরুষরত্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রেম যখন অসুন্দরকে সুন্দর করে—মরুকে উদ্যানে পরিণত করে—অগ্নিকে তুষার,—নীরসকে সরস এবং অপবিত্রকে পবিত্র করে, তখন স্বাভাবিক সুন্দর খাঁ সাহেব যে অপার্থিব সুন্দর বলিয়া অরুণাবতীর চক্ষে প্রতিভাত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঊষার দৃষ্টি যেমন আকাশকে অরুণিমাজাল বিভূষিত করে—বসন্ত যেমন বিগতশ্রী উদ্যানকে উদ্যানকে স্বর্গীয় শ্রীমণ্ডিত ফুল্লফুলদলে বিশোভিত করে, রজনী যেমন আঁধারে আকাশে তারকামালা ফুটাইয়া অপার্থিব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে—প্রেমও তেমনি প্রেমাস্পদকে অলৌকিক সৌন্দর্য, অসাধারণ গুণ এবং অপার্থিব মহিমায় বিভূষিত, বিমণ্ডিত এবং বিশোভিত করে। মাহতাব খাঁ তাহার ত্রিভুবন-মোহিনী দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইতেছে। লজ্জা-রাগে তাহার বদনমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইতেছে। আবার মাহতাব খাঁ নত আঁখিতে আহারে রত হওয়া মাত্রেই, অরুণাবতীর চঞ্চল ও পিপাসাতুর আঁখি তাহার মুখে দৃষ্টি স্থাপন করিতেছে। আবার আঁখিতে আঁখি পড়া মাত্রই দৃষ্টি অন্য বিষয়ে পতিত হইতেছে এবং হৃদয় দুলিতেছে, শরীর শিহরিত হইতেছে, মন দুলিতেছে। প্রাণের তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ উভয়ের হৃদয়কে এত

জোরে টানিতেছে যে, বোধ হয় উভয়ের হৃদয় দুইটি শরীর ভেদ করিয়া এই মুহূর্তেই বাহির হইয়া আসিবে। সেনাপতি নিজের সঙ্কটজনক অবস্থা ভাবিয়া বীরের মত আত্মসংযম করিবার চেষ্টা করিলেন। অতি সামান্য নাশ্‌তা করিয়াই হাত ধুইতে উদ্যত হইলে, অরুণাবতী লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে কি!" এই বলিয়া মাহতাব খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "সব খেতে হবে।" যুবতীর স্নেহমাখা সুকোমল করস্পর্শে মাহতাব খাঁর সর্বাঙ্গে যেন কি এক অপার্থিব পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়ের প্রত্যেক বিন্দু সুধাধারায় সিক্ত হইল। মাহতাব খাঁ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছলছল নেত্রে তাঁহার বিপদের কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া যুবতীর বুক অতি বিষম বেগে স্পন্দিত হইয়া থামিয়া গেল। যুবতী বাক্‌শূন্য স্পন্দহীন মৃন্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান। অরুণাবতীর দুই চক্ষে অশ্রুর ঝরণা ছুটিল। প্রতাপ-কুমারীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে একবার ছিন্ন লতিকার ন্যায় মাহতাব খাঁর চরণমূলে পতিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহাতে বাধ সাধিল। যুবতী অবশেষে থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাছে বা পড়িয়া যায় এই ভাবিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুত উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন। প্রিয়তমের উভয় বাহুস্পর্শে যুবতীর শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে যে প্রেমের তীব্র উচ্ছ্বাস হইল, তাহাতে যুবতী ক্ষণকালের জন্য আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ তাহাকে মূর্ছিত মনে করিয়া তাহার মস্তক নিজ ক্রোধে স্থাপনপূর্বক পাখা দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব মহাবিপদ গণিয়া দুর্গাবতীকে ব্যস্তকণ্ঠে ৩/৪ বার "রাণী মা! রাণী মা!" বলিয়া আহ্বান করিতেই রাণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। চোখে-মুখে কয়েকবার শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিলে অরুণাবতীর চেতনা হইল। সে আপনাকে তদবস্থায় দেখিয়া লজ্জায় সমস্ত বদনমণ্ডল আরক্ত করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দূরে সরিয়া বসিল। রাণী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ইহা যে মূর্ছা নহে, নিদারুণ সকাম প্রেমাবেশ, তাহা বুঝিয়া কন্যার মানসিক অবস্থার শোচনীয়তা স্মরণে নিতান্তই ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরস্পরের চুম্বনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে।

রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মাহতাব খাঁ দুর্গাবতীর নিকট নিতান্ত বিনীত ও কাতরভাবে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা! আশীর্বাদ করি নিরাপদ দীর্ঘজীবন লাভ কর। এ রাক্ষসের রাজ্য ছেড়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বাবা! আমার অরুণাবতীর কি উপায় হবে?" রাণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। মাহতাব খাঁর প্রাণেও অসীম বেদনা। সে স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহার পা যেন অগ্রসর হইতেছিল না। তাঁহার হৃদয় ও চক্ষু সমস্তই অরুণাবতীতে ডুবিয়া মজিয়া গিয়াছিল। বহু

কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিয়া স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণীর কথায় হৃদয় যেন সেখানেই বসিয়া পড়িল। মনে হইল, অরুণাবতীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইব না, 'যা' হইবার তা' হউক। আবার ভাবিলেন, এখানে থাকিবই বা কোথায়? আমার জন্য অরুণাবতীও শেষে কি প্রতাপের রোষানলে দগ্ধ হইবে! মাহতাব খাঁ বজ্রাহতের ন্যায় বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি এমন দুর্বলতা জীবনে কখনও উপলব্ধি করেন নাই। আজ তিনি দেখিলেন, হৃদয় প্রেম-সুরায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে প্রশান্ত করা ভীষণ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষাও শত কঠিন।

"অরুণাবতীর কি উপায় হবে?" এ-প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন? তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, এমন সময় দূর আকাশের কোণে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকায় মাহতাব খাঁর চট্‌কা ভাঙ্গিল। বহু কষ্ট ও যত্নে হৃদয় বাঁধিয়া তিনি বলিলেন, "মা! আমি জীবনে কখনও অরুণাবতীকে ভুলব না। সুদিন হলে অরুণাকে বিয়ে করব। অরুণা ব্যতীত কাকেও বিয়ে করব না। মা! আমি এখন পথের কাঙ্গাল। সঙ্গে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা আছে। ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে জানি না। মা! আমি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি এখন এলাহাবাদের বাদশাহী দুর্গের অধ্যক্ষ। আমি দশ বৎসর চাকুরি করে যে-অর্থ সঞ্চিত করেছি, তা' সবই মহারাজের নিকট গচ্ছিত। সে বিপুল অর্থ পেলে আমি অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে অতি শীঘ্র রাজ্য ছাড়তে না পারলে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হবে। হয়ত এতক্ষণ আমাকে ধরবার জন্য রণতরী অর্ধপথে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

রাণী মাহতাব খাঁর অর্থাভাবে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাড়াতাড়ি একশত মোহরের একটি মোড়ক এবং নিজের হস্তের একটি হীরকাঙ্গুরী উন্মোচনাপূর্বক মাহতাব খাঁর করে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আর বিলম্ব করো না। সত্বর প্রস্থান কর। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তাঁর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করলাম। বড় বিপদ! সত্বর প্রস্থান কর।" রাণীকে অভিবাদনপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ঘাটে যাইয়া তাড়াতাড়ি নৌকা খুলিয়া দিলে মাল্লারা দ্রুত দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

"বাবা! আমার অরুণাবতীর কি হবে?" রাণী দুর্গাবতীর এ কথায় অরুণাবতীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে নিজের হৃদয়কে বহু প্রবোধিত করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা প্রবোধিত হইল না। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার মন ঘড়ির ন্যায় টক টক করিয়া তাহাকে বলিল, "মাহতাব খাঁ আর এ রাজ্যে ফিরিবে না, ফিরিতে পারে না। তোমার কপাল চিরদিনের জন্য পুড়ে গেল।"

অরুণাবতী গৃহে আসিয়া বাত্যাহত লতিকার ন্যায় উত্তপ্ত সৈকত-নিক্ষিপ্ত

শফরীর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মাহতাব খাঁকে যতই ভুলিতে চেষ্টা করিল, ততই তাহার পক্ষে মাহতাব খাঁর বিরহ অসহ্য হইতে অসহ্যতর, অসহ্যতম হইয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে অরুণাবতী উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার গহনার হস্তিদন্ত নির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকা লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাটীর পশ্চাৎভাগের খিড়কী-দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক প্রেমাস্পদের উদ্দেশে ধাবিত হইল।

নৌকা তখন ঘাট ছাড়িয়া কয়েক রশি দূরে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাতি দেখা যাইতেছে। নদীতীর নির্জন। অরুণাবতী বহুদিন নদীতটে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সে তাহার গন্তব্যপথে রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত ধাবিত হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যে নৌকার নিকটবর্তী হইয়া নৌকা কূলে ভিড়াইতে বলিল। মাহতাব খাঁ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অরুণাবতীকে গৃহে ফিরিবার জন্য পুনঃপুনঃ বিনীত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মাঝিরা নৌকা কূলে ভিড়াইতেছিল, কিন্তু মাহতাব খাঁর নিষেধে পুনরায় ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল। অরুণাবতী তখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া নৌকা ধরিতে অগ্রসর হইল। মাহতাব খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অরুণাবতীকে মুহূর্ত মধ্যে কিস্‌তীতে টানিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, অরুণাবতী জলে পড়ায় কোন কষ্ট পায় নাই। কারণ, প্রত্যেহ সে নদীর জলে স্নান করিত বলিয়া ভাল সাঁতার জানিত। উভয়ের সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তন করা আবশ্যক হইল। অরুণাবতীর বস্ত্র লইয়া মাহতাব খাঁকে বিপদে পড়িতে হইল। অরুণাবতী আসিবার কালে কেবল গহনার বাক্সই আনিয়াছিল। অতিরিক্ত কাপড় আনিবার বিষয় চিন্তাও করে নাই। মাহতাব খাঁও ধুতি পরিতেন না। সুতরাং সিক্ত শাড়ী পরিবর্তন করিয়া অরুণা কি পরিবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। এদিকে অরুণাবতী পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নির্গত হইবা মাত্রই দ্বারের শব্দে রাণী গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি বাহির হইয়াই তরল আঁধারে বেশ দেখিলেন যে, অরুণাবতী গহনার বাক্স হস্তে নৌকার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইযাছে। কিন্তু কন্যাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তিনি কন্যার ভীষণ প্রেমোন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাণী তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া নিজের কিছু গহনা, দুইশত মোহর এবং কয়েকখানি কাপড় লইয়া অরুণাবতীর পশ্চাতে ছুটিলেন। তিনি পৌঁছিতে পৌঁছিতেই মাহতাব খাঁ সুন্দরীকে জল হইতে নৌকায় তুলিলেন এবং অরুণার বস্ত্র পরিবর্তনের মহাসমস্যায় পতিত হইয়া অবশেষে বাক্স হইতে নিজের অপ্রশস্ত রেশমী পাগড়ী বাহির করিয়া তাহাকে পরিধানের জন্য দিতেছিলেন, ঠিক এমন সময়েই রাণী তট হইতে আহ্বান করিলেন। দুর্গাবতীর আহ্বানে অরুণার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মাহতাব খাঁও লজ্জিত হইলেন। রাণী নৌকা লাগাইতে বলায়

অরুণার ভয় হইল, পাছে বা তাহাকে ছিনাইয়া বাটি লইয়া যায়। অরুণা বলিল, "মা' নৌকা আর লাগাব না, আমি যখন ভেসেছি, তখন ভাসতে দাও।" রাণী অরুণার প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া বলিলেন, "মা, তুই কলঙ্কিনী নস্। তুই-ই প্রকৃত সতী। মা। আমি তোর গমনে বাধা দিব না। আমি গমনের সুবিধা করে দিবার জন্যই এসেছি। কাপড় ও টাকা এনেছি, নিয়া যা।"

নৌকা কূলে লাগিল। রাণী মোহর, গহনা ও কাপড় দিয়া আশর্বাদ করিয়া বলিলেন : "আজ আমি তোমাদেরকে অকূলে ভাসালাম, কিন্তু বিধাতা শীঘ্রই তোমাদেরকে কূল দিবেন।" রাণী এই বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রাণী বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে এক একবার সাশ্রুনেত্রে পশ্চাৎ ফিরিয়া নৌকা দেখিতে লাগিলেন। শেষে আর নৌকা দেখা গেল না। কেবল প্রদীপের আলো দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে নৌকা বাঁক ফিরিলে তাহাও অন্তর্হিত হইল। রাণী নিঃশব্দে বাটি ফিরিলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া বুঝিলেন—বাড়ী যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। প্রকৃতি যেন উদাস প্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। রাণী রুদ্ধশ্বাসে গৃহ প্রবেশ করতঃ বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেমদার ষড়যন্ত্র

মহর্‌রম নিকটবর্তী। আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমদাকান্ত কাশী হইতে বাটি ফিরিয়াছে। তাহার এক পিসী বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। পিসী হেমদাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিয়াছিলেন। পিসীর সন্তানাদি কিছুই ছিল না। হেমদাই তাঁহার সর্বস্ব। পিসীর যথেষ্ট টাকা-কড়ি ছিল। সুতরাং হেমদাকান্ত বাল্যকাল হইতেই পিসী ক্ষীরদার আদরে বিলাসে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ছোটবেলা হইতেই তাহার কোনও আব্দার বা আকাঙ্ক্ষা একদিনের জন্যও অপূর্ণ থাকিতো না। হেমদা তাহার পিসী ক্ষীরদার নিকটেই প্রায় থাকিত। কাশীতে গঙ্গাতটে একটি দ্বিতল বাড়িতে হেমদা তাহার পিসী ও স্ত্রীর সহিত বাস করিত। পিসীর নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিল। সে কালের এই পঁচিশ হাজার আজকালকার লাখেরও উপর। পিসী সমস্ত টাকাই লগ্নী কারবারে লাগাইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে আয় হইত তাহাতেই পিসী, হেমদা ও হেমদা-পত্নী কমলার স্বচ্ছন্দে খরচপত্র পোষাইত। টাকা হেমদার হস্তেই খাটিত। পিসী দিবারাত্রি তপ জপ আহ্নিক উপবাস করিয়া এবং নানা প্রকার দেবলীলা ও উৎসব দেখিয়া সময় কাটাইতেন। ক্ষীরদা-সুন্দরী সম্ভ্রান্ত

হিন্দু-ঘরের আদর্শ নিষ্ঠাবতী প্রবীণা মহিলার ন্যায় ছিলেন। জীবন-সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীরদাও ততই অন্তিমের সম্বলের জন্য অধীর ও আকুল প্রাণে ধর্মকর্মেই অধিকতর লিপ্ত হইতে লাগিলেন। সংসারের সর্বস্বই হেমদা ও তাহার স্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। হেমদা কয়েক বৎসরের মধ্যেই টাকা খাটাইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোক হইতে দাঁড়াইল। সে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে কাশীর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠী বা ধনীতে গণ্য হইবে, ইহা সকলেই আলোচনা করিত। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার চরিত্র ভীষণরূপে কলুষিত হইয়া উঠিল। পূর্ব হইতেই তাহার লাম্পট্য দোষ ছিল। এক্ষণে এই লাম্পট্যের সঙ্গে মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া এবং পরদারগমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিশিখা বায়ু সংযোগে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাশী ভারতে সত্য সত্যই এক অদ্ভুত স্থান। উহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির, অসংখ্য সুন্দর ও কুৎসিত দেবীর প্রাতঃসন্ধ্যা আরতি-অর্চনায় ধর্মপিপাসু হিন্দু নরনারীর প্রাণে যেমন ভক্তি ও নিষ্ঠার ভাব উদ্রেক করে, অন্যদিকে নানা দিগ্দেশাগত অসংখ্য প্রকারের চোর, জালিয়াত, বিশেষতঃ লম্পট নরনারীর অবিরাম বীভৎস লীলায় পবিত্রাত্মা মানবমাত্রকেই ব্যথিত করে। জগতে যে সমস্ত জঘন্য লোকের অন্যত্র মাথা লুকাইবার স্থান নাই, কাশীতে তাহারা পরমানন্দে বাস করে। বহুসংখ্যক রাজ-রাজড়ার অন্নসত্র উন্মুক্ত থাকায় এই সমস্ত পাপাত্মাদিগের উদরান্নের জন্যও বড় ভাবিতে হয় না। কাশীতে প্রকৃত চরিত্রবান্ ভালো লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। চরিত্রহীন লম্পট ও জুয়াচোরদের সংখ্যাধিক্যে এই অল্প সংখ্যক প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ চরিত্রশালী লোকের অস্তিত্বে অনেক সময়েই সন্দেহের সঞ্চার করে।

যে যাহা হউক, হেমদা কাশীর ব্যভিচার-দুষ্ট বায়ুতে এবং কুসংসর্গ প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রথম শ্রেণীর গুণ্ডার মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার শরীরে বেশ শক্তি ছিল, সে শক্তি এক্ষণে নানা প্রকার পাশবিক এবং পৈশাচিক কার্য সাধনে দিন দিন দুর্দম ও অসংযত হইয়া উঠিল। গায়ের শক্তি, হৃদয়ের সাহস, টাকার বল, সহচরদিগের নিত্য উৎসাহ এবং পাপ-বিলাসের উদ্ভট-চিন্তা তাহাকে একটা সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত করিল। অনবরত কাম-পূজায় তাহার ধর্মকর্ম-জ্ঞান লোপ পাইল। মদের নেশা তাহাকে আরও গভীর পঙ্কে নিক্ষেপ করিল। শেষে মদ্য-সেবা এবং কাম-পূজাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হইয়া উঠিল। অবশেষে বামাচারী তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের এক কাপালিক সন্ন্যাসীর হস্তে সে তন্ত্রে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পাপে দ্বিধাশূন্য ও নির্ভীক হইয়া পড়িল।

হেমদা বামাচারী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার কিছু পরেই সাদুল্লাপুরে প্রায় দুই বৎসর পরে বাড়ী ফিরিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার আগমনে পরমানন্দিত হইল। সে কাশী হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, ছেলেদের খেলনা, বানারসী শাড়ী, চাদর, পাথরের নানাপ্রকার দ্রব্য ও মূর্তি,

জরীর কাচুলী সকলকে উপহার দিবার জন্য আনিয়াছিল। হেমদা বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল যে, উদ্ভিন্ন-যৌবনা প্রদীপ্তকান্তি স্বর্ণময়ী তাহাদের বাড়ী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া সে চমৎকৃত, মুগ্ধ এবং স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কাশীতে নানাদেশীয় অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে এবং নিজে অনেক সুন্দরীর সর্বনাশও করিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হইল স্বর্ণময়ীর ন্যায় কোন সুন্দরী কদাপি নেত্রপথবর্তী হয় নাই। স্বর্ণময়ী যে এরূপ রসবতী, লীলাবতী, লাবণ্যবতী এবং লোভনীয় মোহনীয় সুন্দরীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণ যেন অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ এবং মগ্ন হইয়া গেল। কাশী ত্যাগ করিতে তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ তাহার প্রাণে সমুদিত হইল। সে নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিল। পিশাচের হৃদয় পৈশাচিক ঘৃণিত বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে সর্বোৎকৃষ্ট শাড়ী, চাদর, চুড়ি, পুতুল ও পাথরের একপ্রস্থ বাসন স্বর্ণময়ীকে উপহার দিল। সরল-প্রাণা বিমল-চিত্ত স্বর্ণ ভ্রাতার উপহার বলিয়া প্রাণের সহিত গ্রহণ করিল। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই হেমদার কুৎসিত হাবভাবে, সকাম-পিপাসু দৃষ্টিতে স্বর্ণ একটু সঙ্কুচিতা এবং লজ্জিতা হইল। হেমদার প্রতি তাহার একটু ঘৃণারও উদ্রেক হইল। পাপিষ্ঠ হেমদা নানা ছলে স্বর্ণময়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া নানারূপে তাহার মনোহরণের চেষ্টা করিলেও স্বর্ণময়ী অচল অটল রহিল।

হেমদা যতই তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্বর্ণময়ী ততই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। হেমদার চেষ্টা যতই বিফল হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের পাপ-লিপ্সা বলবতী হইতে লাগিল। তাহার আগ্রহ ও যত্ন বাড়িয়াই চলিল। মেঘ-বিহারিণী চঞ্চলা সৌদামিনী যেমন ময়ূরকে বিমুগ্ধ এবং উন্মত্ত করে, বৈদ্যুতিক শুভ্র আলোক যেমন পতঙ্গকে আত্মহারা ও আকৃষ্ট করে, বংশীধ্বনির মধুরতা যেমন মৃগকে জ্ঞানশূন্য করে, রায়-নন্দিনীর ভরা যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গও তেমনি পাপাত্মা হেমদাকান্তকে উন্মত্ত ও শান্ত করিয়া তুলিল।

হেমদা কাশী হইতে আসিবার সময় তাহার দীক্ষাগুরু অভিরাম স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছিল। অভিরাম স্বামী সন্ন্যাসীর মত গৈরিকবাস পরিধান এবং সর্বদা কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা ধারণ করিত। বাহুতে ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা, শিরে দীর্ঘকেশ, কিন্তু জটাবদ্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত তাহার সন্ন্যাসের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোনও লক্ষণ ছিল না। সে সর্বদাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মস্তকে প্রচুর তৈল মর্দন করিত। তাহার শরীর মাংসল, মসৃণ, স্থূল এবং পেশীবহুল। সে অসুরের মত ভোজন করিত। সকালে তাহার জন্য দুই সের লুচি, এক সের মোহনভোগ ও অন্যান্য ফলমূল বরাদ্দ ছিল। দ্বিপ্রহরে অর্ধ সের চাউলের ভাত, এক পোয়া ঘৃত, এক সের পরিমিত মাছ এবং দুই সের মাংস এবং অন্যান্য

মিষ্টান্ন প্রায় দুই সের, সর্বশুদ্ধ ছয় সের ভোজ্যজাত তাহার উদর-গহ্বরে স্থান পাইত। অপরাহ্নে দেড় সের ঘন ক্ষীর তাহার জলখাবার সেবায় লাগিত। রাত্রে রুটি ও মাংসে প্রায় পাঁচ সেরে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। তাহার ভোজন, আচরণ ও ব্যবহারে সন্ন্যাসের নামগন্ধও ছিল না। মদ্য সর্বদাই চলিত। তাহার চেহারা ও নয়নের কুটিলতা তীব্রভাবে লক্ষ্য করিলে সে যে একটি প্রচ্ছন্ন শয়তান তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহার গৈরিক বাস, দীর্ঘকেশভার এবং রক্ত-চন্দনের ফোঁটা হিন্দু-সমাজে তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত সন্ন্যাসীর আসন প্রদান করিয়া ছিল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর নামে অনেকে 'ইতঃ নষ্ট ততঃ ভ্রষ্টের' দল, শিষ্য ও চেলারূপে স্বামীজীর পাদ-সেবায় লাগিয়া গেল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কবচ লইবারও ধুম পড়িয়া গেল। বশীকরণ, উচাটন, মারণ প্রভৃতির মন্ত্র-প্রণালী ও ছিটেফোঁটা কত লোকে শিখিতে লাগিল। শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে ধান্যেশ্বরীর সেবা খুব চলিল। সেকালের ইসলামীয় শাসনে মদ্য কোথায়ও ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না। এখনকার মত ব্রান্ডি, শ্যাম্পেন, শেরী, ক্লোরেট প্রভৃতি বোতলবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। কোনও মুসলমান মদ্যপান করিলে কাজী সাহেব তাহাকে কষাঘাতে পিঠ ফাটাইয়া দিতেন। হিন্দুর মধ্যে কেহ মদ খাইয়া মাতলামী করিলেও কষাঘাতে পিঠ ফাটিয়া যাইত। কাজেই বড় শহরেও মদের দুর্গন্ধ, মাতালের পৈশাচিক লীলা কদাপি অনুভূত ও দৃষ্ট হইত না। হিন্দুদের মধ্যে বাড়িতে অতি নিভৃতে ধানেশ্বরী নামক দেশী মদ প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ সেবন করিত। ইসলামীয় সভ্যতার অনুকরণে হিন্দু সমাজেও মদ্যপান ও শূকর-মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত গর্হিত এবং ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত।*

স্বামীজির আগমনে আর কিছু উপকার হউক আর না হউক, অনেক হিন্দু যুবকই বাড়িতেই বকযন্ত্রে মদ চোঁয়াইতে লাগিল। স্বামীজি হেমদাকান্তের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই সাদুল্লাপুরে আসিয়াছিল। দুইদিন থাকিবার কথা, কিন্তু আজ পাঁচদিন অতীত হইতে চলিল, তথাপি স্বামীজির মুখে যাইবার কথাটি নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রায়-নন্দিনী। হায় যুবতীর সৌন্দর্য! তুমি এ জগতে কতই না অনর্থ ঘটাইয়াছ! তুমি স্বর্গের অমূল্য সম্পদ্ হইলেও কামুক ও পিশাচের দল তোমাকে কামোন্মত্ততার তীব্র সুরা মধ্যেই গণ্য করিয়াছে। তুমি একদিকে যেমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত রমণীয় কুসুমোদ্যান সৃষ্টি করিতেছ, অন্যদিকে তেমনি পূতিগন্ধপূরিত অতি বীভৎস শ্মশানেরও সৃষ্টি করিতেছ। কেহ কেহ তোমার ধ্যান করিয়া ফেরেশ্তা প্রকৃতি লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু অনেকেই নরকের কামকীটে পরিণত হইতেছে।

** হিন্দুশাস্ত্রে শূকর মাংস ও মদ্য পবিত্র ও ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট। কিন্তু মুসলমানেরা শূকর মাংসভোজী ও মদ্যপায়ীকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন বলিয়া মুসলমান রাজত্বে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা উহা পরিত্যাগ করেন।*

পেটুক বালক রসগোল্লা দেখিলে তাহার মুখে যেমন লালা ঝরে, গর্ভিণী তেঁতুল দেখিলে তাহার জিহ্বায় যেমন জল আইসে, তীব্র তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি বরফ দেখিলে যেমন তজ্জাতে অধীর হইয়া উঠে, বহুমূল্য মণি দেখিলে তস্কর যেমন আকুল হইয়া পড়ে, আমাদের অভিরাম স্বামী মহাশয়ও তেমনি নবযুবতী অতুল রূপবতী নির্মল রসবতী শ্রীমতি রায়-নন্দিনীকে দেখিয়া একেবারে ভিজিয়া গলিয়া গেলেন। পাষণ্ডের পাপলিপ্সা যেন ফেনাইয়া ফুলিয়া উঠিল। শিষ্য এবং গুরু উভয়ে যুগপৎ রায়-নন্দিনীর জন্য দিবস-যামিনী চিন্তা করিতে লাগিল। হেমদার কু-মতলব স্বর্ণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অভিরাম স্বামীর "মনের বাসনা" স্বর্ণ দূরে থাকুক, হেমদাও বুঝিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, শিষ্য অপেক্ষা গুরু চিরদিনই পাকা থাকে। সুতরাং এখানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

হেমদা কয়েক দিনেই বুঝিতে পারিল যে, স্বর্ণকে দূষিত করা সহজ নহে। স্বর্ণ প্রথম প্রথম পূর্বের ন্যায় ভাই-বোন ভাবে তাহার পাশে বসিত, কিন্তু পরে আর তাহার পাশে বসা দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখেও বাহির হইত না। এমন কি, তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করাও পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণ এক্ষণে মহররমের দিন গণিতে লাগিল। কারণ মহররমের পরের দিবসই তাহাকে পিত্রালয়ে লইবার জন্য লোক আসিবে।

যত শীঘ্র হেমদার কলুষদৃষ্টি ও ঘৃণিত সঙ্কল্প-দুষ্ট বাটি হইতে নির্গত হইতে পারে ততই মঙ্গল! কয়েক দিবসের মধ্যেই স্বর্ণ যেন বড়ই স্ফূর্তিহীনতা বোধ করিতে লাগিল। ঈসা খাঁর পত্র পাইয়া স্বর্ণ অনেকটা প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু পাপাত্মা হেমদাকান্তের ঘৃণিত ব্যবহারে বড়ই অসুখ বোধ করিতে লাগিল। একবার তাহার মামীর কাছে হেমদার ঘৃণিত সংকল্প ও পাপ-প্রস্তাবের কথা বলিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিত; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে এবং তাহার নামেও হেমদা মিথ্যা কুৎসা আরোপ করিয়া বিষম কলঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। ভাবিল, আর তিনটা দিন কাটিয়া গেলেই রক্ষা পাই। হেমদাও স্বর্ণময়ীর পিত্রালয়ে যাইবার দিন আসন্ন দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সে এবং তাহার গুরুদেব যত প্রকার তন্ত্রমন্ত্র এবং ছিটেফোঁটা জানিত, তাহার কোনটিই বাকি রাখিল না। গুরুদেব অভিরাম স্বামী হেমদার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। অভিরাম স্বামী নিজে স্বর্ণময়ীর যৌবনে মুগ্ধচিত্ত না হইলে এরূপ ভয়ানক এবং নিতান্ত জঘন্য কার্যের সংকল্প হয়ত লোক-লজ্জার জন্যও অনুমোদন করিত না। কিন্তু সে জানিত যে, হেমদার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িলে সে নিজেও দুগ্ধভাণ্ডে জিহ্বা লেহন করিবার সুবিধা পাইবে।

দিন চলিয়া যাইতেছে—স্বর্ণময়ী হস্তচ্যুত হইতে চলিল দেখিয়া গুরুদেবও

বিশেষ চিন্তিত হইল। অবশেষে তন্ত্রের বিশেষ একটি বশীকরণ মন্ত্র সারা দিবারাত্রি জাগিয়া লক্ষবার জপ করতঃ একটি পান শক্তিপূত করিল। এই পান স্বর্ণকে স্বহস্তে সেবন করাইতে পারিলেই হেমদাকান্তের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া স্বামীজি দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিলেন, পানের রস গলাধঃকরণ মাত্রই স্বর্ণময়ী হেমদার বশীভূতা হইবে।

পাপাত্মা হেমদাকান্ত এই পান পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইল। এক্ষণে এই পান স্বর্ণকে কিরূপে খাওয়াইবে তাহাই হেমদার চিন্তার বিষয়ীভূত হইল। সন্ন্যাসী যখন পান দিল, তখন সন্ধ্যা। স্বর্ণ তখন অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সুতরাং তাহাকে পান দিবার জন্য দুর্বৃত্তের মনে সাহস হইল না।

অতঃপর কিছু রাত্রি হইলে হেমদা সকলের অসাক্ষাতে স্বর্ণময়ীর গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের আড়ালে বসিয়া রহিল। স্বর্ণময়ী আহারান্তে গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ করতঃ শয়ন করিবার পরে পাপাত্মা মৃদুমন্দ হাস্যে স্বর্ণের নিকটে উপস্থিত হইল। স্বর্ণ সহসা তাহাকে গৃহ মধ্যে দর্শন করিয়া—পথিমধ্যে দংশনোদ্যত ফণী দর্শনে পথিকের ন্যায় বিচলিতা হইয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিল। পাপাত্মা তদ্দর্শনে অতীব বিনীতভাবে দুই হস্ত জোড় করিয়া বলিল, "স্বর্ণ! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। তুমি যাতে চিরকাল সুস্থ থাক, সেই জন্য সন্ন্যাসী-ঠাকুর এই মন্ত্রপূত-পান দিয়েছেন; এটা তোমাকে খেতে হবে।"

স্বর্ণ ঃ তুমি এখনই গৃহ থেকে নির্গত হও, নতুবা বিপদ ঘটবে, ও পান সন্ন্যাসীকে খেতে বল। আমি ও পান কিছুতেই খাব না!

স্বর্ণের দৃঢ়তা দেখিয়া হেমদা দুই হস্তে স্বর্ণের পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে পান খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। স্বর্ণ তাহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইয়া সজোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত পূর্বক দ্বার খুলিয়া তাহার ছোট মামীর গৃহের দিকে চলিয়া গেল। সহসা স্বর্ণের সবল পদাঘাতে পাপিষ্ঠ কামান্ধ হেমদাকান্ত একেবারে ঘরের মেঝেতে চিৎ হইয়া পড়িল। বুকে পদাঘাত এবং মস্তকে পাকা মেঝের শক্ত আঘাত পাইল। কিন্তু এ আঘাত অপেক্ষা তাহার মানসিক আঘাত সর্বাপেক্ষা অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপেই হউক স্বর্ণের সর্বনাশ সাধন করিবেই।

হেমদা নিতান্ত দুঃখিত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিতভাবে সমস্তই গুরুদেবের নিকট নিবেদন করিল। অতঃপর পরামর্শ হইল যে, মহররমের দিবস স্বর্ণকে নৌকাপথে হরণ করিয়া একেবারে কাশী লইয়া যাইতে হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

কাননাবাসে

প্রধান সেনাপতি মাহতাব খাঁ যশোর হইতে প্রস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য কালিদাস ঢালীকে আদেশ করিলেন। ঢালী মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া কোথাও খাঁ সাহেবকে পাইলেন না। পরে নদীতটে যাইয়া শুনিলেন যে, খাঁ সাহেব নৌকা করিয়া যামনী নদী উজাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাইয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ঘটনা শুনিয়া প্রতাপাদিত্যের রোষানল শীতল হইয়া গেল। মনে একটু অনুশোচনার উদ্রেক হইল। মাহতাব খাঁই প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত। মাহতাবের বাহুবল এবং রণ-কৌশলেই প্রতাপের যা কিছু প্রভাব ও দম্ভ। মগ ও পর্তুগীজেরা কতবার মাহতাব খাঁর দুর্দম বিক্রমে রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রতাপ ভাবিলেন, মাহতাব খাঁ শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া তাঁহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। তিনি যদি কেদার রায় বা রামচন্দ্র রায়ের অথবা ভুলুয়ার ফজল গাজীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রতাপের পক্ষে বিষম সঙ্কট। এক্ষণে হয় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা, না হয় নিহত করাই মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল। প্রতাপ তখনি কালিদাসকে এক শত বন্দুকধারী সৈন্যসহ একখানি দ্রুতগামী তরী লইয়া মাহতাব খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। কালিদাস কালবিলম্ব না করিয়া শত সৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন। পঞ্চাশ দাঁড়ে প্রকাণ্ড ছিপের আকৃতি নৌকা কল্ কল্ করিয়া যামনীর ঊর্মিল-স্রোত বিদারণ করতঃ মাহতাব খাঁর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল।

মাহতাব খাঁর নৌকা ছয় দাঁড়ের হইলেও ক্ষুদ্র বলিয়া বেশ ছুটিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সারারাত্রি নৌকা বাহিতে পারিলে, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বেলা উদয়েই প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিবেন। প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিলেই তিনি নিরাপদ। মাল্লারা দাঁড় ফেলিতে যাহাতে কিছুমাত্র শৈথিল্য না করে, সে জন্য তিনি অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। মাল্লারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে লাগিল। মাঝি খাঁ সাহেবকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে শয়ন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং নৌকা যে প্রভাতেই সলিমাবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ঈসা খাঁর এলাকায় পৌঁছাইতে পারিবে, এ বিষয়ে খুব বড়মুখে বড়াই করিতে লাগিল।

মাহতাব খাঁ মাঝির ব্যগ্রতা এবং মাল্লাদিগের প্রতি দ্রুত দাঁড় নিক্ষেপে পুনঃ পুনঃ সাবধানতা দর্শনে নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় দেহ পাতিলেন এবং অল্পক্ষণেই

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। মাহতাব খাঁ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে মাঝি ও মাল্লারা একস্থানে নৌকা লাগাইয়া সকলেই পলায়ন করিল। তাহাদের পলায়ন করিবার কারণ যে প্রতাপাদিত্যের কঠোর দণ্ডভীতি, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। খাঁ সাহেব যখন যশোরে নৌকায় আরোহণ করেন, তিনি যে যশোর হইতে পলায়ন করিতেছেন তখন মাঝিরা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তিনি সলিমাবাদে বিশেষ কোন গোপনয় রাজকার্যে যাইতেছেন বলিয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল; কিন্তু মনোহরপুর হইতে নৌকা ছাড়িলে অরুণাবতী যখন পলায়মান-বেশে নৌকায় উঠিল তখন তাহারা বুঝিল যে, সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছেন। তাহারা নিজেদের পরিণাম ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইল; তাহারাই মাহতাব খাঁর পলায়নে সাহায্য করিয়াছে, প্রতাপ ইহা সহজেই জানিতে পারিবেন। জানিতে পারিলে তাহাদিগকে যে জান্, বাচ্চা বুনিয়াদসহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়াইয়া মারিবেন, ইহা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের গায়ে ঘর্ম ছুটিল। অন্যদিকে সেনাপতির ভয়ে নৌকা বাহনেও অস্বীকৃতি হইবার সাহস ছিল না। ঘটনা যতদূর গড়াইয়াছে তাহাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। তবে নিজেদের অজ্ঞতা জানাইয়া সেনাপতির রাজকন্যা হরণের সংবাদ রাজাকে অর্পণ পূর্বক আপনাদের নির্দোষত্ব জ্ঞাপন করিতে পারিলে হয়ত প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে তাহারা পলায়ন করিল। সেনাপতি সাহেব নিজের ব্যস্ততা এবং নিজের বিপচ্চিন্তার মধ্যে মাঝিদের বিপদের কথা একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই। তিনি যেরূপ উদার ও মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন, তাহাতে মাঝিরা নিজেদের বিপদের কথা খুলিয়া বলিলে, তাহাদিগকে নিজের সহস্র বিপদের মধ্যেও বিদায় করিয়া দিতেন।

যাহা হউক, মাঝিরা পলায়ন করিবার প্রায় একপ্রহর পরে মাহতাব খাঁর নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি দাঁড়ের শব্দ না শুনিয়া নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন, মাঝি-মাল্লার কোন নিদর্শন নাই। নৌকা একগাছি রজ্জু দ্বারা একটি গাছের মূলে বাঁধা রহিয়াছে। প্রকৃত রহস্য বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ তিনি অরুণাবতীকে জাগাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। মাঝিদের পলায়নে প্রতাপ-দুহিতা নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও অধীর হইয়া পড়িল। পাছে বা পশ্চাদ্ধাবিত রাজ-অনুচরদের হস্তে ধৃত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত জীবনের উদ্দাম সুখ ও প্রেমের কল্পনা মরীচিকার পরিণত হয়। তাহার হৃদয়-তরণীর ধ্রুবনক্ষত্র, তাহার তৃষ্ণার্ত জীবনের সুশীতল অমৃত-প্রস্রবণ, তাহার জীবনাকাশের চিত্তবিনোদন লোচনরঞ্জন অপূর্ব জলধনু পরে বা বিপদগ্রস্ত হয়, এবম্বিধ চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ মুহূর্তে চিত্ত স্থির করিয়া অরুণাবতীকে করুণাময় আল্লাহতালার উপর নির্ভর করিতে বলিয়া শেষে বলিলেন, "প্রিয়তমে! এ বিপদে

তুমি যদি কোনরূপে নৌকার হালটি ধরে রাখতে পার, তা হলে আমি একাই দাঁড় ফেলে নিয়ে যেতে পারি। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তুমি যখন হতভাগ্যের জীবন-সঙ্গিনী হয়েছ, তখন দুঃখ ভোগ করা ছাড়া উপায় কি?"

মাহতাব খাঁ এমন গভীর অনুরাগ এবং শুভ্র সহানুভূতির সহিত কথাটি বলিলেন যে, প্রতাপ-বালার কর্ণে তাহা অমৃতবর্ষণ করিল। নৌকায় আরোহণ করা পর্যন্ত মাঝিদের জন্য লজ্জায় পরস্পর কোন কথাবার্তা বলিতে পারে নাই। এক্ষণে লোক-সঙ্কোচ দূর হওয়ায় এবং বিপদ সমাগমে উভয়ের হৃদয়, চক্ষু ও জিহ্বা মুক্তাবস্থায় সুরভিত প্রেমের অমিয় দৃষ্টি ও মধুর ভাষা উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। হাতুড়ির আঘাত যেমন দুইখণ্ড উত্তপ্ত ধাতুকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত করিয়া দেয়, বিপদও তেমনি দুইটি অনুরাগোচ্ছ্ব হৃদয়কে একেবারে মিলাইয়া দেয়। অগ্ন্যুত্তাপে অল্পপরিমিত দুগ্ধ যেমন বৃহৎ পাত্রকে পূর্ণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, বিপদের আঁচেও তেমনি হৃদয়ের কোণে যে প্রেম, যে সহানুভূতি নীরবে আলস্যশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে তাহাও জোরেশোরে দশগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের কূল ভাসাইয়া অপর হৃদয়কে ভাসাইয়া ফেলে। তখন দুই মিশিয়া এক হয়।

অরুণাবতী বাল্যকাল হইতেই নৌ-ক্রীড়ারত ছিল বলিয়া হাল ধরিতে অভ্যস্তা ছিল। এক্ষণে বিপদকালে প্রতাপ-কুমারী হাল ধরিয়া বসিল, আর খাঁ সাহেব বীর-বাহুর বিপুল বলে দুই হস্তে দাঁড় ফেলিতে লাগিলেন। নৌকা নদীর খর-প্রবাহ কাটিয়া কল্ কল্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। ছয় দাঁড়ে নৌকা যেরূপ দ্রুত চলিয়াছিল, মাহতাব খাঁর দুই দাঁড়েও নৌকা প্রায় সেইরূপ ছুটিল। মাহতাব খাঁ তালে তালে দাঁড় ফেলিতেছেন, আর সুন্দরী অরুণাবতী সাবধান-হস্তে হাল ধরিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে। সে হাসিতে মাহতাব খাঁও হাসিতেছেন। পরস্পরের হাসিতে উভয়ের হৃদয়ে যে কোটি নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোক মরকত-দ্যুতির ন্যায় জ্বলিতেছে—ঐ নীলাকাশের তারাগুলি যদি সে প্রেমামৃতমাখা দিব্য দীপ্তি দর্শন করিত, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সমস্তগুলি আকাশচ্যুত হইয়া চিরদিনের জন্য ডুবিয়া রহিত। ঊর্ধ্বে অনন্ত নক্ষত্রখচিত জলদ-বিমুক্ত অনন্ত নভোমণ্ডল, নিম্নে শ্যামলা ধরণী বক্ষে রজত-প্রবাহ বামনী নদী কোটি তারকার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করতঃ উদ্দাম গতিতে কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া ফুটন্ত যৌবনা প্রেমোন্মাদিনী রসবতী যুবতীর ন্যায় সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে; আর তাহার বক্ষে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড় ফেলিয়া হাল ধরিয়া অনন্ত আনন্দ ও অপার আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। মরি! মরি!! কি ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন লোচনরঞ্জন দৃশ্য! যে বিপদ্ এমন অবস্থার সংঘটন করে, তাহা সম্পদ অপেক্ষাও প্রার্থনীয় নহে কি?

নৌকা ছুটিয়াছে। আকাশে তারকা দলও ছুটিয়া চলিয়াছে। বামনী ছুটিতেছে,

বাতাস ছুটিতেছে। এ জগতে ছুটিতেছে না কে? জগৎ পর্যন্ত, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। অনন্তকাল হইতে ছুটিতেছে, অনন্তকাল ছুটিবে। এ ছোটার কিছু শেষ নাই, সীমা নাই। রজনী পূর্ব গোলার্ধ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম গোলার্ধে ছুটিল—উষার শুভ্র আলোক-রেখা ছুটিয়া আসিয়া অম্বর-অঙ্গ-বিলম্বিত শ্বেত পতাকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। নদীবক্ষ ঈষৎ আলোকিত হইল। শীতল-সলিল-শীকর-সিক্ত-মৃদু-সমীরণ নায়ক-নায়িকার বাবরী দোলাইয়া কুন্তল উড়াইয়া প্রতি মুহূর্তে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁর ঈষৎ স্বর্ণাভা-মণ্ডিত শুভ্র-রজত-ফলকবৎ ললাটদেশে গুরুশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ফুটিয়াছে। মাহতাব খাঁ দাঁড় তুলিয়া সম্মুখের দিকে স্থির ও দূরগামিনী দৃষ্টিতে চাহিলেন—দেখিলেন, দূর—অতিদূরে একখানি প্রকাণ্ড নৌকায় কয়েকটি বাতি জ্বলিতেছে! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—আবার দেখিলেন,—পকেট হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন বিপদ আসন্ন। অরুণাবতীও দেখিল, একখানি নৌকা তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। খালি চোখে নৌকা দেখা যাইতেছে না, কেবল আলো ছুটিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে। অরুণাবতী ব্যাঘ্রসন্দর্শনভীতা মৃগীর ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল।

মাহতাব খাঁ প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষের মত মুহূর্ত মধ্যে চিত্ত ও কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। অরুণাকে বলিলেন, "অরুণে! ব্যাকুল হইও না, আল্লাহ্ আছেন। আমাদের নৌকায় বাতি নাই, সুতরাং ওরা আমাদিগকে দেখতে পায় নাই। চল, নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় লওয়া যাক। নৌকা বেয়ে ওদের হস্ত অতিক্রম করা অসম্ভব। মুসলমান কখনও শত্রু দেখে আত্মগোপন করে না, কিন্তু আজ আত্মগোপন না করলে অমূল্য কোহিনূর তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। নৃপকিরীট-শীর্ষ-শোভী কোহিনূর কখনও কুক্কুরের গলায় অর্পণ করব না। অরুণা! তুমি আর বিলম্ব করো না, সমস্ত দ্রব্য গুছিয়ে পেটিকা-বদ্ধ কর। আমি এখন নৌকা তীরে লাগাচ্ছি।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগিল। মাহবতাব খাঁ দ্রুত নামিয়া রজ্জু দ্বারা একটি বৃক্ষমূলে নৌকা বাঁধিলেন। তৎপর দুইজনে সমস্ত জিনিষপত্র নামাইয়া জঙ্গলের মধ্যে জমা করিলেন। সমস্ত দ্রব্য তথায় পুঞ্জীকৃত করিয়া নৌকার ছই ও পাটাতনের তক্তা-সকল গভীর জঙ্গলে রাখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিলেন।

বামনীর উভয় পার্শ্বে সেই স্থলে বহুদূরব্যাপী অরণ্য। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। জঙ্গলে নানা জাতীয় বৃক্ষ। জঙ্গল এমন নিবিড় এবং বিশাল ছিল যে, তখন এখানে দলে দলে মৃগ বিচরণ এবং ব্যাঘ্র গর্জন করিত। পূর্বে শিকার উপলক্ষে দুই তিনবার মাহতাব খাঁ এ-জঙ্গলে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি এ-কাননের বিষয় অবগত ছিলেন। খাঁ সাহেব জিনিসপত্র একস্থানে রাখিয়া

একস্থানে একটু দূরে বৃক্ষের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অরুণাকে লইয়া বসিলেন। হিংস্র শ্বাপদভীতির জন্য তিনি তাহার 'খুনরেজ' (রক্তপিপাসু) নামক তরবারি কোমর হইতে মুক্ত করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। জঙ্গলের ফাঁকের ভিতর দিয়া দূরবীণ ধরিয়া মাহতাব খাঁ শত্রুতরী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উষার আলোক আরও স্ফুটতর হইয়া উঠিল। অর্ধ ঘন্টার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড নৌকা দাঁড়ের আঘাতে নদী-বক্ষে ঊর্মি তুলিয়া এবং শব্দে উভয় তটের কানন-হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া মাহতাব খাঁ ও অরুণাবতীর আশ্রয়দাত্রী বনভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া সলিমাবাদের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁ অজু করিয়া ভক্তিপ্লুতচিত্তে বামনীর তটস্থ শ্যাম দুর্বাদলের মখমল আস্তরণে ফজরের নামাজ পড়িয়া বিশ্বশরণ মঙ্গলময় আল্লাহ্‌তালার পদারবিন্দে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি বর্ষণ করিলেন। অনন্তর বিশ্বলোচন অরুণদেব ভুবন-বিমোহন তরুণ অরুণিমা-জালে আকাশ-মেদিনী বামনীর চঞ্চল হৃদয় এবং কাননের বর্ষাবারি-বিধৌত সরস-শ্যামল-মসৃণ তরুবল্লীর পত্রে স্বর্ণ-চূর্ণজাল ছড়াইয়া অপূর্ব শোভা ফুটাইলে মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর কর ধারণ করতঃ আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অরণ্য— শাল, তাল, তমাল, সুন্দরী, ঝাউ, অশ্বত্থ, কদম্ব, বেত, কেতকী, হরীতকী, আমলকী, আম্র, খর্জুর, পনস প্রভৃতি জাতীয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোথাও নানাজাতীয় গুল্ম ও তৃণ বাড়িয়া ভূমি আচ্ছন্ন এবং অগম্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা মনুষ্য-হস্তকৃত সযত্ন-রচিত উদ্যান অপেক্ষাও বনভূমি মনোহর। রাশি রাশি কেতকী ও কদম্ব ফুল ফুটিয়া প্রভাত সমীরে গন্ধ ঢালিয়া সমস্ত বনভূমি আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘুঘু, ফিঙ্গা, দোয়েল, শ্যামা, বন্য কুক্কুট, বুলবুল, টিয়া প্রভৃতি অসংখ্য বিহঙ্গ বিবিধ স্বরে মধুর কূজনে প্রভাত-কানন চঞ্চল ও মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বন-প্রকৃতির সরস শ্যামল নির্মল নগ্ন শোভা দেখিয়া অরুণার নব প্রেমাকুল চিত্ত যেন প্রেমের আভায় আনন্দে ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক নির্মল-সলিলা সরসী দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র সরসীর চারিপার্শ্বে মখমল-বিনিন্দিত কোমল ও শ্যামল শষ্পরাজি। তাহার মধ্যে বর্ষাঋতুজ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের তৃণজাতীয় পুষ্প ফুটিয়া শ্যামল ভূমি অপূর্ব সুষমায় সাজাইয়াছে। সরোবরের জলে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া কূর্দন করিতেছে। মাঝে মাঝে শাপলা ও কুমুদ ফুটিয়া মৃদু হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। জল এত পরিষ্কার যে, নীচের প্রত্যেকটি বালুকা কণা দেখা যাইতেছে। রক্ত-রেখা-অঙ্কিত সমুজ্জ্বল শফরীর ঝাঁক রূপের ছটায় সরসীগর্ভ আলোকিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আকাশের নানাবর্ণ রঞ্জিত অম্বুদমালা আকাশসহ সরসীর তলে শোভা পাইতেছে। কি বিচিত্র দৃশ্য। কি মনোমোহিনী

শোভা। দেখিয়া দেখিয়া প্রতাপ-তনয়া একেবারে মুগ্ধ-লুব্ধ এবং বিস্মিত হইয়া পড়িল। অরুণা অরণ্যভূমির উজ্জ্বল শ্যামল-বিনোদ কোমল শোভা আর কখনও দর্শন করে নাই। সুতরাং তাহার প্রেমাকুল তরুণ চিত্ত যে বনভূমির শান্তি সম্পদে, বিচিত্র সৌন্দর্যে এবং নির্জন প্রেমের সরস পুলকে মাতিয়া উঠিবে, তাহা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার এত আনন্দ হইল যে, ইচ্ছা হইতেছিল সে একবার পুষ্পখচিত গালিচা-বিনিন্দী কোমল ঘাসের উপর চঞ্চলা হরিণী বা প্রেমোন্মাদিনী শিখিনীর ন্যায় নৃত্য করে। মাহতাব খাঁও অরণ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা এবং মোহন দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার চিত্ত নগরের বহু লোক সহবাস পূর্ণ অশান্তি ও কোলাহলময় জীবনের প্রতি ধিক্কার দিল। অলক্ষিতে তাঁহার প্রেমমদিরাকুল চিত্তের মর্ম হইতে প্রভাতকানন মুখরিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ধ্বনিয়া উঠিল ঃ

"দর ফস্‌লে বাহার আগার তনে হুর শিরস্তী
পুর ময়ে কদাহ্‌ বমন্‌ দেহদ্‌ বর্‌ লবে কীস্‌ত,
গরচে বর্‌হর্‌ কসে সখুন্‌ বাশদ জীশ্‌ত।
সগ্‌ বে বমন্‌ আরজাঁকে বরম্‌ নামে বেহেশ্‌ত।"

মাহতাব খাঁ সুললিত স্বরে সেই নির্জন কাননে সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গাবলীর মধুর কূজনে মধু বর্ষণ করিয়া কয়েকবার "রুবাইয়াত"টি গাহিলেন। অরুণাবতী ফার্সী জানিত না, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাহতাব খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি গাইছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মাহতাব ঃ কি গাইব! তোমারই গান গাইছি।

অরুণা ঃ আমার গান কেমন? গজলটা ভেঙেই বলুন না!

"আচ্ছা তবে শোন," এই বলিয়া—প্রস্ফুটিত শুভ্র রজনীগন্ধা মারুত হিল্লোলে যেমন করিয়া ফুটন্ত যৌবনা গোলাপ-সুন্দরীর রক্তবক্ষ স্পর্শ করে, মাহতাব খাঁও তেমনি ভাবে প্রণয়-সোহাগে চম্পক অঙ্গুলে অরুণাবতীর গোলাপী কপোল টিপিয়া বলিলেন, "কবি বলিতেছেন যে, আনন্দময় বসন্তকাল পুষ্পিত নিকুঞ্জ কাননে যদি কোন অপ্সরীবৎ সুন্দরী অর্থাৎ অরুণাবতী কোমল করপল্লবে এক পাত্র মদিরা আমার অধরে ধারণ করে, তাহা হইলে কুকুর আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, যদি আর কখনও বেহেশ্‌ত কামনা করি।"

অরুণা রুবাইয়াতের ব্যাখ্যা শুনিয়া ঈষৎ সলজ্জ কটাক্ষ হানিয়া স্মিত হাসিয়া বলিল, "বটে! কবি তো খুব রসিক।"

মাহতাব ঃ আর আমি বুঝি অরসিক?

অরুণা ঃ কে বলল?

মাহতাব ঃ ভাবে!

অরুণা ঃ কি প্রকারে?

মাহতাব : তবে মদিরাপাত্র কোথায়?

অরুণা : সে যে বসন্তকালে।

মাহতাব : এ বর্ষাকাল হলেও এ কাননে এখনও বসন্ত বিরাজমান।

অরুণা : আচ্ছা, বসন্তই যেন হল; কিন্তু এখানে মদিরা কোথায়? আর তুমি মুসলমান, মদ্য যে তোমার জন্য হারাম।

মাহতাব : কবি যে মদ্যের কথা বলেছেন, তা হারাম নহে।

অরুণা : সে আবার কোন্ মদ্য?

"সে এই মদ্য" এই বলিয়া মাহতাব খাঁ যুবতীকে ভুজপাশে জড়াইয়া অধরে অধর স্থাপন করিলেন। অধর-রসামৃত পানে উভয়েই পুলকিত শিহরিত এবং বিমোহিত হইলেন। অরুণাবতী দেখিল সমস্ত পৃথিবী যেন সুধারসে বিপ্লাবিত। সহসা একটা বুলবুল উড়িয়া আসিয়া অরুণাবতীর অতি নিকটস্থ কদম্ব শাখায় বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল। অরুণাবতী সেই বিহঙ্গের দৃষ্টিতে লজ্জিত হইয়া আনত চক্ষুতে চুম্বনাকৃষ্ট মুখ সরাইয়া লইল। যুবতী-হৃদয়ে যৌবনতরঙ্গে যেমন প্রেমাকুল, লজ্জায় তেমনি সদা অবগুণ্ঠিত।

মাহতাব খাঁ সরোবরের অদূরে গোলাকারে ঘন সন্নিবিষ্ট তালবৃক্ষ পূর্ণ একটি উচ্চস্থান দেখিতে পাইলেন। তাল গাছগুলির ফাঁকে বেতের লতা এমন ঘন ভাবে জন্মিয়াছে যে, বাহির হইতে মধ্যস্থানের নির্মল তৃণাচ্ছাদিত স্থানটুকু সহসা দেখা যায় না। অরুণাবতীও সেইস্থানে কানন-বাসের কুটীর নির্মাণের জন্য পছন্দ করিল। একদিকের কিঞ্চিৎ বেত কাটিয়া দ্বার প্রস্তুত করা হইল। অতঃপর ছোট ছোট দেবদারু ও সুন্দরী গাছ কাটিয়া মঞ্চ প্রস্তুতপূর্বক নৌকার ছই এবং গোলপাতার সাহায্যে দুইটি রমণীয় কুটীর প্রস্তুত করা হইল। কাঁচা বেত চিরিয়া তদ্দ্বারা বন্ধনীর কার্য শেষ করা হইল।

প্রতাপাদিত্যের নৌকা যমুনী নদী হইতে ফিরিয়া না গেলে অরুণাকে লইয়া সেই ভীষণ জঙ্গল অতিক্রম করতঃ অন্যত্র যাওয়া মাহতাব খাঁর পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা ছিল। কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে আর একটি নদী আছে। সেখানে সহসা নৌকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এদিকে নৌকা ব্যতীত কোন নিরাপদ স্থানে যাইবার সুবিধা নাই। কারণ তখন সুন্দরবনের এই অঞ্চল অসংখ্য নদী-প্রবাহে বিভক্ত ও বিধৌত ছিল। হেমন্তকাল হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত অরণ্যে লোকের খুব চলাচল হইত। নল, বেত এবং নানাজাতীয় কাঠ আহরণের জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু বৃষ্টিপাত শুরু ও বর্ষা সূচনা হইলেই এই সমস্ত অরণ্য জনমানব-শূন্য হইয়া পড়িত। মাহতাব খাঁ একাকী হইলে, এই বনভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতাপের রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু অরুণাবতীর বিপদ ও ক্লেশ ভাবিয়া সেই কাননেই আবাস-কুটীর রচনা করিলেন। বিশেষতঃ অরুণাবতী এবং মাহতাব খাঁর প্রেম-উচ্ছ্বাসিত হৃদয়,

কিছুদিন এই রমণীয় কাননাবাসে বাস করিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়াছিল। নৌকায় রন্ধন করিবার পাত্রাদি সমস্তই ছিল। প্রায় দুই মণ অত্যুৎকৃষ্ট চাউল, কিছু দাল, ঘৃত, লবণ ও অন্যান্য মশলা যাহা ছিল, তাহাতে দুইজনের দুই মাস চলিবার উপায় ছিল। বনে হরিণ, নানাজাতীয় খাদ্য-পক্ষী এবং সরোবরে মৎস্যের অভাব ছিল না। মাহতাব খাঁ প্রথম দিবসেই এক হরিণ শিকার করিয়া তাহার গোশত কাবাব করিয়া অরুণাবতী সহ পরমানন্দে উদরপূর্তি করিলেন।

অরুণাবতী মাহতাব খাঁর নিকট ইসলামের পবিত্র কালেমা পড়িয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইল। আপাততঃ আত্মরক্ষার জন্য উভয়েই সেই নিবিড় বনে বাস করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মহর্‌রম উৎসব

১৭ই আষাঢ় মহর্‌রম উৎসব। সেকালের মহরম উৎসব এক বিরাট ব্যাপার, সমারোহকাণ্ড এবং চিত্ত-উন্মাদক বিষয় ছিল। মহর্‌রমের সে অসাধারণ আড়ম্বর, সে জাঁক-জমক, সে ক্রীড়া-কৌশল, সে লাঠি ও তলোয়ার খেলা, সে বাদ্যোদ্যম এবং যাবতীয় নর-নারীর মাতোয়ারা ভাবের উচ্ছ্বাস, সে বিরাট মিছিল, সে মর্সিয়া পাঠ, সে শোক প্রকাশ, সে দান খয়রাৎ, মহর্‌রমের দশদিন ব্যাপী সে সাত্ত্বিক ভাব, বর্তমানে কল্পনা ও অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, আলেম-জাহেল, সকলেই মহর্‌রম উৎসবে যোগদান করিতেন। তখন বাঙ্গালা দেশে অদূরদর্শী কাটমোল্লার আবির্ভাব ছিল না; সুতরাং মহর্‌রম উৎসব তখন বেদাত বলিয়া অভিহিত হইত না। মহর্‌রমের দশ দিবস কেবল মুসলমান নহে, হিন্দুরা পর্যন্ত পরম পবিত্রভাবে যাপন করিতেন। মহর্‌রমের দশ দিবস চোর চুরি করিত না, ডাকাত ডাকাতি করিত না, লম্পট লাম্পট্য ত্যাগ করিত। ধনী ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়া গরীবের দুঃখ বিমোচন করিত। ক্ষুধার্ত অন্ন পাইত, তৃষ্ণার্ত সুমিষ্ট সরবৎ পাইত, বস্ত্রহীন বস্ত্র পাইত, প্রত্যেক লোক প্রত্যেকের নিকট সাদর সম্ভাষণ, আদর আপ্যায়ন এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পাইত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমস্ত কার্য ফেলিয়া মহর্‌রম উৎসবে যোগদান করিতেন। বীরপুরুষ অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া বীরত্ব অর্জন করিবার, কারু ও শিল্পিগণ মহর্‌রমের তাজিয়া সংগঠনে আপনাদের সূক্ষ্ম কারুকার্যের সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার, বালক-বালিকাগণ 'কাসেদ' সাজিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার, ধনী দান খয়রাতে বদান্যতা লাভ করিবার, দেশবাসী গ্রামবাসী পরস্পরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া

বন্ধুত্বলাভ করিবার, দলপতিগণ বিভিন্ন দলের পরিচালনা করিয়া নেতৃত্ব অর্জন করিবার এবং সর্বোপরি সকলেই এই দশ দিন নির্মল আনন্দ, বিপুল উৎসাহ, সামরিক উত্তেজনা, শত্রু-সংহারে উদ্দীপনা এবং মিত্রের প্রতি হিতৈষণা পোষণ করিবার সুবিধা পাইত। মহররমের দশ দিন সমারোহের দিন—উৎসাহের দিন এবং পুণ্যের দিন ছিল। সমগ্র দেশ বাদ্যোদ্যমে মুখরিত—শানাইয়ের করুণ-গীতিতে প্রাণ দ্রবীভূত, খেলোয়াড় এবং বীরপুরুষদিগের অস্ত্র সঞ্চালনে, হুঙ্কারে এবং সদর্প অভিযানে চতুর্দিক উৎসাহ আনন্দে পরিপূর্ণ—মেদিনী কম্পিত—দিঙমণ্ডল চমকিত হইত। মিছিলের বিপুল আড়ম্বরে, তাজিয়া ও দুলদুলের বিচিত্র সজ্জায়, কারুকার্যে, পতাকার উড্ডয়নে, অশ্বারোহীদিগের অশ্ব সঞ্চালনে কি চমৎকার দৃশ্যই না প্রতিভাত হইত! মর্সিয়ার করুণ তানে প্রাণের পর্দায় পর্দায় কি করুণ রসেরই না সঞ্চার করিত! মহররমের দশ দিনে ইস্‌লামের কি অতুল প্রভাবই প্রকাশ পাইত! মহাত্মা ইমাম হোসেনের অপূর্ব আত্মোৎসর্গ ও অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার উন্মাদনা গগনে গগনে পবনে পবনে নব জীবনের স্ফূর্তি ও উল্লাস ছড়াইত। রোগী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিত, ভীরু সাহস পাইত, হতাশ ব্যক্তিও আশায় মাতিয়া উঠিত। উৎপীড়িত আত্মরক্ষার ভাবে অনুপ্রাণিত হইত, বীরের হৃদয় শৌর্যে পূর্ণ হইত। মহররমের দশ দিন দিগ্বিজয়ী বিরাট বিশাল মুসলমানজাতির জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রভাব প্রকাশ পাইত। মুসলমান এই দশ দিন বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে তেজঃ, হৃদয়ে উৎসাহ এবং মনে আনন্দ লাভ করিতেন। সমগ্র পৃথিবীতে মহররমের ন্যায় এমন শিক্ষাপ্রদ, এমন নির্দোষ, এমন উৎসাহজনক পর্ব আর নাই। অধম আমরা, মূর্খ আমরা, অদূরদর্শী আমরা, তাই মহররম-পর্ব দেশ হইতে উঠিয়া গেল। জীবন্ত ও বীরজাতির উৎসব কাপুরুষ, অলস, লক্ষ্যহীনদিগের নিকট আদৃত হইবে কেন? বীর-কুল-সূর্য অদম্যতেজা হজরত ইমাম হোসেনের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ ও স্বাধীনতাস্পৃহার জ্বলন্ত ও প্রাণপ্রদ অভিনয়, প্রাণহীন নীচচেতা স্বার্থান্ধদিগের ভালো লাগিবে কেন? পেচকের কাছে সূর্য, কাপুরুষের কাছে বীরত্ব, বধিরের কাছে সঙ্গীত, অলসের কাছে উৎসাহ কবে সমাদর লাভ করে? যখন বাঙ্গালায় মুসলমান ছিল, সে মুসলমানের প্রাণ ছিল—বুদ্ধি ছিল—জ্ঞান ছিল—তেজঃ ছিল—বীর্য ছিল; তখন মহররম উৎসবও ছিল। যাহা হউক, উৎসবের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।*

মহররমের ১০ তারিখ—বাঙ্গালার পল্লীপ্রান্তর শহর বাজার কম্পিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ ইমাম হোসেনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। দ্বিপ্রহরের সঙ্গে সঙ্গেই সাদুল্লাপুর হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে কল্পিত কারবালার বিশাল মাঠে চতুর্দিক

* *প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মহররম উৎসবকে আবার প্রবল ও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এতদিন পরে হিন্দুদিগের সংগঠন শক্তির ধাক্কা খাইয়া মোল্লা-মৌলবীরা এখন মহররমের সপক্ষে ফতোয়া দিতেছেন। (৪র্থ সংস্করণ)*

হইতে বিচিত্র পরিচ্ছদধারী সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইতে লাগি । নানাবর্ণের বিচিত্র সাজ-সজ্জায় শোভিত মনোহর কারুকার্যভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তাবুত, অসংখ্য পতাকা, সমুজ্জ্বল আসা-সোটা, ডাম্বর বর্শা, তরবারি, খঞ্জর, গদা, তীর, ধনু, সড়কি, রায়বাঁশ, নানা শ্রেণীর লাঠি, খ, ছুরি, বানুটি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে, স্বর্ণ-সজ্জা-শোভিত দুলদুল, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও শত শত হস্তি-শোভিত মিছিলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দল চতুর্দিক হইতে শ্রেণীবদ্ধ সুশৃঙ্খল অবস্থায় কারবালার ময়দানের দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য বাদ্য নিনাদে জলস্থল কম্পিত এবং দিঙমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনশ্রেণী জল ও স্থল আচ্ছন্ন করিয়া নানা পথে নৌকায় কারবালার ময়দানে ধাবিত হইল। জন-কোলাহল সাগর-কল্লোলবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পঁচাত্তরটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিছিলের দল শতাধিক তাবুত সহ বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন পথে আসিয়া কারবালার ময়দানের বিভিন্ন প্রবেশ-পথ-মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর মহররমের বিপুল মিছিল আড়ম্বর, প্রতাপ ও অসাধারণ জাঁকজমকের সহিত কারবালার নিকটবর্তী হইল। ঈসা খাঁর রৌপ্য-নির্মিত স্বর্ণ ও অসংখ্য মণি-মাণিক্য—খচিত সুচারুছত্র, অসংখ্য কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত পতাকা, দর্পণ এবং কৃত্রিম লতাপুষ্প এবং নানা বিচিত্র কারুকার্য-শোভিত ত্রিশ হস্ত পরিমিত উচ্চ, বিশাল ও মনোহর তাবুত মিছিলের অগ্রভাগে একশত ভারবাহী স্কন্ধে বাহিত হইল। ঈসা খাঁর তাবুত দেখিবামাত্রই সেই বিপুল জনতা সমুগ্র-গর্জনে "হায়! হোসেন! হায় হোসেন!" রবে স্থাবর জঙ্গম চরাচর জগৎ যেন কম্পিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রখর কিরণে তাজিয়ার শোভা শতগুণে ঝলসিয়া উঠিল। তাজিয়ার পশ্চাতে দুই সহস্র অশ্বারোহী উর্দী পরিয়া বামহস্তে রক্তবর্ণ বিচিত্র পতাকা বিধূনন এবং দক্ষিণ করে উলঙ্গ কৃপাণ আস্ফালন করিয়া গমন করিল। তাহার পশ্চাতে পাঁচশত সুসজ্জিত স্বর্ণ-আস্তরণ-বিমণ্ডিত হস্তী তালে তালে সমতা রক্ষা করিয়া পৃষ্ঠে ভীষণ ডাম্বর বর্শাধারী দুই দুই জন বীরপুরুষকে বহন করতঃ উপস্থিত হইল। তৎপশ্চাৎ দুইশত বাদ্যকর ঢাক, ঢোল, ভেরী, শানাই, পটহ, ডঙ্কা, তূরী, জগঝম্প, দফ্, শিঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যে ভূতল খতল কম্পিত করিয়া কারবালায় উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে শত শত খেলোয়াড় লাঠি, তরবারি, বানুটি, সড়কির নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে ভীমতেজে অগ্রসর হইল। তৎপর নানাজাতীয় পতাকা ও ঝাণ্ডা পুনরায় দেখা দিল। তৎপর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণসজ্জায় শোভিত তেজঃপুঞ্জ-মূর্তি মহাবীর ঈসা খাঁ শত অশ্বারোহী-বেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। তৎপশ্চাতে শুভ্র পরিচ্ছদ-সমাবৃত দক্ষিণ হস্তে শ্বেত এবং বাম হস্তে কৃষ্ণ চামর-শোভিত সহস্র যুবক পদব্রজে বিলাপ এবং ব্যজন করিতে করিতে আগমন করিল। তৎপর বিপুল জনতা গৈরিক-প্রবাহের ন্যায় চতুর্দিক হইতে

কারবালায় প্রবেশ করিল। ঈসা খাঁ'র তাবুত কারবালায় প্রবেশ করিলে, অন্যান্য মিছিলের দল নানা পথে উল্লাস ও আনন্দে হুঙ্কার করিয়া কারবালায় প্রবেশ করিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান-কুলমহিলাগণ তাঞ্জামে চড়িয়া সূক্ষ্ম যবনিকায় আবৃত হইয়া উৎসব-ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য হিন্দু মহিলা লাল, নীল, সবুজ, বাসন্তী প্রভৃতি বর্ণের শাড়ী পরিয়া সিঁথিতে সিন্দুর মাখিয়া, নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, গুজরী মল, নূপুরের রুণু রুণু ঝুমু ঝুমু এবং ঝন ঝন কৃণ কৃণ শব্দে পল্লী ও প্রান্তরবক্ষে আনন্দমিশ্রণ জাগাইয়া, রূপের ছটায় পথ আলোকিত করিয়া, কথার ঘটায় হাসির লহর তুলিয়া চঞ্চল শফরীর ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইল। মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে সহস্র সহস্র তরণী নানাবর্ণের নিশান উড়াইয়া দাঁড়ের আঘাতে জল কাটিয়া বাইচ দিতে লাগিল। অসংখ্য বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর উৎফুল্ল মুখকমলের আনন্দ-জ্যোতিঃতে মাথাভাঙ্গার জল-প্রবাহ আলোকিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। নদীর পারেই ঘোড়দৌড়ের বাঁধা রাস্তা; তাহাতে শত শত ঘোড়া প্রতিযোগিতা করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহররমের শির্নী স্বরূপ নানা শ্রেণীর মিষ্টান্ন পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। খেলোয়াড়গণ শত শ দলে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকার ব্যায়াম, অস্ত্র-চালনা এবং ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিশাল ময়দানে এক মহা সামরিক চিত্তোন্মাদকর দৃশ্য! অগণিত নরনারী সেই মহা উত্তেজনাকর ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ ও লুব্ধ হইতেছে। মুহুর্মুহুঃ সেই বিশাল জনতা "ইমাম হোসেন কি—ফতেহ্" বলিয়া গগন-ভুবন কম্পিত করিতেছে। শত শত বালক তাবুর চূড়ার ন্যায় লম্বা টুপী মাথায় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া "হায়! হোসেন! হায়! হোসেন!!" রবে প্রকৃতির বক্ষে শোকের দীর্ঘ লহরী তুলিতেছে। ধনাঢ্য নরনারীগণ তাবুত লক্ষ্য করিয়া পুষ্প, লাজ, পয়সা ও কড়ি বর্ষণ করিতেছে। দরিদ্রেরা পয়সা ও কড়ি আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইতেছে। কেহ কেহ রাশি রাশি বাতাসা বর্ষণ করিতেছে। বালকের দল সেই বাতাসার লোভে হুড়া-ওড়ি, পাড়াপাড়ি করিতেছে। বিশাল ময়দানের চতুর্দিকে তাবুত লইয়া মিছিলসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর মধ্যস্থলে অযুত লোক লাঠি তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে। গায়কগণ স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া করুণকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কারবালার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সঙ্গীতালাপে প্রকাশ করিতেছে। ধন্য ইমাম হোসেন! তুমি ধন্য! তোমার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় এবং চিরজীবিত আর কে? ধন্য তোমার স্বার্থত্যাগ! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!! ধন্য তোমার স্বাধীনতা-প্রিয়তা! শত ধন্য তোমার অদমনীয় সাহস ও শৌর্য! তোমার ন্যায় বীর আর কে? তোমার ন্যায় অক্ষয়জীবী বা আর কে? প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তোমার ন্যায় আর কে আত্মত্যাগ করিয়াছে? "মন্ত্রের সাধন

কিংবা শরীর পাতন" এ প্রতিজ্ঞা তোমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। পুণ্যভূমি আরবের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ইসলামের পবিত্রতম প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, মৃত্যুর করাল গ্রাস এবং নির্যাতন ও অত্যাচারের ভীষণ নিষ্ঠুর যন্ত্রণাও তোমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তুমি সবংশে ধ্বংস হইলে, তথাপি অন্যায়ের প্রভুত্বের নিকট মস্তক নত করিলে না। আজ অত্যাচারী এজিদের স্থান এবং তোমার স্থানের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান। তুমি আজ জগতের যাবতীয় নর-নারীর কণ্ঠে কীর্তিত, হৃদয়ে পূজিত। তুমি কারবালায় পরাজিত এবং নিহত হইয়াও আজ বিজয়ী এবং অমর।

মহররম উৎসব খুব জোরে চলিতে লাগিল। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম-গগনপ্রান্তে দ্রুত নামিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিবসের শেষ-রশ্মি বৃক্ষের অগ্রভাগে উত্থিত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে দুই একটি তারকা নীলাকাশে ফুটিতে লাগিল। আর দেখিতে দেখিতে অমনি জল-স্থল সহসা প্রদীপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র মশাল কারবালা ক্ষেত্রে জ্বলিয়া উঠিল। নানা বর্ণের মাহতাব, তুবড়ী এবং হাওয়াই জ্বলিয়া জ্বলিয়া কারবালার হত্যাকাণ্ডের দারুণ রোষানল উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বোমের আওয়াজে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সহস্র সহস্র আগুনের বানুটি খেলোয়াড়দিগের হাতে অদ্ভুত কৌশলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কি অপূর্ব দৃশ্য! প্রান্তরময় মনুষ্য! প্রান্তরময় অনলক্রীড়া! নদীগর্ভে অনল-ক্রীড়া! আকাশে অনল-ক্রীড়া! জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিপুল উৎসাহ। বিপুল আনন্দ!! বিপুল কোলাহল!! বিপুল স্ফূর্তি!!!

সাদুল্লাপুর মিত্রদের বাড়ী হইতেও বিপুল সমারোহে তাজিয়ার মিছিল বাহির হইয়া কারবালায় আসিয়াছিল। পাঠকগণ! অধুনা ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যে-সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তখনকার ঘটনা ইহাই ছিল। বাদশার জাতি মুসলমানের সকল কার্যেই হিন্দুর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি ছিল। মুসলমানের মসজিদ এবং পীরের দরগা দেখিলে সকল হিন্দুই মাথা নোয়াইত, মুসলমানের ঈদ পর্বেও হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পান, আতর এবং মিষ্টান্ন উপহার দিত। মুসলমানের পোষাক পরিয়া হিন্দু তখন আত্মাভিমান বোধ করিত। মহররম পর্ব তো হিন্দুরা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল। আজিও বাংলার বাহিরে বিহার এবং হিন্দুস্থানের হিন্দুরা মহররম পর্বে মুসলমানের ন্যায়ই মাতিয়া উঠে। অনেক রাজ-রাজড়াদের বাড়িতে দস্তুরমত তাবুত উঠে এবং মিছিল বাহির হয়। আজিও হিন্দুস্তানে মহররম পর্বে হিন্দু-মুসলমানে গভীর একপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়।*

---

* অধুনা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফলে হিন্দুস্তান হইতে পিঁয়েরা ফতোয়া জারির ফলে হিন্দুস্তানের হিন্দুরা ও মহররম হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। (৪র্থ সংস্করণ)

সাদুল্লাপুর মিত্রদের বাড়ি হইতে স্থলপথে মিছিল আসিয়াছিল। আর জলপথে দুইখানি সুসজ্জিত পিনীসে বাড়ীর গিন্নি ও বধূরা, অন্যখানিতে স্বর্ণময়ী, মালতী এবং অন্যান্য বালক-বালিকা। মাল্লারা নৌকা বাইচ দিতেছিল। বরকন্দাজেরা দাঁড়ি-গোঁফে তা দিয়া ঢাল-তলওয়ার লইয়া পাহারা দিতেছিল। হেমদাকান্ত এবং অন্যান্য যুবকেরা অশ্বারোহণে আসিয়াছিল। কাপালিক ঠাকুর রক্তবর্ণ চেলি পরিয়া কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণময়ীদের নৌকায় চড়িয়া মহররমের উৎসব দেখিতেছিল। নদীগর্ভে একস্থানে ঈসা খাঁর কয়েকখানি রণতরী নৌযুদ্ধের অভিনয় করিতেছিল। স্বর্ণময়ী সেই অভিনয়ই সাভিনিবেশে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

ঈসা খাঁ যে স্বর্ণময়ীর সহিত মহররম উৎসবের দিন দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, হেমদাকান্ত তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল। কারণ ইহা গোপনীয় বিষয় ছিল না। দুর্মতি হেমদাকান্ত এক্ষণে এই ছলে স্বর্ণকে হরণ করিবার জন্য একটা কৌশল বিস্তার করিল। হেমদা নৌকার পাহারাওয়ালা বরকন্দাজদিগকে সহসা ডাকিয়া কয়েকটি ঘোড়া রক্ষা করিবার ভার তাহাদিগকে দিয়া, "আমি আসছি, তোমরা অপেক্ষা কর" বলিয়া সঙ্গের কয়েকটি কাশী-নিবাসী আগন্তুক বন্ধু লইয়া স্বর্ণের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মালতী! তুই এবং অন্যান্য সকলে নেমে অন্য নৌকায় উঠ, এ নৌকা তাজিয়া-ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। তথায় নবাব সাহেব স্বর্ণকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছেন।" হেমদাকে বাটির ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত ভয় করিত। সুতরাং হেমদা বলিবা মাত্রই তাহারা অন্য নৌকায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অভিরাম স্বামী নৌকা হইতে নামিয়া ডাঙ্গায় উঠিল। মাঝি-মাল্লারা পিনীস তাড়াতাড়ি বাহিয়া তাজিয়াঘাটা পানে ছুটিল। হেমদার সঙ্গের ভদ্রবেশধারী কতিপয় ব্যক্তি নৌকায় উঠিয়া পড়িল। 'ইহারা ঈসা খাঁর লোক, স্বর্ণকে লইতে আসিয়াছে,' মাঝি-মাল্লারা ইহাই মনে করিল।

হেমদা এবং স্বামীজী দুইজন, জনতার মধ্যে মিশিয়া নানাস্থানে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আতসবাজী দেখিতে লাগিল। অনেক বিলম্বে তাহারা বরকন্দাজদিগের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই তাড়াতাড়ি বলিল, "যাও, যাও, তোম্‌লোগ্ জলদি তাজিয়া-ঘাটামে কিস্তীকে হেফাজত মে যাও। উঁহা নবাব সাহেবকা সাথ মোলাকাত করনেকে লিয়ে রাজকুমারী তশরিফ লে গেয়ি হ্যায়। জলদি উঁহা যানা।" বরকন্দাজেরা "হুজুর", বলিয়া তাজিয়া-ঘাটের দিকে দৌড়াইল।

অভিরাম স্বামী পূর্বেই মাঝি এবং মাল্লাদিগকে একটি এমন ঔষধ পানের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিয়াছিলেন যে, তাহারা তাজিয়া-ঘাটায় নৌকা লইয়া যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেই বেহুশ এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। তখন সেই ছদ্মবেশী গুণ্ডার দল পাল তুলিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিমগামী একটা ক্ষুদ্র শাখার দিকে নৌকা চালাইল। নৌকা ভরা-পালে উড়িয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

রাত্রি অর্ধ প্রহরের পর মহররম-উৎসব শেষ হইলে, নবাব ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী যখন জগদানন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া স্বর্ণময়ীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন, তখন চারিদিকে তাজিয়া-ঘাটায় স্বর্ণের অনুসন্ধান হইল। কিন্তু স্বর্ণ এবং তাঁহার নৌকার কোনও খোঁজ-খবর কোথায়ও পাওয়া গেল না। সকলেই মহাব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে বহু নৌকা, লোকজন এবং গুপ্তচর প্রেরিত হইল। শ্রীপুর হইতে রাজা কেদার রায় চতুর্দিকে বহু গুপ্তচর ও সন্ধানী পাঠাইলেন। নবাব ঈসা খাঁও অনেক লোকজন পাঠাইলেন। হেমদাকান্ত তাঁহার গুরু অভিরাম স্বামীকে লইয়া এই সুযোগে স্বর্ণময়ীকে খুঁজিবার ছলে সাদুল্লাপুর পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণময়ীর পিনীসের মাঝি-মাল্লাদিগকে তিন দিন পরে সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় এক জঙ্গলের ভিতর পাওয়া গেল। নানা ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের চৈতন্যবিধান করা হইল বটে, কিন্তু তাহরা তাজিয়াঘাটে উপস্থিত হইবার পরের কোনো ঘটনাই বলিতে পারিল না। কতিপয় ভদ্রলোক ঈসা খাঁর অনুচররূপে হেমদার নিকট উপস্থিত হইয়া তাজিয়া-ঘাটে নৌকা লইতে আসে, হেমদাকান্তের আদেশেই তাহারা নৌকা লইয়া তাজিয়া ঘাটে উপস্থিত হয়। এই পর্যন্ত মাঝি-মাল্লাদিগের নিকট সন্ধান পাওয়া গেল। যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাহা হইতে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের লোকেরাই ঔষধ প্রয়োগে নৌকা-বাহকদিগের সংজ্ঞা হরণ করিয়া স্বর্ণময়ীকে হরণ করিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর নগরে বহু সুদক্ষ চর প্রেরিত হইল, কিন্তু স্বর্ণময়ীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কেদার রায়, তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায়, জগদানন্দ মিত্র এবং ঈসা খাঁ সকলেই স্বর্ণময়ীর জন্য বিষম ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ এবং প্রতাপের ধ্বংসে সাধনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের বক্ষের উপর মৃত্যুর শূল বসাইতে না পারিলে স্বর্ণময়ীর যে কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না ইহাই সকলের বিশ্বাস। ঈসা খাঁ তাঁহার হৃদয়-আকাশের প্রেম-চন্দ্রমা, তাঁহার জীবন-বসন্তের গোলাপ-মঞ্জরী, যৌবন-উষার কোকিল-কাকলী, মানস-সরসীর প্রীতির কমল, অনুরাগ-বীণার মোহন মূর্ছনা, চিরসাধের স্বর্ণময়ীর জন্য একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কি করিবেন, তদ্বিষয়ে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে কেদার রায় কন্যা-শোকে একান্ত বিচলিত এবং অভিভূত হইয়া ঈসা খাঁর সাহায্যে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। ঈসা খাঁও এ বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

প্রথমতঃ প্রতাপকে ভয় প্রদর্শনের দ্বারা স্বর্ণময়ীর উদ্ধার মানসে এক পত্র দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা হইল যে, পত্রপ্রাপ্তি মাত্র স্বর্ণময়ীকে প্রত্যর্পণ না করিলে, তাহার রাজ্য ও জীবন নিরাপদ হইবে না। প্রতাপাদিত্য এই পত্র পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বর্ণময়ীর অপহরণের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। অকারণে তাঁহার উপর স্বর্ণময়ী-হরণের দোষারোপ, অধিকন্তু রাজ্য ও জীবন বিনাশের ভীতি-প্রদর্শনে প্রতাপ ক্রোধে ও অপমানে গর্জিয়া উঠিলেন। প্রতাপ অত্যন্ত তীব্র ও অপমানজনক ভাষায় কেদার রায়কে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। সে প্রত্যুত্তরের তীব্র-তীক্ষ্ণ বাক্য-শেল রাজা কেদার রায় এবং নবাব ঈসা খাঁকে তখন বিষম ব্যথিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপাদিত্য সত্বরতাপূর্বক একদল পর্তুগীজ গোলন্দাজ এবং পাঁচ হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সহস্রাধিক নৌকা সাহায্যে নদীপথে কেদার রায়ের রাজ্যে অতর্কিত অভিযান করিলেন। কেদার রায়ের রাজ্যের প্রান্তপাল সৈন্যগণ প্রবল-প্রতাপ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। প্রতাপ শাহবাজপুর হইতে স্থলপথে অতি দ্রুতবেগে বজ্র-বিদ্-বিদ্যুৎ-সঙ্কুল ঝটিকাবর্তের ন্যায় রাজা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সহসা প্রতাপের এতাদৃশ অগ্রগতি শ্রবণে কেদার রায় প্রথমতঃ বিচলিত, পরে রাজধানী শ্রীপুরের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল লইয়া প্রবল তেজে প্রতাপাদিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং দূত পাঠাইয়া ঈসা খাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিন দিবস অবিরাম যুদ্ধের পরে রাজা কেদার রায় পরাস্ত হইয়া শ্রীপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য, গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে দুর্জয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবস প্রাতে ঈসা খাঁ চারি হাজার পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইলেন। প্রতাপাদিত্যের খ্যাতনামা সেনাপতি কালিদাস ঢালী সাত হাজার পদাতিক এবং নয়শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উদয়গড় নামক স্থানে ব্যূহ-বিন্যাস করিয়া ঈসা খাঁর সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিল। লাঠি, তরবারি, বন্দুক ও তীর সমানভাবে সংহার-কার্য সাধন করিল! উভয় সেনাদল মরিয়া হইয়া যুঝিতে লাগিল। ঈসা খাঁ বিপুল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও বিচ্ছিন্ন করতঃ গম্ভীর হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল চমকিত করিয়া শ্রীপুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কালিদাস-পরিচালিত সেনাদল যাহাতে পুনরায় একত্র হইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আজিম খাঁ শূর নামক জনৈক সুদক্ষ বীর-পুরুষের অধীনে আড়াইশত অশ্বারোহী সেনা রাখিয়া নিজে ঝঞ্ঝা-গতিতে শ্রীপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। সমস্ত দিন

ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদয়গড় হইতে কুচ করিয়া রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইয়া নিঃশব্দে রণক্লান্ত সৈন্যদিগকে আহার ও বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে আদেশ দিলেন। চতুর্দিকে চৌকি স্থাপন করিয়া স্বয়ং সতর্কভাবে সমস্ত সেনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতেই দুইশত অশ্বারোহী এবং এক সহস্র পদাতিক লইয়া বজ্রের ন্যায় ভীষণ গতিতে শত্রু-সেনার উপরে পতিত হইবার জন্য কুচ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে সমর-সজ্জায় প্রস্তুত এবং আহ্বানমাত্রেই ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুকুলে আপতিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গুরু-শিষ্য

কাপালিককুল-চূড়ামণি অভিরাম স্বামী এবং পাপাশয় হেমদাকান্ত স্বর্ণকে খুঁজিবার ছল করিয়া তাহাদের আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নৌকাযোগে সাদুল্লাপুর পরিত্যাগ করিল। হেমদাকান্তের সহকারী গুণ্ডার দল স্বর্ণকে লইয়া পূর্ব পরামর্শানুসারে ইদিলপুরের নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। তখন স্বর্ণকে লইয়া নৌকাপথে বেশীদূর ভ্রমণ করিলে, পাছে কেহ কোন সন্ধান পায়, এজন্য স্বামী ও শিষ্য ইদিলপুরের নির্জন কাননেই আপনাদের পাপ অভিসন্ধি সম্পাদনের নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়াছিল। গুণ্ডার দল স্বর্ণময়ীকে লইয়া সেই কাননাভ্যন্তরে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতেছিল। তিন দিবস পরেই পাপাত্মা অভিরাম স্বামী ও হেমদাকান্ত সেই কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহারা রোরুদ্যমানা এবং ক্ষিপ্তমনা স্বর্ণকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিতে এবং প্রবোধ দিতে ও পাপ-প্রলোভনে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। স্বর্ণময়ী তাহাদের বাক্য শ্রবণে যার-পর-নাই মর্মপীড়িতা হইল। সে কখন ক্রন্দন, কখন তর্জন-গর্জন করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। স্বর্ণের মানসিক উত্তেজনা এবং উৎক্ষিপ্ত-ভাব দর্শনে স্বামী-শিষ্য মিলিয়া তাহাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। স্বর্ণ যখন দেখিল, তাহার কষ্ট ও নির্যাতন চরমে উঠিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যে পাপ-সংকল্পে সম্মত না হইলে, পাষণ্ডরা বল-প্রকাশেও কুণ্ঠিত হইবে না, তখন সে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এক কৌশলজাল বিস্তারের কল্পনা করিতে লাগিল। মাকড়সা যেমন আশ্রয়শূন্য হইলেই নিজের দেহের ভিতর হইতে সূত্র নির্গত করিয়া জাল নির্মাণ পূর্বক আপনাকে আশ্রয়-সংস্থিত করে, মানুষও তেমনি বিপদে পড়িলেই তাহার

অন্তরস্থ আত্মা তাহাকে নূতন বুদ্ধি-কৌশল উদ্ভাবনের কল্পনায় মাতাইয়া তোলে। স্বর্ণ দেখিল, অভিরাম স্বামীও তাহাতে মুগ্ধ এবং লুব্ধ। হেমদা এবং স্বামীজি উভয়েই তাহার শিকার। সুতরাং আপাততঃ একজনকে ভালোবাসার ছলনায় মুগ্ধ করিতে পারিলেই অন্যের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত অনিবার্য। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিতে পারিলে, হয়ত তাহার উদ্ধার হইবার কোন পথ খুলিয়া যাইতে পারে। এই সংকল্পে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বামীজি এবং হেমদাকান্তের সহিত কথোপকথন করিতে ও স্বামীজির প্রতি একটু বেশী ভালোবাসা দেখাইতে লাগিল। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসের ফরমায়েস করিতে লাগিল। অন্যান্য লোক থাকিলে তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হয়, এই অছিলায় সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দেওয়াইল। এক্ষণে এই নিবিড় অরণ্যে স্বামীজি, হেমদা এবং স্বর্ণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না।

স্বর্ণকে লইয়া প্রথম প্রথম স্বামীজি ও শিষ্যের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি, তৎপর অত্যল্পকাল মধ্যেই কলহ হইতে লাগিল। স্বর্ণ চালাকী করিয়া সে কলহে স্বামীজির পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, স্বামীজি সম্মুখে আসিলেই সে আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু হেমদাকে দেখিলেই সে লজ্জা ও ঘৃণায় ঘোমটা টানিয়া বসে। ইহাতে হেমদার দিনদিন স্বামীজির প্রতি জাতক্রোধ হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্ণময়ী একদিন সুযোগ বুঝিয়া, হেমদা কার্যোপলক্ষে একটু দূরে গেলে পর, স্বামীজিকে ডাকিয়া বলিল, "আমি যখন ভাগ্য-দোষে অকূলে পতিত হয়েছি, তখন কূলে উঠবার আর আশাও নাই, ইচ্ছাও নাই। কূলে উঠলে লোক-গঞ্জনায় গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে হবে। সুতরাং মনে করেছি, অকূলে থেকেই একটা কূলে আশ্রয় নেব। দুই কূল তো আশ্রয় করতে পারব না। একটা মন দু'জনকে দিতে পারব না। গুরু থাকতে লঘুকে বরণ করতে পারব না। কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দেখছি, তাতে বোধ হয়, শিষ্যই অবিলম্বে আমাকে উচ্ছিষ্ট করবে। কিন্তু সেরূপ হলে নিশ্চয় জেনে রেখ, আমি আত্মহত্যা করব। তোমাকেই স্ত্রী-হত্যার পাতকভাগী হতে হবে। ঠাকুর! যদি আমার জীবনে তোমার মমতা থাকে, তা হলে আমাকে নিয়ে পলায়ন কর।"

অনলস্পর্শে তুবড়ীবাজি যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গে প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, স্বর্ণময়ীর অনুরাগপূর্ণ হিত-পরামর্শে অভিরাম স্বামীর হৃদয় আশা, আনন্দ ও উৎসাহে তেমনি নাচিয়া উঠিল।

কুকুর যেমন প্রভুহস্ত হইতে মাংসখণ্ড পাইবার সম্ভাবনায় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, কাম-কুক্কুর অভিরাম স্বামীও স্বর্ণময়ীর পরামর্শে তেমনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়-উদ্যানের শুষ্ক কুঞ্জে সহস্র লক্ষ কুসুম ফুটিয়া উঠিল! স্বর্গ-রাজ্য তাহার চরণতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। নিরাশার মরু-সৈকত বিপ্লাবিত করিয়া সুপ্ত প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর, যাহা কেবল তাহার হৃদয়ের

অতি নিভৃত কোণে লুক্কায়িত ছিল—প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে আবর্ত রচিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়া চলিল। পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। পর দিবস রাত্রি থাকিতেই হেমদাকে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া সেই কানন-পথেই পলায়ন করিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতেই অভিরাম স্বামী শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বর্ণকে লইয়া সেই কাননের অন্ধকার-পথে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকাপথে অন্য কোন দিকে পলায়ন করিলে, হেমদা তাহার সন্ধান পাইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই কাননের দক্ষিণভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপালিক চিন্তা করিল যে, আমরা যে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় এই কাননের অন্যত্র আশ্রয় লইব, হেমদা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।

এদিকে হেমদা যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণ ও অভিরাম স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন যেন থামিয়া যাইতে লাগিল। সে চঞ্চল পদে এদিক্-ওদিক্ খুঁজিয়া দুইজনের একজনকেও দেখিতে পাইল না। শেষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, উভয়ের বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান হালকা জিনিস-পত্র কিছুই নাই। তখন হেমদা দুঃখে ও ক্ষোভে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। অভিরাম স্বামী তাহার চক্ষে প্রকট শয়তান বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার প্রতিহিংসাবহ্নি একেবারে নভঃস্পর্শী হইয়া উঠিল। তাহাকে অনন্তকাল নরকানলে দগ্ধ করিলে এবং কুটী কুটী করিয়া কাটিলেও তাহার ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইবে না।

স্বর্ণ এবং স্বামীজি কোন্ পথে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তন্নির্ধারণই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। সে অনেক ভাবিয়া শেষে কানন-পথেই উড়ো-পাখির পশ্চাদ্ধাবিত হইল। স্বামী এবং স্বর্ণ যে-পথে পলায়ন করিয়াছিল, সে-পথে অনেক লতা ও গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন এবং নত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বর্ষা-বারি-পুষ্ট ঘাসের মাথা দলিত হইয়াছিল। হেমদা বহু কষ্টে সেই সমস্ত চিহ্নের অনুসরণ করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী এবং স্বর্ণময়ী দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত চলিতে ছিল। বেলা দুই প্রহরের সময় তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এক স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সঙ্গে যে যৎসামান্য ফল-মূল ছিল, স্বামীজি পরম যত্নে তাহা স্বর্ণকে খাওয়াইতে লাগিল। যে স্থানে বসিয়া তাহারা জলযোগ করিতেছিল, সে স্থান মাহতাব খাঁর আশ্রম হইতে বেশী দূর নহে। স্বর্ণ এবং অভিরাম স্বামী জলযোগান্তে সে স্থান হইতে প্রায় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে অপহৃত-শিকার শার্দুলের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও রুদ্রমূর্তি হেমদাকান্ত পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া একলম্ফে অভিরাম স্বামীর স্কন্ধদেশে ভীষণ খ প্রহার করিল। অভিরাম স্বামী বিকট চীৎকার করতঃ বনভূমি বিকম্পিত করিয়া দশ হাত দূরে যাইয়া

ভূতলে পতিত হইল। তাহার বিকৃত স্কন্ধদেশ হইতে অজস্রধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। হেমদা রোষাবেশে কম্পিত এবং প্রদীপ্ত হইয়া অত্যন্ত তীব্র কটূক্তিতে অভিরাম স্বামী ও স্বর্ণময়ীর মর্মবিদ্ধ করিতে লাগিল। দারুণ ঘৃণায় অভিরাম স্বামীর মস্তকে গুরুতর পদাঘাত করিল। অতঃপর বিকট গর্জন করিয়া রক্তরঞ্জিত-শানিত-খ উদ্যত করতঃ স্বর্ণকে বলিল, "বল্, এখন তোর মতলব কি? এই বলিয়া নিতান্ত অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় স্বর্ণকে গালাগালি করিতে লাগিল। স্বর্ণ তখন লজ্জা, রোষ এবং ক্ষোভে দলিতা ফণিনীর ন্যায়, সন্তপ্তা সিংহীর ন্যায়, কুক্কুরাক্রান্ত নিরুপায় মার্জারের ন্যায়,—বৃকতাড়িত মহিষীর ন্যায় নিতান্ত প্রখরা মূর্তি ধারণা করিল। বন-পথে আসাকালীন অভিরাম স্বামী একখানি তলওয়ার লইয়া আসিয়াছিল। স্বর্ণময়ী মুহূর্ত মধ্যে ভূতল হইতে সে তরবারি উত্তোলন করিয়া সংহারিণী-মূর্তিতে—দৃষ্টিতে অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া বলিল, "পাপাত্মা হেমদা! আয় দেখি তোর কত শক্তি ও সাহস! তোর পাপ-বাসনা অদ্য রক্তধারে নির্বাপিত করব।" এই বলিয়া বিপন্না সতী তাহার গ্রীবামূল লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তরবারি প্রহার করিল। পলকে হেমদাকান্ত ঈষৎ পশ্চাতে হঠিয়া গেল, তাহাকে অসি গ্রীবামূলে না লাগিয়া বাহুমূলে লাগিয়া অনেকটা কাটিয়া গেল। হেমদা তখন স্বর্ণময়ীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় খ প্রহারার্থে উদ্যত হইল। এমন সময় অভিরাম স্বামীর বিকট চীৎকারে উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী হইয়া মাহতাব খাঁ তথায় উপস্থিত হইয়া "কি কর, কি কর" বলিয়া হেমদার উপরে ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পতিত হইলেন এবং তরবারির আঘাতে হেমদার হস্তের খ মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর মুহূর্ত মধ্যে হেমদার বক্ষে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী এবং বন্দী করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত প্রতিফল

উষার শুভ্র হাসি পূর্ব-গগনে প্রতিভাত হইবার পূর্বেই—বিহগ-কণ্ঠে ললিত কাকলী উদ্গীত হইবার বহু পূর্বেই ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী সহস্র পদাতি, দুইশত সাদি লইয়া বজ্র-প্রতাপে, প্রতাপের সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। প্রতাপ-সৈন্য সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ভীত, চকিত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনবরত অস্ত্রাঘাতে তাহারা কদলী তরুর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। উষালোক প্রকাশমান হইলে প্রতাপের সৈন্যদল ঈসা খাঁর সেনাবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দর্শনে অতিমাত্র সাহসী হইয়া বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে ঈসা খাঁর অবশিষ্ট বাহিনী ভীষণ

ঝঞ্ঝাবাত্যার ন্যায় বিদ্যুত্তেজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহা সংহার আরম্ভ করিল। কেদার রায়ের সৈন্যগণও দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া ভীম তেজে প্রতাপ-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। ঈসা খাঁর গোলন্দাজ সেনা অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রতাপের পর্তুগীজ সৈন্য-পরিচালিত তোপগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বহু পর্তুগীজ আহত ও নিহত হইল। অসংখ্য তরবারি সঞ্চালনে মনে হইল যেন গগনমণ্ডলে অসংখ্য বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। বৈশাখের ঝটিকা যেমন মেঘদলকে বিচ্ছিন্ন করে, ঈসা খাঁর প্রবল প্রতাপে তেমনি যশোহরের সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন, দলিত, নিহত এবং আহত হইয়া সমর-ক্ষেত্র আচ্ছাদিত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। পরাজয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপর হইলে, ঈসা খাঁ শোণিত-রঞ্জিত কৃপাণ হস্তে ঘূর্ণিতলোচনে, শত্রু-সংহারক-বেশে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া তরবারি বিস্তারপূর্বক গতিরোধ করিলেন। ঈসা খাঁ প্রতাপাদিত্যের তরবারি ঢালে উড়াইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এখনও স্বর্ণময়ীকে দিতে স্বীকৃত হও, নতুবা আজ তোমার রক্ষা নাই। আজ মুসলমান তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিয়ে যে-ব্যক্তি পরের কন্যাকে দস্যুর ন্যায় হরণ করে, তাকে আমি দস্যুর ন্যায়ই হত্যা করে থাকি। স্বর্ণময়ী কোথায়? প্রকাশ করলে এখনও তোমাকে প্রাণদণ্ড হতে অব্যাহতি দান করতে পারি!" ঈসা খাঁর বাক্যে, প্রতাপ বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং 'ঈসা খাঁ, সাবধান!' এই কথা বলিয়া তরবারি সঞ্চালন করিলেন। ঈসা খাঁ তরবারির আঘাত ঢালে উড়াইয়া কৃতান্তের রসনার ন্যায় দীপ্ত অসি প্রতাপের স্কন্ধদেশে প্রহার করিলেন। প্রতাপ সে আঘাত কৌশলে ব্যর্থ করিলেন। দুইজন দুইজনকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তরবারি, ভল্ল, গদা, খঞ্জর নানা অস্ত্র উভয়ে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত অশ্বদ্বয়ের মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিলেন, "খাঁ সাহেব! এসো অশ্ব হতে নেমে দুজনে মল্ল যুদ্ধ করি।" অতঃপর প্রতাপ ও ঈসা খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই এক পেঁচ খেলিবার পরেই প্রতাপ বুঝিলেন, ঈসা খাঁ তাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তখন প্রতাপ সহসা পরিচ্ছেদের অভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা ঈসা খাঁর বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, ঈসা খাঁ মুহূর্তে ছুরিকা মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন। ছুরির আঘাতে হস্ততল বিক্ষত হইয়া গেল। প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকতায় ঈসা খাঁ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় "বেইমান, কাফের" বলিয়া ভীষণ গর্জন করতঃ প্রতাপের কটিবন্ধনী আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপ শৃঙ্গচ্যুত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া পুনরায় উঠিতে যাইতেছেন দেখিয়া ঈসা খাঁ সজোরে বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জ্বালাময় ভল্ল বক্ষলক্ষ্যে উদ্যত করিয়া বলিলেন, "বল জাহান্নামী কাফের, স্বর্ণ কোথায়? নতুবা এই ভল্লাগ্রে তোর

বক্ষ বিদীর্ণ করব।" প্রতাপ বলিল, "আমি স্বর্ণময়ীর কোন সংবাদই অবগত নহি, অকারণে আমাকে বধ করো না।"

চতুর্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "কি? এখনও প্রবঞ্চনা? মারুন শয়তানকে।" ঈসা খাঁ এইবার বর্শা আরও দৃঢ়মুষ্টিতে উর্ধ্বে উঠাইলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি অশ্বের দাপটে চতুর্দিক শঙ্কায়মান করিয়া শ্বেত পতাকা হস্তে "থামুন! থামুন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে নক্ষত্র-গতিতে ঈসা খাঁর নিকটবর্তী হইলেন। ঈসা খাঁ সকলকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অশ্বারূঢ় ব্যক্তি ঈসা খাঁকে কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, "হুজুর! প্রকৃত অপরাধীকে আমি বন্ধন করে এনেছি। যশোহরপতি স্বর্ণকে হরণ করেন নাই, সুতরাং তাঁকে দণ্ড প্রদান করবেন না।" ঈসা খাঁ আগন্তুকের সম্ভ্রান্ত এবং তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রতাপাদিত্যকে রাজবন্দীরূপে রক্ষা করিতে কর্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন!

সুচতুর পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই আগন্তুক মাহতাব খাঁ। প্রতাপের পরাজয়ে রাজা কেদার রায় পরম আনন্দে ও উল্লাসে ঈসা খাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। দুঃখ-দুর্ভাবনা-পীড়িত শ্রীপুরে আবার নব আনন্দ ও নবশ্রী ফিরিয়া আসিল। নহবতে নহব বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। নগরবাসীরা পত্র, পল্লব, লতা, পুষ্প, কদল বৃক্ষ ও পতাকায় নগর সুশোভিত করিলেন। নানা স্থানে উচ্চ উচ্চ তোরণ নির্মিত ও গীতিবাদ্য হইতে লাগিল। কেদার রায় বিপুল আড়ম্বরে ঈসা খাঁ ও তাঁহার সৈন্য-সামন্তকে ভোজ প্রদানের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে লোকজন ও বাহক যাইয়া মাহতাব খাঁর নৌকা হইতে আহত কাপালিক এবং বন্দী হেমদাকে লইয়া আসিল! পাল্কী করিয়া পরম সমাদরে অরুণাবতী ও স্বর্ণময়ীকে আনা হইল। স্বর্ণময়ীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সভার যাবতীয় ব্যক্তি ঘৃণা ও ক্রোধে কাপালিক এবং হেমদাকে প্রহারে জর্জরিত করিল। আহত কাপালিক সেই প্রহারেই প্রাণত্যাগ করিল। হেমদাকে দণ্ড করিয়া মারিবার জন্য তাহার পিতা বরদাকান্ত এবং রাজা কেদার রায় ঈসা খাঁকে নিবেদন করিলেন। সভার সমস্ত লোক একবাক্যে "ইহাই পাপাত্মার উপযুক্ত শাস্তি" বলিয়া উঠিল। কিন্তু ঈসা খাঁ প্রাণদণ্ডের সমর্থন না করিয়া হেমদার নাক-কান কাটিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সকলে অহাস্তে আরও সন্তুষ্ট হইল। মিথ্যা ধারণার জন্য ঈসা খাঁ এবং কেদার রায় উভয়েই প্রতাপাদিত্যের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ঈসা খাঁ সরল ও পবিত্র অন্তঃকরণে প্রতাপাদিত্যের সহিত গলায় গলায় সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাকে বন্ধুতার চিহ্ন-স্বরূপ অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদত্ত হইল।

ঈসা খাঁর ধর্মগুরু মওলানা রেজাউল মোস্তফা বলিলেন যে, "পাপের দণ্ড

ভোগ অনিবার্য। কিন্তু পরকাল অপেক্ষা ইহকালে দণ্ড ভোগ অনেক সুখের। মহারাজ! আপনি পূর্বে যে স্বর্ণময়ীকে হরণ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, সেই পাপের ফলে আপনার এই পরাজয়, লোকক্ষয়, ধনক্ষয়, অপযশ এবং লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। পাপের শাস্তি তখন না হলে অনেকে মনে করে উহা পাপ নহে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। পাপ কঠোর শাস্তি প্রসবের জন্যই সময় গ্রহণ করে থাকে।"

অতঃপর ঈসা খাঁ অরুণাবতীর বিবাহের কথা পাড়িলেন। প্রতাপ সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে পূর্ব হতেই অরুণাবতীর বিবাহ দিবার জন্য আমার সংকল্প ছিল। আমার দুর্মতিবশতঃই তাঁর সহিত আমার বিরোধ ও শত্রুতা জন্মে ছিল, কিন্তু তিনি আজ আমাকে আসন্নমৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন। তাঁর উদারতা ও মহত্ত্বে আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁর ন্যায় মহানুভব এবং হৃদয়বান পরমোপকারী ব্যক্তির করে কন্যাদান করতে পারলে এক্ষণে আমি পরম সুখ ও গৌরব অনুভব করব। আমার অরুণাবতী-রূপ মাধবীলতা উপযুক্ত সহকারকেই আশ্রয় করেছে।" অতঃপর প্রতাপাদিত্য বিবাহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া অরুণাবতীকে সঙ্গে লইয়া যশোহরে ফিরিয়া গেলেন।

মাহতাব খাঁ ঈসা খাঁর সৈন্যদলে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকদিন পরে, গভীর দুঃখ এবং শোকের সহিত ঈসা খাঁ ও মাহতাব খাঁকে লিখিয়া জানাইলেন যে, বসন্ত রোগের আক্রমণে অরুণাবতী সহসা পরলোক গমন করিয়াছে। মাহতাব খাঁ এই দারুণ সংবাদে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। আশার জ্যোৎস্না চির আঁধারে ঢাকিয়া গেল। অরুণাবতীর যে অরুণিমাজাল তাঁহার হৃদয়ে আলোক-প্রবাহ ও আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সূচিভেদ্য অন্ধকারে পরিণত হইয়া অনন্ত বিষাদ ও অনন্ত শোকের প্রবাহ সৃষ্টি করিল। হায় প্রেম! হায় সুখ! তোমাদের আশা এমনি করিয়া মানুষের হৃদয় চিরকাল ভাঙ্গিতেছে, জ্বালাইতেছে এবং নিষ্পেষণ করিতেছে। তোমাদের দুইজনের মোহে এই বিশ্ব-সংসার মুগ্ধ হইয়া ছুটিতেছে। তাহার ফলে—নিরাশা, অবিশ্বাস, অপ্রাপ্তি; তাহার ফলে—শোক, দুঃখ, বিষাদ ও হাহাকারে বিশ্ব-সংসার পরিপূর্ণ হইতেছে। ঈসা খাঁ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। তিনি মাহতাব খাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিতে ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অন্য স্থানে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাহতাব খাঁ আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তালিকোট যুদ্ধের সূচনা

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য ছিল। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে বিজয়নগর নামক সর্বপ্রধান রাজ্যটি হিন্দু রাজ্য এবং আহমদনগর, বিদর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং চারিটি মুসলমান রাজ্য ছিল। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা বরাবর মুসলমান-রাজ্য চতুষ্টয়ের সহিত মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া দিন দিন প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা সর্বদাই মুসলমানদিগের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং এই রাজ্যের হিন্দু-রাজত্ব লোপ করিবার জন্য নিত্য-জয়শীল কোনও মুসলমান বীরপুরুষ কদাপি উদ্যোগী হন নাই। কিছুকাল পরে মুসলমান নরপাল চতুষ্টয়ের মধ্যে ভয়ানক গৃহ-বিবাদের সূচনা হইল। এই গৃহ-বিবাদের পরিণামে দাক্ষিণাত্যের সোলতানেরা পরস্পরের বল ক্ষয় করিয়া কথঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বিজাপুরের সোলতানের সহিত বিজয়নগরের রাম রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে পরিণত হয়। আহমদনগরের সোলতান রাম রায়ের পক্ষে অবলম্বন করতঃ বিজাপুরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন। বিজয়-নগর এবং আহমদনগরের সম্মিলিত বিপুল বাহিনীর বীর্য প্রতাপে বিজাপুরের সোলতান শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। এই বিজয় লাভে এবং মুসলমান সোলতানগণের অনৈক্য দর্শনে রাম রায় নিতান্ত স্পর্ধিত, অহঙ্কৃত এবং মুসলমানের সর্বনাশ সাধনে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান ও ইসলামের আধিপত্য এবং প্রভাব নাশ করিবার জন্য বিপুল সমরোদ্যোগ করিতে থাকেন। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদিগের সাহায্যে একদল সুদক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য গঠন করেন। গোপনে তোপ-কামান ও বন্দুক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিজয়নগরাধিপ যে মুসলমান ধ্বংসের জন্য এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইবেন, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সোলতানেরা কদাপি তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা তখন ঘোরতর গৃহ-বিবাদে লিপ্ত। বিজয়নগরের বিপুল সংখ্যক হিন্দু অধিবাসী, মুসলমানের চিরনির্বাসন ও সবংশে ধ্বংস কল্পনা করিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তাহাদের উন্মত্ততা পরিশেষে সংহারক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিজয়নগরের মুসলমান সংহারে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়নগরে নানাদেশীয় কয়েক সহস্র মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেন। একদা গভীর রাত্রিতে হিন্দুরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে থাকে। মুসলমানেরা

সর্বত্র উৎপীড়িত এবং কিয়দংশ নিহত হইয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গাজীর বেশে সজ্জিত হন। মুসলমান রমণীরাও তরবারি হস্তে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। মুসলমানদিগের উদ্দীপ্ত তেজে হিন্দুরা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে দুর্গ হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিতে শুরু করে। সমস্ত নগরবাসী হিন্দু ও হিন্দুসৈন্যের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমান নরনারী সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কতিপয় অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমান যুবতীকে বন্দী করিয়া কৃতঘ্ন রাম রায় তাহাদের সতীত্ব নাশে উদ্যত হন। যুবতীরা আত্মহত্যা করিয়া নরাধম পিশাচের হস্ত হইতে ধর্মরক্ষা করেন। অতঃপর মসজিদসমূহ চূর্ণ করিয়া তাহার স্তূপের উপর ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এখানে বলা আবশ্যক যে, স্বীয় রাজধানীর মুসলমানদিগকে প্রথমেই আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না। প্রথমতঃ সোলতানগণকে একে একে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে ঐসলামিক শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে ও পরে যাবতীয় মুসলমান হত্যা করাই তাঁহার অভীষ্ট ছিল। কিন্তু উন্মত্ত নাগরিক ও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদিগের উদ্দাম উত্তেজনায় প্রথমতঃ তাঁহার রাজধানীই মুসলমান-রক্তে রঞ্জিত হইল!

এই সংবাদ অত্যল্পকাল মধ্যেই মুসলমান রাজ্য চতুষ্টয়ে দাবানল শিখার ন্যায় প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ প্রথমে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে সত্যতা অবগত হইয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইলেন। অবশেষে রুদ্র মন্ত্রে জেহাদের অগ্নি-সঞ্চারিণী বাণী ঘোষিত হইল। সোলতান চতুষ্টয় মুহূর্ত মধ্যে গৃহ-বিবাহ ভুলিয়া ইসলামের সম্মান ও আপনাদের মঙ্গলার্থে ভ্রাতৃভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া রাম রায়কে সমুচিত শিক্ষা প্রদান এবং বিজয়নগরে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রোথিত-করণ মানসে পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মোল্লা মৌলবিগণ সর্বত্র অগ্নিময়ী বক্তৃতায় প্রত্যেক সক্ষম ও সুস্থ মুসলমানকে তরবারি ধারণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাম রায় তাহার পরিণাম ভাবিয়া কম্পিত হইলেও অনন্যগতি হইয়া রাজকোষ নিঃশেষিত করতঃ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমানগণ আর্যাবর্তবাসী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে পত্রযোগে পবিত্র জেহাদের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই সময়ে বিজাপুরের শাহী দরবারের আলীম দাদ খাঁ নামক একজন আমীর বাস করিতেন। ইঁহার জন্মস্থান প্রাচীন নসিরাবাদ* জেলার ইউসফশাহী পরগণার শেরমস্ত নামক পল্লীতে। ইঁহার পিতা একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। ঈসা খাঁর

* আধুনিক ময়মনসিংহ।

সহিত আলীম দাদ খাঁর বাল্যকাল হইতে বন্ধুতা ছিল। উভয়ে এক মাদ্রাসায় এক ওস্তাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে আলীম দাদ খাঁ বিজাপুরে গমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভা বলে রাজ-পারিষদের পদে সমারূঢ় হন। আলীম দাদ খাঁ স্বীয় বাল্যবন্ধু প্রবল প্রতাপশালী স্বাধীন ভুঁইয়াকুল-মণি ঈসা খাঁকে পরমানন্দে জেহাদে যোগদান করিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন ঃ

প্রিয়তম সুহৃদ!

করুণাময় বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের মহিমা নিত্য জয়যুক্ত হউক। তাঁহার অনন্ত মঙ্গলকর আশীর্বাদের পুণ্য-বারিতে আপনি অভিষিক্ত হউন। আপনার মনুষ্যত্ব এবং ইসলাম-অনুরাগ, বসন্তে কুসুম বিকাশের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবী আমোদিত করুক। আপনার বীর্য ও সাহস, বর্ষা-বারিপুষ্ট কলনাদিনী খরগামিনী তটিনীর উচ্ছ্বসিত প্রবাহের ন্যায় জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবাহিত হউক।

হে বন্ধু! মানব-জীবন বিদ্যুদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্তেই তাহার বিশ্বোজ্জ্বলকারিণী প্রতিভার তীব্র ছটায় জগৎকে উদ্ভাসিত ও চমকিত করিয়া থাকে, আপনিও তেমনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালা এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষের আশীর্বাদে আপনার কর্মোজ্জ্বল জীবন ধর্মপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করুন।

প্রাণাধিক সখে!

বিজয়নগরের বিশ্বাসঘাতক পিশাচপ্রকৃতি পাষণ্ড রাজা রাম রায় এবং হিন্দুগণ, দাক্ষিণাত্য হইতে করুণাময় আল্লাহ্‌তালার আদিষ্ট ও অভিলষিত পরম পবিত্র ইসলাম ও মুসলমানকে নেস্তনাবুদ ও বে-বুনিয়াদ করিবার জন্য ভীষণ ও ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের যাবতীয় মুসলমান নরনারী, বালকবৃদ্ধনির্বিশেষে পাষণ্ড ও ঈশ্বরদ্রোহী কাফেরদিগের হস্তে অতীব শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে। যাবতীয় মসজিদ চূর্ণীকৃত এবং অপবিত্রিত হইয়াছে। খ্রিষ্টানগণ জেরুজালেম অধিকার করিয়া মুসলমানদের প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণকর ভীষণ জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বিজয়নগরের মুসলমানের প্রতি সেইরূপ অত্যাচার হইয়াছে! কৃতঘ্ন রাম রায় ঐসলামিক সোলতানী শক্তি-তরু উৎপাটিত করিয়া ইসলাম ও মুসলমানকে নিরাশ্রয়, বিপন্ন ও ধ্বংস করিবার মানসে, বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিতেছে। আমরাও সকলে এই পাষণ্ড কাফের এবং তাহার রাজ্য দর্প, ভগ্ন ও চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। সোলতান চতুষ্টয় সমস্ত মনোমালিন্য ভুলিয়া ইসলামের দুষমনকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অনেক মুসলমান রমণী এবং শাহজাদী পর্যন্ত অস্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাবতীয় মুসলমানের হৃদয় রণোল্লাসে

পূর্ণিমার সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে জেহাদের চিত্তোন্মাদিনী গীতিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! বর্ষার প্রভাব হ্রাস হইবামাত্রই আমরা যুদ্ধে অগ্রসর হইব। আশা করি, এই পবিত্র জেহাদ উপলক্ষে আপনার বিজয়ী তরবারি কাফেরশোণিতসিঞ্চনে দাক্ষিণাত্যের ভূমি উর্বরা ও ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শনে আকাশ-মণ্ডলকে প্রভাসিত করিবে। আপনার বীরবাহু বিজয়নগরের দুর্গ-শীর্ষে ইসলামের চন্দ্রকলা-শোভী বিজয়-কেতু উড্ডয়নে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। ইতি।

ভবদীয় প্রণয়াস্পদ সখা ও ভ্রাতা—
অকিঞ্চন আলিম দাদ।

শেখ ইয়াকুব নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই পত্র ও অন্যান্য কতিপয় মূল্যবান উপহার সহ দাক্ষিণাত্য হইতে খিজিরপুরে ঈসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলীর নিকট প্রেরিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিরাশা

প্রতাপের সহিত যুদ্ধের পরে কয়েক দিনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। ঈসা খাঁ ভাদ্র মাসের শেষে অনুরাগাতিশয্যে কেদার রায়ের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বর্ণময়ীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিতে চান, এ প্রস্তাবে কেদার রায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অমাত্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কুলগুরু এবং চাঁদ রায় সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিলেন। ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহের পাকাপাকি কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই বাগ্দত্তা কন্যাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করা অপেক্ষা মহাপাতক আর কি আছে? ইহা দ্বারা কুল অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইবে। এবম্বিধ নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া চাঁদ রায় এবং কুলগুরু যশোদানন্দ ঠাকুর কেদার রায়ের অমত করিয়া ফেলিলেন। আজকাল যেমন বিধবা-বিবাহ লইয়া হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দুই প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, তখন মুসলমানকে কন্যাদান সম্বন্ধে ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতদিগের মধ্যেও সেই প্রকার দুই মত ছিল। মুসলমানকে কন্যাদানের পক্ষে একদল এবং অন্যদল ইহার বিপক্ষে। বলা বাহুল্য, পক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষেই পণ্ডিত সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

স্বর্ণময়ীর মাতা রাণী হিরন্ময়ীও সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে ঈসা খাঁর জননী আয়েশা খানম, স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কেদার রায়ের নিকট ঘটক পাঠাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত এবং ক্ষুণ্ণ হইলেন। ঈসা খাঁকে একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিলেন। স্বর্ণময়ীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ অমত, বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া সে কথাও গোপনে কেদার রায়কে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু গোপনে জানাইলেও ঈসা খাঁ অবিলম্বেই তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি আশায় নিরাশার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কেদার রায় কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় যথাকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার রায় ব্যতীত সকলেরই ঘোর আপত্তি, বিশেষতঃ পূর্বেই স্বর্ণের বিবাহের কথা ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেদার রায় সম্মতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার ঘটক আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

ঘটকের কথা শুনিয়া বীরপুরুষ ঈসা খাঁর স্ফীত বক্ষ যেন দমিয়া গেল। আলোকময় আনন্দকোলাহলপূর্ণ পৃথিবী যেন শ্মশানে পরিণত হইল। স্বর্ণময়ীর প্রেমের মোহিনী আশার কনককিরণ-রাগে তাঁহার যে চিত্ত বিচিত্র জলদ-কদম্ব-শোভিত উষার আকাশের ন্যায় শোভিত ছিল, তাহা হতাশার কৃষ্ণ-মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! বিস্তৃত রাজ্য, অখণ্ড প্রভুত্ব, প্রফুল্ল যৌবন, অগাধ ধন, যাহা এতদিন সুখ ও আনন্দের কারণ ছিল, এখন তাহা জীবনপথের কণ্টক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঈসা খাঁ ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি কুক্ষণেই আমি স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করিয়া ছিলাম! আর কি কুক্ষণেই বা স্বর্ণময়ী আমাকে আত্মডালি দিয়া পত্র লিখিয়াছিল! স্বর্ণকে আমি নির্মম দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শেষে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিব? হায়! যে সরলা যুবতী আমাকে সম্পূর্ণ প্রাণের সহিত বসন্তের নবলতিকার ন্যায় জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব? বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহার জীবন-কুসুম যে অকালে বিশুষ্ক হইবে! হায়! আমিই বা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্বর্ণকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন? বাগদত্তা কন্যাকে কেদার রায়ই বা কি করিয়া পুনরায় অন্যত্র সমর্পণ করেন? হায়! স্বর্ণ আমাতে কেন মজিল? কি বিষম সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা করা মানব-বুদ্ধির অগম্য। হায়! হৃদয় যে এক মুহূর্তের জন্যও স্বর্ণকে ভুলিতে পারিতেছে না। স্বর্ণকে পাইব না, ইহা চিন্তা করিতে—কল্পনা করিতেও হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হায়! আমার স্বর্ণ! আমাতে উৎসৃষ্টপ্রাণা স্বর্ণ,—আমাতে মুগ্ধ স্বর্ণ, আমার প্রেম-বারিদের আকাঙ্ক্ষিণী তৃষ্ণার্ত-চাতকী স্বর্ণ, সে অন্যের পাণিপীড়ন করিবে, উঃ! এ-চিন্তা কি অসহ্য! কি মর্মন্তুদ!! কি ভীষণ!! হায়! আমি যদি স্বর্ণকে না পাই, তবে প্রেমের ব্যভিচার করিয়া এ-জীবনকে আর কলঙ্কিত করিব

না। শুধু তাই কি? এ জীবন লইয়া সংসারে যে কি করিব, তাহাও তো খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি আশ্চর্য! যদি স্বর্ণকে না পাই তাহা হইলে সংসারে আমার আর কিছুই কার্য নাই—অনুরাগ নাই—প্রয়োজন নাই! কিন্তু যদি স্বর্ণকে পাই, তাহা হইলে এ-সংসারে যেন কর্তব্যের শেষ নাই—অনুরাগের সীমা নাই—কর্মের ইতি নাই—আনন্দের ইয়ত্তা নাই (হায় যৌবন! হায় রমণীর সৌন্দর্য! হায় প্রেম! তোমাদের কি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি! কি অদ্ভুত প্রয়াস!! ধন্য প্রেম! তোমার প্রভাবে মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহে, শুষ্ক তরুতে কুসুম ফোটে, অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় হয়, হেমন্তে কোকিল গায়, অন্ধ নক্ষত্র দর্শন করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে! তুমি বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে আনন্দ, নেত্রে জ্যোতি, শরীরে স্বাস্থ্য, কর্মে উৎসাহ, মস্তিষ্কে বুদ্ধি, মানসে কল্পনা। তুমি যেখানে, সেখানেই স্বর্গ! তোমার যেখানে অভাব, তাহাই নরক! তোমার প্রাপ্তিই জীবন, তোমার অভাবই মরণ!")

ঈসা খাঁ প্রেমাস্পদের প্রেম-সৌরভে চিরবঞ্চিত হইবার ক্ষোভে নিতান্ত বিমনায়মান-চিত্ত হইয়া পড়িলেন; চঞ্চল মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পূর্বের শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ঠিক এই উদ্বেগ ও মানসিক অস্থৈর্যের মধ্যে আলীম দাদ খানের জেহাদের নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া শেখ ইয়াকুব খিজিরপুরে উপস্থিত হইলেন। পত্রপাঠে ঈসা খাঁর সর্বশরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। কাপুরুষ শয়তান কাফেরের হস্তে মুসলমানের এতাদৃশ শোচনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাঠে, তেজীয়ান পাঠান বীর ক্রোধে ও ক্ষোভে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জেহাদের উন্মাদনায় তাঁহার বীরহৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। হৃদয়বান পাঠান বীরের জ্বালাময় বিস্ফারিত নেত্রযুগল হইতে নিহত নরনারী ও বালক-বালিকাদিগের জন্য সহ-মর্মিতা এবং শোকের তরল মুক্তাধারা নির্গত হইতে লাগিল। সে পুণ্য অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি ও চাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে আহ্বান করিয়া সেই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পত্র শ্রবণে সকলের চক্ষুতেই ভ্রাতৃ-শোকের এবং জাতীয় সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইল। এ জেহাদে যোগদান করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, সে-বিষয়ে সকলেই একমত প্রকাশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের একশত যুবক জেহাদের জন্য রণক্ষেত্রে যাইতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হইলেন। ঈসা খাঁ, মাহতাব খাঁকে প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্যে রাখিয়া পবিত্র জেহাদে যোগদান করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য রক্ষা এবং রাজকার্য পরিচালনার সমস্ত বন্দোবস্ত করতঃ দুই সহস্র উৎকৃষ্ট রণদক্ষ যোদ্ধা লইয়া জলপথে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। একশত স্বেচ্ছাসেবক বীর যুবকও রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ঈসা খাঁর প্রেম-পিপাসিত হৃদয়ের নিদারুণ উদ্বেগ এবং স্বর্ণময়ী লাভের ব্যাকুল ও অবিরাম

চিন্তা, জেহাদের উত্তেজনায় এবং জাতীয় সহানুভূতির উদ্দীপনায় যেন ঢাকা পড়িয়া গেল। ঈসা খাঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র কর্তব্যকে জাতীয় বৃহত্তর কর্তব্যের নিকট বলিদান করিলেন। নারী-প্রেম, জাতীয়-প্রেমের নিকট ডুবিয়া গেল। ধন্য ঈসা খাঁ! ধন্য তোমার জাতীয় প্রেম!! তুমি যথার্থ বীরপুরুষ!!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শাহ্ মহীউদ্দীন কাশ্মীরী

শরতের সুপ্রভাত। নির্মল নীলাম্বরে বিশ্বলোচন সবিতা অরুণিমাজাল বিস্তার করিয়া ধরণী-বক্ষে নবজীবনের আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়া দিয়াছে। শ্যামল তরুপত্রে বালার্কের স্বর্ণকিরণ সম্পাতে এক চিত্ত-বিনোদন দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইচ্ছামতীর কাচ-স্বচ্ছ সলিলে বাল-সূর্যের হৈমকিরণ পড়িয়া সহস্র হীরক-দীপ্তি ভাসিতেছে। মৃদু সমীরণ ফুলের গন্ধ হরণ করিয়া পুষ্প-চয়নরতা কামিনীর অঞ্চল উড়াইয়া, অলক দোলাইয়া, নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি তুলিয়া এবং পত্র-পল্লব আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক হিল্লোল মানবের প্রাণে স্বাস্থ্য-শক্তি ঢালিয়া দিতেছে। প্রকৃতির চির-গায়ক সুকণ্ঠ বিহগকুল নানা তান-লয়ে সুধাবর্ষী স্বরে মুক্ত প্রাণের মুক্ত আনন্দ কীর্তন করিতেছে। প্রেমিকা রমণীর চক্ষুর ন্যায় মনোহর নীলাকাশের প্রান্তে নানা বর্ণের মেঘমালা বহুরূপীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ শরীর ও বর্ণ পরিবর্তন করিতেছে। প্রকৃতি যেন আজি নির্মল আনন্দপূর্ণ ও হাস্যময়ী।

আজ আশ্বিনের পঁচিশ তারিখ। দুর্গা পূজার ষষ্ঠী। বাঙ্গালার পাখী-ঢাকা ছায়া-ঢাকা পল্লীর শান্ত শীতল বক্ষে আনন্দের স্রোত আজ শতধারায় প্রবাহিত। বালক-বালিকারা নানাপ্রকার রঙ্গীন বস্ত্রে বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ বা উদ্যানে মালঞ্চে, গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গণে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতেছে। গ্রামে গ্রামে জোড়-কাঠিতে ঢাক বাজিতেছে। প্রবলপ্রতাপ রাজা কেদার রায়ের বাসস্থান শ্রীপুরে আজ আড়ম্বরের সীমা নাই। আজ কেদার রায়ের বাড়ীতে মহাসমারোহ। বাড়ীর উদ্যানসংলগ্ন প্রকাণ্ড মণ্ডপ-দালানে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশটি প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপরে মন্দির সংস্থাপিত। কেদার রায়, বিজয়নগরনিবাসী এক জন ইরানী মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা এই মন্দির গঠন করিয়াছেন। ইহা প্রাচীন ধরনের ভিতরে অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র দ্বারবিশিষ্ট মন্দিরের ন্যায় নহে। মসজিদের নিদর্শনে ইহা অনেকটা উন্নত আদর্শে প্রস্তুত। থামগুলি বেশ উচ্চ এবং দ্বার ও জানালা প্রশস্ত। এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীমতী দুর্গাদেবীর সিংহ-বাহিনী দশভুজা প্রকাণ্ড মূর্তি, গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিক, সরস্বতী ও

অসুরের সহিত প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত নাট-মন্দির। নাট-মন্দির বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত। উহাতে ঝাড়, ফানুস, লণ্ঠনের সঙ্গে সুপক্ব কলার কাঁদী ও রঙ্গীন কাগজের ফুলের ঝাড়ও ঝুলিতেছে। দিল্লীর চিত্রকরদের অঙ্কিত কয়েকখানি সুন্দর পটও সোনা-রূপার কাঠাম বা ফ্রেমে শোভা পাইতেছে। দলে দলে লোক পূজা-বাড়িতে আসিতেছে ও যাইতেছে। নানা স্থান হইতে ভারেভারে ফলমূল তরিতরকারি অনবরত আসিতেছে। মন্দির দক্ষিণ-দ্বারী। মন্দিরের পূর্ব-পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড ফল-ফুলের বাগান। সেই বাগানের পূর্বে একটি ইষ্টক-মণ্ডিত পথ। সে পথের নীচেই স্বচ্ছ-সলিলা ইচ্ছামতী কল্ কল্ করিয়া দিবারাত্রি আপন মনে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

নদীর ঘাট অনেক দূর পর্যন্ত সুন্দররূপে বাঁধান। নৌকাযোগে নানা স্থান হইতে নানা দ্রব্য আসিয়া ঘাটে পৌঁছিতেছে। আর ভারীরা তাহা ক্রমাগত ভুঁইয়া-বাড়িতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঘাটে কয়েকখানি পিনীস, বজরা ও ডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে। ঘাটে রাজবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাটীর বহু স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। এলায়িত-কেশা, সিক্ত-বস্ত্রা পদ্মমুখী শ্রীমতীদের মুখে বাল তপন তাহার কিরণ মাখাইয়া সৌন্দর্যের লহরী ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোন রমণী গ্রীবা হেলাইয়া দীর্ঘ কুন্তলরাশি সাজিমাটী ও খৈল-সংযোগে পরিষ্কার করিতেছে। কোন নারী কাপড় ধুইতেছে। বালিকার দল পা নাচাইয়া জল ছিটাইয়া সাঁতার কাটিতেছে। যুবতীরা ঈষৎ ঘোমটা দিয়া আবক্ষ জলে নামিয়া শরীর মর্দন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে আড়চক্ষে সম্মুখ দিয়া নৌকায় কাহারা যাইতেছে, তাহা দেখিয়া লইতেছে। প্রবীণরা ঘাটে বসিয়া কেহ কেহ সূর্যপূজার মন্ত্র আওড়াইতেছে। কেহ কেহ পিতলের ঘটি ও কলসী মাজিয়া এমন ঝক্ঝকে করিতেছে যে, উহাতে সূর্যের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝলমল করিয়া সোনার ন্যায় জ্বলিতেছে। হায়! মানুষ নিজের মনটি যদি এমনি করিয়া মাজিত, তাহা হইলে উহাতে বিশ্ব-সূর্য পরমেশ্বরের জ্যোতিঃপাতে কি অপূর্ব শোভাই না ধারণ করিত! মানুষ নিজের ঘটি-বাটী, এমন কি জুতা জোড়াটি যেমন পরিষ্কার রাখে, মনকে তেমন রাখে না। অথচ মানুষই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।

কোন যুবতী স্নানান্তে কলসী কক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। ঘাটের দক্ষিণ-পার্শ্বে কতিপয় পুরুষও স্নান করিতেছিল। একটি প্রফুল্ল মূর্তি ব্রাহ্মণ পৈতা হাতে জড়াইয়া মন্ত্র জপ করিতেছে। তাহার পার্শ্বে ফুটন্ত গোলাপের মত একটি শিশু স্নানান্তে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে এবং এক দৃষ্টে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জপ, মন্ত্র-ভঙ্গী এবং জল ছিটান দেখিতেছে। বোধ হয়, তাহার কাছে এ-সমস্তই অর্থশূন্য অথচ কৌতুকাবহ মনে হইতেছে। সে এক এক বার মনে মনে ভাবিতেছে যে, তাহার ঠাকুরদাদা জল লইয়া এক রকম খেলা করিতেছে!

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখের গাম্ভীর্য বালকের ধারণা নষ্ট করিয়া দিতেছে। এ-সংসারে গাম্ভীর্যের প্রভাবেই অনেক হালকা জিনিস গুরু এবং গুরু জিনিসও গাম্ভীর্যের অভাবেই হালকা হইয়া পড়ে।

শ্রীপুরের ঘাটে দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীর দিনে প্রাতঃকালে যখন এই প্রকার রমণীদিগের স্নানের হাট বসিয়াছে, সেই সময়ে একখানি সবুজবর্ণ অতি সুন্দর প্রকাণ্ড বজরা, একখানি পিনীস ও একখানি বৃহদাকারের ডিঙ্গি সহ আসিয়া ঘাটে ভিড়িল।

বজরায় খুব বড় একটি ডঙ্কা ছিল। বজরা কূলে লাগিবামাত্রই একজন লোক সেই ডঙ্কা পিটিতে লাগিল। ডঙ্কার আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনেক বাড়িতেই তখন পূজার ঢাক বাজিতেছিল। ডঙ্কার আওয়াজে ঢাকের শব্দ তলাইয়া গেল। ডঙ্কার তুমুল ধ্বনি শুনিয়া ছেলের দল এবং অনেক কৌতূহলী ব্যক্তি বজরার দিকে ছুটিল।

বজরার মধ্যে একটি প্রশস্ত কক্ষে একখানি ব্যাঘ্রচর্মাসনে এক তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দিব্যকান্তি দরবেশ বসিয়া তস্‌বী জপিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, গম্ভীর অথচ ঈষৎ হাস্যময় এবং প্রশান্ত। তাঁহার চেহারার লাবণ্য, দীপ্তি এবং প্রশান্ততা দেখিলেই তিনি যে একজন প্রতিভাশালী ধর্মপ্রাণ তেজস্বীপুরুষ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। তাঁহার গাত্রে অতিশুভ্র একটি সাধারণ পিরহান, তাহার উপরে একটি সদরিয়া এবং মাথায় শ্বেতবর্ণ পাগড়ী। পরিধানে পা'জামা। এই সামান্য বস্ত্রেই তাঁহাকে বেশ মানাইয়াছে। তাপসের বয়স পঞ্চাশের উপর নহে। তাঁহার সর্বাঙ্গের গঠন সুন্দর, দোহারা। মুখে অর্ধহস্ত পরিমিত দীর্ঘ মসৃণ কৃষ্ণশ্মশ্রু শোভা পাইতেছে। গ্রীবাদেশের চতুষ্পার্শ্বে বাবরীগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুই পার্শ্বের জোল্‌ফ প্রভাত বায়ুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যেন দুইটি কালো সর্প দুইপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়া দোল খাইতেছে। যে আসিতেছে, সেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মস্তক নত করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ অগ্রসর হইতেও পারিতেছে না, পিছাইতেও পারিতেছে না। চঞ্চলমতি কলহপ্রিয় ছেলে-মেয়েরা যাহারা মুহূর্ত পূর্বে ভীষণ কোলাহলে প্রভাত-আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারাও দরবেশের সম্মুখে চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে একটু সাড়া শব্দ নাই। তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কেহ তাকাইতেও পারিতেছে না। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য বজরা সংলগ্ন ডিঙ্গীতে যাইয়া একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মুখে ব্রাহ্মণ জানিতে পারিল যে, দরবেশের নাম শাহ্ সোলতান সূফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী। তিনি কাশ্মীরের কোনও রাজপুত্র। রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল শাস্ত্রালোচনা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতঃ ধর্ম-প্রচার উপলক্ষে কিয়দ্দিন হইল নিম্ন-বঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে দরবেশের জপ শেষ হইলে তিনি বালকদিগকে অতি মধুর স্বরে বজরার নিকটে আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে নিতান্ত স্নেহের সহিত সকলের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক-বালিকারা তাঁহার মধুর আহ্বানে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। নৌকায় যথেষ্ট পরিমাণে মর্তমান-কলা ও মিঠাই ছিল। তিনি প্রত্যেক বালককে পাঁচটি করিয়া কলা ও পাঁচটি করিয়া সন্দেশ পরম স্নেহের সহিত দিতে লাগিলেন। বালকদের মধ্যে সন্দেশ লইতে প্রথমে অনেকেই ইতস্ততঃ করিলেও পরে আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিল। বালকেরা সকলেই হিন্দু। তন্মধ্যে ১৪/১৫ জন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান। শাহ্ সাহেব কদলী ও মিঠাই বন্টন করিয়া দিয়া সকলকেই খাইতে বলিলেন। তাহারা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেই বজরার দুই পার্শ্বে বসিয়া স্বচ্ছন্দে কলা ও সন্দেশ খাইতে লাগিল। সেই সময় অনেক হিন্দু পুরুষ ও রমণী দণ্ডায়মান হইয়া ভিড় করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। সকলেই যেন পুত্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া সেই মহাপুরুষের দেব-বাঞ্ছিত-মূর্তি ও বালকদের প্রতি জননী-সুলভ মমতা দর্শন করিতে লাগিল।

বালকদের মধ্যে একটি ছেলেকে রোগা দেখিয়া শাহ্ সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জ্বর হয় কি?" সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "হুঁ"। দরবেশ সাহেব মনে মনে কি পড়িয়া ফুঁ দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "তোমার আর জ্বর হবে না।" বালক বলিল, "বিকালে আমার জ্বর আসবে। এ জ্বরে কোনও চিকিৎসায় ফল করে নাই।" দরবেশ বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! বিকালে একবার এসো, তোমার জ্বর আসে কি-না দেখা যাবে। তোমাদের বাড়ী কত দূরে?" বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিকটের একখানি গ্রামের উচ্চশীর্ষ তালগাছ দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে, আমাদের বাড়ীর তালগাছ দেখা যাচ্ছে।" একটি বালককে জ্বরের জন্য ফুৎকার দিতে দেখিয়া আর একটি বালক বলিল, "আমার একটি ছোট ভাই ক'মাস থেকে পেটের অসুখে ভুগ্ছে।" দরবেশ বলিলেন, "বাড়ী হতে মাটির একটি নূতন পাত্র নিয়ে এস, আমি পানি পড়ে দিব। তোমার ছোট ভাই-এর অসুখ ভাল হয়ে যাব।" নীলাম্বরী-পরিহিতা প্রফুল্লমুখী একটি বালিকা অনেকক্ষণ দরবেশের নিকট বসিয়া তাহার মুখের দিকে এতক্ষণ পর্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতিমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কখন দরবেশ মুখ ফিরাইবেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার দরবেশ মুখ ফিরাইলে সে তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বেশ একটু ভঙ্গিমার সহিত মুখ নাড়িয়া বলিল, "আমার আঙ্গুলটা কেটে গেছে, ব্যথা করছে।" দরবেশ সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "কেমন করে হাত কেটেছে?"

বালিকা : আমার পুতুলের ছেলের বিয়ের তরকারি কুটতে কেটে গেছে।

দরবেশ : তোমার পুতুলের ছেলে আছে? তার বিয়ে হয়েছে?

বালিকা ঃ হ্যাঁ, আপনি দেখবেন?

দরবেশ সাহেব বালিকার মতলব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বিকালে নিয়ে এস, দেখব"---এই বলিয়া তিনি বালিকার আঙ্গুলে ফুৎকার দিয়া বলিলেন, "তোমার বেদনা সেরে গেছে।" বালিকা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আশ্চর্যের সহিত বলিল, "কৈ! আর তো বেদনা করে না! বা! আপনার ফুঁতে বেদনা সেরে গেল।"

তখন স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষের রম্যোদ্যান বঙ্গভূমি, আজকালকার মত রেলের কল্যাণে নদ-নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রিয় নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল না; তাই সেই বহুসংখ্যক বালক-বালিকার মধ্যে একটি মাত্র রুগ্ন বালক ছিল। বালক-বালিকারা সুফী সাহেবের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইল। যে সমস্ত বয়স্ক লোক দাঁড়াইয়াছিল, দরবেশ সাহেব তাহাদিগকে স্থানীয় নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। লোক-সংখ্যা কত, মুসলমান কত, কেদার রায় কেমন লোক, স্থানীয় আবহাওয়া কেমন, জিনিসপত্র কেমন পাওয়া যায়, লোকের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্মানুরাগ কেমন, কত সম্প্রদায়, কত জাতি, কি কি পূজা-পদ্ধতি চলিত আছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহারাও যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। কেবল কেদার রায় কেমন লোক, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সকলেই থতমত খাইয়া পরে বলিল, "ভাল লোক। অনেক লোক-লস্কর আছে; বাঙ্গালার নবাবের খাজনা দুই বৎসর হল বন্ধ করেছে।"

দরবেশ সাহেব প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারিলেন, স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। মৎস্য ও তরিতরকারি অপর্যাপ্ত। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। সাধারণতঃ লোক সকল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কেদার রায় ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায় সামান্য একটু বাঙ্গালা ও ফারসী জানেন। কেদার রায় অপেক্ষা চাঁদ রায় কম নিষ্ঠুর ও উদার প্রকৃতি। কেদার রায় গণ্ডমূর্খ, হঠকারী এবং কূপমণ্ডূকবৎ সংকীর্ণ-জ্ঞান বলিয়া নিজেকে সত্য সত্যই প্রতাপশালী, বিশেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা বলিয়াই মনে করেন। বাঙ্গালার নবাব দায়ূদ খাঁর পতনে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি খাজনা বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে রাজছত্র ধারণ ও মুদ্রাঙ্কনে এখনও সাহসী হন নাই।

কেদার রায় ঈসা খাঁকে সম্মুখে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও হাত-জোড় করিয়া বাধ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধির পথে কন্টক স্বরূপ বিবেচনা করেন। ঈসা খাঁ ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতা উপকার ব্যতীত কেদার রায়ের কখনও অপকার করেন নাই। বলিতে গেলে ঈসা খাঁর বন্ধুভাবই তাঁহার রাজ্যরক্ষার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে। ঈসা খাঁ কেদার রায়ের হিতৈষী না হইলে, ভুলুয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত ফজল গাজীর তরবারি ও কামানের মুখে কোন দিন

শ্রীপুর শ্রীশূন্য হইয়া যাইত। ঈসা খাঁর আনুকূল্যেই কেদার রায় অন্যান্য জমিদারের বহু এলাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দ্বি-প্রহরের প্রারম্ভে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, হজরত মহীউদ্দীন সাহেবের ভৃত্য, খাদেম ও শিষ্যগণ আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। শাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার অনুচর আট জন, বাবুর্চি একজন, খাদেম পাঁচজন এবং মাঝি-মাল্লা কুড়িজন, মোট চৌত্রিশ জন লোক ছিল। তিনি নিজের সম্পত্তি হইতে এই সমস্ত লোকের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কাহারও নিকট হইতে অর্থাদি কিছু লইতেন না। তবে খাদ্যদ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিলে, তিনি গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রায় বারমাসই রোজা রাখিতেন। রাত্রিতে সামান্য কিছু দুগ্ধ, রুটী ও ফল-মূল ভক্ষণ করিতেন। মৎস্য, মাংস স্পর্শও করিতেন না। সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও ধ্যান-ধারণায় রত থাকিতেন। ফজরের নামাজের পরে কোরান শরীফের এক-তৃতীয়াংশ আবৃত্তি করিতেন। তৎপর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সমাগত লোকদিগকে উপদেশ ও রোগীদিগকে পানি পড়িয়া দিতেন। তাঁহার পানি পড়ায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইতেছিল। তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই কবিরাজ ও হাকিমগণের অন্ন মারা যাইত। তাঁহার পানিপড়ার অদ্ভুত শক্তি দর্শনে লোকে আর কবিরাজ বা হাকিমের কাছে ঘেঁষিত না। দুই দিনের রাস্তা হইতে লোক আসিয়া পানি পড়াইয়া লইয়া যাইত, তিনি মধ্যাহ্নে জোহরের নামাজ পড়িয়া আসরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইতেন। তাঁহার নিদ্রার এই এক আশ্চর্যত্ব ছিল যে, আসরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই তিনি জাগ্রত হইতেন। বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। আসরের নামাজ অন্তে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন দিন তিনি আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত ও গজলের চর্চা করিতেন। কোন কোন দিন গ্রন্থ রচনা করিতেন। তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা মাঠে বা নদীর ধারে ভ্রমণ করিতেন এবং সান্ধ্যোপাসনা মুক্ত আকাশের নীচেই প্রায় সম্পন্ন করিতেন। মগরেব বাদ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সমাগত লোকজনদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার স্বর অতীব মিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং গম্ভীর ছিল। উপদেশে শ্রোতৃবর্গ তন্ময়চিত্ত হইয়া পড়িত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লোকজনের ভিড় কমিত না। মসলা-মসায়েল, ফতোয়া-ফারাজ এবং অধ্যাত্ম-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাকে শত শত লোকের প্রশ্নোত্তর দিতে হইত। তাহাতে তিনি বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মওলানা, মুনশী, খোন্দকার ও মুফতিগণ তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতেন। সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লোকারণ্যের হলহলায় দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইত। তিনি যেস্থানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দস্তুরমত হাট-বাজার ও থাকিবার চটী বসিয়া যাইত। রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকজন বিদায় হইলে তিনি নৈশ-উপাসনা সমাপ্ত করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। ফজরের সময় এই ধ্যান ভঙ্গ হইত। ধ্যানের সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ

হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নির্গত হইত।

ফলতঃ শাহ্ মইউদ্দীন একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্ব-প্রেমিক দরবেশ ছিলেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী ও সংস্কৃত এই চারটি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সমগ্র কোরান, হাদিস, মস্‌নবী ও হাফেজ তাঁহার মুখস্থ ছিল। ইহা ছাড়া সংস্কৃত উপনিষদ, ষড়দর্শন ও গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞানের অগাধ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেছেন। ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্য এই চারি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা অভিব্যক্ত হইত। তাঁহার বজরাখানি আড়াই হাজারেরও উপর গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বশোষিকা-জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞান-চর্চার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং নিজে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াও রাজ-সিংহাসন কনিষ্ঠকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ মুসলমানের ন্যায় জ্ঞানপিপাসু, উদারপ্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বহিতৈষী পুরুষ ছিলেন।

নয় মাস কাল তিনি বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তিনি ৩৫ হাজার হিন্দুকে নানাপ্রকারের ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবের কল্পিত বিশ্বাসের মসীমলিন অন্ধকার হইতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ আল্লাহ্‌তালার উপাসনা অর্চনায় দীক্ষা দিয়া মুসলমান সমাজভুক্ত করিয়াছেন! তাহাদের টিকি কাটাইয়া, তিলক মুছাইয়া, গলার রসি খোলাইয়া, সভ্য-পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরা যে মুসলমান ছিলেন, ইহা তিনি বেদ ও উপনিষদ্ হইতে প্রমাণ করিয়া হিন্দু পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। প্রাচীন আর্যজাতি যে সর্বাংশে মুসলমানদিগেরই ন্যায় একেশ্বরবাদী ও একজাতিভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা যে সাকার ও জড়োপাসনার বিরোধী, এমন কি তাঁহারা যে মুসলমানদিগেরই ন্যায় পরম উপাদেয় জ্ঞানে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন* এবং মৃতদেহগুলিকে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে চিতায় দগ্ধ না করিয়া পরম যত্নে গোর দিতেন, তাহা তিনি বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণ হইতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতেন। বিধবা-বিবাহের বহু ঘটনা ও শাস্ত্রীয় বাক্য প্রদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া দিতেন। আধুনিক হিন্দুগণ যে আদিম অসভ্য অনার্যজাতির সংস্রবে মৃৎ-প্রস্তর উপাসক এবং ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থমূলক কূট ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া শতধাবিচ্ছিন্ন, কুসংস্কার-সম্পন্ন এবং ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি এমন ভাবে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিতেন যে, স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণেরাও অশ্রুপাত করিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি দেব-দেবী যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় কবি-কল্পিত তাহা ব্রাহ্মণগণও

---

* *মূল রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, ভাবপ্রকাশ দেখ। অতিথি আসিলে গো-মাংস দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় অতিথির এক নাম 'গোঘ্ন'।*

শেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্রবণে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাতপা শাহ্ মহীউদ্দীন পাঁচ লক্ষ মুসলমানকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। শেরেক, বেদাত প্রভৃতি কুসংস্কার যাহা হিন্দু সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা সমূলে উৎপাটিত করেন।

তিনি দেশের নানা স্থানে বহু ইন্দারা ও দীর্ঘিকা খনন করেন। শুধু তাহাই নহে, গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ, মস্‌জিদ, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর সৎকার্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভায় সমাগত হিন্দু-মুসলমানকে প্রাগুক্ত সৎকার্যসমূহের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথায় আনন্দের সহিত অর্থ দান করিত। এইরূপে নয় মাসে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই টাকার সমস্তই পূর্বোক্ত সদনুষ্ঠানসমূহে ব্যয় করিয়াছিলেন। মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় স্বহস্তে তিনি ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইঁদারা ও পুষ্করিণী খননে দশ কোদাল করিয়া মাটি অগ্রে নিজে উঠাইতেন। রাস্তা নির্মাণেও সর্বাগ্রে নিজে মাটি কাটিয়া দিতেন। তাঁহার এই প্রকার প্রবল লোকহিতৈষণায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হিন্দুরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

তিনি প্রত্যহ অপর্যাপ্ত পরিমাণে যে সমস্ত ফল, মূল, ছাল, ডাল, তরিতরকারি, মৎস্য, খাসী, মোরগ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও বস্ত্র উপহার পাইতেন, তাহা দীন-দুঃখী অনাথদিগকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বিতরণ করিতেন, এবং কোন স্থান হইতে যাইবার পূর্বদিন মহাসমারোহপূর্বক সকলকে ভোজ দিতেন। ফলত, গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গের সমতলভূমিতে সহস্র শাখা বিস্তারপূর্বক সহস্র জল-প্রবাহে জমী উর্বরা করিয়া, মাঠে মাঠে সোনা ফলাইয়া, তৃষ্ণার জ্বালা দূরীভূত করিয়া, দেশের জঞ্জালজাল ভাসাইয়া লইয়া, পণ্য-পূর্ণ তরণী বহিয়া, বায়ুকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করিয়া, সমস্ত দেশে স্বাস্থ্য শান্তি ও আনন্দ ছড়াইয়া কল্ কল্ নাদে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, মহাত্মা শাহ্ মহীউদ্দীন সাহেবও তেমনি প্রেম-পুণ্য-সত্যের আলোক-উজ্জ্বল উদার হৃদয় ও বিশ্বহিত-কামনায় সৌরভ-পূর্ণ মন লইয়া কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার তরুচ্ছায়া-শীতল গ্রাম ও নগরে নবজীবন, নবআনন্দ ও নবপুলকের স্রোত গৃহে গৃহে প্রবাহিত করিতেছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তালিকোটের যুদ্ধ

বসন্তে শরতের প্রারম্ভে দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কৃত এবং ধরাতল সুগম হইলে, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমর-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তালিকোটের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয় বাহিনী পরস্পর বিজিগীষু হইয়া সম্মুখীন হইল। আহমদ নগর, বিদর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সোলতানদিগের সৈন্যের সহিত নানাস্থান হইতে স্বজাতীয় হিতাভিলাষী ইস্‌লামের গৌরবাকাঙ্ক্ষী যুবক যোদ্ধৃগণ আসিয়া যোগদান করিলেন। বীরকুলচূড়ামণি সোলতান হোসেন নিজাম শাহ্‌ দেওয়ান মুসলিমবাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা রাম রায় স্বকীয় সেনাদল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই ভীষণ সমরোদ্যমে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পর আক্রমণোদ্যত হইয়া অবস্থান করিবার পরে, একদা প্রত্যুষে একদল হিন্দুসৈন্য মুস্‌লিম বাহিনীর এক অংশ আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের ফলে সেইদিন উভয় পক্ষে ভীষণ সমর-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। মুসলমান সৈন্য জেহাদের নামে এবং হিন্দু সৈন্য রাজ্য-রক্ষা-কল্পে মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়, হস্তী এবং বীরপুরুষদিগের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। তরবারির চাঞ্চল্যে, বর্শার দীপ্তিতে অসংখ্য বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে লাগিল! তোপের গর্জনে চতুর্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যগণ অসাধারণ রণ-কৌশল প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিবসের ভীষণ যুদ্ধেও কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণয় হইল না।

এইরূপ ক্রমাগত তিন দিবস ভীষণভাবে সমর চলিল। চতুর্থ দিবস মোসলেম-বাহিনী বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। গাজিগণ "আল্লাহ্‌ আক্‌বর" রবে মুহুর্মুহুঃ আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ বিক্রমে শত্রু-সৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

বৈশাখ-বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের ন্যায়, রণক্ষেত্রে ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সহস্র সহস্র হিন্দু সৈন্য আহত ও নিহত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ কালে মুসলমানের বীর্যপ্রতাপ রোধে অসমর্থ হইয়া হিন্দুসৈন্য পশ্চাতে হটিতে লাগিল। তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া একটি উচ্চাবচ ভূমিতে যাইয়া স্থির হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে বিজয়নগরের সৈন্যদল সে-স্থান হইতেও বিতাড়িত হইল। পর দিবস বিজয়নগর হইতে বহু সংখ্যক নূতন তোপের আমদানি হওয়ায়

হিন্দুসেনা সাহসী হইয়া তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পর্তুগীজ গোলন্দাজগণ অবিশ্রান্ত গোলা নিক্ষেপে মুসলমান পক্ষের বহু ক্ষতি সাধন করিল। হোসেন নিজাম শাহ্ ক্রোধে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া একদল যোদ্ধাকে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তোপের উপর পড়িয়া, তোপ কাড়িয়া লইতে বলিলেন। বঙ্গীয় পাঠান-বীর ঈসা খাঁ তোপের উপর পড়িবার জন্য ৫০ জন আত্মোৎসর্গকারী বীরপুরুষকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার অধীনস্থ দুই সহস্র যোদ্ধার প্রত্যেকেই শহীদ হইবার জন্য লালায়িত হইয়া তোপ কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হইলেন। ঈসা খাঁ তাঁহাদের রণোন্মত্ততা দর্শনে অতিমাত্র উৎসাহিত হইলেন এবং সকলকে নিরস্ত করিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্য হইতে বিনা বিচারে পঞ্চাশজনকে গ্রহণপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে তোপ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। বাজ পক্ষী যত দ্রুত চটকের উপর বা নেক্‌ড়ে বাঘ যত সত্বর মেষপালের উপর উৎপতিত হয়, ঈসা খাঁ বাঙ্গালী যোদ্ধৃগণকে লইয়া তদপেক্ষা তীব্র বেগে, ভীষণ ঝটিকাবর্তের ন্যায় মুক্ত কৃপাণ করে "আল্লাহু আক্‌বর" রবে গোলন্দাজ সেনার উপরে পতিত হইলেন! গোলার আঘাতে ৪৩ জন সৈনিক এবং পঁয়ত্রিশটি অশ্বদেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সাতজন মাত্র বীর করাল কৃপাণ করে তোপখানার উপর পতিত হইয়া তরবারির ক্ষিপ্র প্রহারে তোপ-পরিচালক গোলন্দাজগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তোপখানা রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে সৈন্যদল আসিয়া ভীষণ বিক্রমে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সপ্তজন মুসলমান গাজী রুদ্ধশ্বাসে চরম বিক্রমে তরবারি চালাইতে লাগিলেন। দুইজন বিশেষ আহত এবং অবশিষ্ট পাঁচজন শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যের ভীষণ আক্রমণরূপ নদীর প্রবাহকে গুরুতর বাধা প্রদান করিলেন। ওদিকে মুস্‌লিম বাহিনীর অগ্রগামী দলের সৈন্যগণ আসিয়া পড়ায় হিন্দু সেনা তোপখানা পরিত্যাগ করিয়া বৃকতাড়িত শৃগালের ন্যায় পশ্চাদগামী হইল। মুসলমান সেনা তখন তোপের মুখ ফিরাইয়া হিন্দু সেনাকে লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিল। চতুর্দিক বজ্রনির্ঘোষ-নিনাদিত বনভূমির ন্যায় ভীতিসঙ্কুল হইয়া উঠিল। তোপের গোলার অভাব হওয়ায় সোলতান নিজাম শাহ্ রাশি রাশি পয়সা পুরিয়া তোপ দাগিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে গোলা অপেক্ষা অধিকতর সুফল ফলিল। পয়সাগুলি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বহুসংখ্যক হিন্দু সেনা আহত এবং নিহত হইল। তাহার ফলে অবশিষ্ট সৈন্য-ব্যূহ ভগ্ন করিয়া নগরাভিমুখে পলায়নপর হইল। মোসলেম সেনা পলায়নপর হিন্দু সেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। হিন্দু সেনা নগরে প্রবেশ করিয়া নগরদ্বার রুদ্ধ করিল এবং নগর পরিবেষ্টন করিয়া যে পরিখা ছিল, তাহার সেতু তুলিয়া ফেলিল।

বিজয়নগরের চতুর্দিক সমুচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর এবং দুই শত হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ও বিশ হস্ত গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পরিখার গর্ভে নানাবিধ তীক্ষ্ণাগ্র শেল, শূল ও লৌহদণ্ড প্রোথিত ছিল এবং প্রাচীরোপরি প্রস্তর নিক্ষেপের উপযোগী বহুসংখ্যক যন্ত্র ও তোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল। মুসলমান সৈন্য, নগরের সিংহদ্বারের নিকটবর্তী হইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য একস্থান লক্ষ্য করিয়া অনবরত তোপ দাগিতে লাগিল। বিজয়নগরের পক্ষে পর্তুগীজ গোলন্দাজগণও যথাযথ তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

পরিখা অতিক্রম করিতে না পারিলে নগর আক্রমণের বিশেষ সুবিধা নাই দেখিয়া নিজাম শাহ্ পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কৌশল ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক নৌকা নির্মাণপূর্বক পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোনই সুফল ফলিল না। অবশেষে বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও প্রস্তর নিক্ষেপপূর্বক সেতু নির্মাণের পরামর্শ স্থির হইল। তোপের আশ্রয়ে ঈসা খাঁ একদল ধর্মযোদ্ধা লইয়া সেতু রচনা করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের গোলা ও প্রস্তর নিক্ষেপে দলে দলে বীরপুরুষ হত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সে-দিকে আজ কাহারও দৃক্‌পাত নাই! অসংখ্য শবদেহে পরিখার গর্ভদেশের কিয়দংশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরিখার জল রক্তস্রোতে আরক্ত হইয়া উঠিল। বহু সাধনা এবং বহু প্রাণদানে সেতুর কতক অংশ নির্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রাচীরের উপরিস্থ তোপখানা হইতে অজস্রধারে অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলা ও প্রস্তর বর্ষণ হওয়ায় অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ঈসা খাঁ এই প্রতিবন্ধকতায় আরও উত্তেজিত হইয়া ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। বিংশতি হস্তপরিমিত স্থান সেতু নির্মাণ হইতে অবশিষ্ট ছিল। ঈসা খাঁ জলদগম্ভীর স্বরে সৈন্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কে আছ আজ ধর্মপ্রাণ খোদাভক্ত সাচ্চা মুসলমান! এখনি এই সেতু হইতে আমার পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়। সাঁতার কাটিয়া এই অংশ অতিক্রম করিয়া দ্বারের মূলদেশে যেয়ে দ্বার ভাঙ্গবার চেষ্টা কর।"—এই কথা বলিয়া পাঠান-বীর উন্মত্তের ন্যায় পরিখার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সঙ্গে সহস্র সহস্র যোদ্ধা পরিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া আঁকশির সাহায্যে তীরে উঠিয়া দ্বারদেশ আক্রমণ করিলেন। সহস্রাধিক মুসলমান পরিখার জলগর্ভস্থ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রে এবং কামানের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঈসা খাঁ পরিখা অতিক্রমকালে বাহুতে একটা তীক্ষ্ণাগ্র বিষাক্ত শূলের সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রণোন্মত্ত অবস্থায় তিনি তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। ভীষণ বিস্ফোরক প্রয়োগে সিংহদ্বার চূরমার হইয়া গেল। তখন শাণিত কৃপাণ হস্তে 'দীন্ দীন্' রবে মুসলমান বীরগণ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সমর-কাণ্ড অতি প্রচণ্ড এবং

লোমহর্ষণ-জনকভাবে চলিল! নাগরিক সৈন্যবৃন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে আপনাদের বিক্রম নিঃশেষে একবার ভীষণ যুদ্ধোৎসাহ দেখাইল। কিন্তু উদ্বেলিত সাগর-প্রবাহের ন্যায় মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ-গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? অসংখ্য পৌত্তলিক যোদ্ধার ছিন্নমস্তকে রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। মহাবীর সোলতান নিজাম শাহ্ বিশ্বাসঘাতক রাম রায়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে মৃতদেহপুঞ্জের মধ্যে আত্মলুক্কায়িত ভাবে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। তাঁহার এই আত্মগোপনের ভাবে সকলেই হাস্য ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল সমস্ত হিন্দু সৈন্যগণ রাম রায়কে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল। ঘৃণা ও লজ্জায় কাপুরুষ রাম রাজা সহসা মর্মে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

নগরবাসিগণ নিজাম শাহের আনুগম্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া পনের লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিলেন। নিজাম শাহ্ দুর্গশীর্ষ হইতে ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ স্বকীয় ঐসলামিক পতাকা প্রোথিত করিলেন। মোসলেম বীরগণ "আল্লাহু আকবর" রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এইরূপ তালিকোট যুদ্ধে বিজয় লাভান্তে বিজয়নগর অধিকৃত হইল। রাম রায়ের অদূরদর্শিতা এবং ঔদ্ধত্যের ফলে বিজয়নগর হিন্দু-শাসনের তামসী ছায়া হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ঐসলামিক সুশাসনের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল!

বিজয়নগরের বিজয় লাভের পরে মহাবীর ঈসা খাঁ দাক্ষিণাত্যের সোলতান ও প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইলেন। তিনি যে বাহুতে বিষাক্ত শূলের আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহারও চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কুলগুরু যশোদানন্দের ইসলামে দীক্ষা

শাহ্ সোলতান সুফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী শ্রীপুরে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরেই তাঁহার যশঃ-সৌরভে শ্রীপুর পূর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহার পবিত্র কর-স্পর্শে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে ধনী দরিদ্র বহু মুসলমান আসিয়া তাঁহার উপদেশ-রসামৃত পান করিয়া পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল। অনেক হিন্দুও তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বক্তৃতা এবং কোরানের ব্যাখ্যা শ্রবণে ইসলামের পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়া আপনাদের জীবন পবিত্র করিল। ফলতঃ, শ্রীপুরের রাজবাটীতে দুর্গোৎসব এবং শ্রীপুরের ঘাটে সুফী সাহেবের নিকট লোক-সমাগম ও দীক্ষার উৎসবে শ্রীপুর অহোরাত্র জন-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। হিন্দু-ধর্মত্যাগী নব মুসলমানদের জন্য হিন্দু

সমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল।

পূজার উৎসব শেষ হইলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। শ্রীপুরেশ্বরের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুরকে মুখপাত্র করিয়া সেই সভাস্থলে সুফী সাহেবকে আহ্বান করা হইল। সুফী সাহেবও বহু আলেম, ফাজেল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন। এই মহাসভার বিচার, বিতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে বিপুল জনতা আসিয়া সভাক্ষেত্রে সমবেত হইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে সহস্রাধিক যোদ্ধা মুক্ত তরবারি করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত হইল। যথাসময়ে রাজা কেদার রায়ের আদেশে সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুর বেদের প্রশংসা কীর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম এবং সুফী সাহেবের অযথা কুৎসা কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং গৌরবের কথা কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া কেবল ইসলাম ধর্মের আক্রোশপূর্ণ কুৎসা কীর্তন করায় সমবেত হিন্দু-মুসলমান ভদ্রমণ্ডলী সকলেই দুঃখিত হইলেন। মুসলমানগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সুফী সাহেব সকলকেই ধৈর্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আসরের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে পণ্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুর বিদ্বেষ-হলাহল উদগীরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সুফী সাহেবও সমবেত মুসলমানগণও লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইলে সুফী সাহেব উচ্চৈঃস্বরে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্" এই কলেমা সমস্ত মুসলমানকে লইয়া প্রমত্ত অবস্থায় পাঠ করিতে লাগিলেন। কলেমার ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। কলেমা পাঠ করিতে করিতে সুফী সাহেব উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইল। তাঁহার প্রভাব এবং প্রতাপে সভাস্থল যেন প্রদীপ্ত এবং কম্পিত হইয়া উঠিল! তৎপর তিনি সভা মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিত যশোদানন্দের দিকে তর্জনী তুলিয়া তিনবার গুরুগম্ভীর মেঘমন্দ্রে বলিলেন, "হে যশোদানন্দ! তুমি সত্য গ্রহণ কর।"

শাহ্ সাহেব এইরূপ বলিবার পরে যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইল, তাহাতে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর যশোদানন্দ বেগে সভামধ্যে উত্থিত হইয়া গম্ভীর রবে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্" এই কলেমা অনবরত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞসূত্র আকর্ষণ করতঃ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন! অতঃপর পণ্ডিতবর যশোদানন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে শাহ্ সুফী মহীউদ্দীন সাহেবের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণ আনন্দে "আল্লাহু আকবর" রবে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

যশোদানন্দ কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হজরত, আমাকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। ধর্মের আগুন আমার প্রাণের ভিতরে জ্বলে উঠেছে: আমার

পাপ অন্তঃকরণ দগ্ধ হচ্ছে। আমি আর কাঠ পাথরের পূজা করব না।" এই বলিয়া ঠাকুর দীক্ষিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ ও আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সূফী সাহেব তখন তাহাকে ক্ষৌর কার্য ও স্নান সম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই পণ্ডিত যশোদানন্দ মস্তকের টিকি কাটিয়া নখ ও কেশাদি সংস্কার-পূর্বক স্নান করিয়া, সভ্যজনোচিত আচকান পায়জামা ও টুপী পরিয়া দিব্যমূর্তিতে সূফী সাহেবের চরণপ্রান্তে স্থান গ্রহণ করিলেন। সূফী সাহেব তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বিশ্বাসের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহার নাম জহিরুল হক রাখিলেন। মুসলমানগণ পুনরায় আনন্দোচ্ছ্বাসে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজকুলগুরু সর্বজনমান্য মহাপণ্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুরের ইসলাম গ্রহণে হিন্দুগণ হাহাকার করিতে লাগিল! রাজা কেদার রায় দুঃখে এবং লজ্জায় সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্নমনে প্রাসাদে ফিরিলেন।

পণ্ডিত যশোদানন্দ ইসলাম গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরে, একদিন রাজা কেদার রায় তাঁহাকে পূর্ববৎ সমাদরে রাজ-দরবারে আহ্বান করিলেন। নবীন মুসলমান জহিরুল হক দুই চারিজন মুসলমান বন্ধুসহ রাজ-দরবারে আগমন করিলেন। রাজা সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃতঘ্নতাপূর্বক সহসা বন্দী করতঃ দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ জহিরুল হকের প্রতি বিষম অত্যাচার করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াফ্‌ত হইল।

জহিরুল হকের নিদারুণ লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনে কারাগৃহের পাষাণ-প্রাচীর এবং কক্ষতল অশ্রুজলে বিধৌত এবং আর্তনাদে শব্দায়মান হইতে লাগিল! দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অতি নিভৃত কারাগারের সংবাদ বাহিরে কেহ অবগত না হইলেও, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদিগের কাহারও জানিতে বাকী থাকিল না। যশোদানন্দের নির্যাতন এবং লাঞ্ছনায় সকলেই আনন্দিত হইল। অনেকের নিকট তাহা বৈঠকী গল্প, হাসি-ঠাট্টা এবং বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত হইল। কেবল করুণাময়ী স্বর্ণময়ীর কোমল প্রাণ যশোদানন্দের দুঃখে ব্যথিত হইল। স্বর্ণময়ী মধ্যে মধ্যে কারাগারের সম্মুখস্থ উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া লৌহ-দ্বারের গরাদের ভিতর দিয়া যশোদানন্দকে দেখিয়া আসিত। উদ্যানে কোন ফল পাইলে তাহাও প্রহরীকে বলিয়া গোপনে কুলগুরুকে দিয়া আসিত। যশোদানন্দ কারাগারের অসীম দুঃখ এবং নির্যাতনের মধ্যেও করুণাময় পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা এবং অর্চনা-আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়কে স্থির ধীর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা এবং গভীর ধর্মভাব দেখিয়া প্রহরীদিগের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল। হিন্দু থাকিতে

যশোদানন্দকে তাহারা যেরূপ শ্রদ্ধা করিত, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও বেশী শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা যশোদানন্দের উপদেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিও গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর স্বর্ণ তাহাদের সহানুভূতি এবং সাহায্যে জহিরুল হকের খাদ্যের অসুবিধা দূর করিল। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্যজাত সরবরাহ করিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী জহিরুল হকের উদ্ধারের জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সহসা কোন নিরাপদ্ পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিল না। স্বর্ণ নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াও জহিরুল হক্‌কে মুক্ত করিবার জন্য প্রহরীকে অর্থলোভে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জহিরুল হক কিছুতেই সেরূপ ভাবে অন্যের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিতে রাজি হইলেন না।

অতঃপর স্বর্ণ সহসা একদিবস শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। কোনও রূপেই সে শিরোবেদনার লাঘব হইল না, বরং শিরঃপীড়ার সহিত নানা উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া স্বর্ণকে যারপর-নাই ব্যতিত করিয়া তুলিল। কবিরাজ এবং হাকিমগণ স্বর্ণের এই আকস্মিক ব্যাধির কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বর্ণ একদিন শেষরাত্রিতে গভীর চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে শয্যায় উঠিয়া বসিল। স্বর্ণের জননী এবং পিতা সে-চীৎকারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, স্বর্ণ বলিল, "উপাস্য কালিকাদেবী এসে রোষ-কষায়িতনেত্রে গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন যে, 'তুই যদি বাঁচতে চাস, তা হলে তোর পিতাকে বলে কুলগুরুকে শীঘ্র মুক্ত করে দে। নতুবা এই অগ্নিময় মুখে তোকে গ্রাস করব।' এই বলে মুখব্যাদান করলেন, অমনি তাঁর মুখ হতে ভীষণ অগ্নিশিখা বহির্গত হতে লাগল! ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম।"

স্বর্ণময়ীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কেদার রায় তাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পরদিন প্রত্যুষেই জহিরুল হক্‌কে কারামুক্ত করে দিলেন। জহিরুল হক স্বর্ণের উপস্থিত-বুদ্ধি এবং অসাধারণ সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে পরমেশ্বরের সমীপে তাঁহার অজস্র মঙ্গল কামনা করিলেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন দ্বিপ্রহর হইতে স্বর্ণময়ীর শিরঃপীড়া আরোগ্য হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

উৎকণ্ঠা

ঈসা খাঁ দাক্ষিণাত্যে জেহাদের জন্য গমন করিবার পরে স্বর্ণময়ী দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পিতার অসম্মতি প্রকাশে এবং ঈসা খাঁর জেহাদ গমনে তাহার চিত্ত বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হায়! সে যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদয়-মন

সমর্পণ করিয়া প্রেমদেবতা রূপে বরণ করিয়া অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে প্রীতির সিংহাসনে বসাইয়াছে—যাঁহার রাতুল চরণে আপনার সর্বস্ব বিকাইয়া বসিয়াছে—নেত্রে যাঁহার পরমরূপ সর্বদা দীপ্তি পাইতেছে—কর্ণে যাঁহার প্রীতিমাখা মধুরবাণী সর্বদা পীযূষধারা বর্ষণ করিতেছে—হৃদয়ের প্রতি অণু-পরমাণু যাঁহার প্রেমসুধায় আকৃষ্ট এবং বিহ্বল, তাহার সেই সুখদ বসন্তের প্রাণ-জুড়ান, মন-মাতান মলয় সমীরণ, তাহার হৃদয়-আকাশের সেই শরচ্চন্দ্র, তাহার জীবন-মরুর সেই বর্ষণশীল-বারিদখণ্ড, তাহার আতপদগ্ধ পথের সেই সুশীতল বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্তজীবনের সেই অমৃতনির্ঝরিণী, জীবন-তরণীর সেই ধ্রুবতারা, মানসকুঞ্জের সেই বসরাই গোলাপ, তাহার পিতার অসম্মতিতে এবং স্বীয় জননীর অমতে তাহাকে আদর করিয়া চরণতলে স্থান দিতে কি সমর্থ হইবেন? তাহাকে কি তিনি স্মরণ করিতেছেন? তিনি কি তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন? যদি না হন, কিংবা হায়! যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কি হইবে? হায়! আমি যাঁহার পদে জীবন-যৌবন ডালি দিয়া বসিয়াছি, তাঁহাকে আমি পাইব না! তাঁহার চরণে আমাকে সমর্পণ করা হইবে না। কিন্তু যাহাকে আমি জানি না—চিনি না—চাহি না, আমাকে নাকি তাহার হস্তেই দেওয়া হইবে। বিধাতঃ! ইহাই যদি ধর্ম হয়, তবে আর অধর্ম কাহাকে বলে? ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহের কথা নাকি পাকাপাকি হইয়াছে, অথচ আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত অবগত নহি, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি হইতে পারে? হায়! হিন্দুজাতির বিচারে কি স্ত্রীলোকের আত্মা নাই!—বিচার নাই! নিজের সুখ-দুঃখ বোধ নাই! স্ত্রীলোক কি জড় পদার্থ কিংবা খেলার দ্রব্য, যে তাহার রুচি, অনুরাগ, ইচ্ছা এ-সমস্ত সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা হয় না—জিজ্ঞাসা করা হয় না! হা বিধাতঃ! এমন জাতিতে স্ত্রীলোক কেন জন্মে? যদি জন্মে তবে বাল্যেই মরে না কেন? যদি না মরে, তবে তাহার রুচি, অনুরাগ, বিচারশক্তি হরণ করা হয় না কেন?

থাক সে সব। এক্ষণে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব? হায়! কি কুক্ষণেই ঈসা খাঁর সেই চাঁদ বদন দর্শন করিয়াছিলাম। হায়! কিছুতেই যে সে মুখের শোভা, সে বিস্ফারিত আঁখির মধুময়ী দৃষ্টি, সে কণ্ঠের অমৃত-নিস্যন্দিনী-বাণী ভুলিতে পারি না। সে-হৃদয় যেন অফুরন্ত প্রেমপারাবার, তাহাতে ডুবিলে যেন সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তাহাকে পাইলে আর কিছুই পাইতে বাকী থাকে না। তাঁহার কথা স্মরণে কত আনন্দ, কত উল্লাস। সে নাম স্মরণেও হৃদয়ের পরতে পরতে সুধা সঞ্চিত হয়! হায়! তেমন সুন্দর, তেমন প্রিয়, আনন্দকর আর কে? এইরূপ দুশ্চিন্তায় রায়-নন্দিনী দিন যাপন করিতে লাগিল।

আশ্বিন মাস যাইয়া কার্তিক মাস যায়। স্বর্ণময়ীর বিবাহের জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসের ২৭শে তারিখে বিবাহ। রাজবাড়ীর দাস-দাসী,

ভৃত্য, কর্মচারী, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখেই আনন্দ। সকলের মুখেই বিবাহের কথা। যতই বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, স্বর্ণ ততই নিদাঘ-তাপ-দগ্ধ গোলাপের ন্যায়, শুষ্ক এবং কর্দমে পতিত কমলের ন্যায় মলিন হইতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে, এ বিবাহ-পাশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল। ঈসা খাঁকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বরণ করিয়া বসাইয়া,—অন্যকে পাণিদান করিবে? না! না! তাহা কখনও হইবে না। এমন ব্যভিচার, এমন বিশ্বাসঘাতকতা, এমন অধর্ম কিছুতেই করিতে পারিবে না। তৎপরিবর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। স্বর্ণ ভীষণ দুর্ভাবনায় দিনদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইতে লাগিল। তাহার পিতা, ঈসা খাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃত জ্ঞাপনের পরে, ঈসা খাঁর মানসিক মতিগতি বা কি দাঁড়াইল, তাহাও জানিতে পারিল না। স্বর্ণের এই গভীর মনোবেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, সরলা নাম্নী একজন সখী ব্যতীত আর কেহই জানিত না। স্বর্ণ তাহাকে জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী জানিয়া প্রাণের কথা মর্ম-ব্যথা সমস্তই অকপটে তাহার নিকট প্রকাশ করিত।

সরলা তাহার বাল্য-সখী। শিশুকাল হইতে উভয়ের গভীর অনুরাগ। স্বর্ণের বিপদে, স্বর্ণের দুশ্চিন্তায় সরলাও ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। অবশেষে ঠাকুর যশোদানন্দ বা জহিরুল হকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্ণ সরলাকে কৌশল করিয়া পাঠাইয়া দিল। শাহ সোলতান মহীউদ্দীনের নিকট হইতে পানি-পড়া আনিবার উপলক্ষে সরলা জহিরুল হককে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

যশোদানন্দ সুকুমারী স্বর্ণময়ীকে বাল্যকাল হইতেই আপন কন্যার ন্যায় ভালোবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। কারাগারে যখন যশোদানন্দের নির্যাতন ও লাঞ্ছনায় তাঁহার পূর্বের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য-শিষ্যাগণ আনন্দবোধ করিতেছিল, তখন একমাত্র স্বর্ণের চক্ষেই তাঁহার জন্য সহমর্মিতার পবিত্র অশ্রুবিন্দু ফুটিয়াছিল। স্বর্ণ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই চঞ্চল চরণে করুণাপূর্ণ আঁখি ও মমতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া কিরূপ ব্যাকুলভাবে কারাগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কিরূপ পরিপূর্ণ সহৃদয়তার সহিত তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত এবং পরিশেষে তাহার বুদ্ধি-কৌশলে জহিরুল হক সেই সাক্ষাৎ নরক হইতে কিরূপে প্রমুক্ত হইলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের প্রাণের যন্ত্রণা এবং মহাবিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার স্নেহ-মমতা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কোমলপ্রাণা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্বর্ণময়ীর সরল হৃদয়খানি প্রেমানুরাগে কিরূপে দগ্ধ হইতেছে—নৈরাশ্যের ভীষণ ঝটিকা, তাহার আশা-আনন্দ ও আলোকপূর্ণ মানস-তরুণীকে কিরূপভাবে বিষাদের অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিতেছে, তাহা ভাবিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

স্বর্ণময়ী যে ঈসা খাঁর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, জহিরুল হক তাহা স্বপ্নেও

জানিতেন না। ঈসা খাঁর বিবাহ-প্রস্তাবে তিনি যদি আপত্তি উত্থাপন না করতেন, তাহা হইলে স্বর্ণময়ীর জীবন-পূর্ণিমা আজ এমন অমাবস্যায় পরিণত হইত না। তিনিই যে স্বর্ণময়ীর প্রণয়-পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত এবং মর্মাহত হইলেন। এক্ষণে প্রাণপাত করিয়াও সে কণ্টক উদ্ধার করিতে পারিলে, তিনি সুখী হইতে পারেন! স্বর্ণের ভবিষ্যৎ কি হইবে? কিরূপে ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত বিবাহ-সম্পর্ক ভঙ্গ করিয়া ঈসা খাঁর সহিত স্বর্ণময়ীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, তাহাই জহিরুল হকের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। স্বর্ণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে শ্রীনাথ চৌধুরীর পাপ-পাণিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ঈসা খাঁর জননী আয়েশা খানমের অমতে ঈসা খাঁর সহিত কিরূপে তাহাকে পরিণয়সূত্রে সম্মিলিত করা যাইবে, ইহাও এক গভীর সমস্যার বিষয়। অন্যদিকে স্বর্ণ মুসলমান হইলেই বা তাহাকে কোথায় আশ্রয় দেওয়া যাইবে? কেদার রায়ের রোষানলে দগ্ধীভূত হইতে কে স্বীকার করিবে!

জহিরুল হক্ স্বর্ণময়ী সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু মস্তিষ্ক-সিন্ধু আলোড়ন করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অধীর হইয়া তাঁহার ধর্মগুরু ধর্মাত্মা হজরত সুফী মহীউদ্দীন শাহের চরণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদরূপে বিবৃত করিলেন। শাহ্ সাহেব ক্ষণকালের জন্য নেত্র নিমীলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর বলিলেন, "কয়েকদিন অপেক্ষা কর, কি করতে হবে জানতে পারবে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মদান

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাংশ বিগতপ্রায়। স্বর্ণময়ীর বিবাহের আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট। শ্রীপুরের রাজবাটীতে বিবাহের জন্য বিশেষ সমারোহ ব্যাপার। স্বর্ণের উদ্বেগ ও অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। তাহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে, ভাবিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। স্বর্ণের তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক, বদনমণ্ডল মলিন! জহিরুল হকও বিশেষ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। তবে তাঁহার পীর মহাজ্ঞানী মহীউদ্দীন সাহেবের বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়াই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ বৃহস্পতিবার প্রাতে সুফী মহীউদ্দীন সাহেব জহিরুল হককে ডাকিয়া বলিলেন, "এখনি তুমি রায়-নন্দিনীকে লয়ে বিজয়নগরে যাত্রা কর। তথায় গেলেই তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

জাহিরুল হক সূফী সাহেবের আদেশে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বিজয়নগর গমন কষ্টসাধ্য হইলেও, তথায় গমন করিলে সোনামণির অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই আশায় তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী, দুর্দিনের পরম বন্ধু সোনার মঙ্গল চিন্তায় জহিরুল হক ডুবিয়া গিয়াছিলেন; কাজেই তাহার সুখের জন্য যে কষ্ট স্বীকার, তাহা তাঁহার কাছে নূতন সুখের নিদান বলিয়াই বোধ হইল।

পরদিন নিশাশেষে উষার শুভ্র হাস্যরেখা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই জহিরুল হক্ স্বর্ণময়ীকে লইয়া ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে শ্রীপুর ত্যাগ করিলেন। জহিরুল হক্ দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকেও সঙ্গে লইলেন। স্বর্ণময়ী অশ্বারোহণে অনভ্যস্তা হইলেও কিছু দিনের মধ্যে অল্পে অল্পে কিঞ্চিৎ পটুতা লাভ করিল। জাহিরুল হক্ সকল বিষয়েই পিতার ন্যায় স্বর্ণময়ীর যত্ন লইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী নানাদেশ ও জনপদ, অসংখ্য নদী ও মাঠ, নগর ও পল্লী অতিক্রম করিয়া উনত্রিশ দিনে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন।

ঈসা খাঁ তখন ঘোরতর পীড়িত। সেই বিষদিগ্ধ শল্যের আঘাতে তাঁহার বাহুর কিয়দংশ পচিয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শরীর শীর্ণ, কান্তি-শ্রী মলিন। সোলতান নিজাম শাহের খাস চিকিৎসক 'জোব্ দাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ্ খান সাহেব বিশেষ যত্নে তখন চিকিৎসা করিতেছিলেন। ক্ষতস্থানের পচনক্রিয়া কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। ক্ষত শুষ্ক না হওয়ার জন্য জ্বরও বন্ধ হইতেছে না। ঈসা খাঁর নিজের অনুচর ও ভৃত্যগণ এবং সোলতানের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। স্বয়ং সোলতান নিজাম শাহ্ প্রতি শুক্রবারে তাঁহাকে দেখিতে আসেন।

ঈসা খাঁর যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে স্বর্ণময়ী ও জহিরুল হক্ বিজয়নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাণপণে শুশ্রূষায় যোগদান করিলেন। ঈসা খাঁর শোচনীয় অবস্থা বিলোকনে স্বর্ণ, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঈসা খাঁ তাঁহার রোগশয্যা-পার্শ্বে হৃদয়-প্রতিমা স্বর্ণকে অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তনীয়রূপে উপস্থিত দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের মুখ দেখিয়া ঈসা খাঁ প্রথমতঃ প্রফুল্ল, তৎপর তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন।

স্বর্ণ উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরেই আয়েশা খানমও অনুচর, সৈন্য ও ভৃত্যসহ পুত্রকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বিজয়নগরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ ঈসা খাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে মত দিলেন না। বিশেষতঃ সুদূর পথ অতিক্রমের নানা অসুবিধায় তাঁহার শরীর আরও দুর্বল হইতে এবং পীড়ার উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের সোলতান চতুষ্টয় নিজ নিজ প্রধান চিকিৎসকদিগের দ্বারা পরম আগ্রহে ঈসা খাঁর চিকিৎসা

করাইতে লাগিলেন। রাজচিকিৎসকগণ বহু চেষ্টায় জ্বর বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষত আরোগ্য হইল না। বরং জ্বর বন্ধ হইবার পরে ক্ষত কিছু বাড়িতে লাগিল। তাহাতে ঈসা খাঁ জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহু হইতে ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং তিন অঙ্গুলি চওড়া স্থানের ক্ষত কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থলে যদি কোন সুস্থ এবং নির্দোষ-রক্ত যুবাব্যক্তির বাহুর সেই অংশ কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে।

'জোবদাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ খানের এ মত, অন্যান্য হাকিমগণের দ্বারা সমর্থিত হইলে, সোলতান নিজাম শাহ্ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদিগের মধ্য হইতে একজন সুস্থকায় যুবকের বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া ঈসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার জন্য আর এক ব্যক্তির প্রাণসংশয় ব্যাপার এবং ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে অনেক বুঝান হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জন্য কোন ব্যক্তির মাংসচ্ছেদ করিলে তিনি নিজের গলায় ছুরি লইবেন, ইহাও দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন। স্বর্ণ নিজ বাহু হইতে মাংস দিবার জন্য বিষম আকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। স্বর্ণ অনেক বুঝাইল, অনেক কাঁদিল, অবশেষে ঈসা খাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু ঈসা খাঁকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিল না।

স্বর্ণ বলিল ঃ আপনার প্রাণই যদি রক্ষা না হয়, তা হলে আমার প্রাণের জন্য কিছুই মমতা নাই। আপনার জীবনেই আমার জীবন। আমি প্রাণ দিয়েও আপনাকে রক্ষা করব। আপনি না বাঁচলে, আমিও বাঁচব না। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার জীবন রক্ষা করতে পারলেও সুখী হব। মাংস ছেদনে যে কষ্ট হবে, তা আমার সুখ এবং শান্তির কারণ হবে। আমাকে বেহুঁস করেও কাটতে হবে না। আমি নিজ হস্তে মাংস ছেদন করে দিব।

কিন্তু ঈসা খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্বর্ণ নিরুপায় হইয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ঈসা খাঁর প্রাণরক্ষার জন্য স্বর্ণের ব্যাকুলতা এবং কাতরতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঈসা খাঁর প্রতি স্বর্ণের স্বর্গীয় প্রেম এবং অপার্থিব অনুরাগ সন্দর্শনে সকলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িলেন। তাহার স্নিগ্ধ এবং সুন্দর মুখমণ্ডলের পুণ্যশ্রী এবং উদার ও কাতরদৃষ্টিতে সকলেই তাহার দেব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। আয়েশা খানম পর্যন্ত স্বর্ণকে পরম যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের গুণে এবং অনুরাগে আয়েশা খানম এইরূপ মুগ্ধ এবং লুব্ধ হইয়া পড়িলেন যে, স্বর্ণকে তিনি পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে হাকিম আহমদুল্লাহ্ খান যখন ঈসা খাঁর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে অন্যের মাংসচ্ছেদে মত দিবার জন্য বুঝাইতেছিলেন, স্বর্ণ সেই সময় হাকিম সাহেবকে ইঙ্গিতে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আপনি বীরবর খাঁ সাহেবের ক্ষতস্থান কেটে পরিষ্কার করুন, আমি আপনাকে মাংস দিচ্ছি।" 'জোবদাতল হোকামা' স্বর্ণময়ীর দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ইঙ্গিতে অন্যান্য সহকারীদিগকে সত্বর অস্ত্র-চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিতে বলিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইবার পরে সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিতভাবে দেখিলেন যে, একখানি শাণিত ছুরিকা দক্ষিণ হস্তে ধারণপূর্বক স্বর্ণময়ী অবিকম্পিত হস্তে শান্তভাবে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার বাম বাহুর উপরিভাগের অংশে গভীরভাবে বসাইয়া দিয়া মাংস কাটিতে লাগিল। 'জোব্ দাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ্ খান মুহূর্ত মধ্যে ঈসা খাঁর ক্ষত কাটিয়া পরিষ্কার করিলেন। অন্য একজন হাকিম 'জোব্ দাতল হোকামার' ইঙ্গিতে চকিতে স্বর্ণময়ীর বাহু হইতে মাংস লইয়া ঈসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে আর একজন অতি সত্বর একটি হরিণের জানুদেশের উপরিভাগের মাংসচ্ছেদ-পূর্বক স্বর্ণের বাহুতে বসাইয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণের প্রলেপ দিয়া তাহার উপরে বরফ চাপিয়া ধরিলেন!

এত ক্ষিপ্রতার সহিত এবং নীরবে এই গুরুতর অস্ত্র-চিকিৎসার কার্যসম্পন্ন হইল যে, ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বাধা দিবার অবসর পর্যন্ত পাইলেন না। একবার তিনি "ওকি"! মাত্র বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সে শব্দ উচ্চারণের পূর্বেই স্বর্ণ তাহার বাহু হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত এবং এক অঙ্গুলি পরিমিত গভীর ক্ষতের জন্য স্বর্ণময়ীর মুখে কেহ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাইল না। সকলেই স্বর্ণের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। আয়েশা খানম স্বর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্ত আশীর্বাদ ও গভীর স্নেহ জানাইয়া স্বর্ণের মুখ চুম্বন করিলেন। সোলতান নিজাম শাহ্ স্বর্ণের এই অতুলনীয় সৎসাহস এবং স্বার্থত্যাগ দর্শনে যার-পর-নাই প্রীত এবং মুগ্ধ হইলেন। প্রেমের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে সমগ্র বিজয়নগরবাসী নরনারী,—কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! স্বর্ণময়ীর পুণ্য-কথা যত্রতত্র আলোচিত হইতে লাগিল। রাজ-কবিগণ স্বর্ণময়ীর এই পুণ্য প্রেমাসক্তি স্বার্থত্যাগের কবিতা রচনা করিয়া শাহী-দরবারে এবং সভা-সমিতি ও সম্মিলনীতে পাঠ করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণকে দেখিবার জন্য বেগম ও শাহজাদী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণের গৃহে নানাশ্রেণীর অসংখ্য রমণীর সমাগম হইতে লাগিল। সোলতান ও বেগমগণ স্বর্ণময়ীকে ধর্মকন্যা বলিয়া সমাদর ও সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের সুচিকিৎসা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য সর্বপ্রকারের শাহীবন্দোবস্ত করা হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় অল্পদিনের মধ্যেই ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী আরোগ্যলাভ

করিলেন।

ঈসা খাঁর রুগ্ন ও জীর্ণ দেহে আবার নবযৌবনের কান্তি-শ্রী ফিরিয়া আসিতে লাগিল। হিমানী-পীড়িত শ্রীহীন-উদ্যান যেমন বসন্ত-সমাগমে নব-পত্র-পল্লব এবং ফল-ফুল মঞ্জরীতে বিভূষিত হইয়া পিকবধূর আনন্দবিধান করে, ঈসা খাঁর স্বাস্থ্য-শ্রীও তেমনি স্বর্ণময়ীর প্রাণে অতুল আনন্দ দান করিতে লাগিল। জীবনের স্বার্থকতার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধে, জীবনানুভূতি স্বর্গের নিকটে নিতান্তই সুবিধাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের দুঃখ-কষ্ট বা অসুবিধার বিষয় স্থান পাইতে পারে, এমন একটু স্থানও হৃদয়ে রহিল না। তাহার হৃদয়-মন্দিরের প্রেমদেবতা, অন্তর-আকাশের পূর্ণচন্দ্রমা, মন-উদ্যানের মন্দাকিনীধারা জীবনকুঞ্জের শোভন গোলাপ—ঈসা খাঁকে যে মৃত্যুর কবল হইতে নব-জীবনে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে, তাঁহার জন্য যে নিজ বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই মধুর ঘটনা ও উল্লাসে স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের কুঞ্জে অপার্থিব প্রেমের সুধা রাগিণীর যে বিনোদ ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় ভরপুর হইয়াছে। প্রেমাস্পদের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগে যে আনন্দ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব! স্বর্গে সে আনন্দ নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মিলন

মাসাধিক কাল পরে বীরবর ঈসা খাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ ও পূর্ববৎ বলিষ্ঠ হইলেন। সোলতান নিজাম শাহ্ উৎফুল্লচিত্তে এক দরবার আহ্বান করিয়া ঈসা খাঁর স্বার্থত্যাগ, স্বজাতি-প্রেম এবং প্রখর বীরত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিয়া সোলতান চতুষ্টয়ের পক্ষ হইতে হীরকের মুষ্টিযুক্ত একখানি বহুমূল্য তরবারি, বহুমূল্য রাজকীয় পরিচ্ছদ, একটি অত্যদ্ভুদ ঘটিকা-যন্ত্র, একছড়া বৃহদাকারের মুক্তার মালাসহ "বাবর-জঙ্গ"[১] উপাধি প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিজাম শাহের বেগম জান্নাত মহলের আগ্রহ এবং উদ্‌যোগে বিজয়নগরেই ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ীর বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া স্থিরীকৃত হইল। সোলতান নিজাম শাহ্ বিপুল উদ্যোগে বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উদ্বাহ-ক্রিয়ার জন্য বিরাট মহ্‌ফেল সংগঠিত হইল। রাজ্যময় ধূমধাম হৈচৈ পড়িয়া গেল। দশ হাজার লোক বসিতে পারে, এমন বিরাট সভামণ্ডপ নির্মিত হইল। নানাশ্রেণীর দর্পণ, ময়ূরপুচ্ছ, পতাকা, ফুল ও পাতা দ্বারা মজলিস আরাস্তা করা হইল। দশ সহস্র বেলওয়ার ও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বিচিত্র-দর্শন ঝাড়

১. *বাবর-জঙ্গ- যুদ্ধের সিংহ।*

ও ফানুসের দ্বারা মজলিস রওশন করা হইল। অতিসূক্ষ্ম 'অড়বফত' ও 'শবনম' দ্বারা দ্বারসমূহের যবনিকা প্রস্তুত করা হইল। কিঙ্খাপ দ্বারা চতুর্দিকের কানাৎ রচিত হইল। বহুসংখ্যক মূল্যবান 'কালিন'[২] বিছাইয়া তদুপরি নানাশ্রেণীর চিত্র-বিচিত্র কুর্সী, সোফা ও তখত স্থাপন করা হইল। নির্দিষ্ট দিনে বিপুল আড়ম্বরে শত তোপধ্বনি এবং অযুতকণ্ঠে মঙ্গল-কামনার মধ্যে ঈসা খাঁ এবং শামসুন্নেসার (স্বর্ণময়ীর ইসলাম নাম) শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর দুই দিন ধরিয়া নগরে সমস্ত হিন্দু ও মোসলেম অধিবাসী এবং সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে রাজ-ভোজে পরিতৃপ্ত করা হইল। বেগম জান্নাৎ মহল নব-দম্পতিকে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার এবং বহু জিনিসপত্র দান করিলেন। সোলতান চতুষ্টয় প্রত্যেকে একশত করিয়া পারস্য-সাগরজাত মুক্তা এবং নিজ নিজ রাজ্যের একসহস্র করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা, একটি করিয়া আরব্য অশ্ব এবং একটি করিয়া হস্তী দান করিলেন। আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেহ মৃগনাভি, কেহ মুক্তা, কেহ সুবর্ণমুদ্রা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী যে পরিমাণ মুক্তা উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার ওজন ৩০২ তোলা হইয়াছিল।

বিবাহের পরে ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী দীন-দুঃখী এবং পান্থ ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে তিন দিন পর্যন্ত অর্থ বিতরণ করিলেন। এই বিতরণে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অতঃপর সোলতান, বেগম এবং আমীর ওমরাহ ও আলেমদিগকে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের টুপি, পাগড়ী, ছড়ি, তরবারি, পরিচ্ছদ, অঙ্গুরী প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন।

অতঃপর ঈসা খাঁ বিজয়নগরে স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ একটি করিয়া অনাথ আশ্রম এবং শামসুন্নেসা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে একটি রমণীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া মাঘ মাসের শেষে স্বদেশ প্রত্যাগমনে উদ্যোগী হইলেন।

সোলতানগণ আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ গভীর সহানুভূতি, ভ্রাতৃভাব এবং প্রগাঢ় প্রেমের সহিত সাশ্রুনেত্রে বিদায় প্রদান করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের মঙ্গলধ্বনির মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঈসা খাঁ তিন দিবস অশ্বারোহণে যাইবার পরে কৃষ্ণা-নদীর কূলে জাহাজে যাইয়া আরোহণ করিলেন। জাহাজ ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তীরস্থ জনগণ রুমাল উড়াইয়া "জাজাকাল্লাহ্" "জাজাকাল্লাহ্"[৩] বলিয়া উচ্চকণ্ঠে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ ও তীরস্থ ব্যক্তিবৃন্দ রুমাল উড়াইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণা-নদী বহিয়া জাহাজ পাঁচ দিনে সমুদ্রে যাইয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর পনের দিন পরে জাহাজ উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে যাইয়া উপনীত হইল।

---

২. কালিন—গালিচা।

৩. জাজাকাল্লাহ্—আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

একদা প্রাতঃকালে উড়িষ্যার উপকূলে চিল্কাহ্রদের তীরে শিকার করিবার মানসে বীরপুরুষ ঈসা খাঁ কতিপয় শিকারী যোদ্ধাসহ ক্ষুদ্র তরণীযোগে জাহাজ হইতে তটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যখন চিল্কার তট-প্রদেশে নানা জাতীয় হংসে, সারস ও চক্রবাক শ্রেণীর পক্ষী শিকার করিয়া হরিণ শিকারের জন্য চিল্কার পশ্চিমদিকস্থ কাননাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে একস্থানে চিল্কার তীরে বহু লোকসমাগম এবং বাদ্যধ্বনি ঈসা খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঈসা খাঁ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, একটি হিন্দু-রমণীকে তাহার মৃতপতির চিতায় একসঙ্গে পোড়াইবার জন্য এই সমারোহ ব্যাপারের সূচনা। ঈসা খাঁ নিজ রাজ্যের সহমরণ প্রথা কঠোর রাজাদেশ প্রচার করিয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য সহমরণ প্রথা যে কিরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কাণ্ড, তাহা নিজে কখনও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পান নাই। ঈসা খাঁ এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অশ্ব ছুটাইয়া যাইয়া জনতার নিতান্ত সন্নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি পরমাসুন্দরী যুবতী রমণীকে হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় তাহার স্বামীর চিতায় তুলিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে। নারীটি অতি করুণকণ্ঠে আর্তধ্বনি করিতেছে! এদিকে নারীহত্যার উদ্যোগী পাষণ্ডগণ সেই করুণ ক্রন্দনরোলকে কোলাহলে ডুবাইয়া দিবার জন্য বিপুল উদ্যমে বাজনা বাজাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রমণী ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণরক্ষা সঙ্কল্পে অন্তিম চেষ্টায় চরম বল-প্রয়োগে চিতা হইতে মাটিতে পড়িবার চেষ্টা করা মাত্র একটি পাষণ্ড হিন্দু ভীমবংশদণ্ড দ্বারা নারীর কটিদেশে আঘাত করিল! ঈসা খাঁ মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং যার-পর-নাই শোকসন্তপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি কর! কি কর!!" ঈসা খাঁর সঙ্গীয় যোদ্ধাগণও মুহূর্তমধ্যে ঈসা খাঁর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিন্দুগণ ঈসা খাঁকে মুসলমান, সুতরাং সহমরণের নিষ্ঠুর প্রথার তীব্র বিরোধী মনে করিয়া বংশদণ্ড, কুঠার, দা, লগুড় ও পাথর হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ইহাতে ঈসা খাঁ নিতান্ত উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমবেগে তরবারি হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকজন আহত হইয়া ভূপতিত হইবার পরেই সকলে বৃকতাড়িত মেষবৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। ঈসা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে যাইয়া চিতার উপর হইতে নারীকে স্বহস্তে উঠাইয়া লইলেন। তৎপর তাহার হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

রমণী বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তিভরে তাহার জীবনদাতা ঈসা খাঁর পাদস্পর্শ করিতে করিতে বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি অরুণাবতী।" বহুদিনের মৃতব্যক্তিকে সহসা জীবিতাবস্থায় দর্শন করিলে যে-পরিমাণ বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতে পারে, সেই প্রকার বিপুল বিস্ময় ও কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হইয়া ঈসা খাঁ

বলিলেন যে, "কি অরুণাবতী! আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেকি কথা!! তুমি তো অনেক দিন হল বসন্তরোগে মারা গিয়েছ! তুমি এখানে কিরূপে? তুমি কোন্ অরুণাবতী? আমি তোমাকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা রূপেই দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি অন্য কোনও অরুণাবতী! শীঘ্র তোমার পরিচয় দাও।"

অরুণাবতী বলিল, "জাঁহাপনা, আমি যশোহরের অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীই বটে; আমি মাহতাব খাঁর বাগদত্তা ভার্যা। আমি বসন্তরোগে মারা যাই নাই। আমার বসন্ত হবার কথাটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা! পিতা আমাকে মাহতাব খাঁর সাথে পূর্বে বিয়ে দিতে স্বীকৃত হলেও পরে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার জন্য এবং স্বর্ণময়ীকে হস্তগত করতে না পারায় আপনাদের প্রতি যার-পর-নাই জাতক্রোধ হন। মাহতাব খাঁর প্রতি তিনি যার-পর-নাই রুষ্ট এবং বিরক্ত। তাঁহার প্রাণ বধের জন্য তিনি নিতান্তই অধীর ও উন্মত্ত। শুধু দায়ে পড়েই তিনি মাহতাব খাঁর হস্তে আমাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। আমাকে বাটীতে লয়ে যাবার কয়েক দিন পরেই আমাকে একটি বিশেষ ঘরে আবদ্ধ করে, চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে দিলেন যে, আমি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছি। পরে অন্য একটি রমণীকে বাটী হতে রাজ-আড়ম্বরে শ্মশানে লয়ে দাহ করা হয়! তাতেই আপনি ভ্রমে পড়েছেন। বস্তুতঃ, আমি মারা যাই নাই। পিতৃদেব আপনাদের হস্ত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আমাকে মেরে ফেলবার জন্যই সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু আমার জননী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে অবশেষে বীরেন্দ্রকিশোর দত্ত নামক জনৈক নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তানের সহিত আমাকে বলপূর্বক বিবাহ দিয়া লোকজনসহ জগন্নাথধামে অতি সঙ্গোপনে পাঠিয়ে দেন। আমাদের জন্য বার্ষিক পাঁচ সহস্র মুদ্রার বৃত্তি বন্দোবস্ত করে দেন। নগদ দশ হাজার টাকা আমাদিগের বাটী ও সরঞ্জামী খরচের জন্য সঙ্গে দিয়েছিলেন। আমি সমস্ত পথই অশ্রুপাত করতে করতে জগন্নাথক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হই। স্থলপথে এবং জলপথে ২০ দিনে আমরা পুরীতে এসে হাজির হই।

পুরী যাবার পঞ্চম দিবসে বীরেন্দ্র দত্ত অশ্বারোহণে নির্বিঘ্নে যেতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক অরণ্যের অন্তর্বর্তী পন্থায় সহসা ব্যাঘ্র-দর্শনে অশ্বটি উধাও হয়ে তাঁকে পৃষ্ঠ হতে ফেলে দিয়ে ছুটে পলায়ন করে। একখণ্ড প্রস্তরের উপর মস্তক ও কটিদেশ পতিত হওয়ায় তিনি অতি সাংঘাতিক রূপে আহত হন। সেই আঘাতে তিনি যার-পর-নাই দুর্বল এবং পীড়িত হয়ে পড়েন। অনবরত কয়েক দিন রক্তবমন করেন। পুরীতে এসে হাকিম ইকবাল খাঁর চিকিৎসায় অনেকটা আরোগ্য লাভ করেন। তৎপর হাকিমের উপদেশে চিল্কাহ্রদের তীরবর্তী মুরী নামক স্থানে জলবায়ু উৎকৃষ্টতর বলে সেইখানেই আমরা বাস করতে থাকি। কিন্তু মুরীতে এসে বীরেন্দ্র দত্ত কারও কথা না শুনে হাকিমী ঔষধ সেবন পরিত্যাগপূর্বক ময়ূরভঞ্জের জনৈক অবধূত সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করতে

থাকেন। তাতে প্রথমতঃ একটু ভালো ফল দেখা যায়। কিন্তু কয়েক দিন পরেই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর, ঠিক নয় দিবস পরেই গত রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে আমি পলায়ন করে কোনওরূপে আমার একমাত্র স্বামী—যাঁকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নাই, যাঁকে স্বেচ্ছায় আমি হৃদয়-মন্দিরের সিংহাসনে প্রেম-রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে বরণ করে নিয়েছি—সেই মাহতাব খাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় ও শান্তি লাভের সুবিধা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গের লোকজন আমার গহনাপত্র, মণিমুক্তা এবং অর্থলাভের জন্য বলপূর্বক সহমরণে বাধ্য করে। আমার অনুনয়-বিনয় এবং কাতর ক্রন্দন কিছুতেই তাদের পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না। আমি যখন স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হলাম না, তখন বলপূর্বক হস্তপদ বন্ধন করে আমাকে চিতায় তুলে দিল। আমি যখন করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলাম, তখন পাষণ্ডগণ বিকট শব্দে ঢাকঢোল করতাল বাজাতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করতে লাগল। তারপর সর্ববিপদহন্তা মঙ্গলময় আল্লার কৃপায় আপনি এসে উদ্ধার করলেন।"

ঈসা খাঁ অরুণাবতীর মুখে স্বপ্নরাজ্যের অগোচর এবং চিন্তার অতীত অপূর্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুক্তকণ্ঠে "ছোবহান আল্লাহ্!" "ছোবহান আল্লাহ্!" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রুর উন্মেষ হইল। অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখছি করুণাময় বিধাতা একনিষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকাদিগকে কদাপি বঞ্চিত করেন না।"

এক্ষণে চল, আমার সঙ্গে চল। আমি দাক্ষিণাত্য হতে দেশে ফিরছি। মাহতাব খাঁ তোমার মিথ্যা-প্রচারিত মৃত্যু-সংবাদে মরমে মরে আছে। সে আবার তোমার অপ্রত্যাশিত-দর্শনে রাহুমুক্ত মাহতাবের (চন্দ্রের) ন্যায় নবজীবন লাভ করবে। তোমার বাসনাও সিদ্ধ হবে। চল, আর বিলম্ব না করে জাহাজে চল। এথায় কালবিলম্বে অনেক বিপদ ঘটতে পারে।"

অতঃপর অরুণাবতীকে লইয়া ঈসা খাঁ 'বাবরজঙ্গ' জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন।

উপসংহার

প্রায় একমাস পরে বসন্তকালের মধুর সময় ফাল্গুনের শেষে গাজী ঈসা খাঁ খিজিরপুর রাজধানীতে মাতা, বণিতা, বন্ধুবর্গ এবং সৈন্যাদি-সহ উপস্থিত হইলেন। নাগরিকগণ বিপুল আড়ম্বরে নব-দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিল। কয়েকদিন পর্যন্ত রাজধানী এবং অনেক পল্লী ও মফঃস্বলের রাজ-কাচারিতে আলোকসজ্জা এবং পুষ্প-পতাকার বাহার খেলিল। দীনদুঃখিগণ প্রচুর দান পাইল। গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য 'লাখেরাজ' এবং 'মদদে মাশ'* প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক দিবস পরে ঈসা খাঁ নিজে উদ্যোগী হইয়া রাজ-ব্যয়ে প্রতাপ-কন্যা অরুণাবতীকে মাহতাব খাঁর পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিলেন। এই বিবাহে প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইয়াও ঘৃণা ও লজ্জায় উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায় ও চাঁদ রায় দুই ভ্রাতা আসিয়া ঈসা খাঁর সহিত গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

জহিরুল হক প্রচুর জায়গীর লাভ করতঃ সপরিবারে খিজিরপুরে আসিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম ও জ্ঞান-চর্চা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহুতর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার ক্রমশঃ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

---

* জীবিকানির্বাহের জন্য প্রদত্ত ভূমি।

তারাবাঈ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজাপুরের সোলতানের অধীনে কৃষ্ণনগর পরগণার জায়গীরদার সরফরাজ খান নিরুদ্বেগে জাতীয় ভোগ করিতেছিলেন। যুদ্ধকালে সোলতানকে দুই হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। আর সোলতানের সৈন্যদের রসদের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ শত গো এবং এক হাজার মেষ ও ছাগল প্রদান করিতে হইত। ইহা ছাড়া একটি পয়সাও খেরাজ বা খাজনা স্বরূপ দিতে হইত না। সরফরাজ খান প্রায় ছয় শত সত্তর বর্গ মাইল পরিমিত রাজ্যে সাড়ে দশ লক্ষ প্রজা লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতেন। শাসন ও বিচারের সমস্ত বন্দোবস্তই তাঁহার নিজের অধীনে ছিল। কেবল মৃত্যুদণ্ড দিতে হইলে বিজাপুরের দারোল-এনছাফের অর্থাৎ হাইকোর্টের কাজী-উল-কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান জজের হুকুম লইতে হইত। মারাঠা দস্যুপতি শিবাজী সরফরাজ খানের সঙ্গে বরাবরই সদ্ব্যবহার করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সলিমগড়ের মীর্জা ওবায়দুল্লাহ্ বেগের সহিত সরফরাজ খান কন্যা আমিনা বানুর বিবাহের অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, পরস্পরের মধ্যে যখন মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, সেই সময় ওবায়দুল্লাহ্ বেগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থবল এবং সৈন্যবল লাভ করিয়া শিবাজী সহসা কৃষ্ণগড় আক্রমণ করিয়া বসিলেন।

সরফরাজ খান এই আক্রমণ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু অবগত ছিলেন না। সুতরাং সহসা আক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ নিতান্তই অপ্রতিভ এবং উদ্বিগ্ন হইলেন। পরে সত্বরতা সহ প্রস্তুত হইয়া কৃষ্ণগড়ের পার্বত্যদুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভীষণভাবে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্গ হইতে মধ্যে মধ্যে ধাওয়া করিয়া শিবাজীর বহু সৈন্য হতাহত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবাজীর সৈন্য-সংখ্যা অনেক বেশী থাকায়, সরফরাজ খান বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুর্গের রসদ ক্রমে ফুরাইয়া গেল। অথচ বিজাপুর সোলতানের কোনও সৈন্যদল সাহায্যের জন্য আগমন করিল না।

সরফরাজ খান ক্রমশঃ হতাশ হইয়া যার-পর-নাই ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা সৈন্যদল ও একমাত্র বীরপুত্র আলী হায়দর খানকে সঙ্গে লইয়া শিবাজীর সৈন্যদলকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে শিবাজীর সৈন্যদল রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বহুদূরে হটিয়া গেল। শিবাজীর প্রচুর রসদ তোপ-বন্দুক এবং গোলাগুলী

সরফরাজ খানের হস্তগত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার একমাত্র বীরপুত্র আলী হায়দর খান যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এদিকে শিবাজী আরও মাওয়ালী ও মারাঠা সৈনাদল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নবীন উদ্যম এবং বিপুল তেজে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য মারাঠা গোলান্দাজগণ অনবরত এক স্থান লক্ষ্য করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সরফরাজ খান, তাঁহার সেনাপতি মোতামদ খান এবং কন্যা আমিনা বানু দুর্গের প্রাচীরের উপরে তোপ পাতিয়া শত্রুসৈন্য সংহারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ এবং উত্তেজনাপূর্ণ সঞ্জীবনী বাণীতে কৃষ্ণগড়ের সৈন্যদলের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও বীরত্বের সঞ্চার হইল। কৃষ্ণগড়ের গোলন্দাজগণের অব্যর্থ লক্ষ্যে শিবাজীর সৈন্যদল যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, ঠিক সেই সময় একটি শেল আসিয়া বীরপুরুষ সরফরাজ খানের স্কন্ধদেশে পতিত হইল। সেই শেলের দারুণ আঘাতে তাঁহার দেহ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল। সৈন্যদলে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শত্রুগণ যাহাতে সরফরাজ খানের নিধনবার্তা অবগত না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইল।

গভীর রজনীতে পরামর্শ-সভা আহুত হইল। মোতামদ খান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিরাশ হইয়া শিবাজীর সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন। সরফরাজ খানের পত্নী হামিদা বানুও সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু বীর্যবতী কুমারী আমিনা বানু বলিলেন ঃ "বিধর্মী ও বেঈমান কাফেরের সহিত সন্ধি অপেক্ষা যুদ্ধ করাই ভালো। আমাদের প্রেরিত দূত বিজাপুরে পৌঁছে থাকলে, নিশ্চয়ই এতদিনে সোলতান-বাহিনী আমাদের সাহায্যের জন্য রওয়ানা হয়েছে। এ সময় হীন শর্তে সন্ধি করলে, পরে পস্তাতে হবে। শিবাজী যেমন, যখন ইচ্ছা সন্ধি উল্লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করেন না, স্বাভাবিক ধর্মভীরুতার জন্য আমাদের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা শক্তিশালী হলেও এই বেইমান ও অসভ্য কাফেরদিগের অধীনে বহু হীনতা ও নীচতা স্বীকার করতে হবে। সুতরাং কমবখ্‌ত মারাঠা কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সর্বতোভাবে সঙ্গত।

"যুদ্ধে যদি জয়লাভ করি, শত্রুর নিপাত হবে। আর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তাহাও মহাসৌভাগ্যের কারণ হবে। কারণ, মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, 'যুদ্ধ করতে করতে যে মৃত্যু, তাহাই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু। এরূপ মৃত্যু মানুষকে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে লয়ে যাবে।' সুতরাং সকলে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হউন। আমার বিশ্বাস, চরম বিক্রমে আক্রমণ করলে, শত্রুগণ নিশ্চয় পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে।"

আমিনা বানুর উৎসাহ এবং যুদ্ধপ্রিয়তা সন্দর্শন করিয়া সকলেই যুদ্ধের জন্য আবার মাতিয়া উঠিলেন। সুতরাং দুর্গবাসী সকলেই প্রাণপণ যত্নে দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নস্থানগুলি রাতারাতি মেরামত করিয়া প্রভাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোতামদ খান এবং কুমারী আমিনা বানু অশ্বারোহণে দুর্গের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত এবং উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী আমিনা বানু বর্মমণ্ডিত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণপূর্বক ভীম বিক্রম এবং অটল সঙ্কল্পে গৈরিক প্লাবনের ন্যায় শিবাজীর বাহিনীর উপরে যাইয়া আপতিত হইলেন। ভীষণ প্রতাপে শিবাজীর ব্যূহ বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমিনা বানু অনেক দূর পর্যন্ত মাওয়ালী ও মারাঠা সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। শিবাজীর সৈন্যের প্রচুর রসদ-পত্র তোপ-বন্দুক ও গোলাগুলী হস্তগত করিয়া কুমারী আরও দুর্জয় বিক্রমশালিনী হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে ধাওয়া করিয়া মারাঠাদিগকে ভীষণ মার দিতে লাগিলেন। শিবাজীর সৈন্যদল বহু উৎসাহ এবং পুরস্কারের প্রলোভনে উদ্বুদ্ধ এবং প্রলুব্ধ হইয়াও কুমারীর সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না।

কুমারী আমিনা বানু যেমন বীর্যশালিনী, তেমনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সমর-শাস্ত্রে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। অশ্বারোহণে, অস্ত্র-সঞ্চালনে, ব্যূহ-বিন্যাস কৌশলে, তোপ পরিচালনায়, তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার বীরত্ব, প্রতাপ, সাহস ও কৌশল দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইল।

শিবাজী এই কুমারীর প্রতাপ ও সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। রমণীর রমণীয় রূপলাবণ্যের সহিত এই প্রকার বিস্ময়কর বীর্যশৌর্যের অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া শিবাজী এই রমণীরত্নকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বলে পরাস্ত করিতে না পারিয়া কৌশল ও প্রলোভনে কুমারীকে হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইল। আমিনা বানুর অসাধারণ বীরত্ব ও কৌশলে শিবাজী নিতান্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা সঙ্গত নহে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শিবাজী কৃষ্ণগড়ের অধিকারিণী আমিনা বানুর সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তিনি আর কখনও কৃষ্ণগড় আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্য কেহ আক্রমণ করিলে, তিনি আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অতঃপর উভয় পক্ষ হইতে মিত্রতা স্বরূপ উভয় পক্ষকেই বিপুল আড়ম্বরে ভোজ প্রদান করা হইল। ভোজ শেষ হইলে, শিবাজী বহুমূল্য নানাবিধ বিলাস

দ্রব্য, করাচী হইতে লুণ্ঠিত এক জোড়া হীরকের কঙ্কণ এবং লক্ষ টাকা মূল্যের পারস্যসাগর-জাত একটি মুক্তামালা আমিনা বানুকে উপহার প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর রূপ-গুণ যশঃ-বিক্রম প্রভৃতি ভিলে তাল করিয়া বর্ণনা করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা কতিপয় ধূর্ত স্ত্রীলোক দাসী-স্বরূপ প্রেরিত হইল। ইহাদের কর্তব্য ছিল—ক্রমশঃ শিবাজীর গুণকীর্তন করিয়া আমিনা বানুকে শিবাজীর প্রতি অনুরক্ত ও মুগ্ধ করা।

শিবাজীর উদারতা এবং মহত্ত্ব দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বীরাঙ্গনার প্রতি এই প্রকার সম্মান ও দয়া প্রকাশ করায় দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণও শিবাজীর প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিল। অতঃপর যথাসময়ে বিজাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং যুবরাজ যাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমিনা বানুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া 'মালেকা' অর্থাৎ রাণী উপাধি প্রদান করিলেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মুকুট পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ বিজাপুরের হুকুমতের তরফ হইতে একখানি মূল্যবান তরবারি উপহার প্রদান করিলেন। শেখ-উল-ইসলাম জামে মসজিদে যাইয়া আল্লাহ্ তালার মঙ্গল আশীর্বাদ মালেকা আমিনার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শিবাজীও তাঁহাকে অনেক ভেটঘাট প্রদান করিয়া যথেষ্ট সম্বর্ধনা করিলেন। মালেকা আমিনা বানু রাজ্যাভিষেকের পরে বিজাপুরের সোলতানের হুজুরী-নজর স্বরূপ পাঁচটি উৎকৃষ্ট হস্তী, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং ২৫টি বৃহৎ মুক্তা প্রেরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীত ঋতুর অবসান হইয়াছে। মলয় সমীরণের মধুর সঞ্চরণে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের প্রাণে প্রাণে নব-জীবন এবং নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। নবীন পত্র-পল্লবে এবং মঞ্জরী-মৌলী-ভূষণে ভূষিত হইয়া নানা জাতীয় বৃক্ষলতা অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। অনন্ত আকাশের অনন্ত নীলিমা উজ্জ্বলতর হইয়া আল্লাহ্তালার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে! পাখীর কণ্ঠে ললিত ছন্দে নানাবিধ মধুর ও মনোহর কূজন স্ফুরিত হইয়া দিগদিগন্ত মুখরিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন মধুর ও মনোহর বসন্তকালে শিবাজী আমিনা বানুকে বিশেষ সম্বর্ধনা পূর্বক রাজধানী রায়গড়ে বিশেষ পরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

মালেকা প্রথমে নিমন্ত্রণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, নানা প্রকার ওজুহাত দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে বহু সাধ্য-সাধনা এবং অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়া

জননী হামিদা বানু, দুইশত সিপাহী এবং স্বকীয় সহচরীগণ সহ রায়গড়ে শুভাগমন করিলেন।

শিবাজী বিপুল আড়ম্বর ও ধুমধামে মালেকাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ফলতঃ শিবাজী দ্বারা মালেকা আমেনা বানুর আদর-অভ্যর্থনা যতদূর হওয়া সম্ভবপর, তাহার কিছুই ক্রটি হইল না। আমিনা, তাঁহার মাতা এবং সঙ্গীয় লোকজন সকলেই শিবাজীর ভদ্রতা, সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

শিবাজী এই সময়ে কৌশলে আমিনা বানুর রূপ-লাবণ্য বিশেষরূপে দর্শন করিয়া যার-পর-নাই লুব্ধ এবং মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমেনা বানুর ভাসা ভাসা পটল-চেরা ভুবন-মোহন-অক্ষিযুগল এবং সর্বাঙ্গের সুঠাম সুগঠন ও সৌন্দর্য দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবাজী অলোকসামান্য সুন্দরী, অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী এবং প্রখর রাজনীতিজ্ঞা, এই রমণীরত্নকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে, সমগ্র ভারতের অধিপতি হইবার আশাও পোষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমান কখনও কাফেরকে কন্যা দান করিতে পারে না, শিবাজী এই চিন্তাতেই অস্থির হইতে লাগিলেন। সুতরাং অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করিবার জন্য শিবাজী কাল্পনিক পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ধারিত হইল না। মন ক্রমেই মাতিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই লালসা বায়ু-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় অতীব প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

শিবাজী মালেকার সৌন্দর্য-সুধার এমনি পিপাসু হইয়াছিলেন যে, ক্রমশঃ তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা একেবারেই লোপ পাইল। মালেকাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ফেলিল। অবশেষে তাঁহার পরামর্শদাতা গুরু রামদাস স্বামীর পরামর্শে, ভানপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মালেকা আমেনা বানুর পাণিগ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। বিবাহ করিবার পরে সুবর্ণ-নির্মিত কৃত্রিম গাভীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রসব-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সেই গরু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে। আবার তিনি হিন্দুত্ব লাভ করিতে পারিবেন। রাজা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মোস্‌লেম-ললনার পাণিপীড়ন করিতে পারেন, রামদাস স্বামী এরূপ ব্যবস্থাও দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণকলা শশধরের অমল-ধবল জ্যোৎস্নালহরীতে গগন-ভুবন সুখ-তরঙ্গে ভাসিতেছে। কৃষ্ণগড়ের দুর্গ-মধ্যস্থ মনোহর উদ্যানে নানা

জাতীয় ফুল ফুটিয়া কৌমুদী-স্নাত হইয়া মৃদু মন্দ পবনে মধুর গন্ধ বিতরণ করিয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং খেলিতেছে। সরোবরে জলজ পুষ্পদাম প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহারিণী শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। নবপত্রপল্লবাসনে সুখে সমাসীন হইয়া কোকিল ও পাপিয়া সুধামাখা কূজনে অনন্ত শূন্য বক্ষে যেন কি এক পীযূষ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে! জলে-স্থলে শূন্যে সর্বত্র জ্যোৎস্নার মধুর ও শান্তোজ্জ্বল বিকাশ! মলয়া হাওয়ার অবিরাম সুখ-স্পর্শ মৃদু সঞ্চরণ। ফুলে ফুলে হাসির ঢলাঢলি! নীলিম গগন-পটে তারকাবলীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সমাবেশ! এ হেন মধু-যামিনীতে মালেকা আমিনাবানু প্রিয় সহচরী রোকিয়াকে সঙ্গে লইয়া উদ্যান মধ্যস্থ সরোবর ঘাটে গালিচা পাতিয়া বসিয়া প্রকৃতির চিত্তবিনোদন দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। মালেকা এবং রোকিয়া উভয়ে নীরব। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোকিয়া বলিল, "মালেকা! এ মধু-যামিনী এমন করে একেলা ভোগে সুখ কি? হৃদয়-রাজ্যে প্রেমের জ্যোৎস্না না ফুটলে বাইরের জ্যোৎস্নায় কেবল অন্ধকারই বৃদ্ধি করে!"

মালেকা : কেন? এই তো তুমি আছ! তোমার সঙ্গেই মধু-যামিনীর জ্যোৎস্না-লহরী পান করছি।

রোকিয়া : ঠাট্টা রাখ। দুধের সাধ কি ঘোলে মিটে? এমন করে যৌবন-জীবন যাপন করায় ফল কি? বিবাহ করাই সঙ্গত।

মালেকা : কথা তো ঠিক্! কিন্তু যাকে-তাকে তো আর স্বামীত্বে বরণ করতে পারি না। বীরপুরুষ না হলে, কাকেও বিবাহ করব না, এই সংকল্পই তো এখন বাধা হয়ে পড়ছে।

রোকিয়া : কেন, মোতামদ খান কি উপযুক্ত নন?

মা : মোতামদ খান একজন উপযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত আর কিছুই নন। তাঁকে বীরপুরুষ বললে অন্যায় হয় না বটে, কিন্তু আমি যে শ্রেণীর বীর-পুরুষ চাই, সে শ্রেণীর নহেন। মোতামদ খান যদি বাহুবলে রাজ্য সংস্থাপন করতে পারতেন অথবা কৃষ্ণগড়কে স্বাধীন করতে পারতেন, তা হলে তাঁকে বীরপুরুষ বলে স্বীকার করতাম।

রো : তবে শিবাজী?

মা : বটে! শিবাজী সাহসী পুরুষ এবং রাজ্য সংস্থাপনেরও চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতি নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট। শিবাজীকে বীরপুরুষ বলা কিছুতেই সঙ্গত নহে, দস্যু বল। বীরপুরুষের মহত্ত্ব ও বীরত্ব তাঁতে নাই। 'পার্বত্যমূষিক' উপাধিই তাঁর পক্ষে যথার্থ।

রো : কেন, আপনার প্রতি তো খুবই উদার ও সদয় ব্যবহার করেছেন।

মা : নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর ভিতরে তাঁর মৎলব আছে।

রো ঃ মৎলব ছাড়া দুনিয়ার কে কি করে থাকে?

মা ঃ তা বটে! কিন্তু মৎলবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই যার একমাত্র উদ্দেশ্য, সে মৎলব অতীব ঘৃণিত।

রো ঃ শিবাজীর মৎলব ঘৃণিত কিসে?

মা ঃ তাঁর এই সদয় ও উদার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাকে লুব্ধ করে বিবাহ করা। কিন্তু তাঁর জানা উচিত যে, মুসলমান মহিলা কখনও কাফেরকে পাণিদান করতে পারেন না।

রো ঃ তিনি তো আপনার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম পর্যন্ত অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছেন। আপনি বিবাহে স্থির-নিশ্চয় সম্মতি দিলে তিনি পৈতৃক হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম অবলম্বন করবেন। এতে তাঁকে নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে বটে; কিন্তু তবুও তিনি আপনার জন্য সে-সমস্ত সহ্য এবং বহন করতে প্রস্তুত আছেন। প্রেমের এমন আদর্শ এবং প্রেমের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্তই বিরল নহে কি?

মা ঃ নিশ্চয়ই। এরূপ ভণ্ডামী এবং এরূপ শয়তানী নিশ্চয়ই নিতান্ত বিরল!

রো ঃ ভণ্ডামী কিরূপ? হায়! একেই বলে 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!'

মাঃ ভণ্ডামী না হয়ত, ষণ্ডামী তো বটেই। সাত সাতটি স্ত্রী এবং কয়েক গণ্ডা উপপত্নী থাকতেও যাঁর আমার জন্য ঘুম হয় না, সে যদি আদর্শ প্রেমিক হয়, তবে আদর্শ লম্পট এবং পিশাচ আর কে?

রো ঃ যে-ব্যক্তি যাকে তনুমন সমর্পণ করেছে, সে যদি তাকে না পায়, তা হলে তার ঘুম না হওয়াই তো স্বাভাবিক। এ অবস্থা তো বেচারা শিবাজীর প্রতি দয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

মা ঃ বটে, বলিস্ কি? তুই পাগল নাকি! এরূপ লোকের প্রতি যদি দয়া হয়, তা হলে, বাম পদাঘাত করবার প্রবৃত্তি হবে আর কাকে?

রো ঃ ছিঃ! ছিঃ! এমন কথা বলা কি সঙ্গত?

মা ঃ যে ব্যক্তি নারী লাভের জন্য পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তার প্রতি ইহা অপেক্ষা সদুক্তি আর কি হতে পারে? যদি শিবাজী আজ ধর্মের জন্যই ধর্ম পরিগ্রহ করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করতাম। শিবাজী ইস্‌লাম ধর্ম পরিগ্রহ করলেও কদাপি তাতে স্থিরতর থাকবেন না। কোনও রূপে আমার রাজ্য এবং আমাকে হস্তগত করবার জন্যই ইস্‌লাম গ্রহণের ভান করা হচ্ছে। শিবাজী ইস্‌লামের পরম শত্রু। তিনি মস্‌জিদগুলি চূর্ণ এবং তাহা শূকর-রক্তে অপবিত্র করে পরম আনন্দ লাভ করেছেন। শিবাজীর ন্যায় নৃশংস দস্যু যদি দমিত না হয়, তা হলে ইস্‌লামের সমূহ অমঙ্গল বুঝতে হবে। আমি এহেন অস্পৃশ্য পাষণ্ড কাফেরের পাণিগ্রহণ করব, এরূপ আশা করা

বাতুলের পক্ষেই শোভা পায়। বরং শিবাজী এ-বিষয়ে যতই চেষ্টা করবেন, আমার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ততই বৃদ্ধি পাবে। আমি প্রাণান্তেও এমন ঘৃণিত দস্যু ও জাহান্নামী কাফেরকে কিছুতেই স্বামীত্বে বরণ করতে স্বীকৃতি নহি। এমন কি, এ-বিষয়ের আলোচনা করতেও আমি ঘৃণা এবং বিরক্তি বোধ করে থাকি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উষা তাহার অরুণিমা জালের চাঁপা আঙুলের কোমলস্পর্শে ঘন আঁধার রাশিকে তরল করিয়া নিদ্রিত বিশ্ববকে নব চেতনার সঞ্চার করিতেছে। প্রভাতবায়ু কুসুম-গন্ধ হরণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে স্বাস্থ্য ও স্নিগ্ধতা বিতরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে! মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গগণ নানাছন্দে সুললিত তানে বিশ্বপিতার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ধীরে ধীরে মৃতবৎ জগৎ বক্ষে কেমন মনোহর ও মধুরভাবে নবজীবনের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে।

এ হেন মধুর প্রভাতকালে অতি প্রত্যুষেই রায়গড়ের রাজপথের পার্শ্বে লোক সমাগম পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, রায়গড় তখন অতি ক্ষুদ্র শহর।

এই ক্ষুদ্র শহর আজ বিজাপুরের সেনাপতি মহাবীর আফজাল খাঁর অভ্যর্থনাহেতু পরম রমণীয়ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পথের মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে বিচিত্র তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছে! পতাকা, পুষ্প এবং কদলী বৃক্ষে সমস্ত রাস্তা গোলজার করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রগণ যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে! মহারাষ্ট্র রমণীগণ পুষ্পগুচ্ছে কুন্তল সাজাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে কোঁচা ও কাছা দিয়া শাটী পরিয়া অট্টহাস্যে এবং কোলাহলে গগন-পবন মুখরিত করিয়া রাস্তার এক এক স্থানে জটলা পাকাইতেছে। বহু সংখ্যক বালক ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।

এদিকে বাদ্যোদ্যম সহ মহারাষ্ট্রদিগের রাজা শিবাজী সহস্র সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যসহ মুসলমান-পোষাকে উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হইয়া সপারিষদ আসিয়া নগর তোরণের মূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

সহসা দূরে একটি তোপ গর্জন করিয়া উঠিল। সেই তোপ গর্জনের সঙ্গেই সর্বত্র একটি অস্ফুট কলরব উত্থিত হইল। শিবাজী অশ্বারোহী সৈন্য এবং পারিষদগণকে সঙ্গে লইয়া বেগে অশ্ব ছুটাইলেন। নহবতে নহবতে শাহানার সুরে শানাই বাজিয়া উঠিল। রাস্তার পার্শ্বের বাটী হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিবাজী, বিজাপুরের সেনাপতি বীরবর আফজাল খাঁকে পরম

সমাদরে এবং বিপুল আড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর সৈন্যগণ পতাকা উড়াইয়া এবং বিগল বাজাইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতে আফজাল খাঁ সহস্র সংখ্যক বীর-পুরুষসহ শিবাজীর সহিত অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতে বাদ্যকরগণ বিপুল উৎসাহে নানাবিধ শ্রুতিমধুর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল। তৎপশ্চাতে বিপুল জনতা ও পদাতিক সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। মারাঠা রমণীরা চতুর্দিক হইতে হুলুধ্বনি দিতে লাগিল।

আকাশে সূর্য উঠিয়াছে! তরুণ অরুণের লোহিত কিরণরাগে গগন-ভুবন মনোমোহন সৌন্দর্যে ভূষিত হইতেছে। কিন্তু বিশ্বলোচন সবিতা-দেবের প্রতি আজ কাহারো দৃষ্টি নাই। যে-সমস্ত হিন্দু সূর্যোদয়ে "জবা কুসুম সঙ্কাশ" প্রভৃতি স্তব আওড়াইয়া প্রত্যহ সূর্যের উপাসনা করিত, তাহাদেরও আজ সেই উপাস্য সূর্য-দেবতার দিকে নজর নাই। আজ সকলের দৃষ্টিই বিজাপুরের বীর সেনানী রূপবান্ ও তেজীয়ান্ আফজাল খাঁর প্রতি! আফজাল খাঁর অশ্বারোহণে চলিয়াছেন! তেজীয়ান্ অশ্ব নৃত্যশীল গতিতে ধীরে ধীরে কি বাঁকা ভঙ্গিমাতেই চলিয়াছে! আফজাল খাঁ রূপের ছটায় এবং বীর্যগরিমায় চারিদিক যেন আলো করিয়া চলিয়াছেন। কিবা কমনীয় কান্তি! কিবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব্যঞ্জক আয়ত লোচনযুগল! কিবা অঙ্কিত ভ্রূ! কিবা প্রশস্ত ললাট! কেমন বলিষ্ঠ ও পুষ্ট দেহ! মরি! মরি! কি তেজঃপুঞ্জ মূর্তি! কি বীরত্বব্যঞ্জক গোঁফ। যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। রমণীমহলে এই অপরূপ রূপের অস্ফুট স্বরে সমালোচনা উঠিল। সকলেই আফজাল খাঁর কোনও-না-কোনও অঙ্গের প্রশংসা করিতে লাগিল! তাঁহার সঙ্গীয় অশ্বারোহী সৈন্য এবং দেহরক্ষিগণেরই বা কি মনোরম গঠন-পারিপাট্য! কি বাঁকা ঠাম!

আফজাল খাঁর বাম পার্শ্বে শিবাজী চলিয়াছেন। শিবাজী মারাঠাদিগের মধ্যে সুশ্রী এবং সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ মারাঠারা দেখিল,—শিবাজীর শ্রী, চেহারার তেজঃ, গঠন-পারিপাট্য এবং পুষ্টি, আফজাল খাঁর তুলনায় কত নগণ্য! চন্দ্রের নিকট তারকা যেমন, পদ্মের নিকট শাপলা যেমন, কর্পূর আলোর নিকট মৃৎপ্রদীপের আলো যেমন, ময়ূরের নিকটে পাতিহংস যেমন, আফজাল খাঁর নিকটে শিবাজীও সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছেন। শিবাজীও বিস্মিত দৃষ্টিতে এক একবার নেত্রকোণে আফজাল খাঁর কমনীয় কান্তি, রমণীয় গঠন এবং তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দর্শন করিতেছেন, আর হৃদয়ে ঈর্ষার সর্প দংশনে জ্বলিয়া উঠিতেছেন। হায়! শত্রুর এত রূপ। এত বীর্য। একি কখনও সহ্য হয়! তাঁহার স্বজাতীয় মারাঠাদিগের নিকট আজ যে তাঁহার সর্বপ্রকার হীনতাই সূচিত হইতেছে।

যাহা হউক, নগরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই শিবাজী আফজাল খাঁকে লইয়া রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন!

এইখানে শিবাজীর আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁহার গুরু রামদাস স্বামী অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আফজাল খাঁর উপস্থিতি মাত্রেই একশত এক তোপ সম্মুখস্থ প্রান্তরে গর্জন করিয়া উঠিল! এই তোপ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা এক মহাবিপদের সঞ্চার হইল! শিবাজীর একটি প্রকাণ্ড হস্তী ভয়ে চঞ্চল হইয়া জনতার মধ্যে বেগে ছুটিতে লাগিল! মাহুত প্রাণপণে হস্তীটাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া ভীষণ প্রহার করিতে লাগিল। ভীষণ ডাঙ্গশের প্রহারে হস্তীটি উন্মত্তপ্রায় হইয়া মাহুতকে সবলে স্কন্ধ দেশ হইতে আকর্ষণপূর্বক পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। ভীষণ পদাঘাতে এবং গুরুভারে মাহুত মুহূর্ত মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

মাহুতকে নিহত করিয়া হস্তীটি আরও উন্মত্ত এবং ভীষণ হইয়া পড়িল। তাহার উন্মত্ততা এবং ভীষণতায় সেই সুসজ্জিত এবং সুশৃঙ্খল মিছিলের অগ্রভাগ একেবারেই বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিল! সর্বত্র ভীতির কোলাহল পড়িয়া গেল। হস্তীর সম্মুখ হইতে সকলেই বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তীটি বেগে ছুটিতে ছুটিতে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের এক স্থানে, যেখানে মারাঠা স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া মিছিল দেখিতেছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল। স্ত্রীলোকেরা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু রত্নখচিত কৌষেয়বস্ত্র-সুসজ্জিত রাজকুমারী তারা পলায়ন করিতে যাইয়া মঞ্চে কাপড় আট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। হস্তীটি এমন সময়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠায়, তারার দাসীগণ তারাকে ফেলিয়াই পলায়ন করিল। চতুর্দিকে ভীষণ আতঙ্কজনক উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইল! এক পলকের মধ্যে হস্তী তারাকে পাদ বিমর্দিত করিবে! সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল!

শিবাজী-তনয়া তারার কোমল-দেহ-কুসুম কুঞ্জরপদতলে দলিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। হস্তী এক পা উঠাইয়াছে! সর্বনাশ! সর্বনাশ! সকলেই তারার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সহসা কেন হস্তীটা ভীষণ আর্ত-চিৎকার করিয়া উঠিল! সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হইয়া দেখিল যে, উন্মত্ত হস্তীটা কপালে তীর বিদ্ধ হইয়া তারাকে ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। তীর একহস্ত পরিমিত মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং হস্তীটা কিয়দ্দূর যাইয়া ভূপতিত হইল। রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া জমিন সিক্ত হইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে হস্তীটি প্রাণ ত্যাগ করিল!

কে এই আসন্নবিপদ হইতে তারাকে রক্ষা করিল? কে এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে

ভীষণ তেজে তীর নিক্ষেপ করিয়া এই মহাবিপদের অবসান করিল? কাহার বাহুতে এমন দুর্জয় শক্তি যে, হস্তীর মস্তকের মস্তিষ্ক পর্যন্ত তীরে বিদ্ধ করিয়াছে?

সকলেই দেখিতে পাইল যে, বীরকুল-চূড়ামণি আফজাল খাঁই মুহূর্ত মধ্যে ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়া সবল ও নিপুণ হস্তের অব্যর্থ লক্ষ্যে রাজকুমারী তারাবাঈকে আকস্মিক মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্দিকে আফজাল খাঁর নামে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে আফজাল খাঁর সাহস এবং তেজের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

অতঃপর বিচ্ছিন্ন মিছিল আবার সুশৃঙ্খল করা হইল। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৈনিকগণ তিনবার করিয়া কুর্নিস করতঃ আফজাল খাঁ এবং তাঁহার প্রভু বিজাপুরের সোলতানের দীর্ঘজীবন উচ্চকণ্ঠে কামনা করিল।

আফজাল খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে সর্বপ্রথমে রামদাস স্বামী ধান্য-দূর্বা দ্বারা আফজাল খাঁর মঙ্গলার্চনা করিলেন। অতঃপর পুরুষ ও রমণীরা মিলিয়া আফজাল খাঁর শিরে ও সর্বাঙ্গে রাশি রাশি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। এত পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল যে, আফজাল খাঁর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। উপদ্রব দেখিয়া রামদাস স্বামী সকলকে ধমক দিলেন। কিন্তু যুবতীদিগের মধ্যে একটি রমণী নিষেধের পরও গোলাপের পাঁপড়ী আফজাল খাঁর মুখে বর্ষণ করিতে লাগিল। রামদাস স্বামী তখন বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি তারা, কি করছ! তোমার কি হুঁস নাই?" কিন্তু তারা তবুও আর এক মুষ্টি পুষ্প বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইল। তারার ভঙ্গী ও পুষ্প বর্ষণে মত্ততা দেখিয়া আফজাল খাঁ ঈষৎ স্মিতহাস্য করিলেন।

অতঃপর পরম যত্নে সুসজ্জিত প্রাসাদাভ্যন্তরে আফজাল খাঁকে লইয়া রামদাস স্বামী এবং শিবাজীর পিতা শাহজী তাঁহার সেবায় ও পরিতোষ-বিধানে নিযুক্ত হইলেন। সৈনিকপুরুষদিগকেও যথাযোগ্য বাসস্থান এবং আহার প্রদান করা হইল। আদর-অভ্যর্থনা এবং সম্মান-সম্বর্ধনা পূরামাত্রায় চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রি। জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চন্দ্র কিরণধারায় সমস্ত পৃথিবীকে পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে! নানা জাতীয় নৈশ-কুসুমের গন্ধ বাহিয়া মৃদুমন্দ গতিতে বায়ু বহিয়া যাইতেছে। এমন সময় রায়গড়ের একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ ক্ষুদ্র অট্টালিকায় শিবাজী, তাঁহার পিতা শাহজী, গুরু রামদাস স্বামী, বলবন্ত রাও, মালজী প্রভৃতি মারাঠাপ্রধানগণ গুপ্ত

পরামর্শের জন্য নিভৃতে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই গভীর চিন্তাযুক্ত—সকলেই নীরব। এই নৈশ গুপ্ত সভাধিবেশনের কথা আর কেহই অবহত নহে। রাজপুরীর আর কোনও নরনারী এ-সভার কোনও সংবাদ রাখে না এবং রাখিবারও কোনও প্রয়োজন নাই।

সকলেই নীরবে গৃহতলে সমাসীন। সকলেই গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট। মৌনতা ভঙ্গ করিয়া সহসা শাহজী বলিলেন, "বৎস শিবা! অকারণে রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ। আমরা বিজাপুরের সোলতানের অধীনে বেশ আরাম ও স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করছি। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। চোর-দস্যুর উৎপাত একেবারেই নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-কৃষি অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই তুল্যভাবে শাসিত এবং পালিত হচ্ছে। মুসলমান শাসনে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচারে কোনও পার্থক্য নাই। উচ্চ রাজকার্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার। তার পর বিজাপুরের সোলতান, শুধু আমাদের রাজাই নহেন;—আমাদের প্রভু এবং অন্নদাতা। আমি, যে-রাজার একজন অমাত্যের মধ্যে গণ্য, সেই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ—মহাপাপ! ধর্ম এ-পাপ কখনও সইবে না। এতে কেবল ধ্বংস ও অকীর্তিই আনয়ন করবে।

"প্রবলপ্রতাপ সোলতানের বিরুদ্ধাচরণ করা ছেলেমী এবং পাগলামী মাত্র। হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁর দু'চারটি দুর্গ এবং দশ-বিশখানা গ্রাম দখল করেছ বলে, সম্মুখসমরে তাঁর পরাক্রান্ত বাহিনীকে কোনও রূপে পরাজিত করতে পারবে, এরূপ কল্পনা তুমি স্বপ্নেও পোষণ করো না।

"সোলতান অত্যন্ত সরলচেতা এবং উদার প্রকৃতির লোক। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতের পক্ষপাতী নহেন। তাই আমাকে বিনা যুদ্ধে গোলযোগ মিটাবার জন্য পাঠিয়েছেন। বৎস, যদি তোমার পিতা জীবনকে বিপন্ন না করতে—অধিকন্তু নিজেকেও রক্ষা করতে চাও, তা হলে সোলতানের বশ্যতা স্বীকার করে রাজভক্ত প্রজারূপে বাস করাই সর্বথা যুক্তিসঙ্গত। তুমি যে-সমস্ত দুর্গ অধিকার করেছ, তুমিই তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকবে। এ অপেক্ষা মহামাননীয় সোলতানের নিকট আর কি অনুগ্রহ পেতে চাও? ইহা বাস্তবিক লোকাতীত মহানুভবতা। দেবতারাও ইহার অধিক অনুগ্রহ করতে পারে না।

"প্রিয় শিবা! সোলতান আমার বিলম্ব দেখলে নিশ্চয়ই সন্দিগ্ধ হবেন। তুমি সেনাপতি আফজাল খাঁর নিকটে আগামী কল্য বশ্যতা স্বীকার করলেই, সমস্ত অশান্তি ও গোলযোগ মিটে যায়। এ শুভকার্যে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চিন্তা করে দেখ—সামান্য অবস্থায় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং সামান্য লোক হয়ে বিজাপুরের সম্মানিত সামন্তের মধ্যে গণ্য হওয়া ভাল, কি জনসমাজে কুক্কুর তুল্য ঘৃণিত দস্যু বলে অভিহিত হয়ে সর্বদা বনজঙ্গলে উৎকণ্ঠিতভাবে

জীবনযাপন করা ভাল!"

পিতার কথায় শিবাজী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তারপরে বলিলেন, "বাবা! আপনি যা বললেন, তা উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন হীনচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত বটে, যশোলোলুপ রাজ-পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ-উপদেশ গ্রাহ্য হতে পারে না। রাজ্য কাহারও পৈতৃক বা বিধিনির্দিষ্ট নিজস্ব বস্তু নহে। যে বাহুবলে অধিকার করতে পারে, তারই হয়ে যায়। সুতরাং রাজবিদ্রোহীতা কথাটার কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ, ইহা যে কোনও পাপ কার্যের মধ্যে গণ্য, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

"পৃথিবীতে রাজপদ যখন সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তখন ছলে-বলে কলে-কৌশলে যে-কোনও প্রকারে হউক, তা লাভ করাই আমার মতে পরম ধর্ম। যখন আমি সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি, তখন আর সোলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

শাহজী ঃ বৎস শিবা! তুমি যা বললে, তা অনেকটা সত্য বটে। কিন্তু তুমি কি বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেছ? কিম্বা করতে সমর্থ? তুমি অত্যন্ত ভুল বুঝছ! তুমি যে-বৃত্তি অবলম্বন করেছ, তা বীরপুরুষ বা রাজধর্মী ব্যক্তির বৃত্তি বলে কদাপি অভিহিত হতে পারে না, পূর্বেই বলেছি, ইহা অতি জঘন্য দস্যুবৃত্তি! দস্যু সকলেরই ঘৃণার পাত্র এবং শূল-দণ্ডে বধ্য।

শিবা ঃ কিন্তু এই দস্যুবৃত্তি ব্যতীত যখন অন্য কোনও উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন এই দস্যুভাবেই আমাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধনা করতে হবে। আমি এই কর্তব্য হতে কিছুতেই আর এখন বিচলিত হতে পারি না। আপনি আর বিজাপুরে ফিরে যাবেন না। পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম কঙ্কন প্রদেশের দুর্গে যেয়ে সুখে বাস করুন। আপনার কেহ কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আমি এদিকে ছলে-বলে কলে-কৌশলে যে-রূপেই হউক, সোলতানের আধিপত্য নষ্ট করে রাজ্যস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব। যদি কোনও বিপদ ঘটে, তা আমার প্রতিই ঘটবে। যদি কিছু অধর্ম হয়, তা আমারই হবে। সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনি আমার আর কোনও কার্যেরই আলোচনা করবেন না।

শিবাজীর কথা শুনিয়া শাহজী একটু রুষ্ট হইয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য, তোমার পাপ কার্য-মহাপাপ কার্যেরও সমালোচনা করতে পারব না! আমি এমন রাজদ্রোহী দস্যু পুত্রের মুখ দেখতেও ইচ্ছা করি না। তোমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পার, কিন্তু পরিণামে এই ঔদ্ধত্য এবং পাপের জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।" এই বলিয়া শাহজী নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত অবস্থায় সেই নিভৃত গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শাহজী নিভৃত গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলে, শিবাজী এবং রামদাস স্বামী প্রভৃতি মিলিয়া যে-পরামর্শ করিলেন, তাহা যার-পর-নাই ঘৃণিত এবং পাপজনক! আফজাল খাঁকে সহসা আক্রমণ করিয়া বধ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য! তাঁহাকে বধ করিতে পারিলে, বিজাপুরাধিপের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে বলিয়া শিবাজীর দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আফজাল খাঁর ন্যায় এরূপ তেজীয়ান্ এবং মহাবীর সেনাপতি লাভ বহু ভাগ্যের কথা। শিবাজী অনেকবার বলিলেন যে, 'আফজাল খাঁর ন্যায় বীর পুরুষের সাহায্য পাইলে তিনি দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারেন।' এহেন আফজাল খাঁকে কোনও রূপে নিহত করিতে পারিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যে অনেকটা নিষ্কণ্টক হয়, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আফজাল খাঁকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরস্থ একটি অট্টালিকার সজ্জিত কক্ষে তারাবাঈ একটি জানালার ধারে বসিয়া গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। তারাবাঈয়ের সখী মঞ্জরীমালা এবং ধাত্রী সারদা উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। কেবল নীরব প্রশস্ত কক্ষে শিবাজীর প্রাণাধিক-প্রিয় দুহিতা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা তারাবাঈ রূপের ছটায় সমস্ত কক্ষ আলোকিত করিয়া জাগিয়া জাগিয়া কি-যেন চিন্তা করিতেছে। বাতায়ন-পথে হেমন্তের ঈষৎ শীতল সমীরণ ধীর গতিতে প্রবাহিত হইয়া যুবতীর কুঞ্চিত অলকরাজি এবং চেলাঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

যুবতী যেমনি সুন্দর সুঠাম, তেমনি বেশ তেজস্বিনী অথচ কমনীয় মূর্তিবিশিষ্ট। যুবতী শিশিরসিক্ত বালার্কের নব অরুণিমা-রাগ-রঞ্জিত বসরাই গোলাপের ন্যায় মনোহর! অথবা শারদীয় উষার ন্যায় চিত্তহারিণী। সমগ্র মহারাষ্ট্রে তারাবাঈয়ের ন্যায় সুন্দরী যুবতী আর একটি আছে কি-না সন্দেহ। তারাবাঈকে দেখিলে, তাহাকে আদৌ মারাঠা-কন্যা বলিয়া বোধ হইত না। মনে হইত, যেন কোনও ইরাণী-সুন্দরী মারাঠী পরিচ্ছেদে দেহ সাজাইয়া অন্তঃপুর আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। যৌবনসমাগমে তারা বর্ষার নদীর ন্যায়, বসন্তের গোলাপের ন্যায়, শরতের পদ্মের ন্যায়, উষার তারকার ন্যায়, পরিপুষ্ট, কমনীয়, লোভনীয় এবং শোভনীয় হইয়াছে! তাহার অন্তরের পর্দায় পর্দায় কি যেন এক নব ভাবাবেশের অনন্ত সৌন্দর্য উথলিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিমার চন্দ্রদর্শনে নদনদী সমুদ্রের স্থির জল যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, তারাবাঈয়ের স্থির অচঞ্চল হৃদয়ও আজ তেমনি

অসাধারণ সৌন্দর্যশালী পুরুষরত্ন আফজাল খাঁকে দর্শন করিয়া প্রেমানুরাগে অধীর ও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যে মালোজীর সঙ্গে তারার বিবাহের কথা হইয়াছে, যে মালোজীর বীরত্বের কথা শুনিয়া এবং বীর্যপুষ্ট-দেহ-কান্তি এবং রূপশ্রী দেখিয়া তারাবাঈ মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সেই মালজীর শ্রী ও কান্তি তারার কাছে তেমন চিত্তবিনোদন বলিয়া আর প্রতিভাত হইতেছে না। তারা মনে মনে তাহার ইষ্টদেবতা শঙ্করকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল যে, মালোজীর সহিত বিবাহের পূর্বেই সে আফজাল খাঁর ন্যায় পুরুষরত্নের দর্শন পাইয়াছে। আশার সহিত দারুণ নিরাশায় তাহার চিত্ত ঝঞ্ঝানিল-সন্তাড়িত সরসীর ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

আফজাল খাঁকে দেখিয়া তারার হৃদয়-মন তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়! প্রকাশ্যে তাহা উৎসর্গ করিবার কোনও উপায় হইবে কি? পিতার শত্রুপক্ষীয় সেনাপতির প্রতি অনুরাগ, কি ভয়ানক কথা! কি অসম্ভব ব্যাপার! তারাবাঈ প্রেমোদ্বেল চিত্তকে নানা প্রকারে শান্ত ও সংযমিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্যতার অপেক্ষা পরাজয়ের মাত্রাই আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তারা বড়ই বিপদে পড়িল। সে আফজাল খাঁকে যতই ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আফজাল খাঁর মূর্তি ততই উজ্জ্বল ও তাঁহার প্রতি প্রেমাশক্তি ততই শত গুণে দৃঢ় বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তারার দুই কপোল বহিয়া অশ্রুধারা মুক্তাধারার ন্যায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তারা যতই পাঠানবীরকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, মন ততই বলিতে লাগিল, আহা! তাঁহাকে কি ভোলা যায়! কি চমৎকার মোহিনী মূর্তি! মরি! মরি! কি রূপেরই বাহার! কি কান্তির ছটা! কি তেজঃ! কি সাহস! কি স্ফূর্তি! যেন সাক্ষাৎ কার্তিক। কি লাবণ্যের জোয়ার! কি ভুবনভুলানো অক্ষিযুগল! এমন নব্য যুবক, এমন সুঠাম ও সুশ্রী তেজস্বী পুরুষ! হায়! উহার চরণে আত্মবলিদানেও যে সুখ! উহার কথা স্মরণ করিতেও যে হৃদয় অমৃতরসে সিক্ত হইয়া যায়!

তারাবাঈ আফজাল খাঁকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, আফজাল খাঁর প্রোমোন্মাদনায় আরও উন্মত্ত হইয়া পড়িল! ধৈর্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল! মনে হইতে লাগিল, কিসে যেন হৃৎপিণ্ডটাকে আফজাল খাঁর দিকে সবেগে আকর্ষণ করিতেছে! তাহার শরীরের অণু-পরমাণু যেন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আফজাল খাঁর প্রতি ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে! কি ভীষণ ব্যাপার! কি অভূতপূর্ব ঘটনা! যুবতী বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল! বস্তুতঃ প্রেমের আকর্ষণের নিকট সকল আকর্ষণই পরাস্ত! প্রেমের প্রভাবের নিকট সকল প্রভাবকেই খর্ব হইতে হয়। মানব ক্ষুদ্র জীব! তাহার হৃদয়টি আরও ক্ষুদ্র! কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-সঞ্জাত প্রেমের ধারা সারা বিশ্বকে ভাসাইয়া দিতে পারে।

এই প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগে তারা অধীর ও আকুল হইয়া উঠিল! তারাবাঈ আকুল প্রাণ লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে সেদিকে, প্রাঙ্গণের ধারে, দীঘির পাড়ে চিন্তা-ভারাক্রান্ত চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল! আর পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে আফজাল খাঁর অবস্থান অট্টালিকার দিকে দৃকপাত করিতে লাগিল। তাবা বেড়াইতেছে কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগ ও কামনার আগুন তাহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখায় কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। তারা ক্রমশঃ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে বাগানের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে ক্রমশঃ বাগানটির রমণীয় সৌধের নিকটবর্তী হইল। সৌধ দেখিয়া মনে হইল, এই নির্জন সৌধে আফজাল খাঁকে পাইলে সে অশ্রুজলে তাঁহার পদতল অভিষিক্ত করিয়া দিত। কিন্তু হায়! তাহার দগ্ধ অদৃষ্টে এ-সুযোগ কখনও জুটিবে কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই নির্জন সৌধের যেমনি নিকটবর্তী হইল, অমনি শুনিতে পাইল, "আফজাল খাঁকে যে-রূপেই হউক, হত্যা করতে হবে। শত্রুকে ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোনও প্রকারে হত্যা করাই পরম ধর্ম।"

সহসা বজ্রাঘাত হইলেও তারাবাঈ কখনও এরূপ চমকিত ও আতঙ্কিত হইত না। তাহার প্রেমের পাত্র আফজাল খাঁর হত্যার সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাহার হৃদয়ের স্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া গেল! একজন মহা পরাক্রান্ত ক্ষমতাশালী সেনাপতিকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করিবার মত এমন পৈশাচিক প্রবৃত্তি এবং ভীষণ হীনতা যে মানুষের মনে স্থান পাইতে পারে, ইহা কিছুতেই সেই সরলা তরলা প্রেম-বিহ্বলা কুমারীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা বা ধারণা করা সহজ ছিল না। তাহার পিতা শিবাজী ডাকাতি করেন বটে, কিন্তু এমনি করিয়া ছলনা-পূর্বক যে ঠগীর ন্যায় নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতেও পটু,. তাহা জানিতে পারিয়া পিতার প্রতি বিষম ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাবে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল!

এক্ষণে কিরূপে তাহার হৃদয়-আকাশের শরচ্চন্দ্রমা, জীবন-উদ্যানের রসালবৃক্ষ আফজাল খাঁকে হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবে, তচ্চিন্তায় শিবাজীনন্দিনী যৎপরোনাস্তি আকুল হইয়া উঠিল। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রেম-দেবতা আফজাল খাঁকে দস্যুধর্মী পিতার নিদারুণ ষড়যন্ত্র এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য তারাবাঈ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মানব-হৃদয়ে যখন নবীন প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন উহা গিরিগুহা-নির্গত তরঙ্গিণীর ন্যায় তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকে। নদীর সম্বন্ধে—

"পর্বত-গৃহ ছাড়ি,
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

ইহা যেমন সত্য, প্রেমের সম্বন্ধেও তেমনি নীচের কবিতাটি অটুট সত্য।

মানস কন্দর হতে যৌবন-উষায়,
যে প্রেমের মন্দাকিনী কারো পানে ধায়,
কার সাধ্য তার গতি করে অবরোধ?
রোধিতে যে চায়, সেই নিতান্ত নির্বোধ!
বায়ু জল উল্কা তীর কত ধরে বেগ
তাহার অধিক জান প্রেমের উদ্বেগ!
প্রেমের সমুখে হায়! কঠিন পাষাণ
হয়ে যায় সুকোমল ফুলের সমান!
সাগর গোষ্পদ হয়, মরু হয় বন,
দুঃখে উপজয় সুখ, মরণে জীবন!
যত দুঃখ যত ক্লেশ যত নির্যাতন,
প্রেম করে সকলেরে সুধা-প্রস্রবণ!
বিষেরে অমৃত করে, আঁধারে আলোক,
নরকেরে স্বর্গ করে বিষাদে পুলক,
আপনারে ভুলে যাওয়া পরের কারণ
ইহাই প্রেমের বটে প্রথম লক্ষণ।
দ্বিতীয় লক্ষণ শুধু স্মরণ, সেবন
প্রেমাস্পদ হেতু শেষে আনন্দে মরণ!

তারাবাঈ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে প্রাচীরের গায়ে কান লাগাইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শিবাজীর সমস্ত পরামর্শ শ্রবণ করিল। আফজাল খাঁকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের সমস্ত মন্ত্রণা শুনিয়া ব্যাকুল চিত্তে ত্রস্ত চরণে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তরুণ অরুণের কনক-কিরণ-রাগে চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে। প্রভাতপবন বনভূমির স্বভাবজাত কুসুমগন্ধ বহন করিয়া মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। শিশির-সিক্ত পাতায় পাতায় সূর্যের রশ্মি পতিত হইয়া শ্যামলিমার অঙ্গে লালিমার কি অপূর্ব বাহার খুলিয়াছে! নানাজাতীয় বিচিত্র-বর্ণ বিচিত্র-পক্ষ সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গগণ কূজন-লহরীতে বিমাল আরণ্য প্রকৃতিতে মুখরিত এবং পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণগড় ও রায়গড়ের সীমানাস্থিত অরণ্যে মৃগয়ার জন্য

শিবাজী এবং আফজাল খাঁ কতিপয় শিকারী অনুচর, বহুসংখ্যক কুকুর,বাজপক্ষী ও পালিত চিতা বাঘ সহ্ প্রবেশ করিলেন। পঞ্চাশটি হস্তী শিকারী ও শিকারের সরঞ্জাম বহন করিয়া নিবিড় অরণ্য তোলপাড় করিয়া ক্রমশঃ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল। হস্তিযূথের ভয়ে বিহঙ্গগণ ত্রাসিত হইয়া চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় উড়িতে লাগিল। মৃগ, কৃষ্ণসার ও অন্যান্য আরণ্যজন্তু চতুর্দিকে ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শিকারিগণ কেহ্ তীর, কেহ্ বা বন্দুকের দ্বারা মৃগ শিকার করিতে লাগিল।

শিকার করিতে করিতে ক্রমশঃ আফজাল খাঁ এবং শিবাজী একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য-নদীর তটে গভীর বনে উপস্থিত হইলেন। এই নিবিড় বনের একটানা শ্যামল-শোভা দেখিয়া আফজাল খাঁ নিতান্তই বিমোহিত হইলেন। এই বনে সিংহ বাস করিত বলিয়া সাধারণ শিকারীরা প্রায় এ দিকে পদার্পণ করিত না। কিন্তু আফজাল খাঁর সিংহ এবং ব্যাঘ্র শিকারের অপরিমিত কৌতূহল ছিল বলিয়া এই বনে স্বেচ্ছায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনের নিবিড় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আফজাল খাঁ দুই হস্তে বক্রমুখ ক্ষুদ্রাকৃতি দুইখানি তরবারি ধারণপূর্বক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক দুইজন অনুচর সহ্ পদব্রজে বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই সিংহ-নিবাস বনে প্রবেশ করিতে অনেকেরই অমত ছিল। কিন্তু পাঠান বীর আফজাল খাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ এবং দৃঢ়তার নিকট সকলের আপত্তি ও ভীতি প্লাবনের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল্। আফজাল খাঁর পশ্চাতে আরও পাঁচজন বীরপুরুষ তরবারি মাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়াবহ বনে প্রবেশ করিলেন। শিবাজী এবং তাঁহার অন্যান্য মারাঠা অনুচর এবং আফজাল খাঁর সঙ্গীয় অন্যান্য যোদ্ধা ও শিকারী হস্তিপৃষ্ঠে সেই নিবিড় বনের মধ্যে খাঁ সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল।

বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই প্রকাণ্ড শাল, গজারী, দেবদারু, তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। বহুকালের বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া এই নিবিড় বন যার-পর-নাই গম্ভীর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এই কারণে সূর্যরশ্মি কদাচিৎ প্রবেশ করিত। আফজাল খাঁ অনুচর পঞ্চকসহ্ সেই নিবিড় বনে সিংহ শিকারের জন্য তরবারি হস্তে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে এক ক্ষুদ্র পর্বতমূলে একটি গুহার সম্মুখীন হওয়া মাত্র সহসা দুইটি সিংহ ভীষণ গর্জনে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া উল্লম্ফনপূর্বক আফজাল খাঁর উপরে পতিত হইবার উপক্রম করিল। তখন মহাবীর আফজাল খাঁ এবং সহচরগণ মুহূর্ত মধ্যে সাবধান হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সিংহ লক্ষ্যে তরবারি ধারণ করিলেন। এই সময় বীরবর আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সঙ্গীদের বদনে অপূর্ব দৃঢ়তা এবং বীরত্বের তেজঃ অতি চমৎকাররূপে ফুটিয়া

উঠিল। সিংহ আফজাল খাঁর উপরে পতিত হইবার প্রাক্কালে মহাসাহসী আফজাল খাঁ তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে সিংহের গ্রীবাচ্ছেদন করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সিংহিনীও আফজাল খাঁ সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার উপরে আপতিত হইতে না পারিয়া মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং পর মুহূর্তেই লম্ফ প্রদানপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে আফজাল খাঁর বাম বাহুর উপরে পতিত হওয়া মাত্রই খাঁ সাহেব দক্ষিণ হস্তের অসির ভীষণ আঘাতে সিংহিনীর মস্তক বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অর্ধহস্ত পরিমিত তরবারির অগ্রভাগ সিংহিনীর মস্তক মধ্যে প্রবেশ করায় সে ভীষণ হুঙ্কার করিয়া দূরে যাইয়া পতিত হইল। আফজাল খাঁ অসির দ্বিতীয় আঘাতে সিংহিনীটিকেও দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সকলে আফজাল খাঁর সাহস এবং কৌশল দেখিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে 'সাবাস! সাবাস!' করিতে লাগিল।

আফজাল খাঁর বাম বাহুতে সিংহিনীটা একটু নখর বসাইয়া দিয়াছিল, সেখানে কিঞ্চিৎ চূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পট্টি বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

সকলে আফজাল খাঁকে বনপ্রবেশে নিরস্ত হইতে বলিলে, তিনি স্মিত হাস্য করিয়া বিপুল উৎসাহে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া শিবাজী এবং অন্যান্য বীরপুরুষ'ও শিকারিগণ বহু মৃগ, চিতা, বন্য-কুক্কুট, ময়ূর ও অন্যান্য পক্ষী শিকার করিলেন। অতঃপর দ্বিপ্রহর সমাগমে সকলে এক মনোহর উপত্যকায় উপনীত হইয়া আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই স্থলে নির্মল ও বিশুদ্ধ জলের একটি ঝরণা হইতে অতি বেগে জলরাশি উদ্‌গত হইতেছিল। ছায়াযুক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ বিরাজমান থাকায় চন্দ্রাতাপের কার্য সাধিত হইল। সঙ্গে তাম্বুর অভাব না থাকিলেও তাহা খাটাইবার কোনও প্রয়োজন বোধ হইল না। মারহাট্টা এবং মুসলমানগণ পৃথক পৃথক স্থানে মৃগয়ালব্ধ নানা জাতীয় মৃগ ও পক্ষিমাংসের কাবাব, কোফ্‌তা এবং কোরমা প্রস্তুতপূর্বক উদরপূর্তি করিলেন। ঝরণার জল পান করিয়া সকলেই তৃপ্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পরে সূর্যের তেজঃ কিছু মন্দীভূত হইলে, আফজাল খাঁ এবং শিবাজী দলবল সহ হস্তিপৃষ্ঠে কৃষ্ণগড়ের সীমান্তের দিকে মৃগয়া করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে এক বনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সহসা একটি প্রকাণ্ডকায় ভীষণ ব্যাঘ্র একটি উচ্চ ভূখণ্ড হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক একেবারেই শিবাজীর উপর পতিত হইল। হঠাৎ ব্যাঘ্রের আক্রমণে শিবাজী যার-পর-নাই আড়ষ্ট এবং হতবুদ্ধি হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। ব্যাঘ্ররাজ শিবাজীর গ্রীবা ভাঙিয়া রক্তপান করিবার উদ্যোগ করায়

চতুর্দিকে একটি ভীতিজনক অস্ফুট রব উত্থিত হইল। শিবাজীর হস্তের তরবারিখানি ভূপতিত হইবার সময়ে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। কোষে আর একখানি তরবারি থাকিলেও শিবাজী ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেও অসমর্থ ছিলেন।

সকলেই শিবাজীর আসন্নমৃত্যু কল্পনা করিয়া যখন ভীত ও ব্যাকুল হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে দেখিতে পাইল যে, মহা সাহসী আফজাল খাঁ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তরবারি হস্তে বেগে লম্ফ প্রদানপূর্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইবার পূর্বেই প্রচণ্ড আঘাতে ব্যাঘ্ররাজকে দ্বিখণ্ড করিয়া মূর্চ্ছিত শিবাজীকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন। চতুর্দিক হইতে হর্ষ-রসাপ্লুত কণ্ঠে "সাবাস! সাবাস!" শব্দ উত্থিত হইল।

আফজাল খাঁর সাহস, কার্যতৎপরতা এবং সত্বরতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল! শিবাজী ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে তাঁহার প্রাণদাতা বীরবরকে পুনঃপুনঃ মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা জানিয়াও যিনি পরের প্রাণ রক্ষার জন্য ভীষণ ব্যাঘ্রের মুখে লম্ফ প্রদানপূর্বক পতিত হইতে পারেন, তাঁহার বীরত্ব ও পরহিতৈষণার তুলনা কোথায়?

এই ঘটনার পরে আফজাল খাঁর লোকজন আর অগ্রসর না হইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য মত প্রকাশ করিলেও, শিবাজী অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্যে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণগড়ের প্রান্ত পর্যন্ত যাইবার জন্য জেদ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে মহাবীর আফজাল খাঁ সাহেব উৎসাহিত হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া রাত্রি যাপনের মত প্রকাশ করিলেন, সুতরাং শিকারীর দল আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলাও তখন খুব বেশি ছিল না। খুব দ্রুত গমন করিলেও এক প্রহর রাত্রির পূর্বে কৃষ্ণগড়ের প্রান্ত পর্যন্ত উপস্থিত হইবার কোনই আশা ছিল না। সুতরাং মাহুতেরা হস্তিযূথকে খুব দ্রুত গমনের জন্য বিশেষ তাড়া করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে দর্শন করিল যে, নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য হইতে সহসা সর্বাঙ্গ-বর্মমণ্ডিত একজন অশ্বারোহী এক ক্ষুদ্র পর্বতের পার্শ্ব হইতে আফজাল খাঁর সম্মুখীন হইয়া অভিবাদনপূর্বক একখানি পত্র প্রদান করতঃ পর মুহূর্তেই বিদ্যুদ্বেগে অশ্বচালনা করিয়া সেই নিবিড় বনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আফজাল খাঁ পত্র পাঠ করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনৈক পার্শ্বচর পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আফজাল খাঁ বলিলেন যে, পত্রখানি বিজাপুর হইতে আসিয়াছে। সোলতান তাঁহাকে শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরিবার জন্য লিখিয়াছেন।

শিবাজী সহসা সেই অশ্বারোহীর আগমন এবং দ্রুত গমনে কিঞ্চিৎ বিচলিত

হইয়া কয়েকজন সৈনিককে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কয়েকজন মারাঠী অশ্বারোহী সেই অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবনের উপক্রম করায় আফজাল খাঁ কঠোর দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন যে, অশ্বারোহী বিজাপুর সোলতানের খাস সংবাদবাহক। তাহাকে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং অশ্বারোহিগণ আর তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল না। কিঞ্চিত অগ্রসর হইবার পরে আফজাল খাঁ শিবাজীর পশ্চাতে পড়িবার চেষ্টা করিয়া শিবাজীকে বলিলেন, "এখানের পথ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ বিশেষতঃ অন্ধকার হয়ে আসছে, আমার মাহুত ভাল দেখতে পাচ্ছে না, আপনার হাতীটাকে আগে চালান। তা হলে আমার হাতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়ার সুবিধা পাবে।"

শিবাজী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "হায়! তাও কি হয়! আপনাকে পিছে রেখে আমি অগ্রে যাব, তা কখনও মনে করবেন না। আমা দ্বারা এরূপ বে-আদবী কখনও হবে না।"

আফজাল খাঁ হস্তী থামাইয়া শিবাজীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু শিবাজী কিছুতেই অগ্রগমনে সম্মত হইলেন না। সুতরাং অগত্যা আফজাল খাঁই পূর্বের ন্যায় অগ্রগামী হইলেন। এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আফজাল খাঁ শিবাজীকে আবার অগ্রগমনের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। শিবাজী পুনরায় অস্বীকৃত হইলেন। আফজাল খাঁ তখন সেই স্থলে হস্তী হইতে অবতরণপূর্বক সঙ্গী সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা কয়েক খণ্ড গুরুভার প্রস্তর এই রাস্তার উপর দিয়ে সাবধানে সম্মুখের দিকে গড়িয়ে লয়ে যাও। এই রাস্তায় ঘোড়াডুবি-গর্ত আছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আফজাল খাঁর আদেশ মাত্রই কতিপয় সৈন্য দুইটি গুরুভার প্রস্তর গড়াইয়া কিয়দ্দূর লইয়া যাইতেই সহসা একখণ্ড প্রস্তর শ্যামল দূর্বাযুক্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দে নিম্নে পতিত হইল। এই ভীষণ ও ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। আফজাল খাঁর সর্বনাশ সাধনের জন্যই যে, এই ভীষণ ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী থাকিল না। এই ভীষণ ষড়যন্ত্র লইয়া বিশেষ আলোচনা হইবার পূর্বেই শিবাজী সহসা এক বংশীধ্বনি করিলেন। সেই বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক লুক্কায়িত মাওয়ালী সৈন্য, প্রতি প্রস্তর খণ্ড, প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি ঝোপের আড়াল হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আফজাল খাঁ এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী সৈন্যকে ভীষণ ভাবে

আক্রমণ করিল। অগণ্য হস্তী বা মহিষ-যূথ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সিংহ যেমন ভীষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আফজাল খাঁ এবং তৎসঙ্গিগণও সেইরূপ রোষে-ক্ষোভে-দুঃখে প্রজ্বলিত হুতাশন প্রায় নিতান্ত প্রদীপ্ত হইয়া ভীষণ তেজে উলঙ্গ কৃপাণ করে অরাতি নিধনে প্রমত্ত হইলেন। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে তাঁহাদের কাফের-শোণিত-পিপাসু তরবারি বিদ্যুৎ চমক প্রদর্শন করিতে লাগিল। ত্রিশজন মোসলেম প্রায় দুই সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিতে লাগিল।

এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের সম্মুখস্থ মাওয়ালী সৈন্যগণের ভিড় ঠেলিয়া এবং প্রচণ্ড প্রহারে তাহাদিগকে তরল পারদের ন্যায় চঞ্চল করিয়া আফজাল খাঁ সেই গিরপথের মধ্যে প্রবেশ করতঃ আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা ও উদ্যোগ করিলেন।

আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সৈন্যগণ কেহই বর্মপরিহিত ছিলেন না। সুতরাং শরীরের নানাস্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সন্ত্রস্ত হিংসের ন্যায়, পবনাহত পাবকের ন্যায়, উন্মত্ত কুঞ্জরের ন্যায়, আহত ফনীর ন্যায়, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, ভীষণ বাতাবর্তের ন্যায়, নিতান্ত উগ্র এবং একান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া তেজঃদৃপ্ত ও সংহারক হইয়া পড়িলেন! "দীন দীন" রবে ভীষণ গর্জন ও হুঙ্কার করিয়া শত্রু বধ করিতে লাগিলেন। ভীষণ ও অসম যুদ্ধে দশজন মোসলেম বীরপুরুষ নিহত হইলেন। মারাঠীদিগের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিহত হইয়া ভূপতিত হইল। তথাপি রণে ভঙ্গ না দিয়া আফজাল খাঁকে নিহত বা বন্দী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্নাজাল পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। আফজাল খাঁ বিশ্বাসঘাতক ও বেইমান শিবাজীর প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা সাধন মানসে, শত্রুশ্রেণী ভেদ করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিবাজী আফজাল খাঁর ভয়াবহ সংহারক মূর্তি দর্শনে কম্পিত এবং ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই দেখিয়া সম্মান রক্ষার্থ মরিয়া হইয়া ভল্ল বিস্তারপূর্বক তেজের সহিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বহুসংখ্যক মাওয়ালী ও মারাঠী যোদ্ধা আসিয়া আফজাল খাঁর ভীষণ আক্রমণ হইতে দস্যুপতি শিবাজীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। আফজাল খাঁকে লক্ষ্য করিয়া সকলেই ভীষণ বেগে বিষাক্ত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। কয়েকটি তীর আফজাল খাঁর স্কন্ধে এবং শরীরের নানাস্থানে বিদ্ধ হইলেও, পুরুষসিংহ তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুর্বিসহ পরাক্রমে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দমতেজঃ প্রভাবে শিবাজীর দেহরক্ষী কতিপয় দস্যুযোদ্ধার মস্তক ছেদনপূর্বক শিবাজীর প্রতি মালেকল মউতের জিহ্বার ন্যায় ভয়াবহ রক্তরঞ্জিত তরবারি প্রসারণ করিয়া ধাবমান হইলেন। কিন্তু সহসা একটি বিষাক্ত তীর তাঁহার পেশানীতে বিদ্ধ হইল। রক্তধারায় মুহূর্তমধ্যে

তাঁহার মুখমণ্ডল এবং মনোহর শ্মশ্রুরাশি আপ্লুত হইয়া গেল। যন্ত্রণায় তিনি অধীর ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। শিবাজী এবং তাঁহার সঙ্গী যোদ্ধাগণ ভীষণভাবে প্রাণপণ করিয়া আফজাল খাঁকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

আফজাল খাঁ সেইরূপ জখমী অবস্থাতেও দুর্জয় বাহুবলে কয়েকজন মারাঠী দস্যুকে নিধন করিয়া শিবাজীকে প্রচণ্ড তরবারি প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বহু রক্তপাতে ও বিপুল পরিশ্রমে সহসা মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া ভূপতিত হইলেন।

সোলেমান খাঁ নামক জনৈক বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া আফজাল খাঁর দেহ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আফজাল খাঁকে ভূপতিত দেখিয়া শিবাজী এবং অন্যান্য দস্যুগণ তাঁহার শিরচ্ছেদ মানসে মাংস-লোলুপ শকুনির ন্যায় ছুটিয়া আসিল। সোলেমান খাঁ গুরুতররূপে আহত হইয়া শক্তির চরম বিন্দুতে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর রক্ষা করা অসম্ভব! মোসলেম সৈনিকগণ প্রায় সকলেই নিহত কিংবা গুরুতররূপে আহত হইয়া ভূতলশায়ী। যে দুইজন বাঁচিয়া আছে, তাহারাও বহু দূরে আফজাল খাঁ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাংঘাতিকরূপে আহত সোলেমান খাঁ-মাথা আর ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না! হস্ত শিথিল হইয়া আসিতেছে!

এমন সময় সহসা সমস্ত কোলাহল নিবারণ করিয়া অতি ঘন চটাপট্ অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চবিংশতি মোসলেম বীর-পুরুষ বিদ্যুদ্বৎ গতিতে ভীষণ তরবারি হস্তে সংহারক বেশে শিবাজীর সৈন্যদলের উপর প্রচণ্ড বার্তাবহ কিংবা সামুদ্রিক উচ্চণ্ড উর্মির ন্যায় ছুটিয়া পড়িল! তাহারা সকলেই বর্মমণ্ডিত ছিল। একজন যুবক বীরপুরুষ ভীষণ তেজে শিবাজীর উপরে আসিয়া পড়িলেন! তরবারির ভীষণ আঘাতে শিবাজীর লৌহ-ঢাল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার মস্তক আহত করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভীষণ চীৎকার করিয়া দ্রুত অশ্ব ধাবন করতঃ প্রাণ রক্ষার্থ জঙ্গলের অভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। অত্যল্প সময় মধ্যেই সমরক্ষেত্র নির্জন হইয়া পড়িল। শীতল জলধারা অনবরতঃ মস্তকে বর্ষণ করায় এবং ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধিয়া দেওয়ায় অল্পক্ষণ মধ্যেই আফজাল খাঁর চৈতন্য সঞ্চার হইল। অতঃপর তাঁহাকে এবং আহত মোসলেম সৈন্যদিগকে কোনওরূপে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় করিয়া কৃষ্ণগড়ের কেল্লার দিকে আগন্তুক বীর-পুরুষ অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলে, আফজাল খাঁ বলিলেন, "হে বীরপুঙ্গব! আপনার দয়া ও মহানুভবতা অপরিসীম! আপনার ঋণ অপরিশোধ্য! আপনার সহানুভূতি অতুলনীয়! আপনি মঙ্গলের জন্যই আমাকে কৃষ্ণগড়ের দুর্গে নয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমি সেজন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু, হে মিত্রবর! আপনার ন্যায় মহাজন

ও বন্ধুজনের পরিচয় প্রদান করলে প্রাণের ভিতরে গভীর শান্তি ও আরাম পাব।"

আগন্তুক বীর পুরুষ কিয়ৎকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর বামাকণ্ঠে সকলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্বক বলিলেন, মহানুভব সেনাপতে! আমার পরিচয় অতি সামান্য। আমি কৃষ্ণগড় দুর্গের জায়গীয়দার সরফরাজ খাঁর কন্যা আমিনা বানু। সুদক্ষ গুপ্ত সন্ধানীর নিকট আপনার তত্ত্ব এবং আপনাকে নিহত করবার জন্য নৃশংসপ্রকৃতি শিবাজী যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা' অবগত হয়ে অতীব ব্যস্ততা সহকারে দ্রুত রণসজ্জাপূর্বক বীরপুরুষগণকে সঙ্গে লয়ে আপনার সাহায্যের জন্য এখানে আগমন করেছি।"

আফজাল খাঁ আমিনা বানুর পরিচয় লাভ করিয়া নিতান্ত প্রীত ও আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর আমিনা বানু আফজাল খাঁকে লইয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

একটি মনোহর ও প্রশস্ত কক্ষমধ্যে একটি অনতিউচ্চ পর্যাঙ্কে মহাবীর আফজাল খাঁ শায়িত রহিয়াছেন। একজন হাকিম, দুইজন দাসী এবং স্বয়ং তারাবাঈ প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় পরিলিপ্ত রহিয়াছেন। গৃহের ছাদের দোদুল্যমান শতবাহুবিশিষ্ট ঝাড় প্রজ্বলিত হইয়া উজ্জ্বল আলোকে গৃহতল আলোকিত করিয়াছে। ক্রমে রাত্রি বেশী হইলে, হাকিম সাহেব চলিয়া গেলেন। দাসী দুইটিও কক্ষান্তরে যাইয়া শয়ন করিল। তখন তারাবাঈ সময় পাইয়া ধীরে ধীরে আফজাল খাঁর ললাটে ও মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। দুইজন দুইজনকে দর্শন করিয়া গভীর প্রেমাবেশে অভিভূত হইতে লাগিলেন। আফজাল খাঁ দেখিলেন, তারা অসাধারণ সুন্দরী। তাহার প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, উন্নত নাসিকা, আরক্তিম গণ্ড, শঙ্খবিনিন্দিত কণ্ঠ সমস্তই চিত্তাকর্ষক এবং মনোহর। তাহার টানাটানা বাঁকা ভুরু আর তাহার নিম্নে সেই ডাগর ও উজ্জ্বল চক্ষুর লাস্যময় বিদ্যুৎ-কটাক্ষে মুনির মনও বিচলিত হইয়া যায়। সুন্দরীর যৌবন-কুসুম মনোহর ভঙ্গিতে বক্ষ-সরোবরে বিকাশোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি পদসঞ্চালনে তাহার মনোহর মৃদু কম্পনে যুবজনের মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। সুন্দরীর বাহু, অধরোষ্ঠ, তালু, অংস, বক্ষ সমস্তই সুবিভক্ত এবং সুবিন্যস্ত। আফজাল খাঁ তারাবাঈ-এর সৌন্দর্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। কৃষ্ণবর্ণ মারাঠীর ঘরে ইরান-তুরানের এই অপরূপ সৌন্দর্য কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল! বস্তুতঃ, তারাবাঈ-এর বেশ পরিবর্তন করিয়া, কোনও শাহজাদীর পোশাকে তাহাকে

সজ্জিত করিলে কেহই তাহাকে মারাঠী-সুন্দরী বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিবে না। আফজাল খাঁ তারাকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তারার গোলাপের ন্যায় সুন্দর ও কমনীয় হস্তখানি নিজ হস্তে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তারা! তোমার ঋণ শোধ করা সুকঠিন। তোমার সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রেমেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। তুমি যদি সেদিন সৈনিকের ছদ্মবেশে সাবধানতাসূচক পত্রখানি না দিতে, তা হলে আমি সমস্ত দেহরক্ষী সৈন্যসহ ঘোড়াডুবি-গর্তে পড়ে প্রাণ হারাতাম। তোমার পিতা যে এরূপ নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র করবেন, তা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

"এমন কঠিন পিতার ঔরসে জন্মিলেও তোমার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র ও মহৎ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেমন করে তোমার পিতার এই গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হয়েছিলে? আর কি কৌশলেই বা তুমি রায়গড় পরিত্যাগ করে সেই নিবিড় বনরাজিপূর্ণ দুর্গম স্থানের সন্ধান পেলে?"

তারাবাঈ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সেনাপতে! আপনাকে দর্শন করবার পর হতেই আমার প্রাণে ধীরে ধীরে আসক্তির তীব্র অনল প্রজ্বলিত হয়। তারপর আমাকে উন্মত্ত হস্তীর পদতল হতে ক্ষিপ্রতা এবং বীরত্ব ও কৌশলের সহিত রক্ষা করায়, আমি আপনার চরণেই আত্ম বিকিয়ে বসি। আমি সেই গভীর রজনীতে বিমনায়মান চিত্তে উদ্যানবাটিকায় বেড়াতে বেড়াতে উদ্যানমধ্যস্থ গৃহের নিকটবর্তী হয়ে বুঝতে পারলাম যে, গভীর নিশীথে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে আমার পিতা, গুরু রামদাস স্বামী, মালোজী প্রমুখ কি যেন পরামর্শ করছেন।

"অতঃপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই গৃহের অবরুদ্ধ জানালা সংলগ্ন হয়ে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথাই শুনতে পেলাম। শিকারে যাবার কথা এবং শিকারে লয়ে যেয়ে কৃষ্ণগড়ের নিকটবর্তী গিরিসঙ্কটে ঘোড়াডুবি-গর্তের মধ্যে কৌশলে নিক্ষেপপূর্বক প্রাণবধ করবার সমস্ত কথা শ্রবণ করে আমি যার-পর-নাই আকুল ও অস্থির হয়ে উঠি।

"কি করব, কোন্ উপায়ে আপনাকে রক্ষা করব, একান্ত মনে কেবল তাই অবিরাম কয়েকদিন পর্যন্ত চিন্তা করি। অবশেষে মনে করলাম, গোপনে কোনও রূপে দেখা করে বা পত্র দিয়ে আপনাকে সাবধান করে দিব। এইরূপ চিন্তায় একান্ত উন্মনা হয়ে আমার ধাত্রীমাতাকে সমস্ত কথা খুলে বলে তাঁর চরণ ধারণ করলাম। তিনি আমাকে নিবৃত্ত হবার জন্য অনেক বুঝালেন; কিন্তু তাতে আমি আরও অধীর ও ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আপনার অহিত বা অনিষ্ট হলে আমি যে গলায় ছুরি নিব, তা তাঁকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বললাম। তিনি গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করে আপনাকে সাবধান করে দিবেন বলে যে-দিন স্বীকার করলেন, দুঃখের বিষয় যে সেই দিনই আপনি পিতার সহিত সহসা

শিকারে বহির্গত হয়ে পড়লেন।

"আপনার মৃগয়ায় গমনের পরে আমি ধাত্রীমাতার সাহায্যে আপনার উদ্দেশে জনৈক ভৃত্যকে আমার বহুমূল্য হার প্রদানের অঙ্গীকারে সঙ্গে লয়ে গভীর নিশীথের অন্ধকারে অশ্বারোহণে কৃষ্ণগড়াভিমুখে যাত্রা করি। অনুমানের উপর নির্ভর করে আমার সেই প্রাচীন ভৃত্যটির ইঙ্গিতে একটি পার্বত্য পথ দিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হই। পাছে কেউ ধরে ফেলে, এই ভয়েই চকিতে বিদ্যুৎ-গতিতে পত্র দিয়েই পলায়ন করি এবং অবিলম্বে কৃষ্ণগড়ের রানী মালেকা আমিনা বানুর নিকটে উপস্থিত হই। তিনি যখন আমাদের বাটী গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সহিত আমার গভীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে আপনার পথের বিপদ এবং গুপ্ত সৈন্যের অবস্থানের কথা নিবেদন করে, আপনাকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি।

"সেই সূত্রে তিনি একশত তেজস্বী ও বিক্রান্ত অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য লয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য সহসা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরমেশ্বরকে অনন্ত ধন্যবাদ যে, এই হতভাগিনীর চেষ্টা ও উদ্যম, আপনার জীবন রক্ষায় কতকটা সফল হয়েছে। আর কিছু পূর্বে মালেকার সৈন্যদল, ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারলে, আপনি এরূপ গুরুতরভাবে জখম হতেন না। যা হোক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবং হাকিম সাহেবের চেষ্টায় আঘাত প্রায় আরোগ্য হয়ে এসেছে। আর দু'চার দিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন।"

আফজাল খাঁ বলিলেন, "বিশ্বস্রষ্টার কৌশল ও মহিমা অপরিসীম! যিনি তোমার পিতার অন্তঃকরণে ভীষণ কুটিলতা ও হিংসার বিষ প্রদান করেছেন, সেই তিনিই আবার তোমার অন্তঃকরণ কোমলতা এবং প্রেমের সুধায় পরিপূর্ণ করেছেন! যিনি পাষাণকে কঠিন ও নীরস করে সৃষ্টি করেছেন, সেই তিনিই পাষাণের বক্ষ ভেদ করে তরল নির্মল জলের ধারা প্রবাহিত করেছেন।

"একই বৃন্তে একই উপাদানে তিনি কুসুম ও কন্টক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রহস্য, তাঁর মহিমা সকলই বিচিত্র ও কৌশলময়! তিনি কোমল কুসুমেই কঠিন ফলের জন্ম দেন। আবার কঠিন ফলের মধ্যেই সুমিষ্ট রস ও সুশীতল স্নিগ্ধ বারি রক্ষা করেন। অনন্ত তাঁর মহিমা! অপরিসীম তাঁর কুদ্‌রত! তাঁকে ধন্যবাদ দাও।

"যিনি তোমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি তোমাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত এবং তোমার প্রেমতৃষ্ণাকে তৃপ্তি দান করুন, এই প্রার্থনা করি।"

তারাবাঈ বলিলেন, "সেনাপতে! হৃদয়ের আকুল উন্মাদনায় তোমার জন্য গৃহত্যাগ করে আজ অরণ্যে চলে এসেছি। এখন তোমার পূজার মন্দিরে যদি স্থা দাও, তোমার পূজায় লাগব, আর যদি স্থান না পাই, তবে অকালে জীবনকুসুম

শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়বে। যে দিন হতে তোমাকে দেখেছি, সেই দিন হতেই সব ভুলে তোমাতে মজেছি। সেই দিন হতে তোমার চরণকমলের ধ্যান ব্যতীত দেবাদিদেব মহেশ্বর শিবের ধ্যান আর করতে পারি নাই। মহেশ্বরকে যে ফুল ও বিল্বপত্র যুগিয়েছি, তা' তোমার চরণোদ্দেশেই যুগিয়েছি। সেই দিন হতে তোমার মোহনমূর্তি আমি শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারি নাই।

"মনকে যত বুঝাতে লাগলাম, মন ততই অবুঝ হয়ে উঠতে লাগল; যতই ধৈর্যধারণ করতে চেষ্টা করলাম ততই অধীর ও উন্মত্ত হয়ে উঠল! চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তোমার হৃদয় তেমনি আমাকে আকর্ষণ করেছে! এ আকর্ষণে—এ সম্মিলনে বাধা দিবার শক্তি কারও নাই!

"তুমি বিজাপুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। তুমি একজন মস্ত বীর পুরুষ। তোমার সম্মুখে যশঃ-সম্মান ও উচ্চপদ নিয়তই তোমাকে প্রলুব্ধ করছে। তুমি আমার জীবন-বসন্তের মলয়ানিল, হৃদয়-আকাশের পূর্ণ চন্দ্রমা এবং ঊষার আকাশে শুকতারা হলেও, আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্যা। কিন্তু আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র নদী আজ তোমার উদ্দেশে—তোমার প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়-পারাবার পানেই ছুটে চলেছে।

"তার গতি অবাধ! সে আজ আত্মহারা অবশভাবে ছুটে চলেছে। তার পরিণাম কি হবে, তদ্বিষয়ে সে কিছুমাত্র চিন্তা না করেই তোমাতেই আত্ম বিকিয়ে বসেছে! হে প্রাণেশ্বর! হে স্বামিন্! হে আমার জীবন-প্রভাতের মোহন ঊষা! হে জীবনবারিধির কৌস্তভ রতন! এখন তোমার আদর-অনাদরেই এ হতভাগিনীর জীবন-মরণ নির্ভর করে।"

শিবাজী-নন্দিনী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগে সন্দেহ এবং আশঙ্কায় তাহার পদ্মপলাশলোচন হইতে তরল মুক্তাধারা নির্গত হইতে লাগিল।

যে রমণী অনিশ্চিত প্রেমের আশায় চিত্তের উন্মাদনায় পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের বন্ধন খণ্ডন করিয়া তাহার প্রেমাস্পদের সেবায় উপস্থিত হইয়া পিপাসা পরিতৃপ্তি করিতে পারিতেছে না, তাহার পক্ষে প্রেমাস্পদের নিকটে নিজের অবস্থার বিবরণ খুলিয়া বলিতে যাইয়া শোকাবেগে ক্রন্দন করা নিতান্তই স্বাভাবিক।

আফজাল খাঁ সুন্দরীর প্রেমোচ্ছ্বাস এবং হৃদয়ের আবেগ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মনের ভিতরে দ্রবীভূত হইয়া নিতান্ত চাঞ্চল্যে অভিভূত এবং প্রেমের ধারায় অভিসিক্ত হইলেন। অন্তরে বাহিরে তখন মহাবীর আফজাল খাঁর তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। প্রাণের পরতে পরতে অনন্ত পুলক শিহরিয়া উঠিতে

লাগিল! নব বসন্তের মলয়া হাওয়ার প্রথম অনন্ত পুলক শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! নব বসন্তের মলয়া হাওয়ার প্রথম চুম্বনে শীত-সঙ্কুচিত কুসুমকলিকাগুলি যেমন শিহরিয়া উঠিয়া ফুটিয়া উঠে, আফজাল খাঁর হৃদয়-মানঞ্চ তেমনি শিহরিয়া উঠিয়া প্রেমের পুষ্পে ভরিয়া গেল।

অনন্ত প্রেমের কুসুম-সুষমার মোহিনী আভা, সন্ধ্যাকাশে স্বর্ণমেঘের ন্যায় হৃদয় জুড়িয়া বসিল। হৃদয়ে হৃদয়ে আভা ফুটিল। মরমে মরমে বাণ ছুটিল। তখন আগ্রহ ও ব্যগ্রতায় হৃদয়-কুঞ্জে প্রেমের কোকিল পাপিয়া অবিরাম কূজনে ডাকিতে লাগিল!

আফজাল খাঁ প্রেমাবেশে সেই নির্জন দীপালোক-আলোকিত-কক্ষে শিবাজী-নন্দিনীকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে কয়েকটি চুম্বনদান করিলেন। প্রদীপ-শিখা একটু কাঁপিয়া উঠিল! যুবতীর হৃদয় লজ্জা ও প্রেমে সঙ্কুচিত অথচ সহর্ষ হইয়া উঠিল!

উভয়েই ক্ষণকাল নীরব। উভয়ের বক্ষের স্পন্দন দ্রুত চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের গভীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। মারাঠা রাজকুমারীর নেত্র-কুবলয় হইতে প্রেমের মুক্তাধারা বর্ষিত হইয়া পাঠানবীরের বক্ষস্থল বিপ্লাবিত করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিজাপুরের সোলতানের পক্ষ হইতে পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী, সাত শত গোলন্দাজ সৈন্য কৃষ্ণগড়ে সমাগত হইয়াছে। শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৃশংস ব্যবহারের সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হইয়া বিজাপুর দরবার শিবাজীকে সমস্ত দস্যু-সৈন্যসহ ধ্বংস করিতে এই সৈন্যদল প্রেরণ করেন।

আফজাল খাঁ কৃষ্ণগড়ে রাজকীয় বাহিনীর আগমন আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে এই নূতন বাহিনী কৃষ্ণগড়ে সমাগত হইলে, মহাবীর আফজাল খাঁ শিবাজীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। শিবাজীর প্রতি নিতান্ত রুষ্ট এবং বিরক্ত হইয়া মালেকা আমেনা বানুও ইসলামের মহাশত্রু শিবাজীর ধ্বংস সাধন মানসে মহাবীর আফজল খাঁর সহিত যোগদান করিলেন।

ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শিবাজী সম্মুখ-সমরে অক্ষম হইয়া ক্রমাগত পশ্চাদবর্তন করিতে করিতে সহ্যাদ্রি পর্বতের দুর্গম অরণ্য এবং গিরিগহ্বর পরিপূর্ণ স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। হঠাৎ আক্রমণ, গুপ্ত আক্রমণ এবং নৈশ আক্রমণ এই তিন প্রকার আক্রমণ দ্বারা মধ্যে মধ্যে মোসলেম বাহিনীকে

বিপদাপন্ন এবং চঞ্চল করিতে লাগিলেন। মোসলেম সৈন্য তাহার দস্যুসৈন্যের অনুসরণ করিলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নিবিড় অরণ্যানী এবং পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ফেরুপালের ন্যায় লুক্কায়িত হইয়া পড়িত। ফলতঃ শিবাজীর মাওয়ালী দস্যুগণ পলায়নে এবং হঠাৎ আক্রমণে যার-পর-নাই অভ্যস্ত হইয়াছিল।

তাহাদের পলায়ন এবং আক্রমণ বস্তুতঃই শৃগালের ন্যায় দ্রুত এবং কৌশলপূর্ণ ছিল। ফলতঃ শিবাজীর নামের অর্থ তাঁহার কার্যের সঙ্গে বেশ সার্থক হইয়াছিল। তখনকার দিনে "শিবাজী দরহকিকত শিবাজী আস্ত্।" অর্থাৎ শিবাজী কার্যতঃ যথার্থই "শৃগাল", একথা দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছিল।

শিবাজীর ধূর্ততা, ছলনা এবং মিথ্যাবাদিতার কিছু ইয়ত্তা ছিল না। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এমনি অধীর ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট সাধন মানসে কোনও প্রকার পাপ ও অন্যায়কে বিন্দুমাত্রও পরওয়া করিতেন না।

খুন, জখম, চৌর্য, দস্যুতা, প্রবঞ্চনা তাহার জীবনের নিত্য কর্তব্যকর্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এহেন ধূর্ত শিবাজীর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্মুখ-সমরে চেষ্টা করিয়াও আফজাল খাঁ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তরঙ্গায়িত উচ্চাবাস ভূমি, নিবিড় অরণ্য, পর্বতের অসংখ্য গুহা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য-নদীর গর্ভ ও উচ্চপাড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবাজী মধ্যে মধ্যে 'রাতহানা' দিয়া বিজাপুরের সুশিক্ষিত বাহিনীকে যার-পর-নাই ত্যক্ত-বিরক্ত করিতে লাগিলেন।

পার্বত্য প্রদেশে দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা বহু বিলম্ব এবং ক্ষতি সাপেক্ষ দেখিয়া, বীরাঙ্গনা মালেকা আমেনা বানু শিবাজীর জন্মভূমি রায়গড় আক্রমণ করাই ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন। রায়গড় আক্রমণ করিলে, শিবাজী বাধ্য হইয়া সম্মুখ-যুদ্ধ দান করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া, মালেকা আমেন বানু আফজাল খাঁকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আফজাল খাঁ এই পার্বত্য প্রদেশেই শিবাজীকে হীনবল এবং ধৃত করিবার জন্য নানা প্রকার কায়দা-কৌশল এবং ফন্দী খাটাইতে লাগিলেন। মাওয়ালী ও মারাঠী দস্যুগণ ছদ্মবেশ ধারণ এবং চৌর্যকার্যেও বিলক্ষণ পটু ছিল। রাত্রিতে তাহারা নানা প্রকার পশু, বিশেষতঃ গরু-ঘোড়ার কৃত্রিম বেশে আসিয়া মুসলমান শিবিরের খোঁজ-খবর লইয়া যাইত। পার্বত্য রমণীদিগের রূপ ধারণ করিয়া দিবসে তাহারা নানা প্রকার ফলমূল এবং তরিতরকারীও বিক্রয় করিতে আসিত।

মধ্যে মধ্যে সন্দেহবশে কয়েকজনকে ধৃত করায়, তাহারা মারাঠী গুপ্তচর বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় পাহারা আরও কড়াকড় করা হইল। মালেকা আমেনা বানু

বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে এবং শিবাজী-নন্দিনী তারাবাঈকে কোনওরূপে বন্দী বা নিদ্রিতাবস্থায় চুরি করিয়া লইবার জন্য শিবাজীর দলপতিগণ বিশেষ তদবির করিতেছেন।

মালেকা এবং তারাবাঈ সাবধানতার জন্য অস্ত্র-পাণি হইয়া শয়ন করিতেন। মারাঠীরা যে-কোনওরূপে এই সুন্দরীদ্বয়ের কাহাকেও অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করিলেন না। মোতামদ খান স্বয়ং রাত্রিতে মালেকা এবং তাঁহার শিবিরের প্রহরীদিগের সতর্কতার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন।

কিন্তু মানুষ যখন যে-বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধান হয়, অনেক সময় যেমন তাহাতেই অসম্ভাবিতরূপে বিপদ ঘটিয়া থাকে; তেমনি এই সাবধানতার মধ্যেও গুরুতর বিপদ সংঘটিত হইল।

সহসা এক দিন প্রভাতে দেখা গেল যে মালেকার শিবিরে মালেকা নাই। তাঁহার শিবিরের মধ্যে একটি গর্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল, তাহা গর্ত নহে সুড়ঙ্গ। অক্র বক্র পথে পনর শত হস্ত পরিমিত সুড়ঙ্গ কাটিয়া মালেকাকে গভীর নিশীথে নিদ্রিতাবস্থায় বেহুঁশ করিয়া অপহরণ করিয়াছে।

অতঃপর সেই সুড়ঙ্গ পথে নামিয়া ধীরে ধীরে সকলে এক বনের মধ্যদেশে একখণ্ড পরিষ্কৃত ভূমি দেখিতে পাইলেন। সেখানে কিছু পূর্বেও লোক ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। সুড়ঙ্গের মাটিগুলি একস্থানে রাশীকৃত না করিয়া ক্রমশঃ নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুড়ঙ্গের মুখে একটি লতাগুল্মের ঝোপ রহিয়াছে। এমন কৌশলপূর্ণ স্থান যে, দেখিয়াও সহসা কেহ কিছু নির্ধারণ করিতে পারে না।

মালেকা আমেনা বানুকে যে মারাঠীরা অচিন্ত্যভাবে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করিয়া অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সে-বিষয়ে কাহারও আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মালেকার জন্য মোস্‌লেম শিবিরে ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। আফজাল খাঁ যার-পর-নাই শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। সৈন্য-সামন্ত সকলেই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

তারাবাঈ তাঁহার আশ্রয়দাত্রী এবং পরম হিতৈষিণী মালেকার অপহরণে যার-পর-নাই ক্ষুণ্নমনা এবং বিষাদে বিমলিন হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমেনা বানুর মাতা শোকে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। পাছে বা ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য পাষাণ্ড কাফেরগণ এই মোস্‌লেম সুন্দরীকে কলঙ্কিত অথবা নিহত করে, ইহা ভাবিয়া সকলেই পেরেশান ও লবেজান হইয়া উঠিলেন।

দরী-গিরি, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। মারাঠীদিগকে ভীষণ ভাবে যত্রতত্র আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত

করতঃ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা হইল! কিন্তু কোথাও কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

অনেক মারাঠীকে বন্দী করিয়া বিশেষ প্রলোভন এবং প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়াও তাহাদের নিকট হইতে কোনও তত্ত্ব পাওয়া গেল না। চতুর্দিকে বহু গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াও কোনও সূত্র আবিষ্কার করা গেল না। সকলেই যার-পর-নাই বিমর্ষ ও শোকাকুল চিত্তে দিন যাপন করতে লাগিলেন।

মহাবীর আফজাল খাঁ এবং বীরবর মোতামদ খান নানা প্রকার নূতন নূতন পন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করে মালেকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবাজীকে বন্দী করিতে পারিলে, সমস্ত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে বুঝিয়া, শিবাজীকে বন্দী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগলেন।

কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শিবাজী তখন আহবক্ষেত্রে উপস্থিত নাই। সেনাপতি আবাজী তখন শিবাজীর প্রতিনিধি স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর শিবাজীর অবস্থান নিরূপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর রজনী। চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পশ্চিমঘাট গিরিগহ্বরের একটি মনোহর কক্ষ বিশেষরূপে সজ্জিত। এই নির্জন গিরিকক্ষ রাজা অশোকের সময় শ্রমণদিগের নিবাস জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

গভীর নির্জনে বাস করিবার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত কৃত্রিম গুহা খোদিত করা হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি শত্রুর অনুসরণ হইতে অব্যাহতি এবং যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এই নির্জন গিরিগুহায় বাস এবং স্বকীয় ভোগলালসা পরিতৃপ্তি করিতেন।

এইখানেই ভীষণ হত্যা এবং লুণ্ঠনের গুপ্ত পরামর্শ হইত। গভীর বনরাজিপূর্ণ এই দুর্গম পর্বতের পাদমূলে গুহার একটি দ্বার, তাহার কৌশলে প্রস্তর দ্বারা এমন ভাবে অবরুদ্ধ থাকিত যে, কেহ গুহা-দ্বার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিত না।

এই বিশাল গুহার মধ্যে ক্ষুদ্র তিনটি এবং বৃহৎ চারিটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ছিল। গুহার সম্মুখের ভীষণ অরণ্যের সম্মুখে একটি পরিখা খোদিত ছিল। লোকে তাহাকে পার্বত্য নদী বলিয়াই মনে করিত।

পরিখার উভয় পার্শ্বে উচ্চ গড়: তাহা নানাজাতীয় বৃক্ষলতা বিশেষতঃ বৃহৎ বৃহৎ শাল ও তালবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বাভাবিক ক্ষুদ্র পর্বতের স্তূপ বলিয়া ভ্রম

জলপ্লাইত! গড়ের উপরে নানা স্থানে বৃক্ষরাজির পাদমূলের অন্তরালে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তোপ সজ্জিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত বনের নানা স্থানে অদৃশ্য ভাবে তোপ সজ্জা ছিল। বনের মধ্যে মৃত্তিকার নীচে কয়েকটি পাতালপুরী বা গুপ্ত-কক্ষ ছিল। এই সমস্ত পাতাল-গৃহে নানাবিধ যুদ্ধের উপকরণ, লুন্ঠিত সামগ্রী এবং ধন-ভাণ্ডার সংস্থাপিত ছিল। এই গোপনীয় গুহাবলীর একটি প্রশস্ত এবং অধিকতর রমণীয় গুহাতে ললনাকুল ললাম-ভূতা এক ষোড়শী রূপসী রূপের ছটায় কক্ষ আলোকিত করিয়া একখানি পালঙ্কোপরি অর্ধহেলিত অবস্থায় অবস্থিত!

রমণীর ঈষৎ কুঞ্চিত সুচিক্কণ ঈষন্নীলাভ কেশকলাপ ললাট এবং গণ্ডে পতিত হওয়ায় তাহার মুখখানি শৈবালে ঈষদাচ্ছন্ন প্রভাত-প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় অথবা মেঘ-কিরীট-চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে মুখের ও চক্ষুর ছটায় তেজস্বিতা, দৃঢ়তা এবং পবিত্রতার আভাই কেবল বিকীর্ণ হইতেছে।

গৃহস্থিত প্রদীপের আলোক, রমণীর বিশ্ববিমোহন রূপের ছটায় যেন মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উন্নত বিশাল বক্ষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বাত্যাহতা স্ফীতবক্ষা তরঙ্গায়িত পদ্মার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উন্নত এবং অবনত হইতেছে।

রমণীর নেত্রকুবলয়ের প্রশান্ত এবং স্থির দৃষ্টি হইতে উন্নত চিন্তার ইঙ্গিতই সূচিত হইতেছে। রমণী যুবতী—প্রস্ফুটিত-যৌবনা এবং অসাধারণ সৌন্দর্যশালিনী হইলেও, তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাম-গন্ধী প্রেমের উদ্রেক না হইয়া সশ্রদ্ধ ভালোবাসারই সঞ্চার হয়।

রমণী অলৌকিক সুন্দরী। তাহার মুখমণ্ডলে তরুণ অরুণের অরুণিমা, নয়নে বর্ষণ-মুক্ত শারদাকাশের নীলিমা, গঠন-বৈচিত্র্যে কারু-কৌশলের অপূর্ব মহিমা পরিদৃশ্যমান! রমণী নির্বাতি সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় তরল সৌন্দর্যে ভরপুর হইয়াও অচঞ্চল! সুতরাং, তাঁহাকে দর্শন করিলে আনন্দ এবং শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়। সে সৌন্দর্য—সে লাবণ্য কেবল কবিত্বময়, রসময় এবং আনন্দময়! তাহাতে স্বপ্নের আবেশ এবং মদিরার বিহ্বলতা নাই, তাহা স্পষ্ট, মুক্ত এবং ব্যক্ত; সুতরাং সহসা তাহাতে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এই গরীয়সী সুষমা-সম্পন্না মহিমময়ী রমণী আমাদেরই সেই মালেকা আমেনা বানু। রমণী অর্ধশায়িতাবস্থায় বাম হস্ত বাম কপোলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে "দেওয়ান হাফেজ" ধারণ করিয়া পড়িতেছিলেন।

এমন সময় শিবাজী তথায় আসিয়া একাকী উপস্থিত হইলেন। মালেকা আমেনা তখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। শিবাজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ

করিয়া নিকটবর্তী একখানি সোফাতে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল নীরবে যাপন করিবার পরে বলিলেন, "মালেকা! মালেকা! আমার প্রাণের মালেকা! একবার তুমি আমার দিকে মুখ ফিরাও। একটিবার মাত্র কথা শুন। আমি তোমার জন্যই উন্মত্ত হয়েছি। তোমার প্রেমামৃত পানের জন্যই মানস-চকোর চঞ্চল হয়েছে। কিছুতেই তোমাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করতে স্বীকৃতা করতে না পেরে অবশেষে তোমাকে হরণ করতে বাধ্য হয়েছি।"

তোমাকে বশীভূত করবার জন্যই অপহরণ করে এই নিভৃত নির্জন গিরিগুহায় নিয়ে এসেছি। তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে রাজ্য, ধন-সম্পদ্ সমস্তই বিসর্জন দিয়েছি। তোমাকে লাভ করতে না পারলে, জীবনের আর কোনও প্রয়োজন নাই।

হে সুন্দরি! হে মানসি! নব-বসন্তের নব-বিকাশোন্মুখ অবস্থায় অভিমানভরে তোমার এই প্রেমদাসকে তুচ্ছ করে উভয়ের অকল্যাণ ও অমঙ্গল আনয়ন করো না। বসন্ত এসেছে, তবে সৌরভ-সুধা বিতরণে বিলম্ব কেন?

হে মানিনী! শিবাজী দস্যু হলেও রাজা, মারাঠী হলেও বীর-পুরুষ, কাফের হলেও প্রেমিক এবং মূর্খ হলেও কৃতজ্ঞ; সুতরাং একেবারে তোমার অযোগ্য নহে। তোমার প্রেম-প্রবাহের রসসিক্ত হলে, শিবাজী ভারত-সিংহাসনে সমারূঢ় হবারও কল্পনা করে।

হে বীর্যবতী! তোমার বীরত্ব এবং সাহস সহায় হলে, এ বাহু আরও বলশালী হবে, এ মস্তিষ্কে আরও উচ্চ উচ্চ রাজনৈতিক চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হবে। তাই বলি, মালেকা! তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের মালেকা হয়ে মালেকা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রেমে হতাশ করলে এ জীবন-তরু অকালে শুষ্ক হবে। এস মালেকা! এস, আমার বক্ষে এস! নতুবা এই বক্ষে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করে এ বিদগ্ধ অভিনয় শেষ কর।

ক্রমাগত আজ দু'মাস কাল তোমার সাধনা করে মন বড়ই চঞ্চল এবং বিধুর হয়েছে, আর ধৈর্যধারণ অসম্ভব। মনের স্থৈর্য ক্রমশঃ নষ্ট হচ্ছে। এস তুমি! এস, আমার এ মরুভূমিতুল্য দগ্ধবক্ষে তুমি ত্রিতাপ-জ্বালা-নিবারণী মন্দাকিনীর শীতল ধারার ন্যায় প্রবাহিত হও।

এস মালেকা! এস, তাতে কোন কলঙ্ক নেই। আমি তোমাকে কলঙ্কিনী করব না। আমি তোমাকে রাজ-আড়ম্বরে যথারীতি বিবাহ করব। ভগবান্ রামদাস স্বামী আমার অনুকূলে। বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল সমস্তই আমার পদতলে।

মালেকা! একবার তুমি সম্মতি প্রকাশ কর। আজ দীর্ঘ দু'টি মাস ধরে তোমার সাধনা করছি। তোমার রূপবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিসর্জন করতে বসেছি।

হায়! তবুও কি তুমি পাষাণী হয়ে থাকবে? মালেকা! আজ সাধনার শেষ দিন!

"আজ যেমন করেই হউক মনের বাসনা পূর্ণ করব। আজ আর তোমার সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা করতে পারি না। এস রূপসি! এস, এস, বক্ষে এস!"

এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে শিবাজী দুই বাহু প্রসার করিয়া মালেকাকে সহসা আবেষ্টন করিয়া অধর-চুম্বনে উদ্যতপ্রায়। রোষোন্মত্তা মালেকা আমেনা বানু সহসা ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ বলে উত্থিত হইয়া শিবাজীকে দূরে ঝটকাইয়া ফেলিলেন। দেওয়ালে আহত হইয়া শিবাজী কক্ষতলে ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, উঠিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু শক্তিশালিনী মালেকা সহসা ভীমবলে পদতলে শিবাজীকে চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে শাণিত ছুরিকা বক্ষ-লক্ষ্যে উদ্যত করিয়া বলিলেন, "বল্ দুরাত্মন্! বল জাহান্নামী কাফের! বল্ কাম-কুক্কুর! পাষণ্ড শয়তান! আর কখনও নারী হরণ করবি? পাষণ্ড, আজ হতে তোর জীবনের পাপাভিনয়ের শেষ করব।"

মালেকা ভীষণ ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ভ্রুকুটি-কুটিল আঁখিতে অগ্নি বিকীরণ করিয়া এবং ক্রোধাবেগে কম্পিত হইতে হইতে ভীষণ গর্জন করিয়া শিবাজীকে পদতলে আরও ভীষণভাবে চাপিয়া ধরিলেন। ছুরিকার শাণিত ফলক মৃত্যুর করালী জিহ্বার ন্যায় শিবাজীর চক্ষে প্রতিভাত হইল!

শিবাজী ভীতি-বিহ্বলচিত্তে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "মালেকা! মালেকা! আমায় ক্ষমা কর। আর না, যথেষ্ট হয়েছে। দোহাই তোমার, প্রাণবধ করো না! আর কখনও পরনারী হরণ করব না! আর কখনও তোমার প্রতি লালসার দৃষ্টিপাত করব না। আজ হতে বুঝলাম, মুসলমান রমণী যথার্থ সতী। সতীত্বের মহিমা এবং ধর্মের সম্মান মুসলমান রমণীর মত আর কোনও জাতীয়রা রমণীর কাছে আদৃত এবং রক্ষিত নহে।"

মালেকার তর্জন-গর্জনে এবং শিবাজীর করুণ প্রার্থনায় সমস্ত গিরিগুহা শব্দায়মান হইয়া উঠায়, ভিতরের প্রহরী এবং দাস-দাসীগণ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, মালেকা আমেনা বানু ভীষণ রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে শিবাজীকে পদতলে চাপিয়া দণ্ডায়মানা! একজন দাসী আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েছে, মা! এ যে, উগ্রচণ্ডী কালী করালী মূর্তি! পদতলে কাম-কুক্কুর শিবাজী! আজ নরাধমের উপযুক্ত প্রতিশোধ হয়েছে। কি বলব, মা! এই নরাধম কাম-কুক্কুরই আমাকে পাপ-লালসায় ভাসিয়ে স্বকীয় ঘৃণিত পাপ-লিপ্সা চরিতার্থ করেছে। আমি এক্ষণে পুরাতন হয়েছি। তাই নূতন রস ভোগের জন্য নবীনা তোমাকে হরণ করে এনেছে। বেশ হয়েছে, মা! পাষণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কর!"

এই বলিয়া দাসী আনন্দে করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাস্যে সমস্ত গুহা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মালেকা ভীষণ গর্জনে, দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, "বল্ নরাধম কুক্কুর! আর কখনও পরনারীর প্রতি কুভাব পোষণ করবি কি-না?" এই বলিয়া মালেকা আমেনা বানু ছুরিকাখানি বক্ষের দিকে আরও বিনত করিলেন।

শিবাজী ভীত এবং আর্তকণ্ঠে বলিলেন, "মালেকা! মালেকা! রক্ষা কর! দোহাই তোমার! আজ হইতে তুমি আমার মাতা! তোমাকে মাতৃ-সম্বোধন করছি। রক্ষা কর, মা! সত্যই তুমি দানবদলনী পাপ-তাপ-নাশিনী দুর্গা। এতদ্ব্যতীত নারীতে কখনও এমন তেজঃ ও সাহসের সঞ্চার সম্ভব নহে।

"ক্ষমা কর, মা! আমায় ক্ষমা কর! আজ হতে তোমাকে পরম পূজনীয়া জননী বলেই পূজা করব। ধন্য সতী! তুমি শত ধন্য! তোমায় ও পবিত্র পদাঘাতেই কাম-বিকারের নেশা আজ হতে ছুটে গেল। কিন্তু মা! এই পাপী সন্তানের বক্ষ হতে তোমার পাদপদ্ম অপসারিত কর, মা! আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে!"

প্রহরী ও দাসদাসীগণ মালেকা বানুর ভীষণ রণরঙ্গিণী প্রলয়ঙ্করী মূর্তি সন্দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণে তাহাদের মোহ ভঙ্গ হওয়ায় সকলেই "একি কাণ্ড, মা! ছাড় ছাড়! মহারাজার প্রাণ বধ করো না"—বলিয়া সমস্বরে করুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

মালেকা বক্ষ হইতে দক্ষিণ পদ তুলিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলুলায়িতকেশা মালেকা আমেনা বানুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিলেন, "মা! অধম সন্তানের অপরাধ মার্জনা কর। তোমার পূত পদস্পর্শে আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়েছে। আমি মহাপাতকী সন্তান, তুমি পুণ্যবতী সাক্ষাৎ জগন্মাতা ভবানী। আমার অপরাধ লইও না। আমার ধর্ম-বুদ্ধি সঞ্চারের জন্যই তুমি এ মায়া-প্রপঞ্চ বিস্তার করেছ।" সকলেই দেখিল, শিবাজীর চক্ষু অশ্রুপ্লুত। সত্যই তাঁহার প্রাণে তীব্র অনুতাপের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে।

গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বপ্রহ্লাদিনী ঊষার মৃদু হাস্য যেমন বিশ্ববক্ষে নবজীবনের সঞ্চার করে, তেমনি অদ্যকার এই ভীষণ পাপলিপ্সা এবং কামাসক্তির সূচীভেদ্য অন্ধ তমসা ভেদ করিয়া দিব্যজ্ঞানের কিরণ শিবাজীর কলুষিত অন্তঃকরণে পদ্মের ন্যায় নির্মল সৌন্দর্য এবং বিমল সৌরভ ফুটাইয়া তুলিল। অকস্মাৎ যেন মেঘরাশি বিচ্ছিন্ন করিয়া চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিঃ গগনবক্ষে ফুটিয়া উঠিল!

নৈশ-অন্ধকার দূর করিয়া উষার শুভ্র আলোক-রেখা পূর্ব-গগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানাজাতীয় বিহঙ্গরাজি সুমধুর কূজনে কাননরাজি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বিহগকণ্ঠে নানা ছন্দে বিশ্ববিধাতার বন্দনাগীতি গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আফজাল খাঁর শিবিরে ফজরের নামাজের সুধাবর্ষী আজানধ্বনি ধ্বনিত হইল। যোদ্ধৃগণ শীঘ্র শীঘ্র অজু করিয়া উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন।

উপাসনা শেষে মোস্‌লেম শিবিরের প্রধান প্রহরী আসিয়া আফজাল খাঁকে নিবেদন করিলেন যে, শেরমর্দান খান এবং তাঁহার অনুচরগণ কেহই তাম্বুতে নাই। পরে প্রকাশ পাইল, তারাবাঈও তাম্বুতে নাই। তাহার জিনিসপত্র সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। তখন চতুর্দিকে একটি মহা খোঁজ পড়িয়া গেল! নাই—নাই—নাই তো শেরমর্দান খানের দলের কোনও লোকই নাই! চারিদিকে সবাই খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

শিবিরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সুদক্ষ গুপ্তচরদিগকে চতুর্দিকে মারাঠী শিবিরে প্রেরণ করা হইল। ক্রমশঃ জানিতে পারা গেল যে, শেরমর্দান খানই তারাবাঈকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। শেরমর্দান খান এবং তাহার অনুচরগণ কেহই মুসলমান নহে, সকলেই মারাঠী।

তারাবাঈকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই তাহারা মুসলমানের বেশে আসিয়া আফজাল খাঁর সৈন্যদল-ভুক্ত হইয়াছিল।

শেরমর্দান—স্বয়ং মালোজী। এই মালোজীর করেই শিবাজী তারাবাঈকে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মালোজী তারার রূপ-মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তারাকে মুসলমান শিবির হইতে উদ্ধার করিবার আর কোনও পথ না পাইয়া অবশেষে মালোজী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আফজাল খাঁর সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ সেনাপতির নিকট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানপূর্বক বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। অবশেষে সেনাপতি ইঁহার দলভুক্ত লোকের উপরেই তারার শিবির রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে মালোজী ঔষধ প্রয়োগে তারাকে বেহুঁস করিয়া গভীর নিশীথে হরণ করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। মালোজীর চাতুরী এবং কৌশলে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

মারাঠীদিগের চাতুর্য এবং ধূর্ততা সম্বন্ধে এতদিন যাহারা অবিশ্বাসী ছিল, আজ তাহারাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিল। তারাবাঈয়ের অপহরণে

আফজাল খাঁ নিতান্তই বিমনায়মনা হইয়া পড়িলেন। মালেকা এবং তাহার উদ্ধারের জন্য নানাবিধ পরামর্শ ও প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিবাজী : মা! তুমি সাক্ষাৎ ভবানী। তুমি দয়া করে সন্ধি করে দাও। এ ভীষণ যুদ্ধের শান্তি হলেই রক্ষা পাই। অসংখ্য লোক এই সমরাগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হচ্ছে। দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। আর কিছুদিন এই সমরানল প্রজ্বলিত থাকলে, একবারেই উৎসন্ন যাবে।

মালেকা : আমি এখনও তোমার বন্দিনী। এই পশ্চিমঘাট গিরিগুহার নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থেকে কেমন করে সন্ধির প্রস্তাব করতে পারি? আর সন্ধি করবার মত থাকলে, মহামতি আফজাল খাঁর নিকটে সে-প্রস্তাব পেশ করলেই তো হতে পারে।

শিবাজী : আফজাল খাঁ সন্ধি করবেন, এরূপ তো কিছুতেই মনে হয় না। মারাঠী শক্তিকে সমূলে নির্মূল করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন।

মালেকা : অপহৃত রাজ্য ও দুর্গ ফিরিয়ে দিলে এবং বিজাপুরের আধিপত্য স্বীকার করলে, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন।

শিবাজী : তা হলে আমার কি লাভ হবে? আমার স্বাধীনতা বজায় না থাকলে, সন্ধি করে লাভ কি? যাতে আমার স্বাধীনতা থাকে, অথচ সন্ধি হয়, তোমাকে সেইরূপ চেষ্টাই করতে হবে।

মালেকা : অসম্ভব বলে বোধ হয়। তোমাকে "পুনর্মূষিক" হতেই হবে। বিজাপুর দরবারের কঠোর আদেশ যে, তোমাকে বন্দী বা নিহত করতে হবে। এর জন্য অর্থব্যয় ও বলক্ষয় করতে বিজাপুর দরবার কুণ্ঠিত নহে। সোলতান তোমার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

শিবাজী : তবে উপায় কি?

মালেকা : উপায়—রাজ্য প্রত্যর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

শিবাজী : প্রাণান্তেও স্বেচ্ছায় রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারব না।

মালেকা : তবে সন্ধির কথা মুখে আনিও না। যথার্থ বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

শিবাজী : মা! তুমি অন্ততঃ আমার অনুকূল হও।

মালেকা : অসম্ভব! তুমি মুসলমানের প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ

করেছ, মসজিদগুলি যেরূপ ভাবে অপবিত্র করেছ, তাতে তোমার পক্ষ অবলম্বন করা দূরের কথা, তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হওয়াই পাপ। আমাকে শিবিরে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য কি করছ? যত বিলম্ব হচ্ছে, আফজাল খাঁ এবং মোতামদ খান ততই উন্মত্ত হয়ে যুদ্ধ করছেন। আমাকে ফিরিয়ে পেলে, তাঁরা অনেকটা শান্তি লাভ করবেন।

শিবাজী : মা! তোমাকে মা বলেই মেনে নিয়েছি। সাক্ষাৎ ভবানী মূর্তি বলে পূজাও করছি। অন্ততঃ মা সন্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, এ আশা করা কি বিড়ম্বনা?

মালেকা : নিশ্চয়ই নহে। আমি তো প্রথমে যুদ্ধ করি নাই। তুমি পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণগড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমার কত সর্বনাশ করেছ; তা একবার ভেবে দেখ।

শিবাজী : যত শীঘ্র পারি, পৌঁছিয়ে দিবার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু মা! আমার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

মালেকা : আমার তাতে হাত নাই।

শিবাজী : আমি মনে করি যথেষ্ট আছে।

মালেকা : সম্বন্ধ পাততে পারলে, রক্ষা পাবার সম্ভাবনা হতে পারে। কিন্তু তোমার কি তাতে মত হবে?

শিবাজী : সে কিরূপ সম্বন্ধ? সে কিরূপ ব্যাপার?

মালেকা : কেন? কিছুই কি জান না? তোমার কন্যা তারা যে আফজাল খাঁর রূপে প্রেমোন্মাদিনী। আফজাল খাঁও তার সেবা-শুশ্রূষায় মুগ্ধ হয়েছেন। আফজাল খাঁর করে তারাকে সমর্পণ করে সন্ধি করলে, হয়ত সোলতান তোমাকে অনুগ্রহ করতে পারেন। কারণ, আফজাল খাঁ সোলতানের একান্ত প্রীতিভাজন।

শিবাজী : অসম্ভব! মালোজীকে কন্যা সম্প্রদানে পূর্বেই সম্মতি প্রকাশ করেছি। বাগদত্তা কন্যা কিরূপে আফজাল খাঁর করে সমর্পণ করব?

মালেকা : তা'ত বটে! কিন্তু তারা আফজাল খাঁকেই হৃদয় মন দিয়ে বরণ করেছে, সুতরাং মালোজীর পক্ষে তারা আকাশের তারার ন্যায় অপ্রাপ্য।

শিবাজী : আমিও তা' বুঝেছি, কিন্তু কি করব! যেমন করে হউক মালোজীর করেই সমর্পণ করতে হবে। পরিণাম যা' হয়, হবে। মালোজী তারার রূপে মুগ্ধ! মালোজী মুসলমান শিবির হতে তাকে হরণ করে লুকিয়ে রেখেছে।

মালেকা : আমাকে হরণের সঙ্গে সঙ্গে নাকি? কেমন করে হরণ করল? সেই সুড়ঙ্গপথে নাকি?

শিবাজী : না, তার অনেক পরে। ছদ্মবেশে শেরমর্দান খাঁ রূপে! তোমাদের শিবিরে অনেক দিন বাস করবার পরে।

মালেক : শেরমর্দান খাঁই তবে মালোজী!

শিবাজী : হাঁ।

মালেকা : সাবাস বটে! অদ্ভুত সাহস এবং ছদ্মবেশ ধারণে অপরিসীম নৈপুণ্য! আমরা কোনও সন্দেহ করতে পারি নাই। বাস্তবিকই মারাঠারা কি ভীষণ ধূর্ত! তোমাদের অসাধ্য কর্ম কিছু নাই!

শিবাজী : প্রেমের দায়ে সকলি সম্ভব।

এই সময়ে মালেকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শিবাজী : মা! তুমি বুঝি তারাকে খুব ভালবেসেছ?

মালেকা : হাঁ, খুবই! নিজের ছোট ভগ্নী এবং সখির মত! তারাকে মালোজী হরণ করেছে এ-সংবাদ শেলসম অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করছে। হায় তারা! তারাকে বোধ হয় রায়গড়ে নিয়ে গিয়েছে?

শিবাজী : না। তারাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে আমি তা ঠিক অবগত নহি। তবে শুনেছি, তার মাতুলালয়ে আছে।

মালেকা : এ অপহরণে কোনও ফল হবে না। তারা, আফজাল খাঁ ব্যতীত অবগত নহি। তবে শুনেছি, তার মাতুলালয়ে আছে।

মালেকা : এ অপহরণে কোনও ফল হবে না। তারা, আফজাল খাঁ ব্যতীত আর কাকেও স্বামীত্বে বরণ করবে না। জোর জবরদস্তি করে কুফল ব্যতীত কোন সুফল হবে না।

শিবাজী : তা খুবই বুঝছি। কিন্তু মালোজীর করে কন্যা সমর্পণ না করলে, মালোজী বিদ্রোহী হবে। আত্মীয়-স্বজন ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হবে। মহাসঙ্কট! তারার মৃত্যুই এক্ষণে মঙ্গলজনক। এমন কুলত্যাগিনী কন্যার পিতা হওয়া বিষম পাপের ফল! লোক-সমাজে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না!

মালেকা : তুমি অন্যের কুলের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেছিলে, কাজেই তোমার কুলে কলঙ্ক হবেই। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেক নিঃশ্বাসের প্রশ্বাস, প্রত্যেক ধ্বনির প্রতিধ্বনি এবং প্রত্যেক দানের প্রতিদান আছে। অনুতাপ বৃথা! এ তোমার স্বকৃত কর্মফল।

শিবাজী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার ঠিক হইয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আফজাল খাঁকে কন্যা দান করলেই বা কি লাভ হবে? তিনি কি আমার পক্ষাবলম্বন করে বিজয়পুর দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?"

মালেকা : তা নহে। মুসলমান হয়ে তিনি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। তিনি আদর্শ মুসলমান। তবে আপনার জায়গীর যাতে বাজেয়াপ্ত না হয়, তার চেষ্টা করতে পারেন।

শিবাজী : আফজাল খাঁই আমার প্রধান শত্রু। তাঁর মত দক্ষ সেনাপতি না থাকলে বিজয়পুর বাহিনীকে অনেক পূর্বেই পর্যুদস্ত করতে পারতাম!

মালোজী : আফজাল খাঁকে কন্যা দান করলে সন্ধি হতে পারে এবং তারার জীবনও রক্ষা পেতে পারে।

শিবাজী : দেখা যাক কোথাকার ঘটনা কোথায় যেয়ে দাঁড়ায়! তোমাকে আগামী কালই কৃষ্ণগড়ে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। মা! তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, এটাই আমার বিশেষ ভরসা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গভীর নিশীথে সুড়ঙ্গপথে বেহুঁশ অবস্থায় তারাবাঈকে হরণ করিয়া লইয়া মালোজী এক পর্বত গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু সেখানে আফজাল খাঁর চরগণ আশু অনুসন্ধান পাইতে পারে বলিয়া পিত্রালয় রায়গড়ে পাঠাইবার কথা হয়। কিন্তু সেখানে রাখিলে পাছে আফজাল খাঁ রায়গড় আক্রমণ করিয়া বসেন, এই ভয়ে শিবাজী তাহাকে মাতুলালয়ে রাখিতে আদেশ করেন। কঙ্কন প্রদেশের বিঠ্‌ঠলপুরের এক গিরি-উপত্যকায় তারার মাতুলালয়। স্থানটি নিতান্ত দুর্গম, অথচ প্রাকৃতিক দৃশ্যে নিতান্তই মনোরম। তারার মাতামহ মল্‌হর রাও একজন বড় জোতদার এবং হায়দ্রাবাদ নিজামের তহশীলদার। সুতরাং বিঠ্‌ঠলপুরে তিনি একজন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তারাকে এখানে বিশেষ যত্নে গোপনে রাখা হইল। তারার মনের গতি পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইল। কোনওরূপে একটি সন্ধি স্থাপিত হওয়া মাত্রই মালোজীর সঙ্গে তাহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এই আশায় সকলেই উদ্বিগ্ন রহিল।

তারা সহস্র যত্ন এবং আদর পাইলেও কিছুতেই আফজাল খাঁর অতুল গরিমাপূর্ণ সৌন্দর্য এবং প্রেমের মাদকতা ভুলিতে পারিল না। স্বাধীন বনচারী বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ হয়, তারার অবস্থাও তদ্রূপ।

তারার প্রাণের ব্যাকুলতা এবং চাঞ্চল্য দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পলায়ন করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াও কোনও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিল না।

জীবন, তারার কাছে নিত্যই দুর্বহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, ব্যক্ত করিবার জন্য একটি লোকও নাই। তাহার প্রণয়-দেবতা আফজাল খাঁর কোনও সংবাদ না পাইয়া সে আরও অধীর ও চঞ্চল হইয়া

উঠিল। সে কাহারও সহিত মিশিত না বা কথা কহিত না। মনের অশান্তি ও চাঞ্চল্য হাজার চেষ্টা করিয়াও তারা লুকাইতে পারিত না। তাহার মনের প্রতি অণুপরমাণু তুষানলে যেন দগ্ধ হইতে লাগিল।

হায়! সে দুঃখ এবং সে জ্বালা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। তারার মাতামহী তাহার মানসিক শান্তি বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা ও তদ্বির করিলেন। অনেক হোম এবং যজ্ঞ করিলেন। তারার চিত্তরঞ্জনের জন্য গান-বাদ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু জলের পিপাসা কি দুগ্ধে নিবারিত হয়? ক্ষুধার পেট কি কখনও কথায় ভরে? তারার কিছুতেই শান্তি হইল না।

তারা পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সুবর্ণ কান্তি বিমলিন হইতে লাগিল। তারার উজ্জ্বল কটাক্ষপূর্ণ চক্ষু ক্রমশঃ উদাস ও কাতর-দৃষ্টিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেশ বেশ এবং অঙ্গরাগে তাহার আর কিছুই যত্ন রহিল না। কিছুদিন মধ্যে তারাতে কিছু কিছু উন্মাদের লক্ষণও পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

বায়ু শান্তির জন্য নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় তৈল এবং ঔষধের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও সুফল পরিদৃষ্ট হইল না। তারার নধর ও পুষ্ট তনু ক্রমশঃ ক্ষীণ ও শ্রীহীন হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, প্রেমাস্পদ লাভের দারুণ নৈরাশ্যেই তারার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

তারার মাতামহী অম্বুজা বাঈ তারাকে চক্ষের তারার ন্যায় দেখিতেন। তারার শোচনীয় বিষণ্ণ অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি যার-পর-নাই মর্মপীড়িত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিঠ্ঠলপুরে বিঠ্ঠলজীর একটি মন্দির ছিল। এই বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামের নাম বিঠ্ঠলপুর হইয়াছিল। বাসন্তী পূর্ণিমার তিথিতে এই বিঠ্ঠলদেবের মন্দিরে কোথা হইতে এক তেজঃপুঞ্জতনু তপ্তকাঞ্চনকান্তি ললনা-কুল-ললাম-ভূতা মহাতেজস্বিনী ভৈরবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভাত হইতে হইতেই ভৈরবীর আগমন-সংবাদ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে নরনারী কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে এই নবীনা ভৈরবীকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। ভৈরবী অনেক পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ দান করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য করিলেন। ভৈরবীর রূপে গুণে জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক চতুর্দিক হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিঠ্ঠলপুর লোকের হলহলায় সজাগ হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য,

নজর-নেয়াজ এবং মানতের ফল-মূল, নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য জাত, বস্ত্র এবং মুদ্রায় মন্দির পূর্ণ হইয়া উঠিল। সন্তান লাভ কামনায় নারীদিগের বিপুল জনতা হইতে লাগিল। ভৈরবী এই বিপুল খাদ্যসামগ্রী এবং অর্থরাশি প্রফুল্ল চিত্তে গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিতে লাগিলেন।

ভৈরবীর রূপের ছটা, তেজস্বিনী মূর্তি, বিনয়নম্র ব্যবহার, সরল ধর্মোপদেশ এবং রোগ আরোগ্য-শক্তি অবলোকন করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল! চতুর্দিকে ভৈরবীর নামে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল।

ভৈরবীর প্রশংসায় আকৃষ্ট হইয়া একদিন স্বয়ং তারার মাতামহী অম্বুজা বাঈ তারাকে লইয়া ভৈরবী সন্দর্শনে বিঠঠলজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীর অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয় মূর্তি এবং মধুর বাক্যালাপে অম্বুজা বাঈ এবং তারা উভয়েই মোহিত হইয়া পড়িলেন। তারার অসুখের কথা উঠিলে ভৈরবী বলিলেন যে, তিনি একরাত্রি তারাকে নির্জনে নিজের কাছে রাখিয়া একটি মন্ত্র জপ করিয়া গভীর রাত্রে হোম করিবেন।

অম্বুজা বাঈ আনন্দের সহিত তাহাকে অনুরাগপূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর নির্দিষ্ট রাত্রে তারাবাঈকে লইয়া ভৈরবী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কিছু রাত্রি পর্যন্ত মন্ত্র জপ করিবার পরে, ভৈরবী তারাকে বলিলেন, "তোমার এ মানসিক বিকার প্রেমের জন্যই সংঘটিত হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই কারও প্রেম-পাশে আবদ্ধ হয়েছে। তিনি কে, আমাকে খুলে বল।"

তারাবাঈ ভৈরবীর কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল, তাহার গণ্ড রক্তাক্ত হইয়া আবার মলিন হইয়া গেল। তারা নীরবে হতাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভৈরবী বলিলেন, "আমি গণনায় দেখছি যে, সেই নাগররাজ মুসলমান কুলোদ্ভব। তুমি মারাঠী-রাজকুমারী হয়ে কিরূপে মুসলমান নাগরের রূপে মুগ্ধ হলে, ইহা তো নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয়! যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ভুলবার চেষ্টা করলে, ভুলে যাওয়াটা কঠিন নহে?"

তারা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা' সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

ভৈরবী : বটে! প্রেম কি এতই গভীর হয়েছে? এত ফাঁসিয়া গেলে তো মুশকিল! জাতি-কুল মজাইয়া প্রেম করা তো ভাল নয়!

তারা : প্রেম কি জাতি-কুল বুঝিয়া চলে? তটিনী যেমন নিভৃত গিরিকন্দর হতে নির্গত হয়ে আপনার মনে আপনার ভাবে পথে কাটিয়ে সাগর-সঙ্গমে প্রবাহিত হয়, প্রেমও তেমনি উদ্দাম গতিতে আপনার মনের পথে ছুটে চলে। নদী যেমন পথে চলতে কাকেও জিজ্ঞাসা করে ছুটে যায় না, প্রেমও তেমনি

কারও পরামর্শ বা উপদেশের তোয়াক্কা রাখে না। নদী যেমন সমুদ্রের সম্মিলন লাভ না করে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না, প্রেমও তেমনি আকাঙ্ক্ষিতকে প্রাপ্ত না হয়ে স্থির হতে পারে না।

ভৈরবী ঃ তুমি দেখছি, প্রেম-রাজ্যের মস্ত দার্শনিক পণ্ডিত হয়ে পড়েছ! তোমার সঙ্গে এঁটে উঠা কঠিন!

তারা ঃ আপনার বিনয় প্রকাশের কায়দা অতি চমৎকার! এই অধীনা এবং অধমাকে আর লজ্জিত করবেন না। আপনার চেহারা দেখে এবং কথা শুনে আমি একরূপ অনির্বচনীয় শান্তি লাভ করেছি। আপনার স্বর যেন কত কালের পরিচিত! আর আপনাকে যেন কতই প্রাণের জন বলে বোধ হচ্ছে! কেন এরূপ হচ্ছে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না?

ভৈরবী ঃ আমিও সত্য সত্যই তোমার জন্য প্রাণের ভিতরে গভীর মমতা বোধ করছি। তোমাকে নিতান্তই আত্মীয়তম, মধুরতম এবং প্রিয়তম বলে বোধ হচ্ছে। এক্ষণে আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবার কোনও আনুকূল্য করতে পারলেই কৃতার্থ এবং সুখী হতে পারি।—এই বলিয়া ভৈরবী গভীরভাবে ধ্যানমগ্না হইলেন। দীর্ঘ ধ্যানের পর সহসা ধীরে চক্ষুরুন্মিলন পূর্বক প্রভাত-প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় স্মিত হাস্যে বলিলেন, "তোমার ভাগ্যাকাশ উষালোকে আলোকিত দেখে আশ্বস্ত হলাম।"—এই বলিয়া ভৈরবী গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন।

তারা ঃ কি দেখলেন? বিশদরূপে বুঝিয়ে বলুন।

ভৈরবী ঃ আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।

তারা ঃ এখানে বসেই কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে?

ভৈরবী ঃ নিশ্চয়ই না।

তারা ঃ তবে কোথায় যেতে হবে?

ভৈরবী ঃ তা আমি জানি। সমুদ্র-সঙ্গম ব্যতীত গতি আর কোথায়?

তারা ঃ কে আমাকে নিয়ে যাবে?

ভৈরবী ঃ যে তোমাকে নিতে এসেছে।

তারা ঃ আপনি! আপনি!! আপনি আমাকে নিতে এসেছেন! বটে, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের জন্য, কিম্বা দেবতার মন্দিরে বলিদানের জন্য! ভৈরবীর প্রাণ যে অতি কঠোর। আমার জন্য আপনার এত গরজ কি? কে আপনি?

ভৈরবী ঃ বেশী কথা বলো না। স্থির হও। আমি কে, এই দেখ।

ভৈরবী এই বলিয়া তাহার বাহুর উপরের অংশে একটি দাগ দেখাইল। এতক্ষণ ইহা বস্ত্রাবৃত ছিল।

তারা এই অশ্রুলেখা দেখিয়া বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল। ভৈরবীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ভৈরবী আনন্দোদ্বেলিত-চিত্তে তারার পেলবগণ্ডে দুইটি গাঢ় চুম্বন করিয়া স্নেহভরে বলিলেন, "আর অশ্রু বর্ষণ করো না। তোমার ক্রন্দনে আমার হৃদয় মথিত হচ্ছে। প্রস্তুত হও। নদীর ঘাটেই নৌকা। এখনই এই স্থান ত্যাগ করে নৌকায় আরোহণ করতে হবে।"

তারার মুখমণ্ডল সহসা মেঘাবরণ মুক্ত শরচ্চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! আনন্দোল্লাসে তারার হৃদয়ের স্তরে স্তরে এবং শোণিতের কণায় কণায় বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল!! নৈরাশ্যের গ্রীষ্ম-জ্বালা পরিতপ্ত হৃদয়-তটিনীতে আশা ও আনন্দের বর্ষাকালীন জীমূত-ধারা মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। সে বর্ষণে প্রেমের দু'কূল-প্লাবী বান ডাকিয়া যুবতীর হৃদয় তোলপাড় করিয়া দিল। ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ-অম্বুধির ন্যায় তাহা চঞ্চল এবং উত্তাল হইয়া উঠিল।

অতি সত্বর ভৈরবীও বেশ পরিবর্তন করিয়া সাধারণ মারাঠী যুবকের ন্যায় সজ্জিত হইলেন। অতঃপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ নির্গত হইবার উপক্রম কালে তারা বিঠ্‌ঠলজীর প্রতিমাটি ভূপাতিত করিয়া পদাঘাতে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিল! ভৈরবী বলিলেন, "তারা! ছি! ছি! এ করলে কেন? প্রতিমার সহিত প্রতিহিংসা কিসের?"

তারা : প্রতিহিংসার জন্য নহে। মারাঠীদের ভ্রমাপনোদনের জন্য। তাহারা এই মূর্তিকে জাগ্রত এবং জীবিত বলিয়া জানে। আমার সঙ্গে কত দিন এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমি এই প্রমাণ করে গেলাম যে, ইহা প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতে তাদের অনেকের ভ্রান্তি দূর হবে।

ভৈরবী : দেখছি, তুমি মূর্তিপূজক কাফেরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেও হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লার ন্যায় প্রতিমা চূর্ণ করতে বিশেষ আনন্দ লাভ কর।

অতঃপর ভৈরবী এবং তারা নিশীথের গভীর অন্ধকারের মধ্যে যথাস্থানে যাইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। সুবাতাস বহিতেছিল। নৌকা পালভরে তীরের মত ছুটিয়া চলিল। পাঠক-পাঠিকা! বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই ভৈরবী আর কেহ নহে, ভৈরবী—আমাদেরই অসাধারণ তেজস্বিনী বিচিত্রকর্মা মালেকা আমেনা বানু।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নৌকা ভরাপালে জোর বাতাসে কল কল রবে নদীর জলরাশি কাটিয়া তীরের মত বেগে ছুটিল। রাতারাতি নৌকা অনেক দূরে সরিয়া পড়িল। প্রভাত সমাগমে

বায়ুর বেগ কিছু মন্দ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে বায়ুর প্রবাহ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং মাল্লারা নৌকার পাল নামাইয়া দাঁড় ধরিল। ঝড়ের মত যে নৌকা বায়ুভরে ছুটিয়া যাইতেছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাকৃত ধীর মন্থরভাবে যাইতে লাগিল। মালেকা এবং তারা কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; মাল্লাদিগকে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে দাঁড় ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। মাল্লারা যতদূর সম্ভব তীব্রবেগে দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ আঁধার ভেদ করিয়া প্রভাতের অরুণিমাজাল পূর্বগগনে দেখা দিল। বিহঙ্গ-কণ্ঠে বিশ্ব-বিধাতার বিবিধ বন্দনা ললিত-স্বরে গীত হইয়া পৃথিবীকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল! স্নিগ্ধ গন্ধবহ মৃদু মন্দ সঞ্চারে কুসুম গন্ধ বহন করিয়া বিশ্ব-বিধাতার মঙ্গলাশীর্বাদের ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া নব জীবনের সূচনা করিতে লাগিল।

নিশাচর প্রাণীদিগের মনে নৈরাশ্য ও ভীতির সঞ্চার এবং দিবাচরদিগের মনে আনন্দ উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেখিতে দেখিতে দিবসের আবির্ভাব হইল। দিবা আবির্ভাবে মালেকা এবং তারা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক মারাঠী পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া নৌকার ভিতরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নৌকায় কয়েক জন পাঠান বীরপুরুষ আসিয়াছিলেন; তাঁহারা বীর-পরিচ্ছদ পরিবর্তন পূর্বক সাধারণ মাল্লাদিগের সাজে সজ্জিত হইলেন।

নৌকা ভরাপালে তীব্র বেগে গেলে যেখানে তিন দিনে নিরাপদ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিত, সেখানে বায়ুর গতি রুদ্ধ হওয়ায় শুধু ক্ষেপনী সাহায্যে চারি দিনে অর্ধপথে যাইয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে বিঠ্ঠলপুর হইতে ভৈরবী এবং তারার সহসা অন্তর্ধানে এবং দেবমূর্তির ভগ্নদশা দর্শনে পরদিবস প্রাতঃকালেই এক হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল! দেবমূর্তির ভগ্নাবস্থা এবং দারুণ অবমাননা দর্শনে সকলেই ক্রুদ্ধ এবং মর্মাহত হইল! ভৈরবীর সম্বন্ধে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

কেহ ভৈরবীকে নাস্তিক, কেহ উন্মত্ত বলিতে লাগিল। কিন্তু একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধা বলিল যে, এই ভৈরবী বাস্তবিক পক্ষে ভৈরবী নহে। এই ভৈরবী নিশ্চয়ই কোন মুসলমান রমণী। রমণী অসাধারণ সাহসিনী এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী। তারাকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই ভৈরবীবেশে এখানে আসিয়াছিল। মারাঠীদের ধূর্ততা এবং কৌশলকে এবার মুসলমান রমণী বেশ টেক্কা দিয়াছে। ধন্য রমণীর সাহস এবং বুকের পাটা! সমস্ত মারাঠীর মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছে! কথা তড়িদ্বেগে সর্বত্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ঘটনা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল! ভগ্নপ্রতিমা সন্দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারী সমাগত হইল। ভৈরবী এবং তাহার উদ্দেশ্যে সহস্রকণ্ঠে সহস্রভাবে অজস্র অভিসম্পাত এবং সহস্র গালাগালি বর্ষিত

হইতে লাগিল। কোনও কোনও প্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাহাদের আরাধ্য এই ভগ্নমূর্তির শোকে অশ্রুধারা বহাইতে লাগিল! নবীন-নবীনারাও অনেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কেবলমাত্র একটি মারাঠী কুমারী বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "ওমা! বিঠলজী আমাদের কেমন প্রভু! একজন মুসলমান রমণীর সঙ্গে যুদ্ধেই চুরমার হয়ে গিয়েছে। তবে দেখছি, এসব দেবতা-টেবতা কিছুই নয়—সবই মাটী! সবই ভূয়া! সবই মিথ্যা!"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই জিব কাটিয়া বলিল, "সর্বনাশ! সর্বনাশ! হীরা বলে কি! হিন্দুর মেয়ের মুখে একি সর্বনেশে কথা! ঘোর কলি! ঘোর কলি!! ধর্ম আর থাকে না।" এই বলিয়া হীরার প্রতি সকলেই তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল! হীরাবাঈ তাহাতে আরও ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমি কি অন্যায় বলছি? যে-দেবতা নিজেকে রাখতে পারে না, সে আমাদিগকে কেমন করে রাখবে, আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমি দিব্য দেখতে পাচ্ছি, এটি একটি বড় পাথরের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়! উহাতে ভক্তি করা আর লাথি মারা, সমান কথা।" হীরার কথার ধারে সকলেই হতভম্ব হইয়া পড়িল। কেহ কেহ হীরার প্রতি রুখিয়া উঠিল। হীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তারার মাতামহ মল্হর রাও নানাস্থানে নানাদিকে অনুসন্ধানী লোক পাঠাইলেন। নানুপুরে মালোজীর নিকট একজন অশ্বারোহীকে অবিলম্বেই পাঠান হইল। মালোজী তখন বিশেষ কার্যের জন্য নানুপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সংবাদ শুনিয়া মালোজী বজ্রাহতের ন্যায় প্রথম স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই পনর জন অশ্বারোহী সহ তুঙ্গা নদীর তীর ধরিয়া দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ভবানীপুর নামক স্থানে—যেখানে নদী সঙ্কীর্ণ অথচ গভীর প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, সেই ভবানীপুর লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটাইলেন। ঘোড়াগুলি পদাঘাতে প্রস্তর-গাত্রে স্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া এবং পর্বত ও বন-প্রান্তরে পদধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল। তরুশাখাসীন বিহঙ্গাবলী এবং ক্ষেত্রমধ্যস্থ বাবুই পক্ষীর ঝাঁক কেবল চকিতে চঞ্চল হইয়া কোলাহল করিতে করিতে উড়িয়া উঠিল। পথিকগণের চক্ষে কেবল মারাঠী সৈন্যদিগের রবিকর-প্রতিফলিত বর্শাফলকগুলি ঝলিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নৌকা চলিয়াছে। একটু বাতাস বহিতেই মাঝি আবার নৌকায় পাল তুলিয়া দিল। সকলেই নিরুদ্বেগচিত্তে নানা প্রকার গালগল্পে মশগুল! ভবানীপুর আর

বেশী দূর নহে। ভবানীপুর পার হইলেই নৌকা প্রশস্ত নদীবক্ষে পড়িবে।

মালেকা বলিলেন, "যে পর্যন্ত ভবানীপুর না ছাড়াও, সে-পর্যন্ত বিশেষ সাবধানে চলবে।" মালেকা নিজে নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের যেখানে যেখানে বন ছিল, সেখানে সেখানে নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা ভবানীপুরের নিকটবর্তী হইল। নৌকা ভাবনীপুর পার হইয়াছে, এমন সময় কতিপয় অশ্বারোহী মারাঠী চীৎকার করিয়া নৌকা থামাইতে বলিল। মালেকার বুঝিতে বাকি রহিল না, ইহারা শত্রু পক্ষেরই লোক। সুতরাং মাঝিকে অপর তীরে নৌকা চালাইতে ইঙ্গিত করিল। নৌকা নদীর অত্যন্ত প্রশস্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় দস্যুদের পক্ষে নৌকা আক্রমণ করা সহজ নহে! নৌকা অপর তীরে দূর দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মারাঠীরা ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "আমরা দস্যু নহি। আমরা কোতয়ালীর লোক। তোমরা কোনও রমণীকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ কি-না, তাই মাত্র আমাদের প্রতি দেখবার হুকুম। আমরা তোমাদের কোনও অনিষ্ট করব না। অল্পক্ষণের জন্য তোমাদের নৌকা থামাও, নতুবা আমরা গুলী চালাব। অনর্থক খুন-জখম হবে।"

মালেকার ইঙ্গিতে মাঝি বলিল, "আচ্ছা, তবে আমরা সম্মুখের বাঁকে থামাচ্ছি। তোমরা অনুসন্ধান করে দেখ।" বাতাস খুব জোরে বহিতেছিল, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা বাঁকে আসিয়া লাগিল। নদীবক্ষ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তবে নির্মেঘ আকাশ বলিয়া দৃষ্টি একেবারে অবরুদ্ধ নহে। মালেকার নৌকার ভিতরে মাত্র একটি ক্ষীণ বাতি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরে তাহার আলোক প্রায় কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

মালেকা সকলকে যাহার যাহা কর্তব্য বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। নৌকার ভিতরে অব্যর্থ-লক্ষ্য সৈনিকগণ নৌকার পার্শ্বের ছইয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মুখে বন্দুকের নল সংযোগ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। দ্বাদশ ছিদ্রে দ্বাদশটি বন্দুক সংস্থাপিত হইল। আট জন মাল্লা এবং এক জন মাঝি মাত্র বাহিরে রহিল। তাহারা সকলেই আপন আপন কার্য সম্পাদনে অত্যন্ত পটু।

দস্যুরা দুইটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালাইয়া নদীর তীরে সারিবন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল।

মাঝি বিনীতভাবে মালোজীকে বলিল, "সর্দার সাহেব! আপনি যে কয় জন ইচ্ছা লোক লইয়া নৌকার ভিতরে এসে দেখে যান। তবে ভিতরে এরূপ স্থানাভাব যে, ৩/৪ জনের অধিক লোকের দাঁড়াবার জায়গা হবে না। জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে রয়েছে।"

মালোজী : বেশী লোক নিয়ে উঠবার দরকার কি? আমি মাত্র দু'জন লোক নিয়ে উঠছি। তোমাদিগকে মিছামিছি জ্বালাতন করব না।—এই বলিয়া মালোজী তরবারিধারী দুইজন সৈনিকপুরুষ সহ নৌকার সিঁড়িতে পদার্পণ করিলেন। মাল্লারা কয়েকজন আসিয়া মস্তক নত করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভরে সালাম করিল। মালোজী সৈনিক পুরুষদ্বয় সহ নৌকায় যেমনি উঠা, অমনি তাহাদের ঘাড়ে বজ্রের ন্যায় ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত আর সেই সঙ্গে একেবারে দ্বাদশ বন্দুকের এক সঙ্গে আওয়াজ। দ্বাদশটি অশ্বারোহী সৈন্য মুহূর্ত মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল। ঘোড়াগুলি ভড়কাইয়া দিগ্বিদিকে উধাও হইয়া পলায়ন করিল। অবশিষ্ট তিনজন অশ্বারোহী প্রাণভয়ে চিৎকার করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান হইবার উপক্রমেই মাল্লাদিগের গুলীর আঘাতে হতজীবন হইয়া ভূপতিত হইল।

এদিকে নৌকায় সমাগত মালোজী, সঙ্গীদ্বয় সহ মুহূর্ত মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িলেন। অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া লৌহশৃঙ্খলে কঠোরভাবে আবদ্ধ করিয়া তিন জনকে নৌকার ডহরে রজ্জুবদ্ধ কূর্মের ন্যায় ফেলিয়া রাখা হইল।

এদিকে তিন চার জন মাল্লা তীরে উঠিয়া নিহত মারাঠীদিগের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি নৌকায় উঠাইয়া তাহাদের লাশগুলি নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

প্রবল পবনে তখন নৌকা বিজয়ী বীরের মত স্ফীত বক্ষে ছুটিতে লাগিল। এই ঘটনার বর্ণনা করিতে যে-সময় লাগিল, তাহার দশমাংশ সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর সকলে করুণাময় খোদাওন্দতালাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চৈত্রমাসের শেষ। বসন্তের পূর্ণ বিকাশ এবং গ্রীষ্মের সমাগমে শিবাজী ক্রমশঃ পরাস্ত হইয়া নিবিড় কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঝাড়ে-জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মালোজী বন্দী হওয়ায় শিবাজী যার-পর-নাই হতাশ এবং বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রামদাস স্বামী, আবাজী প্রভৃতি তখন সন্ধি করিবার জন্য শিবাজীকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু আফজাল খাঁ শিবাজীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত এবং উৎসাদিত করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইলেন। শিবাজী অনেক হীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধির জন্য পুনঃ

পুনঃ আবেদন-নিবেদন এবং প্রার্থনা ও মিনতি চলিতে লাগিল। অবশেষে শিবাজী এক দিন মালেকা আমেনা বানুর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিখারী হইলেন।

মালেকা আমেনা বানু তখন আফজাল খাঁকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। পরামর্শ হইল যে, শিবাজী স্বেচ্ছায় আনন্দ-উল্লাসে তারাবাঈকে রাজোচিত আড়ম্বরে আফজাল খাঁর করে সমর্পণ করিবেন। আর আফজাল খাঁ শিবাজীকে তাঁহার অধিকৃত পরগণা এবং কেল্লাগুলির মাত্র এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিবেন। শিবাজী দস্তুরমত বিজাপুর সোলতানের আধিপত্য ধর্মতঃ এবং কার্যতঃ স্বীকার করিবেন।

শিবাজী মুসলমানদের যে-সমস্ত মসজিদ ভগ্ন করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যথাযথরূপে প্রস্তুত করিয়া দিবেন। শিবাজী রণতরী রাখিতে পারিবেন না। এই সমস্ত শর্ত যথারীতি লিখিয়া বিজাপুর দরবারে প্রেরণ করা হইল। বিজাপুর দরবার একবারেই শিবাজীর উৎসাদনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু আফজাল খাঁর অনুরোধে এই সমস্ত শর্ত স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

আফজাল খাঁর সহিত তারাবাঈয়ের বিবাহ সম্বন্ধে বিজাপুরের সোলতান প্রথমতঃ আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু তারাবাঈ-এর করুণ প্রার্থনা এবং গভীর ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র পাইয়া পরে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ২১শে চৈত্র শুক্রবারে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান সামন্তদিগের সম্মুখে যথারীতি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। শিবাজীর প্রার্থনানুযায়ী মালোজীকে আমেনা বানু বিনা নিষ্ক্রয়ে মুক্তি প্রদান করিলেন। মালেকা বলিলেন, "মালোজী আপনি তারাকে বেহুঁস করে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সচেতন এবং সশস্ত্রাবস্থায় আপনাকে বন্দী করেছি। সুতরাং আশা করি, আমাতে কোনও হীনতা দর্শন করবেন না।"

মালোজী লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিলেন, "আপনার সাহস যেমন অপরিসীম, দয়াও তেমনি তুলনাহীন! আপনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।" অনন্তর যথাসময়ে বৈশাখী পূর্ণিমাতে বিবাহের দিন নির্ধারিত হইল।

শিবাজী তারাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তারার প্রতি যাহাতে কোনও উৎপীড়ন না হয়, সেজন্য মালেকা শিবাজীকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন। তারার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইলে শিবাজীকে যে সকল-হারা হইতে হইবে, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ বৈশাখী শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। অমল ধবল শশীর মনোহর কৌমুদী জালে গগনমণ্ডল ও ভূতল কি সুন্দর ও শোভন দৃশ্য ধারণ করিয়াছে! রায়গড়ে শিবাজীর বাটী আজ বিশেষরূপে ধ্বজপতাকা আলোকমালায় সুসজ্জিত! বিরাট সভামণ্ডপে অসংখ্য আলোকের সমাবেশ! রাজবাড়ীর ফটকে ফটকে নহবতে নহতে মধুর সুরে শাহানা বাজিতেছে! সৈনিকেরা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহুসংখ্যক নারী বিচিত্র পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ শিবাজীর রাজপুরী আজ উজ্জ্বলিত নাট্যশালার ন্যায় মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে।

একটু রাত্রি হইতেই "বর আসিতেছে, বর আসিতেছে" বলিয়া সর্বত্রই একটু ধুম পড়িয়া গেল। সুবর্ণখচিত মনোহর পরিচ্ছদ পরিহিত দুই শত অশ্বারোহী রৌপ্য-নির্মিত বর্শাফলকে রক্তবর্ণ রেশমী পতাকা বিধূনন করিয়া সকলের অগ্রে নমুদার হইল। অতঃপর পঞ্চাশটি হস্তী স্বর্ণাস্তরণে আস্তৃত এবং স্বর্ণমুকুট পরিহিতাবস্থায় অগ্রসর হইল। অতঃপর নানা শ্রেণীর তূরী, ভেরী, বাঁশী, স্বরুদ, রুদ, কুপচাগ, সেতার, সারেঙ্গী, বীণ, রবাব, তানপুরা, বেহালা প্রভৃতি কোমল সুরের বাদ্যের ঐক্যতান বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরগণ অগ্রসর হইল।

তৎপর খাসগেলাফ, আসাসোটা, অসংখ্য প্রকার ফুলের ঝাড় সহ বাহকগণ অগ্রসর হইল। তৎপর সুবর্ণ তাঞ্জামে চড়িয়া বীরকুঞ্জর, রূপসাগর, বর নাগর আফজাল খাঁ আগমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিজাপুরের কতিপয় অমাত্য সর্দার ও সামন্ত উৎকৃষ্ট অশ্বারোহণে নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত আগমন করিলেন। অতঃপর সোলতানী "তবলখানা," নানাজাতীয় বিগল, কর্ণাল, ভেরী, দফ, তবল, নাকারা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যে গুরু গম্ভীরভাবে উৎসবের বাজনা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল।

তৎপর সাধারণ সৈনিক, অন্যান্য লোক এবং রাস্তার জনতা অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ বরযাত্রীদল শিবাজীর দীর্ঘ প্রাসাদের সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শিবাজী এবং তাঁহার পিতা শাহজী, মালোজী, গুরু রামদাস স্বামী, বলবন্তরাও এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ পরম যত্নে সকলকে আদর অভ্যর্থনা এবং সাদর সম্ভাষণে প্রীত এবং সন্তুষ্ট করিয়া যথাযোগ্য আহার ও আবাসস্থান প্রদান করিলেন।

আফজাল খাঁর আনীত নানাপ্রকারের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, মোরব্বা, হালুয়া এবং ফলমূল সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুপড়িতে করিয়া অন্তঃপুরে নীত হইল।

আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সঙ্গীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোককে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকার মধ্যস্থ সুন্দর গৃহে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। শিবাজী সেইখানে আসিয়া আফজাল খাঁ এবং অমাত্যবর্গকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা এবং সম্বর্ধনা করিলেন। শিবাজীর বিনয়নম্র ব্যবহার, মধুর সাদর সম্ভাষণ ও সশ্রদ্ধ যত্নে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না-জালে জগন্মণ্ডল যেরূপ মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে, রায়গড়ের রাজবাটীও আজ তেমনি আলোক ও পুষ্প পতাকা সজ্জায় পূর্ব দিন অপেক্ষাও যেন অধিকতর শোভায় প্রদীপ্ত এবং পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে! সমস্ত দিন ভোজের বিপুল উৎসব অন্তে মগরেবের নামাজের পরে যথারীতি ইস্‌লাম প্রথানুযায়ী উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

অতঃপর জামাতা আফজাল খাঁকে অন্তঃপুরে আনয়নের ব্যবস্থা হইল। অন্তঃপুরের একটি নির্দিষ্ট অট্টালিকা বাসরের জন্য পূর্বে হইতেই আরাস্তা করা হইয়াছিল। আফজাল খাঁকে সেই অট্টালিকায় লইয়া বসাইবার কিছু পরেই অন্তঃপুরে ভীষণ আর্তনাদ উত্থিত হইল। সে আর্তনাদে অন্তঃপুরের যে যেখানে ছিল সকলেই চকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল!

"খুন! খুন! তারা খুন হয়েছে!" এই ভীষণ অশনিপাততুল্য শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতে লাগিল! শিবাজী এবং আফজাল খাঁ উঠিতে পড়িতে প্রাঙ্গণে ছুটিয়া গেলেন! স্ত্রীলোকদিগের ভিড় ঠেলিয়া সত্যই দেখিতে পাইলেন যে, সালঙ্কারা সুসজ্জিতা তারা বুকে শাণিত-ছুরিকা-বিদ্ধ-অবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে! রক্তে মেদিনী ভাসিয়া যাইতেছে! ছুরিকা তন্মুহূর্তেই বক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হইল। চিকিৎসার যথারীতি বন্দোবস্ত হইল! কিন্তু হায়! সকলি বৃথা! তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল! সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা প্রাণত্যাগ করিল। এই লোমহর্ষণকর নিদারুণ সাংঘাতিক ঘটনার বৃত্তান্ত এই যে, তারাকে যখন নববধূবেশে সাজাইয়া বাসর ঘরের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন প্রাঙ্গণে অবস্থিত একখানি পাল্কির ভিতর হইতে সহসা মালোজী নির্গত হইয়া শানিত-ছুরিকা তারার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দেন। ছুরি বিদ্ধ করিয়াই মালোজী ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটিয়া যান! দ্বারবান বাধা দিতেই দ্বারবানকেও ছুরি

মাজিয়া নিজের পথ মুক্ত করেন। কিন্তু অন্তঃপুরের দ্বার হইতে ছুট পাইলেও বাহিরের দ্বারে সৈনিক-প্রহরী কর্তৃক গ্রেফতার হন।

মহা আনন্দের মধ্যে মহা বিষাদের তরঙ্গ উত্থিত হইল। পূর্ণিমার শোভা অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। আশার কমল নিরাশার পঙ্কে মগ্ন হইল। রায়গড়ে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। তারার শোকে সকলেই আত্মহারা হইল। সেই বিবাহোৎসব দিনের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শোকের বিষয় পাঠক-পাঠিকা অনুমানে বুঝিয়া লউন। আর যদি সহানুভূতি থাকে, তবে এক বিন্দু অশ্রুপাত করুন।

পরদিন প্রত্যূষে মালোজীকে শূলে চড়ান হইল। মুহূর্ত মধ্যে নৈরাশ্যদিগ্ধ হিংসাপরায়ণ আত্মা শূন্যে মিশিয়া গেল। রায়গড়ের বিষাদ ভার আরও বাড়িয়া গেল। কারণ সকলেই বুঝিল যে, মালোজী তারার প্রতি একান্তই আসক্ত এবং অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তারা তাহাকে একেবারেই চাহিত না। সে আফজাল খাঁর রূপসরোবরেই প্রেমের কমল তুলিতে সাঁতার দিয়াছিল। কিন্তু হায়! হতভাগিনীর আশা পূর্ণ হইল না। দগ্ধজীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমের আগ্নেয়-পিপাসা লইয়াই জীবন ত্যাগ করিল! প্রেম-সরোবরে ডুবিয়াও এক বিন্দু প্রেমসুধা পানের পূর্বেই তাহার জীবনলীলা শেষ হইল। কি তীব্র বিষাদপূর্ণ ভয়াবহ ঘটনা! শিবাজী কন্যার শোকে নিতান্ত বিমনায়মান এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আফজাল খাঁর নিকটে গভীর দুঃখ ও করুণ বিলাপ প্রকাশ করিলেন। আফজাল খাঁর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইল।

অনন্তর আফজাল খাঁর সহিত আত্মীয়তা এবং কুটুম্বিতা বজায় রাখিবার জন্য শিবাজী তাঁহার ভগ্নী কামিনীবাঈকে আফজাল খাঁর করে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু আফজাল খাঁ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। আফজাল খাঁ তৎপর দিবস প্রাতঃকালে বিজাপুরে কুচ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিবাজীও অগত্যা তাহাকে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে সেনাপতি সাহেব রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে, শিবাজী, রামদাস স্বামী প্রভৃতি সকলেই বিদায় দিতে আসিলেন। শিবাজী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহাবীর সেনাপতে! আমার আশা পূর্ণ হল না। নৌকা কূলে লেগেও ডুবে গেল। আপনি আমার প্রবল শত্রু ছিলেন। আপনি অসাধারণ বীরপুরুষ! আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত হলে, দিল্লীর সিংহাসন দখল করাও অসম্ভব ছিল না। আমার আশা পূর্ণ হল না! আপনার সহিত যুদ্ধে কখনও পারব না! আমার রাজ্যলিপ্সা কখনও দমিত হবে না; সে পথের আপনি কণ্টক। যে উপায়ে সে কণ্টক দূর করার জন্য আশা করেছিলাম, তা ব্যর্থ হল! সুতরাং এক্ষণে দস্যুবৃত্তি ব্যতীত আর উপায় নাই।"

শিবাজীর কথা শেষ হইতে না হইতেই আফজাল খাঁ ভীষণ চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে সকলে চমকিত এবং ব্যস্ত ভাবে দেখিল— শিবাজী ভীষণ ব্যাঘ্র-নখাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আফজাল খাঁর বুকে আমূল বসাইয়া দিয়াছেন। সকলে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল! আফজাল খাঁর লোকজন প্রস্তুত হইবার পূর্বেই শিবাজী এবং মাওয়ালী সৈন্যগণ মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিহত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, আসাসোটা এবং অন্যান্য সমস্ত মূল্যবান পদার্থই লুণ্ঠিত হইল। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্রাদিসহ ধৃত হইল।

অল্পসংখ্যক লোকই প্রাণ লইয়া বিজাপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী অনতিবিলম্বেই আবার নানাস্থানে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সহকারী যুদ্ধবিশারদ তেজস্বী বীরপুরুষদিগের নিধনে শিবাজী অতিমাত্রায় স্পর্ধিত এবং সাহসী হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর ভীষণ ও ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহাবীর আফজাল খাঁর সদলবলে নিধন-সংবাদে বিজাপুর দরবার এবং বিজাপুরের যাবতীয় অধিবাসী যার-পর-নাই শোকে মুহ্যমান এবং ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। যেখানে-সেখানে এই লোমহর্ষক এবং পৈশাচিক হত্যার নিদারুণ কাহিনী একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল।

শিবাজীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং জুগুপ্সিত বিশ্বাসঘাতকতায় দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজরাজড়াই শিহরিয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিল, শিবাজীর অসাধ্য পাপকর্ম কিছু নাই!

উপসংহার

আফজাল খাঁর হত্যাকাণ্ডের পরে শিবাজী নানা দুর্গ এবং পরগণা অধিকার করিয়া ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন। অবশেষে বিজাপুরের প্রবল বাহিনীর বিপুল প্রতাপে শিবাজী পুনরায় পর্যুদস্ত এবং নিতান্ত হীনবল হইয়া বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই যুদ্ধে মোহাম্মদ খান বিশেষ পরাক্রম এবং প্রতিভা প্রদর্শন করায় মালেকা আমেনা বানু তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠীদিগের পুনরভ্যুত্থানের আশা সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, এই সময়ে ভারতেই অদ্ভুতকর্মা তপস্বী সম্রাট মহাপরাক্রান্ত মহাযশঃ বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব সমগ্র ভরতের একচ্ছত্র প্রভুত্বের লালসায় অকারণে গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করেন। এই দুই রাজ্য পূর্ব হইতে দিল্লীশ্বরদিগের বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং শাহ্জাহানের সময় হইতে উভয় রাজ্য 'সালানা নজরানা' দিল্লীর দরবারে পেশ করিতেন। তথাপি আওরঙ্গজেব এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করেন।

গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও সমৃদ্ধ এবং বলদৃপ্ত ছিল। জ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা এবং বিজ্ঞানচর্চায় উভয় রাজ্যই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উভয় রাজ্যের সোলতান, মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণ নিতান্ত দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মহীয়ান চরিত্রে এবং গরীয়সী বীর্যবত্তা ও দূরদর্শিতার শুভ্র-যশে এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করাই হইতেছে অদূরদর্শিতা এবং স্বজাতিদ্রোহিতার দুরপনের কলঙ্ককালিমা। এই রাজ্যদ্বয় দখল করিবার জন্য তাঁহাকে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান বাদশাহ্ এবং সোলতানদিগের এই ভীষণ আত্মকলহের সুযোগে শিবাজী বাদশাহ্ এবং সোলতানদিগের এই ভীষণ আত্মকলহের সুযোগে শিবাজী অবসর বুঝিয়া বহু পরগণা ও বহু দুর্গ দখল করিয়া স্বাধীন রাজ্য পত্তন করেন। মারাঠীগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। অবশেষে আওরঙ্গজেবকে এই মারাঠী শক্তি দমনের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ না করিলে, শিবাজী আর কখনও মাথা তুলিবার সুবিধা পাইতেন না। বিজাপুরের রাজশক্তিই শিবাজীকে চিরকাল দমন রাখিতে সমর্থ হইত।

ফিরোজা বেগম

প্রথম পরিচ্ছেদ

শারদীয় পৌর্ণমাসী শশধরের ন্যায় নির্মল কৌমুদীজাল বিতরণ করিয়া মোসলেম-প্রতিভা-শশী কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতুলনীয় কীর্তিকিরীটিনী নগরীকুলশিরোমণি দিল্লীর প্রতাপ ও গৌরব খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। ভুবনবিখ্যাত তৈমুরবংশে বীরচূড়ামণি বাবর, বিচিত্রকর্মা হুমায়ুন, প্রতিভাশালী আকবর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাহাঙ্গীর, কীর্তিমান শাহ্‌জাহান এবং তাপস-সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরে ক্রমশঃ হীনবীর্য অদূরদর্শী বাদশাহগণ দিল্লীর তখতে বসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যসন-বিলাস, অবিমৃষ্যকারিতা এবং উজির ও সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ভুবনবিখ্যাত দিল্লীসাম্রাজ্য ক্রমশঃ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া হীনবল এবং হীনপ্রভ হইতে লাগিল।

অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, সিন্ধু, কাশ্মীর, বাঙ্গলা, হায়দ্রাবাদ, কর্নাট, মালব প্রভৃতি বহু স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হইল। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার সমগ্র ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সুবর্ণ সুযোগে মারাঠীরা দলবদ্ধ হইয়া শিরোত্তোলন করিল। তরবারি এবং অগ্নিমুখে তাহারা হিন্দুস্থানে এক মহাপ্রলয়কাণ্ডের সূচনা করিয়া দিল। শান্তিময় ভারত সাম্রাজ্যে মারাঠীরা বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, বৃক্ষচ্ছেদন, শস্যদাহ, সতীত্বনাশ প্রভৃতি যত প্রকারের অত্যাচার এবং অবিচার শয়তানের মস্তিষ্কে থাকিতে পারে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই মারাঠীদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। মারাঠীদিগের অত্যাচারে ভারতের সর্বত্রই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' আর্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। মারাঠী দস্যুদিগের নিকট ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান কোনও প্রভেদ ছিল না।

সর্বত্রই তাহারা ভূমি-রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ) পাইবার জন্য ভীষণ জুলুম এবং অত্যাচার করিতে লাগিল। জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী চঙ্গেজ খাঁর নৃশংস আক্রমণে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে যেমন একদিন পশ্চিম-এশিয়ার মুসলমানগণ উৎপীড়িত, নিহত, লুণ্ঠিত এবং ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, আরব ও ইরান-তুরানের বিপুল বিশাল বিমল সভ্যতার আলোক-ভাণ্ডার যেমন নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, ধূর্তচূড়ামণি নির্মমপ্রকৃতি মারাঠী দস্যুদলের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং হত্যা ও লুণ্ঠনে ভারতের বক্ষেও তেমনি ঘরে ঘরে দারুণ হাহাকার উঠিয়া গগন-পবন আলোড়িত করিতে লাগিল। এই অত্যাচার, হত্যা এবং লুণ্ঠনের মুখে হিন্দু ও মুসলমানের কোন পার্থক্য ছিল না। লুণ্ঠন করিতে করিতে মারাঠীরা তাহাদের গুরু শিবাজীর সময় হইতেই সাহসী, কৌশলী, ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর হইয়া

পড়িয়াছিল।

এইরূপ যখন মারাঠীদিগের অত্যাচারে মন্দির ও মসজিদ চূর্ণীকৃত এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই লুণ্ঠিত এবং নিহত হইতেছিল, সেই সময়ে দিল্লী-লুণ্ঠনকারী মারাঠীদিগের বিক্রান্ত এবং রণনিপুণ সেনাপতি সদাশিব রাও এবং তাহার অধীনস্থ নায়ক, ভাস্কর পাণ্ডতের মধ্যে দিল্লীর প্রান্তবর্তী একটি শিবিরে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

সদাশিব : কি অপরিসীম রূপ! ছবিতে যা দেখলাম, তাতেই অবাক্ হয়েছি। রূপের সহিত এমন তেজের প্রভা এবং দৃঢ়তার গাম্ভীর্য কখনও দেখা যায় না!

ভাস্কর : তা আর বলতে কি? বিধাতা নির্জনে বসে একটু একটু করে বোধ হয় যুগযুগান্ত ধরে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের যে পদার্থে যতটুকু সৌন্দর্যের বিশেষত্ব এবং মাধুরী ছিল, তা তিল তিল করে কুড়িয়ে ললনা-কুল-ললামভূতা এই ত্রিলোকমোহিনী বরাঙ্গনাকে সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যুতের সহিত চাঁদের হাসি, গোলাপের সহিত কমল, কোমলতার সহিত কঠোরতা, শান্তির সহিত তেজঃ, শুভ্রতার সহিত লালিমা, মণির সহিত কাঞ্চন, বসন্তের সহিত শরৎ, উষার সহিত সন্ধ্যার, শ্রীর সহিত বর্ণের, লাবণ্যের সহিত রূপের, মধুর সহিত সৌরভের, গাম্ভীর্যের সঙ্গে সারল্যের, প্রেমের সহিত প্রভুত্বের একত্র সম্মিলন করে অপরূপ প্রেমপ্রতিমা এই বিশ্বমোহিনী নারীসত্তমাকে সৃষ্টি করেছেন। যে দেশে এমন নারীরত্ন জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ ধন্য! যে জাতিতে প্রতিভা ও সৌন্দর্যের এমন অপরূপ জীবন্ত নিরুপম প্রতিমা জন্মগ্রহণ করে, সে জাতিও ধন্য। এমন নারীর পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় হতে পারলেও গৌরব!

সদা : আর স্বামী হতে পারলে?

ভাস্কর : হায়! স্বর্গপ্রাপ্তি কোন্ ছার!

সদা : স্বর্গ! ছি! তার চরণ-তলেই শত স্বর্গ। এই স্বর্গপ্রাপ্রির জন্যই তো এত সাধ্যসাধনা। এই পরম স্বর্গকে লুণ্ঠন করতে না পারলে, আমাদের "বর্গী" বা "লুঠেরা" নামটাই বৃথা।

ভাস্কর : এ যে পরম রত্ন! কত নির্জীব রত্ন লুণ্ঠন করেছি, আর এই সজীব রত্নকে কি লুণ্ঠন করতে পারব না?

সদা : কই, কোথায় পারলে? এত দিন হয়ে গেল, তবুও তো কিছু কূল-কিনারা করতে পারলে না। তার বিবাহের কথাও তো হচ্ছে। বিবাহের পরে উচ্ছিষ্ট হলে কি আমার ভোগে লাগবে?

ভাস্কর : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উচ্ছিষ্ট হবার পূর্বেই ভোগে লাগাব। আমার দেবতাকে কখনও উচ্ছিষ্ট ভোগ দিব না।

সদা : রোহিলাখণ্ডের পরাক্রান্ত সিংহ নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গেই নাকি বিবাহ নির্ধারিত হয়েছে?

ভাস্কর : তাই বটে! তা হলে সিংহের সহিতই সিংহিনীর সংযোগ! নজীব-

উদ্দৌলাও পরম সুশ্রী এবং তেজীয়ান পুরুষ।

সদা : তার সঙ্গে তো আমাদের সন্ধি আছে। সুতরাং ফিরোজা বানুকে হরণ করলে বা ছিনিয়ে নিলে, তার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য।

ভাস্কর : আমরাও তো তাই চাই। সন্ধিতে আমাদের ক্ষতি। সন্ধি আছে বলেই তো রোহিলাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে পাচ্ছি না।

সদা : কিন্তু রোহিলাদিগকে ঘাঁটান আর ভীমরুলের চাকে আঘাত করা সমান কথা। রোহিলাদিগকে ঘাঁটালে আমাদিগকে বিষম বেগ পেতে হবে।

ভাস্কর : তেমন কিছু নয়, মহারাজ। রোহিলারা মহাতেজস্বী এবং বীরপুরুষ বটে; সম্মুখযুদ্ধে তারা চির জয়শীল। কিন্তু আমরা তো আর যুদ্ধ করব না। গভীর অন্ধকারে হঠাৎ তাদের উপর আপতিত হয়ে তাদিগকে বিপর্যস্ত করে ফেলব। আর আসল কথা হচ্ছে, আমরা রোহিলাখণ্ডে না গেলে, তারাই বা কেমন করে এখানে এসে আক্রমণ করবে?

সদা : রমণী হরণ করলে, মুসলমান তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। সে প্রতিশোধে যতই প্রাণ বলি দিতে হোক না কেন, মুসলমান কখনই তাতে কুণ্ঠিত হবে না। এমন কি, সমস্ত ভারতেও এই অগ্নি প্রজ্বলিত হতে পারে। রমণীর ইজ্জতকে ওরা নিজের প্রাণ হতেও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ বোধ করে।

ভাস্কর : এত আশঙ্কা করলে এ ভোগে লালসা না করাই সঙ্গত। কি প্রয়োজন? মারাঠীদিগের মধ্যে না হয়, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হতে শত শত সুন্দরী বিনা ক্লেশে বিনা ঝঞ্ঝাটে সংগৃহীত হতে পারে।

সদা : কিন্তু অমৃতের পিপাসা কি জলে মিটে? ফিরোজাকে না পেলে তো জীবনই বৃথা। ফিরোজার ন্যায় সুন্দরী গুণবতী আর কে?

ভাস্কর : মহারাজ! গুড়, মধু, চিনি, মিশ্রী সবই মিষ্ট।

সদা : মিষ্ট তো সবই বটে! কিন্তু তাই বলে গুড় ও মধুর মিষ্টতা তো এক নয়।

ভাস্কর : এক তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, মধু খেতে গেলেই মৌমাছির হুলও খেতে হবে।

সদা : সেইটা যাতে খেতে না হয়, অথচ মধুর চাক ভাঙ্গা যায়, এইরূপ বন্দোবস্তু করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য।

ভাস্কর : সেই বুদ্ধি খাটাবার জন্যই তো এত মাথাব্যথা।

সদা : মাথাব্যথা তো বটে, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, মাথামুণ্ড করলে কি?

ভাস্কর : নিশ্চিন্ত হউন। সে ফন্দি এঁটেই বসে আছি।

সদা : ফন্দিটা একবার শুনিই না কেন?

ভাস্কর : ফন্দি হচ্ছে এই যে, আপনি সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য নজীব-উদ্দৌলার বরযাত্রী এবং বন্ধু ও হিতৈষীরূপে বিবাহে উপস্থিত থেকে আপনার হিতৈষণা এবং সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। আমরা জাঠদিগের ছদ্মবেশে

ফিরোজাকে হরণ করে নিব। এ জন্য আমি একদল জাঠ দস্যুরও বন্দোবস্ত করেছি। আপনি বরং আপনার মারাটী দেহরক্ষী সেনা নিয়ে আমাদিগকে বাধা দিবেন। দুই একটা জাঠকে কৌশলে গ্রেফতারও করে দিব। তাদিগকে পূর্ব হতেই মন্ত্র পড়ায়ে রাখবো। তাদিগকে মুক্তিদানের অঙ্গীকার করলেই তারা ভরতপুরের মহারাজের সমস্ত কারসাজী বলে ব্যক্ত করবে।

সদা : বাহবা ভাস্কর! বাহবা তোমার বুদ্ধি! তুমি যে শুধু সেনাপতি নও, পণ্ডিতও, তা যথার্থই বটে! এক ঢিলে দুই পাখী শিকার!

ভাস্কর : মহারাজ! রথ দেখা এবং কলা বেচা দুটোই হবে। এই ব্যাপারে ভরতপুরের মহারাজের সঙ্গে সফদরজঙ্গের এবং তৎসঙ্গে নজীব-উদ্দৌলার স্বয়ং বাদশাহের পর্যন্ত বিরোধ লেগে যাবে। ভরতপুরের মহারাজ আমাদের যেরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করছে, তাতে এইরূপ উপায়েই তাকে জব্দ করতে হবে। রোহিলার হস্তেই তার বলি হবে।

সদা : কেন? আমরাও তো সফদরজঙ্গ এবং নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিয়েই ভরতপুর লুণ্ঠন করবো। তাতে রোহিলাদিগের সঙ্গে আমাদের আরও সদ্ভাব বেড়ে যাবে।

ভাস্কর : মহারাজ! এখন এ অধমের ফন্দিটা পছন্দ হয়েছে তো?

সদা : তা কি আর বলতে হবে? ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি। যাও, এখন কাজে যাও। কার্যসিদ্ধির পরে আশাতীত খেলাত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লীর হেরেমের নিভৃত কক্ষে বাদশাহ্ শাহ্ আলম, শেখুল-ইস্‌লাম মওলানা আমিনর রহমান, উজীর সফদরজঙ্গ, মালবের শাসনকর্তা আফ্‌তাব আহ্‌মদ খান এবং মোসাহেব মালেক আনোয়ার উপস্থিত। বাদশাহ্ একখানি সোফায় উপবিষ্ট, আর সকলেই দ্বিরদ-রদ-নির্মিত পুরু গদ্দিবিশিষ্ট কুর্সীতে সমাসীন।

এইটি অন্তঃপুরের সম্মিলন-কক্ষ। একটি ১০১ ডালের স্বর্ণখচিত ঝাড়ে কর্পূরমিশ্রিত মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া শুভ্র ও সুগন্ধি আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে দুগ্ধফেননিভ শ্বেত মর্মরের উপরে সুবর্ণের নানাবিধ চিত্র ও নক্শা অঙ্কিত। সে কারুকার্য একদিকে যেমন সূক্ষ্ম কৌশলের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তেমনই গঠনপারিপাট্যের চরম গৌরবের পরিচায়ক! মধ্যখানে একটি হস্তিদন্ত এবং আবলুস কাষ্ঠনির্মিত মেজ। সে মেজের উপরে সমস্ত পৃথিবীর বিস্তৃত চিত্র সুবর্ণে অঙ্কিত। মেজের একপার্শ্বে কতকগুলি সচিত্র গ্রন্থ। দক্ষিণের দেওয়ালে জগদ্বিজয়ী বীরকুলের গৌরবকেতন মহাতেজা তাইমুরের অশ্বারোহী কৃপাণ-পাণি মূর্তি! তাইমুরের চক্ষু হইতে প্রভাত-তারকার ন্যায় বিশ্ববিজয়িনী প্রভা নির্গত

চিত্র দুইটি পাশাপাশি থাকায় বীরত্ব ও জ্ঞানের প্রভাব ও পার্থক্য সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার উভয়ের সম্মিলন কেমন প্রীতিপূর্ণ আনন্দজনক এবং অপার্থিব শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রকাশকর, তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ চিত্র প্রসিদ্ধ চিত্রকর আরসালান খানের রচিত। আওরঙ্গজেব এ চিত্রের জন্যও লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই দুইখানি চিত্র এমনি সুন্দর স্বাভাবিক এবং শিক্ষাপ্রদ যে, দেখা মাত্রই সকলে মুগ্ধ হয়। ইউরোপের মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা র‍্যাফেলের পক্ষেও এমন ভাবপূর্ণ মহান্ চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভবপর ছিল না। এই চিত্র ব্যতীত দিল্লীর অন্যান্য বহু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর এবং বীরপুরুষের চিত্র শোভা পাইতেছে।

বাদশাহ্ শাহ্ আলম আলবোলা টানিতে টানিতে গৃহমধ্যে সুগন্ধি তাম্রকুটের ধূসর ধূমের কুণ্ডলী ত্যাগ করিয়া তাইমুরের চিত্রের দিকে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, "হায়! কি ভয়াবহ অধঃপতন! কি বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিভামণ্ডিত মূর্তি! কিবা সাহস! পদভরে পৃথিবী কম্পিত! তরবারি-মুখে রক্তধারা পরিদৃশ্যমান! অশ্ব-পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতেছে! সমস্ত পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ ভয়ে কম্পিত এবং করজোড়ে নজরহস্তে দণ্ডায়মান। আর আমরা?—এই ভুবনবিখ্যাত বীরবংশের সন্তান আমরা। আমাদের তেজঃ-বীর্য, সাহস-শৌর্য কালের গর্ভে বিলীন! বিলাসব্যসনে দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল। মনের ভিতরে কেবলই আশঙ্কা ও ভীতি! মনুষ্যত্বহীন—চরিত্রহীন—অধ্যবসায়হীন—ধন মান রাজত্ব প্রত্যহ লুপ্ত হইতেছে। কিঙ্করেরাও মাথা তুলিতেছে। হা অদৃষ্ট! হায় বিধি! তোমার মনে কি ইহাই ছিল! অহো! সিংহের বংশে শৃগাল, বনস্পতির বংশে তৃণ এবং সম্রাটের বংশে ভিখারী হইলাম। এমনি দুর্দশা যে, নিজের শরীরটা পর্যন্ত রক্ষা করিতে অক্ষম। যুদ্ধের দুন্দু ভিনাদে পূর্বপুরুষেরা এক দিন নাচিয়া উঠিতেন। আর আমরা বাঈজীদিগের নূপুরের রুনুঝুনু ধ্বনিতে নাচিয়া উঠি। আমরা অগ্নিতে জন্মিয়া ছাই! দাহিকা-শক্তিহীন।

"অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! যে মারাঠীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চরণতলে পতিত ছিল, আজ তাহারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের প্রভু হইয়া পড়িতেছে! হায়! যে দিল্লীর নামে জগৎ কম্পিত ছিল, আজ সেই দিল্লী দস্যুপদতলে দলিত, মথিত এবং লুণ্ঠিত! হা খোদা! এ লাঞ্ছনা, এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না।" এই বলিয়া শাহ্ আলম অশ্রুপ্লুত নেত্রে আরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আফতাব : মুসলমানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ হতে একেবারেই লুপ্ত হবে। এখনও যা আছে, তা'ও থাকবে না। হা খোদা! অবশেষে কি না বর্গীরা দিল্লীর ধনভাণ্ডারও লুণ্ঠন করল, বর্গীর পদচিহ্নে দিল্লী অপবিত্র হল! বাদশাহের সম্মানটুকুও রইল না! তাইমুর-খান্দানের এ অবমাননা একেবারেই অসহ্য!

সফদরজঙ্গ : আপনি বলছেন, অসহ্য! কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য রাজা নবাবদের তো এতটুকুও টনক নড়ল না! আজ দিল্লীর অসম্মান হল, কালই অযোধ্যা,

হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু, বাঙ্গলা এবং কাশ্মীরের হবে। মারাঠীর অত্যাচার হতে কেউই রক্ষা পাবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিমকহারামের দল যদি অন্ততঃ আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও দিল্লীর তখ্‌তের সম্মান রক্ষা করতে প্রস্তুত হত, তা হলে মারাঠীদিগকে দমন করা কঠিন হত না।

মালেক ঃ এরা একত্র হবে কি? এরা তো পরস্পর নিজেরাই যুদ্ধ-বিগ্রহে মত্ত। কে কা'কে মেরে বড় হবে সেই চেষ্টায়ই রত! ফলে সকলেই মারা যাবে। জাতীয়তার ভাব একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। খোদার কি মর্জী বোঝা যায় না।

শেখুল ইস্‌লাম ঃ খোদার মর্জী বুঝা যাবে না কেন? খোদাতালা তো তাঁর মর্জী সুস্পষ্ট করেই তাঁর কালামে বুঝায়ে দিয়েছেন। চরিত্রহীন জাতির অধঃপতন অনিবার্য। ইহা তো খোদারই মর্জী। খোদা তো স্পষ্টই বলেছেন যে, 'যতদিন পর্যন্ত কোনও জাতি চরিত্রকে বিকৃত না করে, ততদিন তাদের সৌভাগ্য নষ্ট হয় না।' এরূপ স্পষ্ট ঘোষণার পরেও যদি আমরা চরিত্র রক্ষা করতে না পারি, তা হলে তার জন্য কে দায়ী হবে?

"চরিত্রবান হবার জন্যই ধর্মের আবশ্যক। কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছি। সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, ঐক্য, সখ্য, সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি প্রেম, যে জাতির ভূষণ এবং নিত্যধর্ম ছিল; আজ তাদের ভিতরে কেবল অনৈক্য, হিংসা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং স্বার্থপরতাই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। কি ভয়ানক অধঃপতন! বাইরের অধঃপতন আপনারা যা' দেখছেন, ভিতরের অধঃপতন অর্থাৎ মনের অধঃপতন তার অনেক বেশী হয়েছে—সর্বাগ্রে হয়েছে।

"মনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অধঃপতন, আর চরিত্রের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের অধঃপতন হয়। মনের ভিতরে যেমন ভাবের, যেমন কল্পনার প্রদীপ জ্বলে, বাইরে তারই আলো পড়ে। চরিত্রের কেন্দ্র হচ্ছে মন, অথবা মনের বহির্বিকাশ হচ্ছে চরিত্র। আমরা সেই চরিত্রের বিকাশ হারিয়েছি। খোদার ইচ্ছা এবং আদেশের বিরুদ্ধে চলেছি। সুতরাং আমাদের অধঃপতন এবং দুর্গতি অনিবার্য। আমরা ধর্মকে রক্ষা করি নাই; সুতরাং ধর্মও আমাদিগকে রক্ষা করবে না।

মালেক ঃ কেন, আমরা ধর্ম রক্ষা না করলে ধর্ম কি আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না?

শেখ ঃ কখনই নয়। নদীতে নৌকা বাইবার সময় যেমন মানুষই নৌকাকে বহন করায় মানুষ নিজেও তৎসহ বাহিত হয়; ধর্মও ঠিক তাই। ধর্মকে রক্ষা করলে আমরাও রক্ষা পাই। নৌকা ডুবিয়ে দিলে আরোহী এবং মাঝি মাল্লা যেমন ডুবে মরে, ধর্ম ডুবালে আমরাও তেমনি ডুবে মরি।

মালেক ঃ কিন্তু ধর্মকে তো আমরা খুবই মানি। কোরান ও হাদিসকে তো পূর্বের ন্যায়ই সম্মান করি। নামাজ রোজা তো আমরা ছেড়ে দেই নাই।

শেখ ঃ কোরআন-হাদিসকে মানেন, ইহা মিথ্যা কথা। কোরান-হাদিসকে

মানসে ব্যসন-বিলাস, কামুকতা, মিথ্যাবাদিতা, কাপুরুষতা এবং অনৈক্য কখনই আমাদের ভিতরে প্রবেশ করত না।

"কোরআনকে মানার অর্থ এ নয় যে, ভক্তির সহিত কোরআন শরীফকে মস্তকে রাখা বা চুম্বন করা। কোরআনকে মানার অর্থ এই যে, কোরআনের উপদেশ অনুসারে নিজের চরিত্রকে রক্ষা করা। নামাজ রোজার কথা যা' বললেন, তা অনেকটা ঠিক। এখনও বহু লোকে নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে বটে। কিন্তু তার নামাজ রোজার কোনও উদ্দেশ্য বুঝে না।

"তৌহিদের তেজে তেজীয়ান্ করাই নামাজের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নামাজী ব্যক্তি অটুট বিশ্বাসী, সুতরাং অতুল বীর্যশালী হবে। তাঁরা অন্যায় অসত্যের প্রতি বজ্রাদপি কঠোর এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি কুসুমাদপি কোমল হবেন। চরিত্রে বল ও তেজ লাভ করাই নামাজের উদ্দেশ্য। রসান দিলে স্বর্ণের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল হয়, নামাজও মুসলমানের চরিত্রকে তেমনি উজ্জ্বল এবং প্রভামণ্ডিত করবে। কিন্তু আজকাল দেখা যায়, অনেক মুসল্লী নীচমনা, স্বার্থপর, হিংসুক ও কাপুরুষ। তা'রা নামাজের অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই অবগত নয়। অনেকে শুধু লোক দেখাবার জন্য নামাজ পড়েন।

"রোজা মুসলমানকে সংযম ও সহানুভূতি শিক্ষা দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের চরিত্রে সংযম ও লোকহিতৈষণা বা সহানুভূতির একান্তই অভাব হয়েছে। রোজা ও নামাজ আমাদের একটি ফ্যাসান এবং পদ্ধতি হয়ে পড়েছে। রোজা নামাজের দ্বারা চরিত্রে সংযম ও পরাক্রম লাভ করতে হবে, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। নৌকায় বা যানে উঠে কেউ যদি নিজের গন্তব্য পথ ভুলে যায়, তা হলে সে যেমন আরও বিপাকে পড়ে, রোজা নামাজের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখায় আমাদেরও তেমনি সর্বনাশ হচ্ছে। চরিত্রের উন্নতিই হচ্ছে যে একমাত্র ধর্ম, তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এর উপরেও আরও একটি পরম ও চরম কর্তব্য আছে। তাই হচ্ছে ইস্লামের বিশেষত্ব।

মালেক : তা কি?

শেখ : তা হচ্ছে সর্বদা সঙ্ঘবদ্ধ থেকে সকল বিষয়ে ইস্লামের প্রাধান্য রক্ষা করা।

সফদর : তবে তো আমরা ইস্লাম হতে বহু দূরে সরে পড়েছি!

বাদশাহ্ : নিশ্চয়ই। সরে পড়েছি বলেই তো আজ এই দুর্দশা। কাঠ পচে গেলেই তাতে পোকা ধরে। তাজা কাঠে পোকা ধরে না। পানি পচে গেলেই তা হতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং শৈবাল জন্মে। নির্মল বিশুদ্ধ জলে দুর্গন্ধও হয় না এবং শৈবালও জন্মে না। তেমনি চরিত্রবান জাতিতে কখনও অধঃপতনের ঘূণ ধরে না, তাদের মধ্যে দুর্গতির শৈবাল জন্মগ্রহণ করে না।

এমন সময় বাদশাহ্ শাহ্ আলমের শ্যালক আফসার-উদ্দৌলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সালাম এবং সাদর সম্ভাষণের পরে সকলেই সোৎসুক

চিত্তে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ্‌ : কতদূর কি হল? কেমন বুঝলেন?

আফসার : কি আর বুঝব, সকলই পণ্ডশ্রম। বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দী খাঁ পীড়িত—উদরী রোগে আক্রান্ত। তিনি গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু বেচারা দীর্ঘকাল পীড়িত—কি করে মহাসমরের আয়োজন করেন। অযোধ্যার সুজা-উদ্দৌলা মারাঠীদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের নামে ভীত এবং সঙ্কুচিত। কিছুতেই তাঁকে সম্মত করাতে পারলাম না। হায়দ্রাবাদের নিজামও অসম্মত।

বাদশাহ্‌ : সিন্ধুর আমীর?

আফসার : তিনিও সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কেবল নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। রোহিলাদিগের অর্থাভাব সত্ত্বেও তারা জেহাদে যোগ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারে শুধু রোহিলাদিগের সাহায্যে কি হবে?

বাদশাহ্‌ : হায় ইস্‌লাম! তোমার আজ এই অসম্মান! মুসলমানের আজ কি ভীষণ পরিণতি!

শেখ : আমাদের কল্পনা ও আশা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব।

সফদর : দেখছি মারাঠীরাই ভারতের সার্বভৌম প্রভু হবে।

বাদশাহ্‌ : বৃথা পরিশ্রম! বৃথা পরিশ্রম! অদৃষ্টের ভীষণ পরিহাস!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উজীর সফদরজঙ্গের বাড়ীখানি আজ নয়নমোহন সাজে সজ্জিত। পত্রে-পুষ্পে, আলোকে এবং ধ্বজপতাকায় শ্বেতমর্মরনির্মিত বিরাট প্রাসাদ, প্রাঙ্গণ ও রাস্তা সুশোভিত ও সজ্জিত। ফটকের উপরের নহবতে মধুর শাহানা সুরে রওশনচৌকি বাজিতেছে। সেরূপ মধুর বাজানা দিল্লী ব্যতীত আর কোথায়ও সহজে সম্ভবপর নহে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনে, শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের অর্ধচন্দ্রখচিত রেশমী পতাকা, সহস্রে সহস্রে উড্ডীয়মান হইয়া চমৎকার শোভার সৃষ্টি করিতেছে।

পথের মধ্যে মধ্যে নানা শ্রেণীর পুষ্প-পত্রসংবৃত তোরণাবলী রচিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। হাজার হাজার নানাবর্ণের ফানুস এবং কন্দিল জ্বালাইয়া বাটী এবং পথ-ঘাট আলো করা হইয়াছে। রাজপথের দুই পার্শ্বে দশ দশটি করিয়া হিন্দু এবং মুসলমানদিগের জন্য সুসজ্জিত সুন্দর রমণীর আহার-আশ্রম খোলা হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক দিবারাত্র উৎকৃষ্ট পান ও ভোজনে রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে। আটটি পান ও আতরের আড্ডা বসান হইয়াছে। সপ্তাহ পর্যন্ত যাহার যত ইচ্ছা নানা নানা প্রকারের মিঠাই মণ্ডা, রসকরা,

গোল্লা, মোরব্বা, হালুয়া, ক্ষীর, রুটি, কাবাব, কোফ্‌তা, লাড্ডু দোকানে বসিয়া বিনামূল্যে খাইতে পারিবে।

রাজপথগামী যে-কোনও লোককে আদর করিয়া ডাকিয়া বসাইবার জন্য কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। বসিবার জন্য উৎকৃষ্ট মূল্যবান কার্পেট চৌকির উপর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদেমগণ পরম যত্নে আগন্তুকদিগকে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রদানে তাহাদের মুখ মিষ্ট এবং উদর পূর্তি করিতেছেন। পানওয়ালারা রাশি রাশি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পান তৈয়ার করিয়া সোনার তবকে মোড়াইয়া নানা আকারের খাঞ্চায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আত্তার'গণ প্রত্যেক লোকের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুক-শিশিতে উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর ভরিয়া হাজার হাজার সাজাইয়া রাখিয়াছে। যাহার ইচ্ছা, সেই এক শিশি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

যথাসময়ে রোহিলাখণ্ডের সর্দার-পুত্র তেজিয়ান্ ও পরম শ্রীমান যুবক নজীব-উদ্দৌলা বহু বরযাত্রীসহ হস্তিপৃষ্ঠে সুবর্ণ হাওদায় চড়িয়া আগমন করিলেন। কতিপয় রোহিলা সামন্ত ও যুবক অত্যুৎকৃষ্ট আরবীয় অশ্বে আরোহণপূর্বক জাঁকজমকের সাথে আগমন করিলেন। ঘোড়াগুলির গঠনভঙ্গিমা এবং চলনের কায়দা দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, নওশাহ্-এর আগমনে বাদ্যকরগণ মহোৎসাহে বাদ্য বাজাইতে এবং মালাকরগণ সহস্র সহস্র আতশবাজী পোড়াইতে লাগিল। তোপচিগণ ক্রমাগত একশত একটি তোপধ্বনি করিল।

সফদরজঙ্গ এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন পরম সমাদরে যথানিয়মে বর এবং বরযাত্রিগণকে লইয়া বিবাহসভায় বসাইলেন। অনন্তর নানা প্রকার চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি লজিজ ও নফিস্ খানা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে যথারীতি ইস্‌লামী কায়দা অনুযায়ী উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। বিবাহান্তে আবার বাদ্যধ্বনির উচ্চ শব্দে এবং অবিরাম তোপ ও বোমের গর্জনে দিগ্বলয় কম্পিত হইতে লাগিল। নানা শ্রেণীর বিচিত্র আতশবাজীর অগ্নিক্রীড়ায় নভোমণ্ডল আলোকিত এবং সমবেত জনমণ্ডলী পরম পুলকিত হইলেন।

বিবাহান্তে দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাঈজীদিগের নাচের বন্দোবস্তের উপক্রমেই মওলানা আমিনর রহমান এবং আরও কয়েকজন ধর্মভীরু বৃদ্ধ লোক উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কেহই তাঁহাদিগকে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন নজীব-উদ্দৌলা নিজেই তাঁহাদিগকে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মওলানা বলিলেন, "বাবা! দেখছ না বাঈজীরা সব এসে হাজীর। এমন ঘৃণিত ও হারাম দৃশ্য কেমন করে দেখ্‌ব?"

নজীব : আপনি একেলা উঠে গেলে আপনি মাত্র পাপ হতে বাঁচলেন, কিন্তু অবশিষ্ট লোকের এই মহাপাপ দৃশ্য দর্শন হতে বাঁচবার কি উপায় করলেন?

তাদের পাপের জন্য আপনি কি দায়ী হবেন না?

মওলানা ঃ আমি আর কি করব?

নজীব ঃ কেন, আপনি নিষেধ করুন। সকলকে হেদায়েত করুন। বুঝিয়ে দিন যে, এরূপ নৃত্যগীতেই আমাদিগকে ইহলোকে ধ্বংসের আবর্তে এবং পরলোকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।

মওলানা ঃ আমার কথা কে শুনবে?

নজীব ঃ সকলেই শুনবে। এমন কোন্ পাষণ্ড আছে যে, ধর্মের উপদেশ অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও প্রতিপালন করবে না? আপনি এবং আপনার সঙ্গীয় আলেমগণ আল্লাহ্‌র প্রতি তওয়াক্কা রেখে একবার তেজস্বিনী রসনায় অনলময়ী বাণীতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন; দেখবেন সকলেই এর অপকারিতা স্বীকার করবেন। আমি আপনার সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি, আপনি মেহেরবানি করে ওয়াজ ফরমাতে আরম্ভ করুন।

নজীব-উদ্দৌলার অনুরোধ এবং প্ররোচনায় শেখুল ইস্‌লাম মওলানা আমিনর রহমান সাহেব সভায় দণ্ডায়মান হইয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদের কতদূর অধঃপতন হয়েছে চিন্তা করুন! আল্লাহ্ এবং রসুলের আদেশ এবং উপদেশকে অগ্রাহ্য করে অদ্য আমরা পবিত্র উদ্বাহক্রিয়ায় ঘৃণিত-চরিত্রা নর্তকীদিগের অশ্লীল নৃত্য দেখবার নিমিত্ত সোৎসাহে বসে আছি! এই অশ্লীল নৃত্য-গীতে আমাদের যুবকদিগের মনে উত্তেজনা এসে প্রথমতঃ, তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং দেহের ক্ষয় সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ, তাদের মনে চাঞ্চল্য এবং তারল্য জন্মিয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ, যারা পরস্পর একত্র হয়ে এই প্রকার ঘৃণিত গীতবাদ্য শ্রবণ করে, তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভক্তিহীন এবং বেহায়া বা নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ, যারা দেখে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর এই সমস্ত কুৎসিত সঙ্গীত এবং নৃত্যের অশ্লীল ভঙ্গিমার আলোচনা হয়, তার ফলে অনেকের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

"ফলতঃ এই শ্রেণীর গান-বাজনা, বিলাসিতা ও ব্যসনের প্রধান অঙ্গ। এই শ্রেণীর পাপের পরাক্রমেই আমাদের জাতির ভিতরে হতে সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, বীর্যবত্তা একেবারে লোপ পেয়েছে। যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সমস্ত বিষয়ে দেখতেন, তা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যুকামনা করতেন।

"ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এখন সাবধান হউন! তওবা করে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। এরূপ পাপের ফলে আমাদের আরও ধ্বংস এবং অধঃপতন হওয়া স্বাভাবিক। যারা একদিন পৃথিবী হতে এই শ্রেণীর সমস্ত কদাচার, পাপাচার ও অশ্লীলাচারকে নির্মূল করেছিলেন, আজ তাঁদেরই বংশধরদিগের মধ্যে এইরূপ পাপকার্যাদি বর্ষাসমাগমে তৃণের ন্যায় বেড়ে উঠছে। কি শোচনীয় অধঃপতন! কি ভয়াবহ ব্যাপার! কি দূষিত পরিণতি!

"আওরঙ্গজেবের সময়ে যে দিল্লীতে একটিমাত্র বাঈজী বা রূপজীবিনী ছিল

না, আর ওখায় সার্ধ চারশত রূপজীবনী নগরবাসীদিগের ধর্ম, মনুষ্যত্ব, নীতি একেবারে চর্বণ করছে। আজ এই পবিত্র বিবাহ-সভায় যেখানে বর ও পাত্রীর সম্মুখে সংযম, সাধুতা এবং শ্লীলতার আদর্শ স্থাপন করা কর্তব্য ছিল, তার পরিবর্তে তাদের সম্মুখে অশ্লীলতার কি বিরাট ও উলঙ্গ অভিনয়!"

মওলানা সাহেব এই পর্যন্ত বলা মাত্রই অনেকেই তওবা পড়িতে লাগিলেন। অনেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, "এইরূপ পাপাচারেই তো ধ্বংস হলাম।"

উজীর সফদরজঙ্গ লজ্জায় নতবদন হইলেন। বাঈজীর দল তখন তখনই বিদায় লাভ করিল। স্থির হইল, পর দিবস বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য সৈন্যদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ পাহ্‌লোয়ানদিগের কুস্তি হইবে। এই নির্দোষ আমোদের ব্যবস্থায় মওলানা সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী এবং রোহিলা প্রধান ও সর্দারবর্গ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রাত্রি প্রভাতেই কৃত্রিম যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধের বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। তখন নজীব-উদ্দৌলা স্মিতহাস্যে মওলানা সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখলেন হজরত! আপনাদের সামান্য উপদেশে এবং সামান্য দৃঢ়তার কত বড় বড় পাপ এবং কদাচার কত শীঘ্র বিলুপ্ত হতে পারে! চাই একটু মনের বল এবং হেদায়েত করবার ইচ্ছা।"

মওলানা সাহেব বলিলেন, "বাবা! আপনার মঙ্গল হোক! খোদা আপনার ঈমান এবং হিম্মতকে মজবুত করুন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরযাত্রীর দল বিবাহের পর-দিবস আহারান্তে ফিরোজা বেগমকে লইয়া রোহিলাবাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। সফদরজঙ্গের বন্ধুবর্গ, বাদশাহ্ শাহ্ আলম, মারাঠী সেনাপতি সদাশিব রাও এবং দিল্লীর অন্যান্য আমীর রইসগণ যে-সমস্ত বহুমূল্য উপঢৌকন দান করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত এবং তদ্ব্যতীত সফদরজঙ্গের নিজ প্রদত্ত অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র, যথা—হস্তিদন্তনির্মিত ৪ খানি কুর্সী, সুবর্ণনির্মিত আতরদান, গোলাবপাশ, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত নানা শ্রেণীর রেকাব, পেয়ালা, জাম, তশ্‌তরী, পানদান, আবলুস কাঠের বাক্স, চন্দন কাঠের পালঙ্ক, কাশ্মীরে নির্মিত জরীজড়োয়া পাগড়ী, বোখারায় নির্মিত সুবৃহৎ দর্পণ, বৃহৎ মুক্তার হার, লাহোরে নির্মিত সুবর্ণখচিত কার্পেট, দামেস্কে নির্মিত হীরকের বাঁটবিশিষ্ট তরবারি এবং একটি বিচিত্রি কৌশলময় বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র প্রভৃতি মূল্যবান উপহার এবং তাহার হেফাজতের জন্য একদল সৈন্য সহ নজীব-উদ্দৌলা আনন্দ-উৎফুল্লচিত্তে স্বদেশাভিমুখে চলিলেন।

সদাশিব রাও প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গে সঙ্গেই গমন

করিলেন। সন্ধ্যার পরে বরযাত্রীর মিছিল আরামপুর অতিক্রম করিয়া একটি বিশাল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর মাঠ অতিক্রম করিবার পরই নিবিড় বন। শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ জ্যোৎস্না বনের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ নহে দেখিয়া, মশালচীরা বৃহৎ বৃহৎ মশাল প্রজ্বলিত করিয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া ফেলিল। সাবধানে সকলেই সেই বনভূমি অতিক্রম করিল। বন অতিক্রম করিয়া সকলেই হর্ষোৎফুল্ল মনে গমন করিতে লাগিল।

জঙ্গল অতিক্রম করিয়াই একটি প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির পাড়ের নীচ দিয়াই শাহী রাস্তা। দীঘির ধারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই একদল অশ্বারোহী জাঠ দস্যু ভীষণবেগে অতর্কিত অবস্থায় বরযাত্রীদলের উপরে যাইয়া মার মার করিয়া পতিত হইল। সহস্রাধিক দস্যুর সহিত একশত সৈন্য ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বরযাত্রীর দল গাফেল ছিল বলিয়া অনেকেই বিব্রত এবং হতভম্ব হইয়া পড়িল। সর্দারগণ অস্ত্রপাণি ছিলেন বলিয়া বেগমের পাল্কী রক্ষার জন্য দ্রুতবেগে তথায় ধাবিত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া তরবারিযোগে যুদ্ধ করা অসম্ভব বলিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক একটি দস্যুর উপরে পতিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহার শিরশ্ছেদন করতঃ তাহার অশ্বে আরোহণ করিয়া দস্যুদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। নজীব-উদ্দৌলা এবং তাঁহার সঙ্গীয় কয়েকটি যুবক ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া দস্যুদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা এবং তাঁহার সঙ্গিগণ কেহই বর্মমণ্ডিত ছিলেন না, সুতরাং সকলেই গুরুতররূপে আহত হইলেন। অনেকে বিপাকে বিঘোরে পড়িয়া নিহত হইলেন। জিনিসপত্র সমস্তই লুণ্ঠিত হইল। দস্যুদিগের মধ্যে প্রায় ৩০ জন নিহত হইয়া লুণ্ঠনক্ষেত্রেই পতিত হইল। নজীব-উদ্দৌলা গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আঘাত পাইয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দস্যুগণ চলিয়া যাইবার পরে যাহারা জীবিত এবং সচেতন ছিল, তাহারা মশাল জ্বালাইয়া সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সকলকেই মৃত বা জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু হায়! ফিরোজা বেগমের কোনই সন্ধান হইল না। তাঁহার পাল্কীর বাহকেরা বলিল যে, দস্যুরা তাঁহাকে পাল্কীসহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অল্প সময় মধ্যেই এ সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। দিল্লী এবং রোহিলাখণ্ডে হাহাকার পড়িয়া গেল। নজীব-উদ্দৌলা পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন! হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক ও উত্তেজনার সঞ্চার হইল।

ফিরোজা বেগম তৎকালে সৌন্দর্যের জন্য সর্বত্রই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যেমন রূপবতী, তেমনি বিদূষী ছিলেন। পারস্য ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলেই "মুনশী ফাজেলা" বলিয়া অভিহিত করিতেন। শাহ্ আলম তাঁহাকে নিজের কন্যার মত ভালোবাসিতেন। তাঁহার মধুর চরিত্র, নির্মল রূপ, অপূর্ব গঠনভঙ্গিমা, প্রগাঢ়

ধর্মভাব এবং তাঁহার সরস কবিতা পাঠে দিল্লীর সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।

চতুর্দিকে ফিরোজা বেগমের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অনেকেই সিদ্ধান্ত করিল যে, এই লুণ্ঠন ও হরণ ব্যাপারটা মারাঠীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই বলিলেন যে, আক্রমণকারীরা জাঠ ছিল। সদাশিব রাও যে কয়েকটি দস্যুকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা জাঠ ছিল। তাহাদিগকে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহারা প্রকাশ করিল যে, ভরতপুরের রাজাই এই লুণ্ঠনের কারণ। তাঁহার আদেশেই তাঁহার সৈনিকেরা রাতহানা দিয়া অতর্কিত অবস্থায় ফিরোজা বেগমকে লুঠিয়া লইয়াছে।

ইতিপূর্বে যখন মারাঠীরা ভরতপুর আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ভরতপুরের রাজা ছত্রসিংহ রোহিলাদিগের নিকট এবং বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোহিলা বা বাদশাহ্ কেহই ছত্রসিংহকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন না। সেই রাগেই ছত্রসিংহ রোহিলাদিগকে জব্দ করিবার জন্য ফিরোজা বেগমকে হরণ করিয়া লইয়াছে। সদাশিব রাও বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই জাঠদিগের কার্য। মারাঠীরা কখনও রোহিলা সর্দারের পুত্রবধূ হরণ করিবেন না। মারাঠীদিগের কোনও দলই সেদিন কোথায়ও লুণ্ঠনে বহির্গত হয় নাই।"

সফদরজঙ্গ, নজীব-উদ্দৌলা এবং বাদশাহ্ স্বয়ং নানা স্থানে সুদক্ষ সন্ধানীদিগকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোথায়ও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ভরতপুরেও অনেক গুপ্তচর পাঠান হইল। কিন্তু হায়! কেহই কোনও খবর আনিতে পারিল না। ভরতপুররাজ লোকমুখে এবং জনশ্রুতি-পরম্পরা তাঁহার সম্বন্ধে ফিরোজা বেগমের হরণের কলঙ্কারোপ শুনিয়া দিল্লীশ্বরকে এক পত্র লিখিলেন।

। পত্র ।

মহামহিমান্বিত দিল্লীশ্বর!

সহস্র সহস্র সালাম এবং কুর্ণিশ পর কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত নিবেদন এই যে, অকারণে আমার প্রতি ফিরোজা বেগমের হরণের কথা বিশ্বাস করিতেছেন। আমার শত্রুরাই এই অলীক কলঙ্ককালিমা আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ অধীন দ্বারা এমন পাপকার্য কদাপি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমি এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত অবগত নহি। অধুনা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া মর্মান্তিক ক্লেশ ভোগ করিতেছি। দাসকে আর বৃথা সন্দেহ করিবেন না। দাস এখনও দিল্লীপতিকেই ভারতপতি বলিয়া মনে করে। পত্রের অপরাধ মার্জনা করিতে মর্জি হয়।

শাহানশাহের কৃপাভিখারী
ছত্রসিংহ,
ভরতপুর।

এই পত্র পাইয়া নজীব-উদ্দৌলা এবং শাহ্ আলম বলিলেন, "ইহা কদাপি ভরতপুরের কার্য নহে। ছত্রসিংহ চরিত্রবান এবং ধার্মিক। ইহা নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও মারাঠীদলেরই কার্য। তাহারা ব্যতীত এমন কার্য আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না।"

কিন্তু সদাশিব রাও বলিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই জাঠদিগের কার্য। তাহা না হইলে 'মাচার উপরে কে রে?' তার উত্তর 'আমি কলা খাই না।' এরূপ ঘটনা ঘটিবার কোনও কারণ নাই। ভরতপুরপতি ছত্রসিংহ গায়ে পড়িয়া নিজেই নিজের দোষ ক্ষালন করিয়াছেন। আমরা তো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, তিনি পত্র লিখিয়া নিজের সাফাই গাহিবেন। অযাচিতভাবে এই পত্র লেখাতেই তাঁহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইতেছে।"

অতঃপর সফদরজঙ্গ এবং বাদশাহের প্রেরিত কয়েকজন গুপ্ত-সন্ধানীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, সদাশিব রাও সন্ধান দেওয়াইলেন যে, ফিরোজা বেগম ভরতপুর-প্রাসাদেই আছে। এইরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে বাদশাহ্ এবং সফদরজঙ্গ ক্রমশঃ বিশ্বাস করিলেন যে, ইহা ভরতপুর-রাজ্যেরই কার্য। কিন্তু নজীব-উদ্দৌলা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তবে কঠোরভাবে প্রতিবাদও করিলেন না।

পরামর্শ ঠিক হইল যে, ভরতপুর আক্রমণ করিয়া ফিরোজাকে উদ্ধার করিতে এবং ছত্রসিংহকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। সদাশিব রাও সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং ভরতপুর আক্রমণে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেতারার সুসজ্জিত একটি প্রাসাদে ফিরোজা বেগমের বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফিরোজা বেগমের নাম লক্ষ্মীবাঈ রাখা হইয়াছে। তাহার সেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক দাসদাসীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সুখ-সুবিধার জন্য কোনও ত্রুটি নাই। কিন্তু হায়! বন্দীর মনে আবার সুখ কবে? স্বাধীন বন-বিহারী বিহঙ্গকে বহু যত্নে সুবর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে এবং পৃথিবীর নানা দেশের সুরসাল ও সুললিত ফলমূল দান করিলেও, তাহার প্রাণে অশান্তি এবং আত্মগ্লানি কখনও বিন্দুমাত্রও দূর হয় না।

আর মানুষ—জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহার মধ্যে কোমলপ্রাণা রসবতী চরিত্রবতী যুবতী—যাহার জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রেম-প্রবাহ যাহা শুধু পতির উদ্দেশ্যে মাত্র সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবাহিত হইবার সময় পায় নাই, তাহার অন্তর্বেদনার কে ইয়ত্তা করিবে? একে বিরহবেদনা, তাহার উপর বন্দীদশায় হীনতার জ্বালা, তদুপরি ধর্মনাশের আশঙ্কা। দারুণ দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে ফিরোজা বেগম বসন্তের

কীটদষ্ট মধুর লতিকার ন্যায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন। কর্দমে পতিত পদ্মের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, ধূমাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় একান্ত বিমনায়মানচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

মুরলা নামক একটি পরিচারিকা নিতান্ত চতুর এবং সুন্দরী ছিল। ফিরোজার সদ্ব্যবহারে সে ক্রমশঃ ফিরোজার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং সহানুভূতিসম্পন্না হইয়া পড়িল। মারাঠীরা তাহাকে মালব দেশ হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল; আনিবার পরে একটি ভৃত্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহের পরেই অল্পদিন মধ্যেই বিধবা হইয়াছে। ফিরোজার মনোমোহিনী দেবীদুর্লভ পরমা শ্রী, মধুর ভাষা এবং সস্নেহ ব্যবহারে মুরলা এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, ফিরোজার সেবা করিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করিত। ক্রমে সে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে বাসিতে ফিরোজা-গত-চিত্ত হইয়া পড়িল।

সে আনন্দের সহিত ফিরোজার রক্তকমলনিন্দিত হস্তপদ টিপিয়া দিত। ফিরোজার দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিত। ফিরোজার সহিত মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিত। সেই যমদূতের ন্যায় প্রহরী-প্রহরিত বাটী হইতে নির্গত হইয়া কিরূপে দিল্লী গমন করিতে পারে, সে-বিষয়ে কত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় পরামর্শ করিল। মুক্তির জন্য কত রূপ কল্পনা-জল্পনা করা হইল। কিন্তু কিছুই কূল-কিনারা হইল না। কোনও উপায় উদ্ভাবিত ও নির্দিষ্ট হইল না।

ইহার মধ্যে ঘোষিত হইল যে, সদাশিব রাও আর কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে সেতারায় আসিবেন। দালান-কোঠার চূণকাম হইতে লাগিল। বাগান ও বৃক্ষবাটিকা সকল পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। রাজবাটীর সকলেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এ-সংবাদ অবশেষে মুরলা কর্তৃক ফিরোজা বেগমেরও গোচরীভূত হইল। ফিরোজা শিহরিয়া উঠিলেন। ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া আল্লাহর দরগায় সেজদা করিলেন। তাহার পর অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে মোনাজাত করিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! তুমিই ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষাকর্তা। হে এলাহি! কাফেরের হস্ত হতে আমাকে উদ্ধার কর। আমার ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষা কর। হে প্রভু! তোমার অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই। তুমি হজরত ইউনুসকে মৎস্যের উদর হতে, ইব্রাহীমকে অগ্নিকুণ্ড হতে, হজরত মুসাকে দরিয়া হতে রক্ষা করেছ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তুমি অনন্ত কোটি জীবজন্তুকে লক্ষ লক্ষ বিপদ, মছিবত এবং লক্ষ প্রকারের অধঃপতন ও পাপ হতে রক্ষা করছ। তোমার মহিমা ও কৌশল অপরিসীম।

"হে মালেক! তোমার এই ক্ষুদ্র ও অধম বান্দীকে বন্দিত্ব হতে মুক্ত কর। তুমি পরমপিতা, পরমবন্ধু এবং পরমহিতৈষী! কীটাণুকীট আমি, হীনতম দাসী আমি, অধমাদপি অধম আমি, আমি তোমার দয়ার ভিখারী!

"হে বিশ্বপ্রভু! তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর। তুমি পর্বতকে সমুদ্র ও সমুদ্রকে পর্বতে পরিণত করতে পার। তুমি রাত্রিকে দিবস এবং দিবসকে রাত্রিতে

পরিণত করতে সমর্থ। তোমার ইচ্ছায় মৃত জীবিতে এবং জীবিত মৃতে পরিণত হয়। তুমি ইচ্ছা করলে অসম্ভব সম্ভব এবং সম্ভব অসম্ভব হয়। করুণাময় স্বামিন! এ দাসীকে কাফেরের হস্ত হতে মুক্ত কর।"

এইরূপে উদ্বেগ অশান্তি এবং ধ্যান ও প্রার্থনায় আরও কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মুরলা বেগমের মুক্তির জন্য অবশেষে এক কৌশল খেলিল; দ্বারের প্রহরীকে হাত করিবার জন্য ফন্দি আঁটিল। মুরলা প্রহরীর সহিত ক্রমশঃ খুব ভাবের পশার জাঁকাইয়া তুলিল। মুরলার যৌবনের প্রভাব, রঙ্গ-রস ও ভাব-কৌতুকপূর্ণ বাক্য এবং লোলকটাক্ষে প্রহরী হরি সিংহ ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া গেল। মুরলা যে তাহার অত্যন্ত হিতৈষিণী, এ ভাব হরি সিংহের মনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইল।

ফাল্গুন মাসের ১২ই তারিখ বুধবারে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে সদাশিব রাওয়ের বাড়িতে মহা মহোৎসব ব্যাপার! সন্ধ্যার পরেও বহু নর-নারী বালক-বালিকা রাজপুরীতে যাতায়াত করিতেছে। মুরলা তাহার সঙ্গে মিশিয়া উৎসবের বাসন্তী বেশে সজ্জিত হইয়া অপরাহ্ণেই বাহির হইয়া গিয়া সেতারা হইতে পলায়নের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনে লিপ্ত রহিল। প্রহরী ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পাইল না।

এদিকে মুরলাকথিত নির্দিষ্ট সময়ে ফিরোজাবানু মুরলার পরিত্যক্ত আটপৌরে কাপড়খানি মুরলার ভঙ্গীতে পরিয়া জনতার সহিত মিশিয়া ব্যস্তভাবে দ্বার পার হইয়া নিকটবর্তী উদ্যানের দক্ষিণ দিকে যাইতেই দেখিলেন মুরলা তাঁহার জন্য ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মারাঠী শিবির

সদাশিব : নজীব-উদ্দৌলা বোধ হয় আমাদিগকেই সন্দেহ করছে?

ভাস্কর : ভাব-ভঙ্গীতে তো তাই বোধ হয়। নজীব বড় ধূর্ত এবং চতুর।

সদাশিব : তেজস্বীও খুব। জাতীয় টানও খুব আছে। মারাঠীদিগকে বিষচক্ষেই দেখে।

ভাস্কর : তা তো দেখবেই। আমরা দিল্লী পর্যন্ত দস্তদারাজী করছি, এতে আর কি মুসলমানের চিত্ত স্থির থাকতে পারে?

সদাশিব : হিন্দুর চিত্তই বা কোথায় প্রফুল্ল? গুপ্তচরেরা সবাই বলে যে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই দিল্লীপতির মঙ্গল কামনা করেন। দিল্লীর অধঃপতনে সকলেই মর্মান্তিক দুঃখিত।

ভাস্কর : দিল্লীশ্বরের প্রায় কিছুই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, এখনও দিল্লীপতির সম্মান ও প্রতিপত্তি কি অপরিসীম! দিল্লীপতি এবং তাঁর উজীর ও আমীরগণ তেজস্বী, কর্মঠ এবং উদ্যোগী পুরুষ হলে, এখনও আবার সমগ্র ভারতে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপিত হতে পারে।

ভাস্কর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া সদাশিবের সহকারী তুলাজী দেশপাণ্ডে বলিলেন, "তাহার জন্য যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা-চরিত্র হচ্ছে না, তা কে বলবে? অগ্নি, শত্রু এবং সর্পকে কদাপি তুচ্ছ ভাবতে নাই। আমার মতে বাদশাহ্‌কে পদচ্যুত করে পেশোয়া স্বয়ং দিল্লীর তখ্‌তে বার দিন। দিল্লীর তখ্‌তে বসতে না পারলে, পেশোয়াকে কদাপি ভারতের বাদশাহ্‌ বা সম্রাট বলে কেউই মান্য করবে না। এখনও ভারতবর্ষে মুসলমানের যে শক্তি আছে, তা একত্র হলে মারাঠীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দিতে পারে।

ভাস্কর : তা বটে। কিন্তু তা' আর হচ্ছে না। অতি শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে আক্রমণ করে উৎপাটিত করবার বন্দোবস্ত করছি। বাঙ্গলা, অযোধ্যা ও সিন্ধু, আর্যাবর্তের এই তিনটি রাজ্যকে আশু ধ্বংস করা আবশ্যক। দিল্লীর তখ্‌তে পেশোয়াকে না বসালে এবং দিল্লীর জামে মস্‌জিদে ভবানী-মূর্তি স্থাপিত করতে না পারলে রাজ্যাধিকারের পূর্ণ আনন্দলাভ হচ্ছে না।

তুলাজী : কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা হিন্দুদিগের সহানুভূতি পাবার জন্য কোনও চেষ্টা করছি না। আমরা ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রাধান্য ও রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা না করে কেবল হত্যা ও লুণ্ঠন করায় ভারতের প্রত্যেক লোকই আমাদের নাম শুনলেই ভয়ে শিউরে ওঠে। বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানে আমাদের নামে যে-সব ছড়া ও কবিতা রচিত হয়েছে তাতে আমাদের জুলুমের কথাটা লোকের মনে একেবারে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। আমাদের অত্যাচারে নিরীহ্‌ এবং দরিদ্র কৃষক-পল্লীতে পর্যন্ত হাহাকার উঠেছে।

সদাশিব : কিন্তু এরূপ অত্যাচার ও কঠোরতা প্রদর্শন না করলে কেউ আমাদের ন্যায় নগণ্য জাতিকে গ্রাহ্য করত কি? আজ যে সমগ্র ভারতে আমাদের নামে আতঙ্ক পড়ে গিয়েছে, ভারতের সমস্ত রাজা, নবাব এবং বাদশাহ পর্যন্ত যে আমাদের করুণাভিখারী, তা এই কঠোরতা এবং নৃশংসতারই সুফল। আমাদিগকে আরও কঠোর ও নৃশংস হতে হবে। রাজপুত এবং জাঠগণ যদি আমাদের সহায় হত, তা হলে ভারতময় একচ্ছত্র হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করা সহজসাধ্য হত। কিন্তু রাজপুতেরা আমাদিগকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করে থাকে। আমরা সমূলে উৎসাদিত হই, এটাই তাদের আন্তরিক কামনা। তাদের ধারণা যে, রাজপুত ব্যতীত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করবার জন্য আর কোনও জাতি উপযুক্ত নয়। রাজপুতের অধিকাংশই এখনও দিল্লী সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানকামী।

তুলাজী : ওরা তো বলতে গেলে, অর্ধ-মুসলমান। এমন কোনও রাজপুত

নাই, যে মুসলমানকে কন্যাদান করে নাই। শিশোদীয়, গিহ্লোট, রাঠোর ও কনোজ-গোত্রীয় সকল রাজা, রাণা ও সর্দারই মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। যে উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ মুসলমানকে কন্যাদি দিবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যিনি, মানসিংহ আকবরকে ভগ্নীদান করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে একত্রে আহার করতেও সম্মত হন নাই, পরে তাঁরই কন্যা অশ্রুমতী যুবরাজ সেলিমের প্রেমের বাণে বিদ্ধ হয়ে উন্মাদিনী হয়ে গেল।* সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, রাজপুতেরা মুসলমানের মাতুলকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তার যে দিল্লীর বাদশাহী প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করবে, তা তো স্বাভাবিক। রাজপুতেরা এই মাতুলত্বের দাবীর জন্যই অন্যান্য সর্বজাতীয় হিন্দু অপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছে।

সদাশিব ঃ ভরতপুরের রাজা তো রাজপুত নয়; কিন্তু সেও দিল্লীর হিতৈষী। এই জাঠ বেটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

ভাস্কর ঃ ফন্দী তো খুবই খাটান হয়েছে। যা'র জন্য সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে কুণ্ঠিত নয়, এবার সেই বাদশাহকে দিয়েই সাপ খেলাব।

তুলাজী ঃ এই তো যথার্থ রাজনীতি,—'যাক্ শত্রু পরে পরে।' আমরা মজা করে তামাশা দেখব।

ভাস্কর ঃ তামাশা আর মজা করে দেখতে হবে না। এ তামাশা দেখতে বহু সহস্র মারাঠীর মুণ্ড ধূলায় লুটবে। জাঠেরা সহজে হারবার পাত্র নয়।

তুলাজী ঃ তা তো বটেই। পরিণাম কি হয় বলা কঠিন। ভিতরের কথা যদি ফেঁসে পড়ে, তা হলে সবই পণ্ডশ্রম হবে। অধিকন্তু মুসলমানদের সঙ্গে ভীষণ বিবাদ ও বিগ্রহ হবে।

সদাশিব ঃ যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা গেছে।

তুলাজী ঃ কিন্তু কথা হচ্ছে, পাপ কখনও লুক্কায়িত থাকে না।

সদাশিব ঃ আরে! মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ যখন লেগেই আছে এবং আরও লাগবে, তখন আর ভাবনা-চিন্তা করবার কি আছে? হায়! যার জন্য এত করলাম, এখনও তার তো মুখকমল দেখা দূরে থাক, পা'খানিও দেখতে পেলাম না। সে অলোকসুন্দর প্রফুল্ল কমলের ঘ্রাণ নেবার ভাগ্য আছে কিনা, কে বলবে!

ভাস্কর ঃ তা হবে, মহারাজ। কমল যখন তোলা গেছে, তখন ঘ্রাণ নেওয়া তো নিজেরই হাত। এদিকের বন্দোবস্ত করে ধাঁ করে সেতারায় চলে যান।

সদাশিব ঃ পেশোয়া টের পেলেও যে বিপদ!

ভাস্কর ঃ পেশোয়া বড় কিছু মনে করবেন না। বরং কথা আছে যে, চোরে চোরে মাসতুত ভাই। তবে চুরির এই অমূল্য রত্নটি পাছে চেয়ে না বসেন।

সদাশিব ঃ ওরে বাপরে! তবেই তো গেছি। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া! এমন অধর্ম কখন করবেন না।

* *শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'অশ্রুমতী' নাটক দেখুন।*

ভুলাজী : ও সব কথার প্রয়োজন নাই। এখন এ যুদ্ধে আপনি স্বয়ং যাবেন, কি পণ্ডিতবরকে পাঠাবেন, তাই নির্ধারণ করে সৈন্যদলকে সজ্জিত হবার আদেশ প্রদান করুন।

সদাশিব : নজীব-উদ্দৌলার তো খোঁজ-খবর নাই। মাত্র দু'হাজার রোহিলা সৈন্যকে সর্দার আহমদ খান পাঠিয়েছেন।

ভুলাজী : নজীব-উদ্দৌলা নাকি স্ত্রীর শোকে নিতান্ত উন্মাদ হয়ে পড়েছেন।

সদাশিব : বেশ কথা, বড় ভুল হয়ে গেছে। তাকে সে রাত্রে সাবাড় করে ফেলাই উচিত ছিল।

ভুলাজী : সফদরজঙ্গ যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ফিরোজা বেগম ভরতপুরেই আছেন।

সদাশিব : যথা লাভ। সফদরজঙ্গ ভালো যোদ্ধা। দিল্লীর সেনাপতি শমশেরজঙ্গও ব্যূহ রচনায় বেশ পণ্ডিত। তা'হলে আপনি কাল সকালে ভরতপুরে কুচ করবার জন্য প্রস্তুত হোন। ভাস্করজী আমার পরিবর্তে দিল্লী থাকবেন। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই সেতারায় রওয়ানা হব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেগমকে লইয়া মুরলা দ্রুতপদে অক্রবক্র রাস্তা অবলম্বন করিয়া একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই পল্লীতে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির ছিল। শিব-মন্দিরের চতুর্দিকে নানাজাতীয় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি থাকায় স্থানটি অন্ধকারপূর্ণ ছিল। রাত্রিতে ভয়ে এ মন্দিরে কেহই প্রবেশ করিত না। মুরলা এবং ফিরোজা দুইজনে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালাইল। প্রদীপ জ্বালাইয়া দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, কিরূপ বেশে সেতারা হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক।

ফিরোজা বলিলেন, "আমরা উভয়েই যুবতী। সুতরাং নারীবেশে দূর-দূরান্তরে গমন করা অসঙ্গত।"

মুরলা : ঠিকই বলেছেন। নারীবেশে বের হলেই আবার বিপদে পড়তে হবে। আপনার কমনীয় কান্তি, রমনীয় শ্রী এবং ললিত লাবণ্য যে দেখবে সেই বিমোহিত হবে। আপনি যে মারাঠী মহিলা নন, তা স্পষ্টই ধরা পড়বে। অন্য দিকে পুরুষের বেশেও মহাবিপদের সম্ভাবনা। এজন্য আমি মনে করি, আমরা দু'জনেই সন্ন্যাসিনী বেশে বহির্গত হলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। আমি তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। আমরা মারাঠা রাজ্য ত্যাগ করে নিজাম-রাজ্যে পৌঁছলে সেখানে আপনি রাজসরকারেও অনেক সাহায্য পেতে পারবেন। অথবা তথা হতে দিল্লী বা রোহিলাখণ্ডে সংবাদ প্রেরণও বেশী কিছু কঠিন হবে না।

আপনি তো বলেছেন যে, নিজাম-দরবারে আপনার উচ্চপদস্থ আত্মীয় আছেন।

ফিরোজা ঃ আমি তো সন্ন্যাসিনীর আচার-ব্যবহার কিছুই জানি না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই বা কি বলব?

মুরলা ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ঠিক করে দিব। সন্ন্যাসিনীর নাম ধাম, ধর্মমত কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। এরূপ জিজ্ঞেস করা নিয়মবিরুদ্ধ। জিজ্ঞেস করলেও নিরুত্তর থাকবেন। তাতে কেউই দোষ ধরবে না।

ফিরোজা ঃ সঙ্গে অস্ত্র থাকা আবশ্যক।

মুরলা ঃ একটি একটি করে আমাদের দু'টি ত্রিশূল তো থাকবেই।

ফিরোজা ঃ তরবারি হলেই ভালো হয়। আমি তরবারি ভালো চালাতে জানি।

মুরলা ঃ তরবারি থাকলে লোকে সন্দেহ করবে। আমরা যে যথার্থ সন্ন্যাসিনী নই, তাই বুঝাবে। লোকের সন্দেহের উদ্রেক হবে।

ফিরোজা ঃ তা হলে তরবারির আর প্রয়োজন নাই।

অতঃপর মুরলা বেগমকে ভৈরবী সাজাইতে আরম্ভ করিল। গিরিমাটি ঘষিয়া চুলগুলির তৈলাক্ত ভাব দূর করিয়া ললাটোপরি শিব-চূড়া বাঁধিয়া দিল। বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া রক্তবর্ণ চেলী পরাইয়া দিল। হস্তে এবং গলে রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। ফিরোজার বর্ণ কিছু মলিন করিবার জন্য প্রথমে মুখে কিছু ছাই মাখিয়া পরে গৈরিক আমর্শন করিয়া দিল। এইরূপ ভাবে ফিরোজাকে সাজাইয়া দর্পণে মুখ দেখিতে বলিল। ফিরোজা আপনার মূর্তি দেখিয়া আনন্দে স্মিতহাস্য করিলেন।

মুরলা বলিল, "এবার এ ভৈরবীর রূপ দেখলে তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে এসে শ্রীচরণতলে গড়াগড়ি দিবে। দেবাদিদেব মহাদেব ভৈরব পর্যন্ত ত্রিলোকমোহিনী চির উদ্ভিন্নযৌবনা কমলাননা পার্বতীকে পর্বতে ত্যাগ করে তোমার নীলোৎপলনিন্দিত নয়নের সম্মোহন বাণে বিদ্ধ হয়ে ঐ লোলিতাজ-সঙ্কাশ প্রেমিকজন-শরণ চরণতলে লুণ্ঠিত হবেন।"

মুরলার কথা শুনিয়া ফিরোজা স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, "এখন রঙ্গরস রাখ। পলায়নের উপায় দেখ। নিজে শিঘ্র সজ্জিত হও।"

"আমরা শহরের বাইরে বের হয়ে পড়েছি। সুতরাং রাত্রিতে রওয়ানা হলে আর কোন আশঙ্কা নাই।"—এই বলিয়া মুরলা নিজেও ভৈরবীর বেশে সত্বর সজ্জিত হইয়া ফিরোজার হস্তে একগাছি ত্রিশূল ও তাঁহার স্কন্ধে গৈরিক একটি ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়া তদনুরূপ নিজেও ত্রিশূল এবং ঝুলি ধারণ করতঃ নির্গত হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি গমনের পরে প্রভাতে তাঁহারা ত্র্যম্বকনাথ নামক গ্রামে "বাবা একলিঙ্গের" মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীযুগলকে দেখিয়া মন্দিরের সেবাইতরা পরম যত্নে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উভয় ভৈরবীর একত্র সম্মিলন এবং তন্মধ্যে একজনের বিস্ময়কর রমণীয় কান্তি ও তেজস্বিনী প্রকৃতি

যুগ যুগ ধরি সে রূপমাধুরী
মরণে না মিটে আশা;
দেখে তারে যত রূপ বাড়ে তত
সৃজিয়া অসীম তৃষা।

হেন রূপবতী হেন রসবতী
হেন গুণবতী বালা,
দেখিল যে জন মজিল সে জন
হইয়ে আপন ভোলা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেগম এবং মুরলা ক্রমাগত সাত দিন গমনের পরে এক বিরাট কাননের পথে অগ্রসর হইলেন। এই কানন অতিক্রম করিবার পরেই বিন্ধ্য পর্বত পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্য পর্বতে বিন্ধ্যেশ্বরীর বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত হইতে বহু হিন্দুই পুণ্যলাভের আশায় এই তীর্থে বারমাসই সমবেত হইয়া থাকে। বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্যও নিতান্ত মনোহর। সুতরাং এই পথেই শ্যামল বনরাজির চিত্তবিনোদিনী শোভা, বন্য জন্তু এবং বিহঙ্গাদির রমণীয় সৌন্দর্য, পার্বত্য-প্রকৃতির নিরুপম সুষমা সন্দর্শনে নয়ন-মনের তৃপ্তিসাধনপূর্বক হিন্দুস্থানের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার জন্যই বেগম ও মুরলা সংকল্পারূঢ় হইলেন।

ফিরোজা বেগম এবং মুরলা সেই কাননপথে ত্রিশূল হস্তেই বিন্ধ্য পর্বত পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ফাল্গুন মাস। বসন্তের চরম প্রকাশ। তরুপল্লবীর শ্যাম সুন্দর শোভা এবং নানাজাতীয় ফুলরাজির মনোহর বিকাশ দেখিয়া উভয়ে মোহিত হইতে লাগিলেন। এই অরণ্যভূমিতে অগণ্য ময়ূর, কুক্কুট ও ধনেশ পক্ষী দল বাঁধিয়া বিচরণ করিত। কাকাতুয়া, টিয়া এবং ময়না ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া কলরব করিয়া বনভূমিতে মুখরিত করিতেছিল। নানা জাতীয় বিচিত্র বর্ণের হরিণ যত্রতত্র বিচরণ করিতেছিল। সুগন্ধি পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া সুকোমল স্নিগ্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া সকলের শরীরে স্নিগ্ধতা এবং চিত্তে প্রসন্নতা দান করিতেছিল। কোকিলের মধুর কূজনে, পাপিয়ার পিউ তানে এবং বুলবুল প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষীর ললিত গানে বনভূমি প্রাতঃসন্ধ্যা ঝঙ্কৃত হইতেছিল।

ফিরোজা বেগম স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয় এবং রসবোধিকা ছিলেন। তদুপরি পারস্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের কাব্যরাশি বহুল-চর্চা করায় তাঁহার অন্তঃকরণ

দেখিয়া সকলেই ভয়, বিস্ময় এবং ভক্তিতে গড় করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে আবার দুইজনে পদাতিক্রমে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমাদের ভৈরবীযুগল যে-পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই পথের দুইপাশে বহু নরনারীর ভীড় হইতে লাগিল। অনেকেই বলিল, "স্বয়ং মা পার্বতী ভৈরবী মূর্তি ধারণ করে সখীসহ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বের হয়েছেন।"

রমণীর তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের কথা অনেকেই শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ কখনও চোখে দেখে নাই। কিন্তু আজ সকলে রক্ত-চেলী পরিহিতা ভৈরবীর প্রতপ্ত স্বর্ণ-সন্নিভ বর্ণ দর্শনে বিস্ময় মানিল। এমন টানা টানা বাঁকা বাঁকা জোড়া ভুরু, ভাসা ভাসা উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত চক্ষু, এমন প্রভাতপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল বদনমণ্ডল, এমন উষার সিন্দুরসুবর্ণরাগমিশ্রিত রক্তিমা মাখা পেলবগণ্ড তাহারা কখনও দেখে নাই। দেখা মাত্র মনে হয় ঃ

বিরলে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
একেলা গড়েছে বিধি
কামনার ধন ত্রিলোকমোহন
অতুল রূপের নিধি!

বাছনি করিয়া সুষমা লইয়া
সারাটি জগৎ হতে,
শতবার করি ভাঙ্গি আর গড়ি
গড়িলা মনের মতে।

সে রূপমাধুরী আহা! মরি! মরি!
দেখিয়া মেটে না আশা,
রূপের প্রতিমা প্রেমের মহিমা
কহিতে নাহি ক ভাষা।

চরণ-পরশে ধরণীর অঙ্গে
থরে থরে ফুল ফুটে,
নয়ন-কটাক্ষে কাদম্বিনী-অঙ্গে
শতেক দামিনী ছুটে।

গগনেরি গায় চারু নীলিমায়
অযুত তারকা জ্বলে।
প্রেমিক সুজন পেলে দরশন
ভাসে প্রেমরস-জলে।

পরিমার্জিত, উন্নত এবং সরস হইয়াছিল। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। কবিসুলভ ভাবুকতা এবং রসের ধারা তাঁহার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। সুতরাং বনভূমির কবিত্বময় ললিত সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়ে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করিল।

সমস্ত দিন বনভূমির সৌন্দর্য অবলোকন করিতে করিতে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বন্য-ফল এবং সঙ্গের সম্বল ছাতু খাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছেন। অষ্টম দিবস এক প্রহর বেলার সময় উভয়ে এক বিশাল সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। সে সরোবরের পানির পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা দেখিলে পিপাসা যেন আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। কাকচক্ষুর মত নির্মল জল মন্দ সমীরসঞ্চারে টলমল করিতেছে। অসংখ্য শ্বেত ও রক্তপদ্ম এবং অন্যান্য নানা জাতীয় জলজ পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইয়া কি এক অনির্বচনীয় ও অপরূপ স্বর্গীয় সুষমার বিকাশ করিয়াছে। নানা শ্রেণীর বিচিত্র চন্দ্রক ও বর্ণবিভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হংস, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, কেঁপী, মরাল, টিট্টিভ, বলাকা প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুলের কলরবে বিশাল সরোবরটি মুখরিত! তটভূমি শ্যামল তৃণ-আস্তরণে আচ্ছন্ন। মনে হয় যেন, কেহ সবুজ বর্ণ ইরানী গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শাল, তমাল, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ দূরে দূরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শীতল ছায়াদানে কোমল তৃণপুঞ্জকে ভানুর প্রখর কিরণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিতেছে। মহতের লক্ষণই এই, নিজের ক্ষতি সাধন করিয়াও—সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াও আশ্রিত যে, দুর্বল যে, তাহাকে রক্ষা করিবে।

এইসব তরুর ছায়ায় মৃগশাবকগণ মনের আনন্দে ধাবন ও কূর্দন করিয়া মাতার সহিত নব নব তৃণাঙ্কুরগুলি ভক্ষণ করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের আগমনে নিকটবর্তী হরিণগুলি চমকিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ফিরোজা এবং মুরলা বড় শ্রান্ত হইয়াছিলেন। সরোবরের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সরোবরের শীতল-সলিল-শীকর-সম্পৃক্ত সমীর সেবনে শরীর স্নিগ্ধ হইল। সরোবরের পাড়ে দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিহ্বল নয়নে ফিরোজা, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মোহনীয় পবিত্র সৌন্দর্যসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। দিল্লীর শাহী-উদ্যানের চক্ষুবিনোদন শোভা এবং তন্মধ্যস্থ সরোবরে জলজ পুষ্পের চমৎকার বাহার অনেকবার দেখিয়াছেন; কিন্তু কৈ, এমন বিপুল ও বিমল শোভা এবং প্রশান্ত ও মধুর দৃশ্য তো কখনও দেখেন নাই! দেখিয়া দেখিয়া ফিরোজা মুগ্ধ হইলেন। মুরলাও হর্ষে উৎফুল্ল হইল।

ফিরোজা বলিলেন, "কি রমণীয় বিশাল সরোবর! কি নির্মল ইহার জল! কি চিত্তহারিণী শোভা! ইচ্ছা করে এই রমণীয় স্থানে প্রস্ফুটিত কমলকলির ন্যায় আনন্দপূর্ণ কবিত্বময় জীবন অতিবাহিত করি।"—এই বলিয়া ফিরোজা কিয়ৎক্ষণ

নীরব রহিবার পরে মনের আবেগে গাহিলেন ঃ

কে তুমি হে পরম সুন্দর!
সৃজেছ এই সুন্দর বিশ্ব,
সুন্দর তোমার গঠন-কল্পনা
সুন্দর তোমার সকল দৃশ্য!

সুন্দর তোমার অণুপরমাণু
সুন্দর তোমার লতাপাতা ফুল,
সুন্দর তোমার গিরি নদী বন
সুন্দর তোমার পথের ধূল!

সুন্দর তোমার গগন পবন
সুন্দর তোমার ভূমি ও জল,
সুন্দর তোমার রবি শশী তারা
সুন্দর তোমার জোনাকীদল।

সুন্দর তোমার পশু পক্ষী কীট
সুন্দর তোমার জলদদাম,
সুন্দর তোমার দামিনী-স্ফুরণ
সুন্দর তোমার নিখিলধাম!

সকলি তোমার সুন্দর সুন্দর
তুমি হে অনন্ত সৌন্দর্যময়,
হে প্রিয়তম! হে সুন্দরতম!
তোমার সৌন্দর্য নিখিলময়।

ফিরোজার গান থামিবার পরে মুরলা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখ—সে স্বর্গীয় মুখ সরোবরের কবিচিত্তরঞ্জিনী সুষমাবলোকনে ভাবাবেশে এবং সঙ্গীতরসে আরও নির্মল সুন্দর হইয়াছে। মন্দ সমীরণ কপোলের দুই পার্শ্বস্থ অলকাবলী দোলাইয়া দোলাইয়া উড়াইয়া উড়াইয়া প্রবাহিত হওয়ায় কি চমৎকারই দেখাইতেছে! মনে হয় যেন, শারদীয় ঊষা নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বজগতের কোলাহল ত্যাগ করতঃ এই নিভৃত নির্জন সরোবরের শ্যাম তটে আপন মনে বিচরণ করিতেছে।

মুরলা, বেগমের মুখ দেখিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিল, "বেগম! তুমি মানবী নহ—দেবী। ইচ্ছা করে, এই সরোবর-তটে বাস করে, জীবন ভরে সাধ মিটিয়ে তোমার সেবা করি। আর রক্তোৎপল তুলে প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার চরণে দেই। তোমার দর্শনে কি আনন্দ! তোমার সেবায় কি সুখ! তোমার পূজায় কি পুণ্য!'

ফিরোজা ঃ মুরলা! পরমপিতা আল্লাহ্-তাআলার মহিমা কীর্তন কর। এই সৌন্দর্যেও তাঁরই মহিমা। কবি সভাই বলেছেন ঃ

নেহাদ নোৎকায়া জুরতে চুঁ পরী
*কে কারদাস্ত বর আব্ ছুরত্ গিরি।**

অর্থাৎ *তুচ্ছ ত্রপে করেছেন*
অক্ষরার রূপদান,
জলেতে আঁকয়ে ছবি
কে শিল্পী ক্ষমতাবান।

মুরলা! আমার এ রক্তমাংসময় তুচ্ছ দেহের সামান্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছ! একবার তোমার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত এবং দূরদর্শিনী কর। দেখ, অনন্ত নীল নভোমণ্ডল হতে এই চির শ্যামলা, গিরি-কানন-কুন্তলা সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীর প্রতি পদার্থে, প্রতি তরুলতাতে, প্রতি ফল-ফুলে, প্রতি অণুরেণুতে তাঁর কি বিচিত্র বিপুল ও সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্য বিরাজমান! তিনি অনন্ত জগৎ জুড়ে কত অসংখ্য প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ ও ছন্দ ছড়িয়ে রেখেছেন! তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হও। তাঁরই সৌন্দর্যে বিভোর হও। তাঁরই প্রশংসা কর। তাঁরই পূজা কর এবং তাঁরই গুণ কীর্তন কর। তাঁর রসে ডুবে রও। তাতেই জীবনের সফলতা।

মুরলা বলিল, "দিদি! তোমার কথা কত যুক্তিপূর্ণ! কত মধুর। এবং কত সুন্দর! মুসলমানগণ কেন যে পরমেশ্বর ব্যতীত আর কারও পূজা, অর্চনা, স্তব-স্তুতি করেন না, এতদিনে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আমিও আর কারও পূজা করব না। ইস্‌লাম বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

এইরূপ কথোপকথনের পরে উভয়ে সেই স্বচ্ছ শীতল সরসীসলিলে অবগাহনপূর্বক আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বেগম এবং মুরলা আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় ফিরোজা দেখিলেন যে, দূরে বনান্তরাল হইতে দুইটি অশ্বারোহী মারাঠী সৈন্য দেখা যাইতেছে। ফিরোজা মুরলাকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিলেন। মুরলা সাবধান হইয়া মাটী হইতে কম্বল দুইটি, ঝুলি ও ত্রিশূলাদি লইয়া একটি বৃহৎ ঝোপের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইল। বেগমও সেই ঝোপের আড়ালে যাইয়া সৈন্যদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

* মানুষ কাঠ পাথর দ্বারা মূর্তি গঠন করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌তালা জল অর্থাৎ শুক্রবিন্দু দ্বারা মানবের কি চমৎকার মূর্তি গঠন করিয়াছেন।

দেখিলেন, দুই জন নহে—সাত জন অশ্বারোহী সৈনিক এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেছে। বন্দীর অঙ্গে গৈরিক বসন পরিহিত। সৈনিক ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে দেখা গেল যে, একজন তরুণ বয়স্ক যুবক-সন্ন্যাসীর হস্তে কড়া এবং কটিদেশে জিঞ্জির লাগাইয়া একটি অশ্বের উপরে দৃঢ় বন্ধনপূর্বক সৈন্যগণ "নাঙ্গা তলোয়ার" হস্তে লইয়া যাইতেছে। সৈনিকেরা খুব প্রফুল্ল। বন্দীর মুখে দারুণ ক্লেশ ও হতাশার লক্ষণ সুস্পষ্ট বিরাজমান।

মারাঠী সৈনিকেরা সেই সরোবরের তটে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক শ্যাম তৃণতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বন্দীটিকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া একটি বৃক্ষের সহিত দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিল। তৎপরে নিজেদের ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আহারান্তে সৈনিকগণ বন্দী পুরুষকেও কয়েকখানি রুটি এবং কিছু ছোলাভাজা খাইতে দিয়া পুনরায় হস্ত-পদাদি দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্বক একজনকে প্রহরায় নিযুক্ত করিয়া আর সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। গালিচা-বিনিন্দিত কোমল তৃণের উপরে কম্বল বিছাইয়া মন্দ সমীরণে শয়ন করায় সৈনিকগণ শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

যে সৈনিকটি প্রহরায় ছিল, সেও ক্রমশঃ বন্দীর জন্য কোনও আশঙ্কা না থাকায় এবং ক্লান্তিবিনাশী সমীরণ সেবনে ক্রমশঃ প্রগাঢ়রূপে ঘুমাইয়া পড়িল। ফিরোজা এবং মুরলা বৃহৎ ঝোপের নিবিড় আড়াল হইতে চুপে চুপে দস্যুদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বন্দীকে বিশেষরূপে দেখিবার পরে, তাহাকে তাঁহার হৃদয়নিধি, সংসারমরুভূমির আশ্রয়-উদ্যান সহধর্মী নজীব-উদ্দৌলা বলিয়া ধারণা হইল। কিন্তু চক্ষের দৃষ্টিকেই প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, আমার প্রাণকান্ত নজীব-উদ্দৌলা দস্যুহস্তে বন্দী হইয়া থাকিলে, এখানে তাঁহাকে কোথা হইতে লইয়া আসিবে? তৎপরে তাঁহার গৈরিক বাস পরিধান করিবার কারণ কি? না, আমার শোকে, আমার অনুসন্ধানে, আমার তত্ত্বতল্লাসে সন্ন্যাসীবেশে বাহির হইয়াছিলেন? কিছুই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! মন কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে। হায়! সত্যই কি ইনি আমার প্রিয়তম স্বামী?

বেগমের ব্যাকুলতা, ললাটে চিন্তার রেখা এবং মুখে বিষাদ-কালিমা দেখিয়া মুরলা চিন্তিত হইল। মুরলা ভাবিল যে, বেগম বোধহয় দস্যু সিপাহীদের উপস্থিতিতেই আমাদের ধৃত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতেছেন। এই ভাবিয়া বেগমকে বলিল, "দিদি! ভীত হবার কিছু নাই। সিপাহীরা কিছুতেই আমাদিগকে দেখতে পায় নাই এবং এদিকে আস্‌লেও দেখতে পাবে না। আমরা এমন চমৎকার স্থানে আছি যে, আমরা দস্যুদিগের সমস্তই দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু ওরা কিছুতেই আমাদিগকে দেখতে পাবে না।"

ফিরোজা : মুরলা, সিপাহীদিগকে দেখে আমি ভীত হই নাই। কিন্তু বন্দীকে দেখেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। আমার মন যেন বলছে, এই বন্দীই আমার

স্বামী। চেহারা দেখেও সেই রকম মনে হচ্ছে। তবে দূরত্বানিবন্ধন একেবারে সুস্পষ্টরূপে মালুম হচ্ছে না। যেই হোক এবং যাই হোক, বন্দীকে মুক্ত করতে হবে। আমি ধীরে ধীরে যাচ্ছি; তুমি এখানেই থাক। যদি কোনও বিপদ সংঘটিত হয়, আমার উপর দিয়েই যাবে।

মুরলা : ছি! বেগম! এমন কথা কখনই বলবেন না। আপনার সঙ্গ আমি কখনই ত্যাগ করব না। যদি বিপদ ঘটে, তবে সর্বাগ্রে তা আমিই বরণ করে নিব। আপনাকে প্রাণ থাকতে বিপদগ্রস্ত হতে দিব না। বরং আপনি থাকুন, আমি বন্দীকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসি।

ফিরোজা : আমি না গেলে বন্দীকে তো তুমি চিনতে পারবে না। আমাকেই যেতে হবে। বন্দীকে না দেখে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।

মুরলা : তবে চলুন দু'জনেই যাই।

ফিরোজা : খুব সাবধান, যেন কোনও শব্দ না হয়। শুষ্ক পত্রের উপরে পা দিও না। তুমি সৈনিকদের তরবারিগুলো সাবধানে সংগ্রহ করে ফেলবে।

এই বলিয়া ফিরোজা ঝুলির ভিতর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাখানি গ্রহণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বন্দীর নিকটবর্তী হইলেন। সৈনিকেরা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইলেও, বন্দীর চক্ষে নিদ্রা নাই। বন্দীর হস্ত যেরূপ ভাবে বন্ধন করিয়াছে এবং তাহাকে যেরূপ অসুবিধায় রাখিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে নিদ্রালাভ সহজ নহে। ফিরোজা একেবারে যাইয়া বন্দীর নিকটস্থ হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, বন্দী—সত্য সত্যই নজীব-উদ্দৌলা। তাঁহার প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দের তুমুল কল্লোল তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ফিরোজা গভীর সংযম এবং মানসিক ধৈর্যের বলে চঞ্চল চিত্তকে স্থির ও গম্ভীর করিয়া ফেলিয়া তরবারি ও প্রস্তরের সাহায্যে হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাতকড়ি ভাঙ্গিতে যাহাতে শব্দ না হয়, সে জন্য ফিরোজা যথেষ্ট সাবধান হইলেও প্রস্তরাঘাতে একটু শব্দ হওয়ায় প্রহরী চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিবার পরে সে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে ভীষণ আতঙ্কজনক চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার চীৎকারে সৈনিকদের মধ্যে সকলেই জাগিয়া উঠিয়া মহাব্যস্ততার সহিত নজীব-উদ্দৌলাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। কিন্তু একজন ব্যতীত কাহারও বন্দুক ও তরবারি কিছুই ছিল না। মুরলা সমস্তই অপহরণ করিয়া একটি বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। একজন সৈনিক তরবারি মস্তকের নীচে স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া মুরলা তাহার তরবারিখানি অপহরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল না। কেবল সেই সৈনিকটি ধৃত করিবার জন্য ছুটিয়া গেল।

ফিরোজা বেগম প্রাণবল্লভের বিপদ দেখিয়া তীব্রবেগে ত্রিশূল লইয়া সৈনিকটিকে ভীষণ আঘাত করিলেন।

সৈনিকের তরবারির আঘাত ত্রিশূল-অগ্রে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল, অথচ ত্রিশূলের আঘাতে মারাঠী সৈনিকপুরুষ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইল।

ইতিমধ্যে অন্যান্য সৈনিকেরা বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া নজীবকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। মুরলা একখানি তরবারি আনিয়া শত্রুগণ দেখিতে-না-দেখিতেই বিদ্যুতের মত বেগে আসিয়া নজীবকে প্রদান করিলেন। নজীব-উদ্দৌলা তরবারি পাইয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন এবং আস্ফালন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। শাখারূপ লগুড়ধারী সৈনিকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। নজীব-উদ্দৌলা মুরলাকে বলিল, "ইহাদিগকে স্বীয় স্বীয় তলোয়ার প্রত্যর্পণ কর। অস্ত্রহীনের সহিত যুদ্ধ করায় কোনও পৌরুষ নাই। কেমন যোদ্ধা তা আমি দেখে নিব। আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বন্দী করিয়াছে; আমি তার সমুচিত শিক্ষা প্রদান করব।"

মুরলা বলিল, "শত্রুকে বলশালী করা ভাল নহে। এতগুলি লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা সহজ নহে। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আঁটিয়া উঠা কঠিন, তাতে এরা সশস্ত্র হলে আপনার জীবন নাশের আশঙ্কা।"

নজীব ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ্‌র কৃপায় এরা কখনও যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারবে না। এরা যোদ্ধা নহে, লুঠেরা মাত্র। দাও, তুমি শীঘ্র এদেরকে তরবারি দাও।

নজীব-উদ্দৌলার পীড়াপীড়িতে মুরলা বর্গীদিগকে তরবারি দান করিল। বর্গীরা তরবারি পাইয়া নজীবকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করায় ফিরোজা বেগম ত্রিশূল হস্তে সংহারিণী মূর্তিতে পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা পরাক্রান্ত এবং নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রবল বিক্রমে ও কৌশলে অল্পকালের মধ্যেই তিন জন দস্যুকে ছিন্নমুণ্ড করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ত্রিশূল-আঘাতে ফিরোজা বেগমও এক জনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। একজন পূর্বেই ফিরোজা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হওয়ায় একজনকে মুরলা ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু আর একজন তড়িৎগতিতে অশ্বারোহণপূর্বক সেই বনপথেই বিদ্যুদ্বেগে অশ্ব ছুটাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

বর্গী সঙ্কীর্ণ বনপথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড বিলের নিকটে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক একটি বনের আড়ালে গায়েব হইয়া গেল। নজীব-উদ্দৌলা অতি দ্রুত অশ্ব ধাবিত করিয়া সেই ঝোপের নিকটবর্তী হইয়া বর্গীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়াও মারাঠীর আর কোনও অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াটি মাত্র বিচরণ করিতেছে। নজীব-উদ্দৌলা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে ফিরোজা এবং মুরলা অনেক পিছনে পড়ায়, তাঁহাদের জন্যও সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে

লাগলেন। কিছু পরেই ফিরোজা এবং মুরলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজা বলিলেন, "বর্গীটা কোথায় গেল? আপনি তাকে ধরতে পারেন নাই?"

নজীব : বর্গী এই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করেছে; কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তাকে খুঁজে পেলাম না।

ফিরোজা : তবে অন্য কোনও দিক দিয়ে পলায়ন করেছে।

নজীব : নিশ্চয়ই না। আমি বিশেষ লক্ষ্য করেছি। আর বিশেষ কথা হচ্ছে যে, ঝোপের চতুর্দিকে কোনও রূপ জঙ্গল নাই; সুতরাং তার পক্ষে লুকিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব।

"তবে এখানেই আছে।" এই বলিয়া ফিরোজা এবং মুরলা আবার সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বপদমথিত-গুল্মের এবং ঘাসের চিহ্ন ধরিয়া বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনুসরণ করিতে করিতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরোজা প্রস্তর দেখিয়া বলিলেন, "বর্গী এই প্রস্তরের নীচে পলায়ন করে নাই তো?"

মুরলা : এত বড় প্রস্তর উত্তোলন করাই অসম্ভব।

ফিরোজা : তা তো বটেই। তবু এস, একবার ধরা যাক্ না কেন? লোকটা গেল কোথায়? এখান হতে হয় আসমানে উঠে গিয়েছে, না হয় জমিনে প্রবেশ করেছে। পাথরখানা গুরুভার নাও হতে পারে।

এই বলিয়া ফিরোজা এবং মুরলা পাথরখানির নীচে হাত দিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কি সাধ্য যে, পাথরখানিকে কিছুমাত্র নড়ায়। পাথরখানি একটুও নড়িল না।

মুরলা বলিল, "আপনার যেমন বুদ্ধি, তিনটা হাতী যে পাথর নড়াইতে পারিবে না, আপনি সেই পাথর উত্তোলন করিতে সাহস করেন। ইহা হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

ফিরোজা মুরলার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্দিকস্থ বৃক্ষাদি শ্যেনদৃষ্টিতে নিপুণভাবে দেখিতে লাগিলেন। একটি বৃক্ষের গোড়ায় সামান্য একটু খৈাড়ল দেখিলেন। খোড়লের মধ্যে দৃক্‌পাত করিয়া হাতালীর মতন কি যেন দেখিতে পাইলেন। সেই হাতালী ধরিয়া জোরে আকর্ষণ করা মাত্রই সেই প্রস্তরের এক প্রান্ত ক্রমশঃ উঁচু হইতে হইতে একেবারেই খাড়া হইয়া গেল। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া ফিরোজা এবং মুরলা আশ্চর্যান্বিত হইয়া নজীব-উদ্দৌলাকে আহ্বান করিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা আসিয়া দেখিলেন যে, প্রস্তরের নীচে সুড়ঙ্গ রাস্তা; সুড়ঙ্গ বেশ প্রশস্ত।

তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই পাতালপুরী হইতেছে দস্যুদিগের নিভৃত গৃহ। এখানে নিশ্চয়ই তাহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার আছে।

নজীব-উদ্দৌলা বলিলেন, "এই পাতালপুরীতে বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করতে হবে। কত দস্যু এখানে আছে, তা' অবগত হওয়া আবশ্যক। ভৈরবী মূর্তি পরিত্যাগ করি তোমাদিগকে মারাঠী সৈনিকবেশে সজ্জিত হওয়া আবশ্যক।"

ফিরোজা ও মুরলা উভয়েই তখন নিহত মারাঠী দস্যুদিগের বস্ত্র ও উষ্ণীষ সংগ্রহ করিয়া মারাঠী বর্গীর বেশেই সজ্জিত হইলেন। রাত্রিকালেই দস্যুদিগের গমনাগমনের সময় বিবেচনাপূর্বক তিনজনে পরামর্শ আঁটিয়া সেই বিরাট ঝোপের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় দেখিতে পাইলেন যে, একদল মারাঠী দস্যু টাকার তোড়া মস্তকে বহন করিয়া মশাল হস্তে গুহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দ্বাদশজনের মস্তকে টাকার তোড়া এবং তিনজনের মস্তকে অলঙ্কার-পত্রের পুঁটুলী বলিয়া বোধ হইল। সকলের হস্তেই উলঙ্গ তরবারি। দস্যুগণ বরাবর সরাসর সেই প্রস্তরের নিকটবর্তী হইয়া শিকল টানিয়া দ্বারোন্মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পরে প্রস্তরখানি আপনা আপনি আবার সুড়ঙ্গের মুখে চাপিয়া গেল।

নজীব-উদ্দৌলা, ফিরোজা বেগম এবং মুরলা সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই গুপ্ত পাতালপুরীতে মারাঠীদিগের বিশাল ধনভাণ্ডার সংস্থাপিত। এই ধনভাণ্ডার লুঠ করিতে পারিলে বিপুল যুদ্ধের আয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে এই পাতালপুরী অধিকার করিতে পারা যায়, তাহাই হইতেছে বিষম সমস্যা। এই বিপুল অর্থ কিরূপেই বা এখন হইতে দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহাও এক দুরূহ সমস্যা। দিল্লী এখান হইতে বহু দূরে। সমস্ত পথেই বর্গীদিগের আনাগোনা। মুসলমানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি! প্রকাশ্যে এই অর্থ লইয়া যাইবার সম্ভাবনা অসম্ভব।

গুপ্ত আক্রমণ হঠাৎ লুণ্ঠন করিয়া গুপ্তভাবে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এখন চুপ করিয়া এখান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। তাহারা এই গুপ্ত ভাণ্ডারের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে, কোনওরূপে দস্যুদের মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই ভীষণ ক্ষতিজনক। সুতরাং সকলে মিলিয়া নীরবে সেস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য উদ্যত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা এই গুপ্তস্থানের নকশা ও পথঘাটের নির্দেশ বিশেষরূপে লিখিয়া লইলেন এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া স্মরণযোগ্য করিয়া রাখিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা ফিরোজা বেগমকে বলিলেন, "এই গুপ্ত পাতালপুরীর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া আবশ্যক। আমার যার-পর-নাই কৌতূহলের উদ্রেক হচ্ছে। তৎপর অর্থের পরিমাণ এবং গুহাবাসী দস্যুদিগের সংখ্যা ভাল করে বিদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশে ফিরে এই গুপ্ত-গৃহ আক্রমণ করবার বিহিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।" এই বলিয়া সকলেই গাত্রোত্থানপূর্বক সন্তর্পণে অন্য দিকে রওয়ানা হইলেন।

মারাঠী সৈনিকের বেশ পরিধানপূর্বক তিনজন সেই গভীর অন্ধকারে সেই সরোবরতটে উপস্থিত হইয়া, ক্লান্তি বোধ করায় বিশ্রামলাভ মানসে সেই স্থানেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে দস্যুদিগের ঘোড়াগুলির মধ্য হইতে আরোহণের জন্য তিনটি উৎকৃষ্ট অশ্ব বাছিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া সকলেই বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরের পথে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে নজীব-উদ্দৌলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মারাঠী দস্যুদিগের অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভের আর কোনও উপায় নাই।" এই বলিয়া নজীব-উদ্দৌলা, ফিরোজা বেগমের অপহরণের কথা তুলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা যে সেনাপতি সদাশিব রাও-এর ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা উভয়েই বিশ্বাস করিলেন। ফিরোজা বলিলেন, "আমার অপহরণের পরে আর কি ঘটনা ঘটেছিল? আপনি তখন কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন?"

নজীব: আমি পূর্বেই আহত এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ি। চৈতন্য লাভের পরে বুঝতে পারলাম যে, দস্যুরা তোমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। সদাশিব রাও-এর ধোঁকাবাজী এবং ষড়যন্ত্রে প্রথমতঃ সকলেই এই লুণ্ঠন ভরতপুরের রাজা কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে বলে রটনা এবং সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ভরতপুর রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য বাদশাহ্ স্বয়ং মারাঠীদিগের সহায়তার জন্য অভিযানে উদ্যত হন। কিন্তু ভরতপুররাজ ছত্রসিংহ এই ঘটনার কথা অবগত হয়ে স্বকীয় দোষ স্খালনের জন্য বাদশাহকে এক বিনীত পত্র লিখে জানান যে, তিনি এই লুণ্ঠনের বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। তাঁর দ্বারা এইরূপ ঘৃণিত ও কলঙ্কজনক পাপকার্যের অনুষ্ঠান কদাপি সম্ভবপর নহে।

"তথাপি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে বহু সুদক্ষ গুপ্তচর লাগিয়েও ভরতপুরে তোমার কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সদাশিব রাও তথাপি ভরতপুর আক্রমণের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। সম্রাট তাঁর অনুরোধ ও উত্তেজনায় পড়ে ভরতপুরে অভিযান করেন। কিন্তু আমি ছদ্মবেশে তোমার অনুসন্ধানে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে সন্ন্যাসীর বেশে মারাঠী সৈনিকদিগের নিকট অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

"এক জনের কাছে সন্ধান পেলাম যে, তুমি সেতারায় আছ। হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে সেতারার দিকে রওয়ানা হলাম। একদিন একটি মন্দিরে প্রবাসী ছিলাম। স্বপ্নের ঘোরে রাত্রিতে "ইয়া আল্লাহ্" বলে ফেলি। এতেই আমাকে মুসলমান সন্দেহে গ্রেফতার করতঃ বিস্মিত করে বন্দী দেখতে পায়। বন্দী দেখে আমাকে

কঠোর নির্যাতন করতে থাকে। আমাকে মেরে ফেলবার জন্যই তাদের সংকল্প ছিল। কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ায় এবং সেনাপতি সদাশিব রাও আমার বন্ধু বলে দাবী করায় তারা সেতারা অভিমুখেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তোমরা আমাকে মুক্ত করেছ।"

ফিরোজা : তবে তো আপনি অপরিসীম কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। আর মিছামিছি ভরতপুরের রাজা, বাদশাহ্ ও মারাঠী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। সে বেচারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই নির্দোষকে রক্ষা করাই এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রধান ধর্ম। আমাদিগকে এখনই দিল্লীর অভিমুখে রওয়ানা হওয়া কর্তব্য।

নজীব-উদ্দৌলাও ইহাতে সম্মত হইলেন। অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে ফিরোজা বেগমও আপনার সম্বন্ধীয় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আল্লাহ্‌তালার প্রশংসা কীর্তন করিলেন।

অতঃপর নজীব-উদ্দৌলা, বেগম ও মুরলা অপরাহ্ণকালে এক রমণীয় নির্ঝরতীরে উপনীত হইলেন। এই স্থানের দৃশ্য যার-পর-নাই রমণীয় ছিল। বৃক্ষাবলীর হরিৎকান্তি, দূর্বাদলের শ্যামলচ্ছটা, পুষ্পভারাবনত ললিত লতিকাকুলের নধর শোভা, কুসুমসৌরভবাহী সমীরণের মৃদুমন্দ সঞ্চারণ, বিহগাবলীর মধুর কূজন, নির্ঝরবারির কুলু-কুলু নিঃস্বন, মৃগশিশুদিগের ধাবন ও কূর্দন, ময়ূর-ময়ূরীর মোহন নর্তন তাঁহাদিগের চিত্ত ভাবাকুল করিয়া তুলিল! নির্ঝরতীরস্থ একটি রমণীয় বিরাট তমালতলে সকলে উপবেশন করিলেন। মুরলা অশ্বগুলি বৃক্ষে বাঁধিয়া ফল আহরণের জন্য বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

বেগম ও নজীব নির্ঝরতীরে বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। শীতল বাতাসে দুই জনে বড় আরাম বোধ করিলেন। বায়ু প্রবাহে তমাল-অবলম্বিনী মালতী লতা হইতে ফুল ঝরিয়া ঝুরঝুর করিয়া তাঁহাদের মাথার উপর পড়িতে লাগিল। কোকিল-দম্পতি তাঁহাদেরই সমুখস্থ একটি গাছের ডালে বসিয়া ডাকিতে লাগিল। মাথার উপরে পুষ্পগুচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমর গুঞ্জন করিতে লাগিল! চতুর্পার্শ্বে নানা বর্ণের বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির দল উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহার করিতেছিল! পদতলে নির্ঝরজলে মৎস্যগুলি দলে দলে বিচরণ করিতেছিল। অদূরে পাপিয়া পিউ পিউ তানে আকাশের গায়ে লহর তুলিয়া ভাবুকের প্রাণে ভাব জাগাইয়া, প্রেমিকের মনে প্রেমস্রোত বহাইয়া ছুটিতেছিল। চতুর্দিকের এই মোহিনী শোভা, ফুলরাণীর এই ফুল্লবিভা, দম্পতীর মনে প্রেমের আভা জ্বালাইয়া দিল। এমন সময়ে স্রোতের তীরস্থ একটি পাষাণখণ্ডের উপর কপোতমিথুন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া উপবেশন করিল। তাহারা নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া প্রেম-সোহাগে নব অনুরাগে ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

কপোত-কপোতীর এই প্রেমের সোহাগে, নজীব-উদ্দৌলা ও বেগমের মন, প্রেমের উত্তেজনায় আকুল ও অধীর হইয়া উঠিল। নজীব-উদ্দৌলা বাহুবেষ্টনে

বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া অধরসুধা পানে উদ্যত হইলে, বেগম চমকিত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর নজীব-উদ্দৌলার পদস্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিন্! দাসীর অপরাধ মার্জনা হউক, তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রেম-দেবতা। তোমার সেবাই আমার পরম ধর্ম। তোমার বাসনা পূরণই আমার একমাত্র প্রেম-ধর্ম। তোমার প্রেমামৃত পানের আশায় এ হৃদয় সাহারার ন্যায় দগ্ধ হচ্ছে। প্রেম-জোয়ারের প্রবল তরঙ্গে আমার হৃদয়তট চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু মিলনের জন্য তীব্র আকর্ষণ করছে! ভোগের বাসনা লালসার কামনায় আমাকে উন্মত্ত করে রাখছে! প্রাণের মর্মে সহস্র ধারায় মিলনতরঙ্গ ভুজ তুমুল হয়ে উঠছে। নারী আমি—এই অনিবার্য শারীর ও হৃদয়ধর্মকে কি কঠিন ও কঠোর সাধনায় অবরুদ্ধ করবার চেষ্টা করছি, তা একবার চিন্তা করে দেখ।

"প্রিয়তম! হৃদয়বল্লভ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন পর্যন্ত মারাঠীদিগের কবলগ্রাস হতে স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের রাজমুকুট ও সিংহাসন রক্ষা করতে না পারছি—যতদিন আবার ইস্লামের গৌরবচ্ছটায় মারাঠী দস্যুর অত্যাচার দূরীভূত করতে না পারছি—যতদিন দিল্লীর বাদশাহী প্রভুত্বকে সার্বভৌম ও একচ্ছত্র না করতে পারছি—যতদিন ভারতীয় প্রজাবৃন্দের ধন-জন ও মান-সম্মানকে সংরক্ষিত করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত যৌবন ও জীবনকে সর্বপ্রকারের ভোগবিলাস এবং দাম্পত্য জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রেমামৃত পান হতে বঞ্চিত রাখব।

"স্বামিন্! যে নারীর লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নী কাফেরের অত্যাচার-অবিচারে ও দাসত্বচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, সে নারী সচ্ছন্দচিত্তে কেমন করে স্বামী-সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করবে?

"স্বামিন! আমি নারী, তুমি আমার সর্বতোভাবে বরণীয় ও পূজনীয়! কিন্তু প্রাণবল্লভ! মারাঠী কাফেরের নৃশংস ও পৈশাচিক অত্যাচারে প্রাণের পর্দায় পর্দায় যে তীব্র ভীষণ অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত হচ্ছে, তাতে আমি স্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ ও প্রয়োজন হলে আত্মবিয়োগের জন্যই উন্মত্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমি প্রাণ খুলে আকুল আবেগে তোমার সম্মতি ও উৎসাহ পাবার জন্য গভীর আশা পোষণ করছি। বল প্রাণেশ্বর! তা'তে আমার দোষ নিবে না? আমাকে সদ্যুক্তি প্রদান করে কঠোর ব্রত-চারিণী হবার জন্য প্রস্তুত করবে।"

নজীব : তোমার প্রাণ অতি উদার! তোমার তেজঃ অপরিসীম। তোমার লোকহিতৈষণা, স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম নিতান্তই প্রশংসনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তুমি সামান্য স্ত্রীলোক হয়ে বিপুল শক্তিশালী দুর্বৃত্ত মারাঠী দস্যুদিগকে কিরূপে দমন করতে সমর্থ হবে? ভারতীয় মোস্‌লেম নৃপতিবৃন্দ এখনও একতাভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মারাঠী দমনে অগ্রসর হলে, মারাঠীদিগকে সমূলে নির্মূল করা যায়। কিন্তু হায়! তারা নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ হয়ে সেদিকে কেউই ভ্রূক্ষেপ

করছে না? তারা বরং পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট সাধনে রত হয়ে ক্রমশঃ আপনাদিগকে দুর্বল ও মারাঠীদিগকে প্রবল করছে' যে জাতির রাজা ও রাজপুরুষগণের এতাদৃশ দুর্দশা ও অব , তাদের আর কল্যাণ কোথায়?

"প্রাণেশ্বরি! মারাঠা দস্যুগণ যেদিন হতে দিল্লী আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছে, সে দিন হতেই অন্তঃকরণে যে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হয়েছে, তার দুর্বার দহনে আমি নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছি। নানাস্থানে গুপ্তচর ও বিশেষ ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করেও মুসলমান নবাবদিগকে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারলাম না। দিল্লীর বাদশাহের সহিত এখনও যদি বাংলা, অযোধ্যা, কর্ণাটের নবাব এবং সিন্ধুর আমীর, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের সোলতান যোগ দেন, তবে মারাঠীদিগকে আমরা অনায়াসেই উৎসাদিত করে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শান্তি ও ধর্মের রাজ্য স্থাপন করতে পারি। কিন্তু হায়! এই সমস্ত স্বার্থপর নবাবগণের অন্তঃকরণে স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা কিছুই নাই! এই মহা পাপেই এই সমস্ত হতভাগ্যগণের রাজত্ব অচিরেই বিনষ্ট এবং বংশধরগণ সত্বরই নির্বংশ বা নীচাশয় নরাধমে পরিণত হবে। এই রাজরাজড়াগণকে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহিত করতে না পারলে, আমাদের দ্বারা কোনও কার্যই সাধিত হবে না।

"প্রাণেশ্বরি! মারাঠীগণ যে-দিন হতে তোমাকে হরণ করেছে, সেই দিন হতে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য আমি আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি যে, মারাঠী-রক্তে ভারতভূমিকে ধৌত করতে হবে। আমি নিজে আবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব। স্বজাতির প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব প্রাধান্যের হ্রাস দেখে যার প্রাণে দুঃখের সঞ্চার না হয়, সে মহাপাষণ্ড, মালাউন। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান!
হউক বিভব তার সম সিন্ধুজল
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল!
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে।
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন রে রোত্তম!
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তাবকগণ স্তব সঙ্কীর্তন!
কিন্তু সে সাধেনি কভু জন্মভূমি-হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ;
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর!

বৃথা রে জনম তার বৃথা রে জীবন,
অতি অপদার্থ সেই অভাগা অধম।
মারিবারে দাও তারে কীটের মতন
করিও না কোন রূপ বিলাপ ক্রন্দন।
ভ্রমেও তাহারে কেহ করো না সম্মান,
অস্পৃশ্য কুক্কুর সম কর তারে জ্ঞান।
শত কল্প হোক তার জাহান্নামে বাস,
লুপ্ত হক ধরা হতে নাম বংশ বাস।

বেগম! তোমার সঞ্জীবনী বাণী ও কঠোর পণ দেখে প্রাণে গভীর আনন্দ ও ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। তোমা হেন তেজস্বিনী রমণীরত্ন লাভে আজি হৃদয়ে যে তেজঃ ও গর্ব বোধ করছি, তার তুলনা নাই। রহিম রহমান আল্লাহ্‌তা'লা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আদেশ ও অনুরোধ করছি। সিদ্ধিপথে কাঠিন্য ও বাধা দেখে ভীত হলে চলবে না। গভীর ও কঠোর সাধনা এবং চেষ্টার বলে সমস্ত কঠিনতাকে তরল এবং বাধা-বিঘ্নকে চূর্ণ করতে হবে। প্রাণের আগুন খুব বেশী চাই। তাহলেই সাধনা চরম ও পরম হবে। উপযুক্ত সাধনা হলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

বেগম ঃ এক্ষণে উপায় নির্ধারণ এবং কার্যপ্রণালী ঠিক করাই হচ্ছে আসল কথা। পথ দেখাতে পারলেই লোকও ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। আমার মতে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রাজানবাবদিগের আশা ত্যাগ করে অত্যাচারিত যারা—উৎপীড়িত যারা, তাদিগকেই প্রতিহিংসাপরায়ণ করতে হবে। তার জন্য শত শত সহস্র সহস্র লোক চাই। আমাদের আলেমগণ এ কার্যে লিপ্ত হলে অতি সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সর্দারগণের প্রবল সহানুভূতি চাই। গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে মারাঠীদিগের বিরুদ্ধে একযোগে অভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। তার পর সর্বপ্রধান কথা হচ্ছে—নেতা। এমন নেতা চাই, যাঁর নেতৃত্বের নাম শুনলেই উৎসাহে প্রা নেচে উঠবে। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের কোনও রাজা নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় রাজ্যাধিপতিগণ বা জনসাধারণ কদাপি অভ্যুত্থান করবে না। বিলাসব্যসনে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ইসলামী হিম্মৎ ও কুওৎ একেবারে হারিয়ে বসেছেন। আর সবচেয়ে সঙ্কটের কথা এই যে, তারা কেউ কাকেও মানতেও চায় না। সকলেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় বলে মনে করেন। বাদশাহ্‌ নিজে শক্তিশূন্য এবং মারাঠীদিগের হাত-ধরা।

নজীব ঃ তবে তুমি কি করতে চাও?

বেগম : ভারতের বাহির হতে কোন স্বাধীন নরপতিকে আহ্বান করে আনতে হবে—নতুবা ভারতীয় মুসলমানদিগকে কিছুতেই জেহাদের পবিত্র পতাকার নীচে সমবেত করা সম্ভব হবে না।

নজীব : কাকে আনতে চাও? আহমদ শাহ্ আবদালীকে বুঝি?

বেগম : নিশ্চয়ই। তাছাড়া উপযুক্ত আর কাকেও তো দেখি না। তাঁর ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বীর নরপতি ব্যতীত, এই মহাসমরের এবং মহা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব আর কেউ নিতে পারবে না।

নজীব : নির্বাচনটি মনের মতই হয়েছে—এখন এই দুঃসাহসিক সমরে তাঁকে টেনে আনতে পারলে হয়।

বেগম : তার ভার আমার হস্তে। আমি তাঁকে যেরূপেই হোক সম্মত করাব। সে দৌত্য-কার্যে আমি নিযুক্ত হব।

নজীব : বটে! এমন দূতী না হলে চলবে কেন?

বেগম : দূতীরূপে যাব না, দূতরূপেই যাব। যদি দূতের বেশে না হয়, তবে দূতীরূপে—ভয়ঙ্করীরূপেই প্রকট হব।

নজীব : ধন্য তোমার সাহস! তোমার কবিত্ব, বাগ্মীতা ও তেজস্বিতা দ্বারা আবদালী শাহ্‌কে অভিভূত করতে সমর্থ হও, এই প্রার্থনা করি। তোমার প্রাণে বীরবর রোস্তম ও খালেদের তেজের আবির্ভাব হোক। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বেগম : না, তার দরকার নাই। আপনি দেশে থেকে দেশীয় রাজন্য এবং সর্দারবৃন্দকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত ও প্রস্তুত করতে থাকুন। অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

নজীব : আফগানিস্তানে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে! অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বেগম : ঘটুক। ঘটবার জন্যই তো এ ব্রত অবলম্বন করেছি। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

নজীব : ধন্য তোমার সাহস ও সহিষ্ণুতা।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে তিন জনে সতর্ক ও সন্তর্পণে পথে অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ ভরতপুরের রাজা ছত্রসিংহ কেল্লার সমস্ত সৈন্য লইয়া চরম বিক্রমে শেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মারাঠী এবং দিল্লীপতির মুসলমান সৈন্যের প্রতাপ ও প্রভাবে বহু সংখ্যক জাঠসৈন্য নিহত হইলেও জাঠদিগের

সৈন্যবল খুব বেশী পারমাণে হ্রাস হইয়াছিল না।

রাজা ছত্রসিংহ একটি সমুন্নত তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেনাপতি রণধীর সিংহ এবং যুবরাজ হামীর সিংহ সহ বীরের ন্যায় অত্যুগ্র প্রতাপে মারাঠী-বাহিনীকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া তাদের ব্যূহ বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। জাঠগণ ভীষণভাবে বীর্য-প্রতাপ প্রকাশপূর্বক শত্রু নিধন করিয়া সমরক্ষেত্রে দেহপাত করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক মারাঠী সৈনিক জাঠদিগের অস্ত্রাঘাতে অকালে কালসাগরে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিল। মারাঠীগণ জাঠের কৃপের ও প্রচণ্ড বিক্রমে পর্যুদস্ত-প্রায় হইলে দিল্লীর শাহী সৈন্যদল প্রচণ্ড তেজে জাঠগণের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বীরবর সফদরজঙ্গ প্রকাণ্ডকায় তেজীয়ান তাজী অশ্বে সমারূঢ় হইয়া জাঠরাজ ছত্রসিংহকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল বলে জাঠদিগকে বিমর্দিত করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হামীর সিংহ আসিয়া সফদরজঙ্গের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সমরের সূচনা হইল।

হামীর সিংহ সফদরজঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত ভল্ল প্রক্ষেপ করিলে, বীরকুলর্ষভ সফদরজঙ্গ মুহূর্তমধ্যে তাহা লৌহঢালে উড়াইয়া দিয়া প্রসারিত করে ভীষণ তরবারি প্রহারে বামস্কন্ধ সাংঘাতিকরূপে বিক্ষত করিয়া দিলেন। হামীর সিংহ উৎকৃষ্ট লৌহবর্মে বিমণ্ডিত থাকিলেও তরবারি ভীষণ বেগ প্রভাবে লৌহ-বর্ম ভেদ করিয়া চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্কন্ধদেশে বসিয়া পড়িল। অবস্থা শোচনীয় বলিয়া হামির সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন।

হামীর সিংহের পশ্চাদাবর্তনে সফদরজঙ্গ সুবিধা পাইয়া একেবারেই বিপুল বিক্রমে যাইয়া ছত্রসিংহকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমে তরবারিতে তরবারিতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অতঃপর তরবারি ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেলে, প্রচণ্ড তেজে বর্শা লইয়া উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিলেন। বর্শাযুদ্ধ করিতে করিতে সফদরজঙ্গ বাম বাহুতে একটু আঘাত পাইয়া একান্ত উন্মত্ত ও নিতান্ত প্রচণ্ড হইয়া পড়িলেন। অমিতবিক্রম সিংহতেজা সফদরজঙ্গ ভীমবেগে ছত্রসিংহের উরস লক্ষ্য করিয়া এমনভাবে বর্শা প্রহার করিলেন যে, ছত্রসিংহের লৌহ ঢালের উপর লাগিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই বেগে ছত্রসিংহ ঘোড়ার একদিকে যেমন হেলিয়া গেলেন, অমনি সেদিকের রেকাব দোয়াল হইতে ছিঁড়িয়া ভূপতিত হওয়ায় ছত্রসিংহও সহসা ভূপতিত হইলেন।

বীরপুরুষ রাজা ছত্রসিংহের আকস্মিকভাবে এইরূপ ভূপতিত হওয়ায় মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিকস্থ জাঠসৈন্যদলের মধ্যে একটি অস্ফুট আর্তধ্বনি সমুত্থিত হইল। জাঠেরা সকলেই ভাবিল যে, এইবার মহাবীর সফদরজঙ্গের শাণিত তরবারি আঘাতে মুহূর্ত মধ্যে ছত্রসিংহের শির গ্রীবাচ্যুত হইবে। কিন্তু সকলেই বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মুসলিম সেনাপতি শত্রুকে তরবারি প্রহারের পরিবর্তে তাহার বাহু ধরিয়া ভূমি হইতে টানিয়া তুলিলেন! বীর সেনাপতি চীৎকার করিয়া

বলিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হচ্ছেন এবং আমাকে অগ্রে আঘাত না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার তরবারি মুক্ত থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকবে। অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ করা আর মৃত ব্যক্তিকে বধ করা সমান কথা। আমি মুসলমান। তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমা হতে বিপন্ন ব্যক্তির জন্য কোনও আতঙ্ক নাই। বিপন্নের প্রতি সদয় হওয়া মুসলমানের পরম ধর্ম!"

উজীরের এই মহানুভবতা দর্শনে জাঠগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাজা ছত্রসিংহ সত্বর ভূমি হইতে উঠিয়া আর একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্রুপরিপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "মহানুভব সেনাপতি! বড় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় যে, আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। হায়! যে দিল্লীর বাদশাহের শরণাগত থাকাই গৌরবের বিষয় বলে পুরুষানুক্রমে মনে করে আসছি, আজ সেই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"র সহিত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যে তরবারি দিল্লীর বাদশাহের সম্মানের জন্য দিল্লীর শত্রু বিনাশ করে চিরকাল পবিত্র হয়ে আসছিল, হায়! হায়! আজ সেই তরবারি দিল্লীপতির সৈন্য-রক্তে কলঙ্কিত হচ্ছে। এ অপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে? জানি না, কোন্ পাপের ফলে নিদারুণ লজ্জাকর বিড়ম্বনা ভোগ করতে হচ্ছে। বাদশাহ্ এবং আপনার কি নিদারুণ ভ্রম! মারাঠী দস্যুগণ বাদশাহের চরম অবমাননা করে এখন আবার মিত্ররূপে প্রকটিত হয়ে মহা সর্বনাশ সাধন করছে! নিদারুণ মোহে আপনারা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।"

সফদরজঙ্গ বলিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে বিলাপ করে ফল কি? নারী-হরণকারীকে মুসলমান কখনও ক্ষমা করতে পারে না।"

ছত্রসিংহ : উজীর সাহেব। মনে রাখবেন, নারী-হরণকারীকে জাঠও প্রাণের সহিত ঘৃণা করে। ছত্রসিংহ কখনও নারী-হরণকারী নহে। তাঁর বংশে এ-কলঙ্ক নাই। মারাঠীরাই এ কলঙ্কে কলঙ্কিত! তাদের ষড়যন্ত্রেই অকারণে আমাকে ফিরোজা বেগমের অপহারক বলে ধারণ করছেন।

উজীর : নির্দোষ হলে খোদা আপনাকে কোনও-না-কোনও রূপে এই বিপদ হতে মুক্ত করবেনই। এক্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ করা যাক!

এই বলিয়া সফদরজঙ্গ বিপুল বিক্রমে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ছত্রসিংহও চরম প্রতাপে উজীরকে তরবারি-যোগে আক্রমণ করিলেন। দুইজন বিখ্যাত বীর রণরঙ্গে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া ঘোরতর রূপে যুঝিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রচণ্ড ভুজবীর্য, সামরিক কৌশল ও অস্ত্র-চালনার নৈপুণ্য দেখিয়া উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দ পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল? ভারত-বিখ্যাত উভয় বীর-পুরুষের দ্বৈরথ যুদ্ধ যখন চরম প্রতাপে ও পরম বিক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আপাদমস্তক বর্মপরিহিত দুইজন সৈনিক পুরুষ

বিদ্যুৎগতিতে উভয়ের মধ্যে যাইয়া উচ্চ কণ্ঠে যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। একজন চীৎকার করিয়া মুখত্রাণ খুলিয়া বলিলেন, "আমি নজীবউদ্দৌলা, আপনারা বৃথা যুদ্ধ করবেন না। মহারাজ ছত্রসিংহ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ফিরোজা বেগমকে পাষণ্ড নরাধম সদাশিব রাওয়ের অনুচরগণই অপহরণ করেছিলেন। ফিরোজা বেগম স্বয়ং উপস্থিত।"

নজীব-উদ্দৌলার কথা শেষ হইতে না হইতে ফিরোজা বেগম মুখত্রাণ খুলিয়া পিতার পবিত্র পদাম্বুজ চুম্বন করিলেন। উজীর সফদরজঙ্গ কন্যার মুখাবলোকন করিয়া পরম উল্লাসবোধ করিলেন। আনন্দ ও অনুতাপের অশ্রুসিক্ত প্রেমপূর্ণ চক্ষু ও হৃদয় লইয়া ছত্রসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে সমগ্র জাঠ ও মুসলমান বাহিনীর মধ্যে এক মহা আনন্দ-কল্লোল পড়িয়া গেল। মারাঠীরা স্তম্ভিত এবং চিন্তিত হইয়া পড়িল। বাদশাহ্ শাহ্ আলম ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে মারাঠী সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। বীরকুলতিলক নজীব-উদ্দৌলা এবং বীরাঙ্গনা ফিরোজা বেগম প্রচণ্ড বিক্রমে মারাঠীদিগকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। শাহী তোপখানা এবং জাঠদিগের তোপখানার গোলান্দাজদিগের ক্ষিপ্রকারিতা-প্রভাবে মারাঠী-বাহিনী অচিরেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। নজীব-উদ্দৌলা ক্ষিপ্র আক্রমণ করিয়া মারাঠী সেনাপতি তুলাজী দেশপাণ্ডেকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। রোহিলা-সৈনিক ও বীরগণ দীর্ঘকালের সঞ্চিত জিঘাংসায় প্রদীপ্তপ্রায় হইয়া তীব্রতেজে মারাঠী সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ ছত্রসিংহ যে ফিরোজা বেগমকে হরণ করিয়াছেন, এ-সম্বন্ধে মুসলমানদিগের অনেকের মনেই গভীর সন্দেহ ছিল, সুতরাং এক্ষণে সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হওয়ায় মোসলেম ও জাঠ যোদ্ধৃবৃন্দ যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ ও তেজস্বীভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করায় মারাঠী-বাহিনী অচিরেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়নপর হইল।

নজীব-উদ্দৌলা, উজীর সফদরজঙ্গ এবং তাঁহার বীর্যবতী তনয়া ফিরোজা বেগমের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য এবং অস্ত্রকোবিদতা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। আক্ষেপ করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, মুসলমানকুলে এহেন পরাক্রমশালী শূর ও শূরী বিদ্যমান থাকিতেও, আজ শুধু নবাবদিগের ঔদাস্য ও স্বার্থপরতার জন্যই মারাঠিগণ দিন দিন অদীম-বিক্রম মুসলিম আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ, মলিন ও বিলীন করিতে সমর্থ হইতেছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। একে অমাবস্যা রাত্রি, তদুপরি আবার ঘোর ঘনঘটা! কৃষ্ণানদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গল; তবে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মধ্যে মধ্যে মেঘের ফাঁক দিয়া দুই একটি তারকা জ্বলজ্বল করিয়া কিরণ ছড়াইয়া অচিরেই আবার মেঘের স্তরে ঢাকিয়া যাইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, ঠিক যেন অধঃপতিত মুসলিম জাতির পুঞ্জীভূত মূর্খতা এবং দুর্দশার মধ্যে দু'একটি প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণপূর্বক কিয়দ্দিন প্রতিভার রশ্মি বিকীর্ণ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিরাট সমাজকে গভীর আঁধারে নিমজ্জিত করিতেছেন! অন্ধকারে কৃষ্ণা নদীর জল বহিয়া সাতখানি বৃহৎ নৌকা দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়াছে। নৌকাগুলি যাইয়া একটি বৃহৎ বনের আড়ালে নঙ্গর করিল।

নৌকা হইতে সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালাইয়া ২০ জন সশস্ত্র রোহিলা পাঠানসহ নজীব-উদ্দৌলা দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর যাইবার পরেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে পাঁচ জন মুসলমান সিপাহী পঁচিশটি তেজস্বী অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নজীব-উদ্দৌলা এবং তাঁহার সঙ্গী ২০ জন সৈনিক এবং উপস্থিত দণ্ডায়মান ৫ জন বীর পুরুষ বিদ্যুৎবেগে অশ্বারোহণ করিয়া নজীব-উদ্দৌলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গে একজন রাহাবর অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক ছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় এই অভিযানকারীর দল সেই গুপ্ত পাতালগৃহের মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নজীব-উদ্দৌলা পূর্বের ন্যায় বৃক্ষের গহ্বরস্থ হাতল ধরিয়া আকর্ষণ করিলে আমাদের পূর্বপরিচিত সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ড ধীরে ধীরে উত্থিত হওয়ায় তন্নিম্নে সুড়ঙ্গ-পথ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অমনি কর্পূরমিশ্রিত ৬টি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালাইয়া চতুর্দিক তীব্র আলোকে আলোকিত করা হইল। দুইটি মশালসহ ৫ জন প্রহরীকে সুড়ঙ্গমুখে রাখিয়া অবশিষ্ট ৪টি মশাল ও ২০ জন সৈনিক সহ নজীব-উদ্দৌলা শাণিত তরবারি হস্তে পাতালগৃহে অবতরণ করিলেন। ৪০টি ধাপ অতিক্রম করিবার পরে একটি প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রাঙ্গণের তিন পার্শ্বে সারি সারি একতল অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধরূপে নির্মিত। মশালের শোঁ শোঁ শব্দে তীব্র আলোকশিখা এবং সৈনিকদিগের পদশব্দে দস্যুগণ সহসা চমকিত এবং ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। নজীব-উদ্দৌলার ইঙ্গিতে সৈনিকগণ, দস্যুগণ অস্ত্রগ্রহণ করিবার পূর্বেই ৭ জনকে বন্দী করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট ৪ জন তরবারি লইয়া আক্রমণোদ্যত হইলে পাঠান বীরগণ তাহাদিগকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়া কয়েদ করিয়া ফেলিল।

দস্যুদিগকে কয়েদ করিবার পরে তাহাদের একজনের নিকট হইতে চাবির তাড়া লইয়া নজীব-উদ্দৌলা কয়েকটি ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। তিনটি গৃহে তোড়াবন্দী স্বর্ণমুদ্রার ৭০০ শত থলিয়া ছিল। অবশিষ্ট ৭টি ঘরে কেবল রজত মুদ্রা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত নানাবিধ মূল্যবান পদার্থ। একটি গৃহ হইতে দশ বাক্স মণিমুক্তা বাহির হইল। মণির ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত গৃহ অপূর্ব শোভায় শোভমান হইল। অবশিষ্ট পাঁচটি গৃহ নানা প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত তরবারি, ছুরি,

ধনুক, বল্লমের হাতাগী মণি-মুক্তাখচিত এবং স্বর্ণমণ্ডিত। কত দেশের কত রাজরাজড়া, নবাব নাজিম এবং সর্দার, জমিদার ও জায়গীরদারের হস্তের সখের অস্ত্র-শস্ত্রই যে জমা করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? একখানি বিরাট আকারের দর্পণ, তাহার চতুর্দিকে সোনার কাঠামে বৃহদাকারের মুক্তার লতা কাটা। দর্পণখানির মূল্য তিন লক্ষ টাকার কম নহে। রত্নখচিত একটি অলঙ্কারের মূল্যবান রমণীয় কৌটা। তাহাতে বৃহদাকারের মুক্তার কারুকার্য। কানাড়ার এক মুসলমান জায়গীরদারের নাম তাহাতে লেখা আছে। একটি হস্তীদন্তের বাক্স, হীরক কাটিয়া তাহার উপরে গোলাপের গুচ্ছ সাজান হইয়াছে। তাহাতে গুজরাটের বাহাদুর শাহের বেগম আবেদা বানুর নাম লেখা রহিয়াছে। পাতাল-গৃহটির সাজ-সজ্জাও অতি মনোরম! উপাসনার জন্য তাহাতে কৃষ্ণমর্মরের একটি ক্ষুদ্র মসজিদও আছে। সোলতান বোলবন শাহ্ তখ্ত ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন এখানেই ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ এই পাতালপুরীর উপরিস্থ ভূভাগে বন-জঙ্গল জন্মিয়া এই স্থানকে শ্বাপদসঙ্কুল এবং মানবের দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় এখানে দস্যুগণ তাহাদের গুপ্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করে। তৎপরে তাহারাও কালক্রমে নির্মূল হইয়া যায়। অতঃপর মারাঠীদিগের অভ্যুত্থানের সময় হতে পেশোয়াগণ এই স্থানকে গুপ্ত ধনাগারে পরিণত করে।

পাতালপুরীর সঞ্চিত গুপ্ত-ধনরাশি এবং মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিয়া নজীব-উদ্দৌলা বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে অশ্রুসিক্ত আঁখিতে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। যে অর্থাভাবের জন্য তিনি মারাঠীদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্যোগ আয়োজনে কুণ্ঠিত ছিলেন, অথচ কর্তব্যবুদ্ধির তীব্র উত্তেজনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিলেন, তাহার সুসার হইবে ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল এবং সাহসে সবল হইয়া উঠিলেন।

এই বিপুল মণি রত্ন এবং অর্থরাশি বহন করিয়া লইবার জন্য সঙ্গীদের মধ্যে ২০ জনকে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর নৌকা হইতে আরও ৩০ জনকে আনয়ন করিয়া টাকা ও মোহরের তোড়া, মণি-মুক্তার থলিয়া এবং আবলুস কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স পেটিকায় আবদ্ধ বহুমূল্য জড়োয়া গহনা সকল বহন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত রাত্রিতে অশ্বারোহী ২০ জন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কেবল মাত্র তিনবার স্বর্ণাদির তোড়া নৌকায় লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। অশ্বপৃষ্ঠে তিনবারে প্রায় ২০০ শত তোড়া স্বর্ণমুদ্রা বহন করিতে সমর্থ হইল। পদাতিক ৩০ জন সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কেবল মাত্র ১২০ তোড়া রৌপ্যমুদ্রা লইতে সক্ষম হইল। রাত্রি প্রভাতে ধন লুণ্ঠন ব্যাপার প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া, নজীব-উদ্দৌলা লুণ্ঠনে নিরস্ত হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত চৌকি দিতে লাগিলেন। দস্যুদিগের আগমনের রাস্তার নানা স্থানে বনের আড়ালে প্রহরী রক্ষা করিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার কিছু পরে—তরল অন্ধকার কিছু ঘনীভূত হইলে আবার ধন লুণ্ঠনব্যাপার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পাতালপুরীর সমস্ত ধনরত্নই নজীব-উদ্দৌলার লোকেরা কিশ্তীতে লইয়া গেল।

একজন তেজস্বী সৈনিক পুরুষ মারাঠী দস্যুগণকে প্রাণদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করায় তাদের খাজাঞ্চী বলিল যে, তাহাদিগের প্রাণদান করিলে সে আরও একটি অর্থভাণ্ডার, দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। অতঃপর তাহাদিগকে প্রাণদানের প্রতিশ্রুতি দিবার পরে তাহারা কক্ষের মেজের একখানি পাথর তুলিয়া ফেলিলে তন্নিম্নে একটি কক্ষ বাহির হইয়া পড়িল। সেই কক্ষে স্তূপীকৃত টাকা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। নজীব-উদ্দৌলা সাতখানি নৌকায় সাতজন প্রহরী রাখিয়া সমস্ত মাঝি-মাল্লা লইয়া সেই অর্থ নৌকায় বহন করিতে লাগিলেন। সর্বশুদ্ধ ৮৫ জন লোক অর্থ বহনে কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। নজীব-উদ্দৌলা গুহামুখে ৩ জন মাত্র অনুচরসহ চৌকিতে ব্যাপৃত থাকিলেন।

অদ্য দিবসেও অর্থলুণ্ঠন এবং বহনকার্য চলিতে লাগিল। বেলা যখন অর্ধপ্রহর তখন দেখা গেল যে, একদল মারাঠী সৈনিক সেই পাতালপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি টাকার তোড়াও দেখা গেল। দস্যুগণ সংখ্যায় ১৫ জন। দস্যুদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া নজীব-উদ্দৌলা দ্বার বন্ধ করিয়া বনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। দস্যুরা হাতল টানিয়া প্রস্তর উঠাইয়া গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এদিকে নজীব-উদ্দৌলা দ্বারের মুখে সঙ্গিত্রয় লইয়া তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। দস্যুগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ভিতরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া এবং গুহাস্থ বন্দী বন্ধুগণের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া শীঘ্রই তাহাদের অনুসন্ধানে উপরে আসিবে মনে করিয়াই নজীব-উদ্দৌলা সুড়ঙ্গ-মুখে কৃপাণপাণি হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে অর্থবহনকারী সৈনিকগণ ক্রমশঃ আসিয়া গুহামুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরে যখন দস্যুদের কেহই আর উপরে আসিল না, তখন অনর্থক অনুচিত বিলম্ব বিবেচনায় পাথর তুলিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশের চেষ্টায় হাতল ধরিয়া টান দিতেই লোহার ছিন্ন শিকল সহ হাতল বৃক্ষের গহ্বর হইতে একেবারেই খসিয়া পড়িল। নজীব-উদ্দৌলা বুঝিলেন যে, দস্যুরা দ্বার উত্তোলন করিবার কল হইতে শিকল কাটিয়া দিয়াছে। এক্ষণে বলপূর্বক এই গুরুভার প্রস্তরকে না সরাইলে ভিতরে প্রবেশ করিবার আর কোনও উপায় নাই।

মুসলমানগণ নিরুপায় হইয়া তখন বলপূর্বক সেই প্রস্তরখণ্ডকে ১৫ জনে ধরিয়া সুড়ঙ্গের মুখ হইতে তুলিয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সেই পাতালপুরীতে মুক্ত তরবারি-করে অবতরণ করিলেন। সকলেই ভাবিয়া ছিলেন যে, মারাঠিগণ সুড়ঙ্গে অবতরণমুখেই বাধা দিবে, কিন্তু তাহারা সেই গুপ্তপুরীর ভিতরে নামিয়া একটি লোকেরও নিদর্শন পাইলেন না। পূর্বে মারাঠিগণকে দৃঢ়রূপে হাত-পা বাঁধিয়া যে-ঘরে বন্ধ রাখা হইয়াছিল, সে ঘরে

যাইয়া সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল যে, বন্ধনরজ্জুগুলি কর্তিত হইয়া ওখায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু বন্দীদের কেহই নাই। সমস্ত ঘরগুলি বিশেষ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কিন্তু একটি প্রাণীরও চিহ্ন পাওয়া গেল না। হঠাৎ এতগুলি লোক কোথায় পলায়ন করিল, ইহা ভাবিয়া সকলেই চমকিত এবং বিস্মিত হইলেন! অনেকেই অনুমান করিলেন যে, দস্যুগণ এই পুরীতেই কোনও গুপ্ত-গৃহে লুক্কায়িত আছে; নতুবা বাহিরে যাইবার অন্য আর একটি পথ আছে।

নজীব-উদ্দৌলা বলিলেন, 'দস্যুগণ নিশ্চয়ই এখানে নাই, তারা অন্য পথ দিয়া অন্যত্র পলায়ন করেছে এবং সুবিধা থাকিলে সৈন্যদল লয়ে আমাদিগকে আক্রমণের চেষ্টায় আছে। আমাদিগের পক্ষে একটি সঙ্কটজনক অবস্থা সমুপস্থিত।' এই বলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই পাতালপুরীর সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোথাও কোনও গুপ্তপথ, ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ দেখা গেল না।

সকলেই বিস্মিত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। দস্যুদিগের খোঁজে অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া অবশিষ্ট অর্থ লুণ্ঠন করিয়া নৌকায় প্রত্যাগমন-পূর্বক স্থান পরিত্যাগ করাই ভাল বলিয়া সকলেই ঠিক করিলেন।

এমন সময় একটি জলের হাওজের গায়ে শৈবালের মধ্যে একটি লৌহবলয় পরিদৃষ্ট হইল। সেটি দেওয়ালের গায়েরই কড়া বলিয়া সকলেই দেখিয়াও না দেখার মত চলিয়া গেলেন। কিন্তু শমশেরজঙ্গ নামক একটি সৈনিক সহসা ঘুরিয়া আসিয়া ঐ কড়াটি টানিতে লাগিল। জোরে টান দেওয়া মাত্রেই কড়াটি শিকলসহ সরিয়া আসিতে লাগিল এবং সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন যে, হাওজের নীচের প্রস্তর-খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মধ্যে উঁচু হইয়া উঠায়, সমস্ত পানি দুই পার্শ্বের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল! অতঃপর আরও জোরে টানিতে টানিতে প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হইয়া একটি গহ্বরমুখ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি মশাল জ্বালাইয়া সেই সুড়ঙ্গপথে কয়েকজন লোকপুরুষ নামিয়া গেল।

সৈনিকগণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সানুদেশে উঠিয়া পড়িল। সেখানে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, দস্যুগণ সেই পথে নির্গত হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র লতা-গুল্ম সকল দলিত এবং মথিত হইয়া রহিয়াছে। নজীব-উদ্দৌলা দেখিলেন যে, এই সুড়ঙ্গপথে নৌকায় অর্থ বহন করিয়া লইয়া গেলে পথ খুব সংক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং এই পথেই তাড়াতাড়ি সমস্ত অর্থ বহন করিতে লাগিলেন।

কিছু রাত্রিতে অনেক প্রহরী আসিয়া নজীব-উদ্দৌলাকে খবর দিল যে, বহুসংখ্যক বর্গী দস্যু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নীরবে ধীরে ধীরে ওহার দিকে আগমন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যার বিপুলতার কথা শুনিয়াই নজীব-উদ্দৌলা বুঝিতে পারিলেন যে, দস্যুগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই সমাগত

হইতেছে। সুতরাং নজীব-উদ্দৌলা অতি ত্বরা পাতালপুরীর পথ খোলা রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থাদি লইয়া সুড়ঙ্গের নব প্রকাশিত পথ অবলম্বনে অতি সত্বর সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

সাতদিন পরে সেই বিরাট সপ্তডিঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উপনীত হইল। নজীব-উদ্দৌলা সমস্ত নৌকার টাকার উপরে রেশম বোঝাই করিয়া বন্দরে বন্দরে রেশম-নৌকা বলিয়াই পার হইয়া গেলেন। সমুদ্রের কূলে কূলে ধীরে সন্তর্পণে নৌকা চালাইয়া অনুকূল বায়ুভরে ১৫ দিবসেই গঙ্গার মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর গঙ্গা বাহিয়া বাঙ্গলার ভিতর দিয়া ২৯ দিনে নৌকা গঙ্গা এবং তৎপরে যমুনা বাহিয়া দিল্লীতে উপনীত হইল। নৌকা হইতে আটার বস্তার মধ্যে এক একটি করিয়া টাকার তোড়া লইয়া দিল্লীর বিশেষ একটি স্থানে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রাখা হইল। বিপুল অর্থ পাইয়া নজীব-উদ্দৌলা এবং সফদরজঙ্গ প্রাণপণে ভিতরে ভিতরে সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

মারাঠীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য দেশের প্রত্যেক পরগণা এবং থানায় একটি করিয়া গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল। লোক সংগ্রহ এবং সংগৃহীত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধের কায়দা-কানুন শিক্ষা দেওয়াই হইল ইহাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত-সূর্যের কনক কিরণরাগে কাবুলের চতুর্দিকস্থ গিরিশিখরসমূহ ঝক্-ঝক্ করিতেছে। কাবুলের রাজপথে নানাবিধ বিচিত্র পরিচ্ছদধারী অগণ্য লোকের যাতায়াত শুরু হইয়াছে। বিরাট দরবারগৃহের সম্মুখে নহবতে রওশন চৌকি বাজিতেছে। সম্মুখস্থ ময়দানে আহমদ শাহ্ দোররানীর জগদ্বিখ্যাত অপরাজেয় এবং অতুল কষ্টসহিষ্ণু নিমকোটি সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চলিতেছে।

সহসা গুড় ম করিয়া ভীষণ তোপধ্বনি হইল। অমনি জরীজড়োয়া উর্দী পরিহিত পঞ্চশত অতি সুন্দর সুশ্রী এক বয়সী সৈনিক পুরুষ একই বর্ণের পোশাক পরিহিত, এক বর্ণের একই আকৃতি বিশিষ্ট অশ্বে সমারূঢ় হইয়া, ঝটিকাবেগে সমস্ত রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া দরবার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, আবার দ্রুত-গতিতে ফিরিয়া যাইয়া বাদশাহ্‌কে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। বাদশাহ্ চৌঘোড়ার গাড়ীতে প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতি সহ উপবিষ্ট। অশ্ব চতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ এবং একই আকৃতিবিশিষ্ট। অশ্বের সাজ-সজ্জা এবং বল্গা সমস্তই সুবর্ণ-নির্মিত। বাদশাহ্ তুষারশুভ্র পোশাকে সজ্জিত। মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষে একখণ্ড শ্বেতহীরক সন্ধ্যাতারার ন্যায় জ্বল জ্বল্ করিয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে।

পাশ্বদেশে তরবারি সুবর্ণাপধানে সংবদ্ধ। অশ্বযান যাইয়া দরবার-গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

বাদশাহ্ দরবার-গৃহে প্রবেশ করিতেই সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে সালাম করিলেন। বেদিকায় উপরিস্থ সিংহাসনে যাইয়া বাদশাহ্ উপবেশন করিলেন। পাত্র-মিত্র সকলেই আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিলেন। অতঃপর গায়কগণ আসিয়া বাদশাহের গুণ-যশঃ ও জয়সূচক সঙ্গীত কীর্তন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সঙ্গীতশেষে সভা নীরব ও নিস্তব্ধ। অতঃপর দিল্লীর রাজদূতকে দরবারে হাজির হইবার জন্য প্রধান মীর মুন্সী ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত মাত্রে একটি উজ্জ্বলকান্তি মনোহরমূর্তি তেজস্বী যুবক বাদশাহের সিংহাসন-সম্মুখে আসিয়া তিনবার কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লিপির পেটিকাটি পেশ্‌কারের হস্তে অর্পণ করিলেন। পেশ্‌কার হস্তিদন্তনির্মিত মণিমুক্তাখচিত ক্ষুদ্র বাক্সটি খুলিয়া বাদশাহের হস্তে সুবর্ণপাত্রে লিখিত লিপিখানি প্রদান করিলেন। বাদশাহ্ উহা স্পর্শ এবং চুম্বন করিয়া প্রধান পাঠকের হস্তে প্রদান করিলেন। পাঠক-রত্ন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন।

। পত্র ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তালার নাম ও মহিমা জয়যুক্ত হউক। তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আশীর্বাদ প্রাপ্ত হউন। আল্লাহ্‌তা'লার আদিষ্ট ইসলামধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ হউক।

এই পত্র দিল্লীর বাদশাহ্ ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মের রক্ষক আলেমদিগের নিকট হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগের উদ্ধার-সংকল্পে প্রতাপান্বিত মহামান্য বাদশাহ্ (আফগান ও ইরানের অধিপতি) আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী দোর্‌রানী সাহেবের সমীপে সম্মান ও প্রীতি সহ প্রেরিত হইল।

হে মহানুভব ধর্মপ্রাণ বাদশাহ্! আমাদের সালাম এবং আন্তরিক প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আপনি মুসলমান, সেই জন্য আজ মুসলমানের বিপদ্ ও দুঃখে আপনাকে তীব্রভাবে স্মরণ করিতেছি এবং আপনার সাহায্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি।

ভারতীয় মুসলমানগণ, অসভ্য ও দস্যুপ্রকৃতি মারাঠীদিগের ভীষণ অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নির্যাতনে যার-পর-নাই প্রপীড়িত হইতেছেন। প্রতাপশালী দিল্লীপতির প্রতাপ খর্ব এবং ইসলামের তেজঃপ্রভাব ও সম্মান মলিন হইয়া পড়িয়াছে। বহুসংখ্যক মসজিদ ধ্বংসীকৃত ও শূকর-রক্তে অপবিত্র হইয়াছে। বহু মুসলমান রাজ্য মারাঠিদিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দিল্লী পর্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় সর্বধর্মাবলম্বী সর্ব জাতীয় প্রজার ঘরে ঘরে মারাঠীর অত্যাচারে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

নারী ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে ভারতের আকাশ মুখরিত হইতেছে! মারাঠীদিগকে দমন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে এমন কোনও নেতা ও বীরপুরুষ নাই যে, এই বিজাতীয় ও বিধর্মীর করাল কবল হইতে মুসলমানগণকে উদ্ধার করিতে পারেন। আমাদের রাজশক্তিসমূহ খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! আপনার বিজয়িনী পতাকার আকর্ষণ এবং শোণিতপিপাসু তরবারির তীক্ষ্ণতা ব্যতীত, তাহাদিগকে আর কেহ একত্র করিতে সমর্থ নহে হে মহাবাহু তেজস্বী বীর! আপনার তেজস্বী রণতুরঙ্গমের পাদস্পর্শে ভারতের ভূমি চিহ্নিত না হইলে মারাঠী জম্বুকগণ কদাপি তাহাদের গর্তে প্রত্যাবর্তন করিবে না। হে গাজী! আপনার তরবারির ঔজ্জ্বল্যের দামিনীদ্যুতি ব্যতীত মারাঠী পেঁচকদিগের চক্ষু ঝলসিত হইবে না। হে মহাপ্রাণ! আপনার সিংহ-হুঙ্কার ব্যতীত কদাপি মারাঠী-শৃগালের কোলাহল নিবারিত হইবে না। আপনার মহতী সেনা ব্যতীত ইসলামের মর্যাদা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। হে শাহানশাহ্! আমরা কায়মনোচিত্তে আপনার শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আপনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবা মাত্রই আমরা ভবদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী মূলে একত্র হইব। আপনার বাহুবলে ইসলামের সম্মান এবং মুসলমানের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসেই এই পত্র প্রেরিত হইল। ইতি।

বিনয়াবনত—

শাহ্ আলম (বাদশাহ্)
সফদরজঙ্গ (প্রধানমন্ত্রী)
নজীব-উদ্দৌলা (রোহিলা সর্দার)
আমিনর রহমান (শেখুল ইস্লাম)
মোহাম্মদ আলী হাসান (লক্ষ্ণৌ-এর প্রধান মওলানা)
শামসোজ্জমান (পাঞ্জাবের প্রধান মুফতী)
সর্দার মোহাম্মদ আলী খান (আগ্রার একজন বড় জমিদার)

এই পত্রে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রধান প্রধান বিখ্যাত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। পত্রপাঠান্তে সকলেই নীরব এবং নিস্তব্ধ। সভাস্থল নির্বাক নিষ্কম্প! সকলের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ!

আহ্মদ শাহ্ দোররানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য! ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলমান বিদ্যমান থাকতে আজ মারাঠিগণের অত্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠন নির্বিরোধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলমানেরা স্বদেশে থেকেই তার প্রতিকার করতে সমর্থ নহে। এ-অবস্থায় বিদেশ হতে যেয়ে আমি কি সাহায্য করতে সমর্থ হব? ভারতের একটি প্রদেশে যত লোকের বাস, আমার সমস্ত আফগানিস্তান এবং ইরানেও তত লোক নাই। আমি যুদ্ধে যুদ্ধে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; তদুপরি নিজ রাজ্যে নানা গোলযোগ। এ অবস্থায়

পেশোয়ার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভবপর?"

প্রধানমন্ত্রী : পেশোয়ার সঙ্গে হয় তো দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হবে। তা হলে বিস্তর কামান-বন্দুক ও সৈন্য চাই। এখন যা আছে তাতে কুলাবে না।

প্রধান সেনাপতি : মারাঠীদিগের ৪ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে অন্ততঃপক্ষে আমাদের ২ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষণে যে সৈন্যবল আছে, তন্মধ্য হতে খুব বেশী হলেও আমরা ৪০ হাজারের বেশী ভারতবর্ষে পাঠাতে পারব না। এ অবস্থায় ভারত উদ্ধারে অভিযান করা কদাপি সঙ্গত নহে।

যুবরাজ : ভারতবর্ষের জন্য আমরা কেন মাথা দিতে যাব? ভারতের মুসলমানেরা কি করে? যাদের ঘরে ডাকাত পড়েছে তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে, আর পাড়াপ্রতিবেশীকে ডাকাত তাড়াবার জন্য ডাকাডাকি! ব্যাপার তো মন্দ নয়! যারা নিজেদের স্বাধীনতা ও রাজত্ব রক্ষা করতে পারে না, তারা আবার কিরূপ মুসলমান?

বাদশাহ : মুসলমানের এমন অধঃপতন আর কখনও এবং কোথায়ও হয় নাই। এমন হতভাগ্য এবং হীনবীর্যদিগকে সাহায্য করতেও ঘৃণা হয়!

শেখুল ইসলাম : কি আশ্চর্য ব্যাপার! একেশ্বরবাদী মোমেনদিগের প্রতি ভূত-প্রেতের উপাসক চিরদাস ও চিরকাপুরুষ হিন্দুরা কেমন করে আধিপত্য লাভ করছে এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! কাফের যাদের উপর অত্যাচার করতে পারে, তারা কেমন মুসলমান?

দূত : হজরত মওলানা! আপনি যা ফরমালেন, তা যথার্থ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যারা অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর না হয়, তারাই বা কেমন মুসলমান?

শেখুল ইসলাম : ভারতীয় মুসলমানেরা যদি সংখ্যায় কম হত, তা হলে সাহায্য করা আবশ্যক হতো।

দূত : সংখ্যার শ্রেষ্ঠতাই তো শ্রেষ্ঠতা নহে, ক্ষমতার শ্রেষ্ঠতাই হচ্ছে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা। দুর্বলকে রক্ষা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।

শেখুল ইসলাম : মারহাবা! মারহাবা! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

বাদশাহ : (শেখুল ইসলামের প্রতি) তা হলে আপনি ভারতীয় মুসলমানদের উদ্ধার কল্পে অভিযান করাই সঙ্গত মনে করেন?

শেখ : শক্তিতে কুলালে নিশ্চয়ই।

উজির : তা হলে এক্ষণে নিজের শক্তির পরীক্ষা করে দেখাই কর্তব্য।

সেনাপতি : যুদ্ধক্ষেত্রে নাকি?

উজির : (সহাস্যে) না, না, নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখুন।

সেনাপতি : ভারত অভিযানে গেলে কেবল মাত্র আমার সেনাপতিত্বে চলবে না। আপনাকেও উজীরী ছেড়ে সেপাহীগিরি এখতেয়ার করতে হবে।

উজির : তাতে আপত্তি ছিল না, তবে বয়সটা আর বার্ধক্য ছেড়ে যৌবনে

ফিরবে না, এই যা দুঃখ!

সেনাপতি : অন্ততঃ পরামর্শ সভায় থাকলেও চলবে।

বাদশাহ্ : হে দূতপ্রবর! আপনার আনীত পত্র পাঠ করে ভারতীয় মুসলমানদিগের দুর্দশা ও দুর্গতির বিবরণ জানতে পেরে নিতান্ত দুঃখিত এবং মর্মাহত হলাম। আমার বৈদেশিক সংবাদ-বিভাগ হতেও এ সমস্ত কষ্টকর সংবাদ আমি পূর্বেই অবগত হয়েছি। পেশোয়ার শক্তি যখন অল্প ছিল, তখন তাকে দমন করা সহজ ছিল। এক্ষণে উপচিতবলসম্পন্ন মারাঠাশক্তিকে সমূলে উৎপাদিত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ খোরাসানের বিপ্লব লয়ে আমি যেরূপ বিব্রত আছি, এ সময়ে আমার পক্ষে ভারতে অভিযান করা কিছুতেই সম্ভবপর বলে বোধ করি না।

দূত : শাহানশাহ্! আপনার জয় ও মঙ্গল কামনা করি। আপনার কথা শুনে মনে বড় দুঃখ ও ক্লেশের সঞ্চার হচ্ছে। বিপন্নকে উদ্ধার করবার জন্য, স্বজাতির দুর্দশা ও দুর্গতি দূর করবার জন্য যদি আপনার সাহস ও শক্তি উদ্দীপিত এবং কর্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত না হয়, তা হলে আপনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে ব্যবসায়ীর গদিতে যেয়ে উপবেশন করুন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ পেলেই দগ্ধ করে থাকে, ব্যাঘ্র যেমন শিকার পেলেই আক্রমণ করে থাকে, জল যেমন নিম্নস্থান পেলেই চলতে থাকে, বীরপুরুষও তেমনি শত্রু পেলেই আক্রমণ করবেন।

"জাহাঁপনা! যথার্থ মোসলেম কখনও স্বজাতি স্বধর্মীয় ঘোরতর বিপদ্বার্তা শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারেন না। যথার্থ মুসলমান কখনও নিজের জন্য প্রাণ ধারণ করেন না। ইসলাম যেমন কোনও দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ নহে; মুসলমানের প্রেম ও উদারতা তেমনি কোনও দেশ বা জাতি বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ইসলামে কোনও পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল বা নদী-প্রান্তরের সীমা-সরহদের বাধা-বিঘ্ন বা গণ্ডী নাই। ভারতের মুসলমানগণ শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে আর্তনাদে গগন-পবন মুখরিত করবেন, আর আপনি এখানে নিষ্কণ্টকে নিরুপদ্রবে রাজ্যসুখ ভোগ করবেন, এ কখনও ঐসলামিক বিধিসঙ্গত নহে।

"ভারতে কোটি কোটি মুসলমান আপনার মুখ চেয়ে রয়েছেন, আর আপনি কিনা ভারত গমনে অবলা রমণীর ন্যায় ভীতি ও সঙ্কুচিত হচ্ছেন! আপনার হৃদয় এত সাহসহীন ও শক্তিশূন্য আমি কখনও এ ধারণা করি নাই। আমরা জানতাম, আফগানগণ বিজাতি বিধর্মীর সংস্রব ও সংসর্গহীনতা বশতঃ যথার্থ ইসলাম-তেজে সন্দীপ্ত রয়েছে। কিন্তু এক্ষণে দেখছি এরূপ ধারণা পোষণ করা অন্যায় হয়েছে।

"জাহাঁপনা! ভারতীয় মুসলমানগণ ভীরু বা কাপুরুষ নহে। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলে সমস্ত পৃথিবী জয় করতেও সমর্থ। কিন্তু তাঁদিগকে এক পতাকার নীচে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য একজন ক্ষমতাশালী নেতার প্রয়োজন মাত্র।"

বাদশাহ : দূতবর! আপনার কথা অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ। দূতের কথা এরূপ

হওয়া উচিত নহে।

দূত : শাহানশাহ্! সত্য কথা সর্বদাই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। আমি শুধু হুজুরে পরের কথা নিবেদনের জন্যই দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত হই নাই। আমি নিজেও আপনাকে ভারত-অভিযানের জন্য পরামর্শ দিতে ও আহ্বান করতে আগমন করেছি। আপনাকে বীরপুরুষ জানেই আপনার নিকটে বহু কষ্ট স্বীকার করে এসেছি। আপনাকে ভারতীয় মুসলমানদিগের রক্ষাকল্পে অগ্রসর হতেই হবে। আপনার কোনও অসুবিধা ও অভাব হবে না। আপনি নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবেন। শিখদিগের সঙ্গে যুদ্ধে শিখদিগকে যেমন তেজস্বী বলে বোধ করেছেন, মারাঠিগণ সেরূপ নহে। শিখেরা যোদ্ধা, আর মারাঠিগণ দস্যু। সম্মুখ-সমরে তারা চিরদিনই ভীত ও অনভিজ্ঞ। কিন্তু এবারে তাদিগকে সম্মুখযুদ্ধই করতে হবে। বেকায়দা লড়াই এবং লুট-তরাজে তারা কবলিত রাজ্য কখনও রক্ষা করতে পারবে না। আপনার তরবারি-ফলক বিজয়ের গৌরবে নিশ্চয়ই ঝলসিত হবে। আল্লাহ্ কাফেরদিগের উপরে নিশ্চয়ই আমাদিগকে জয়যুক্ত করবেন। আল্লাহ্ জালেম জাতকে কখনও উন্নত করেন না।* মুসলমান চিরকালই কাফেরদিগের উপর জয়লাভ করেছেন। জাঁহাপনা! মুহালিব, মোহাম্মদ বিন কাসেম, সোলতান মাহ্‌মুদ গজনবী, শাহাবউদ্দীন মোহাম্মদ গোরী, বাবর, নাদিরশাহ্ সকলেই ভারতবর্ষ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর আপনি ভারতীয় মুসলমানের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েও ভারতীয় পৌত্তলিকদিগকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবেন না? ভারতীয় রমণীগণও যে কার্য সম্ভবপর বলে মনে করেন, আপনি সেই কার্যকেই কঠিন বলে মনে করেন? রমণী অপেক্ষাও কি আপনার সাহস ও আশা দুর্বল?

বাদশাহ্ : দূতবর! আপনি বাক্যকুশল, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, সত্যের অপলাপ করা কদাপি কর্তব্য নহে। যেদেশে পুরুষগণ রাষ্ট্রনেতৃত্ব হতে বীরত্বের অভাবে দিন দিন স্খলিত হচ্ছে, তাদের রমণীবৃন্দের যুদ্ধস্পৃহা ও তেজস্বিতার কথা আকাশ-কুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দূত : জাহাঁপনা! আপনি যা বললেন, তা আপনার অনুমান মাত্র; কদাপি তা সত্য নহে। শাহানশাহ্! আপনি জেনে রাখুন যে, ভারত-অভিযানে সম্মত না হলে আপনাকে ভারতীয় রমণীর সহিত যুদ্ধ করে অব্যাহতি লাভ করতে হবে।

দূতপ্রবরের কথা শুনিয়া সভাস্থলে সকলেই বিদ্রূপসূচক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। হাস্যাবেগ প্রশমিত হইলে বাদশাহ্ বলিলেন, "দূতপ্রবর! যদি কখনও ভারত-রমণী আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, তা হলে আমি আমাকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। এমন বীরাঙ্গনার সমস্ত আদেশ মস্তক পেতে নেব। ভারতে যদি এমন তেজস্বিনী পুরী থাকেন, তবে ভারতের জন্য আফগানিস্তানের সমস্ত রক্ত ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হব না।"

* ইন্নাল্লাহা লা ইহ্‌দিয়াল কওমা জালিমীন— (মহা কোরআন)।

দূত : জাহাঁপনা! এ উপহাসের কথা, কিম্বা সত্যকার কথা?

বাদশাহ্ : আমি কখনও মিথ্যা বলি না।

দূত : জাহাঁপনা! আমিও কখনও মিথ্যা বলি না।

বাদশাহ : তবে ভারতবর্ষ হতে তেমন বীরাঙ্গনা নিয়ে আসুন।

দূত : নিয়ে আসবার আবশ্যক কি?

বাদশাহ্ : না নিয়ে আসলে ছাড়ব না, আনতেই হবে। আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর কাছে বৃথা দাম্ভিকতা দণ্ড না পেয়ে যায় না।

দূত : আপনার দাম্ভিকতা চূর্ণ না করে ছাড়ব না। প্রস্তুত হউন। আমি সেই ভারতরমণী, আমি পুরুষ নহি। প্রতিজ্ঞা করে এসেছি যে, যদি আপনাকে ভারত-অভিযানে সম্মত করাতে না পারি, তা হলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে হয় নিজে নিহত হব, না হয় আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করব। আমি উজীর সফদরজঙ্গের কন্যা ফিরোজা বেগম।—এই বলিয়া বেগম শাণিত তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া উর্ধ্বে উত্তোলন করিলেন।

সহসা সভাস্থলে বজ্রাঘাত হইলে অথবা সহসা দরবারগৃহে সূর্যোদয় হইলে লোকে যেমন বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইত, ফিরোজা বেগমের সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি এবং তেজঃপুঞ্জ কমনীয় অথচ তেজস্বিনী মূর্তি, চেহারায় দৃঢ়তা ও কঠোরতার স্পষ্ট প্রকাশ এবং তরবারি নিষ্কাশনে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

বাদশাহ্ লজ্জিত এবং সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "মা! তুমি ধন্য! তোমার জন্যে ভারতবর্ষ পবিত্র এবং তোমার পুণ্যপদরজে আফগানভূমি ধন্য হইল! যে দেশে এমন আদর্শ বীরাঙ্গনা জন্ম গ্রহণ করে, সেদেশের ললাটে দুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের জলদজাল বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে না। মা! আমি তোমার সম্মানের জন্যই ভারতে অচিরেই অভিযান করব।"

বাদশাহ্ এই বলিয়াই উজীর ও সেনাপতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা অচিরেই ভারত-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন করুন।"

অতঃপর বীরকুলকেশরী শাহানশাহ্ আহ্‌মদ শাহ্ প্রধান খাজে-সারাকে ডাকিয়া ফিরোজা বেগমকে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভুবনের অমরাবতী প্রাসাদমালিনী লক্ষ্ণৌ নগরী। অসংখ্য আলোকমালায় শারদীয় নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের ন্যায় রাজধানী একান্ত রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। উচ্চ উচ্চ বিরাট বপু সৌধ ও প্রাসাদাভ্যন্তরে হইতে নানা প্রকার সুমধুর রাগ

রাগিণী-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চন্দ্রোদয় হইতেছে। পূর্ব-গগনের নীলকান্ত মণির ন্যায় নির্মলভাবে চন্দ্রকলা নববধূ-সীমান্তে সুবর্ণ তিলকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কি বিচিত্র এবং মনোহর দৃশ্য! নিস্তব্ধ রজনীতে নির্মল আকাশে চন্দ্রকৌমুদীর বিকাশে দিগ্বলয় যেন স্মিত হাস্য করিতেছে। লক্ষ্ণৌ-এর নূরবাগ নামক বিরাট শাহী-বাগানে কত যে বিচিত্র জাতীয় পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া কবি-চিত্তসম্মোহিনী অপূর্ব শোভার বাজার খুলিয়াছে, কে তাহার বর্ণনা করিবে?

এই বিরাট উদ্যানের মধ্যে ভাস্কর কলার আদর্শস্বরূপ রমণীয় ও বিখ্যাত 'নূর মঞ্জিল' নামক প্রাসাদে নিভৃত দরবার বসিয়াছে। একপার্শ্বে নবাব সুজা-উদ্দৌলা, মন্ত্রী এবং সেনাপতি, অন্যপার্শ্বে নজীব-উদ্দৌলা এবং দোররানী সেনাপতি তাহের খান সমাসীন। অন্যদিকে চিকের আড়ালে বেগম এবং নবাব-মাতা আজাদীবানু বেগম সমাসীনা।

বিরাট কক্ষ নীরব ও নিস্তব্ধ। কেবল পুষ্পগন্ধবাহী সমীরণ প্রাসাদের মুক্ত কক্ষের ভিতর দিয়া ফুর ফুর করিয়া সূক্ষ্ম তঞ্জেবের পর্দা উড়াইয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

উজ্জ্বল আলোকরশ্মিপাতে প্রাসাদ-প্রাচীরের মণিমুক্তার কারুকার্যগুলি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাসাদের বিশাল কক্ষ নানা আকারের ঘটিকাযন্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মণিমুক্তাখচিত পুষ্পবৃক্ষে ও ফলবৃক্ষে যার-পর-নাই রমণীয়ভাবে সুকৌশলে সজ্জিত। পুষ্পে পুষ্পে হীরকখচিত কত চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি, মৌমাছি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী। মরি! মরি! কিবা মনোহর গঠনপ্রণালী! কি মনোহর ছাঁদ ও ভঙ্গিমা। সৌন্দর্যের সহিত কলাকৌশলের অপূর্ব সম্মিলন! দেখিলে সহসা স্বভাবসৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

কক্ষের সেই রমণীয় কৃত্রিম পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাপের উৎস উৎসারিত হওয়ায় দৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। চতুর্দিকে এইরূপ পুষ্পপুঞ্জের মঞ্জুল কুঞ্জ; মধ্যস্থলে বসিবার জন্য বিচিত্র কারুকার্যময় কুর্সি, সোফা ও তখ্ত! আলোকচ্ছটায় সমস্তই জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রথম দর্শনেই লক্ষ্ণৌর দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য ও ত্রিলোকমোহন বিলাসের জাঁকের প্রভাব স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি হয়।

এ হেন দরবারগৃহে সকলেই মৌনী। সকলেই কি যেন গভীর ও গুরুতর বিষয়ের ভাবনায় গুরুগম্ভীর ও ধীর।

সহসা নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া নবাব সুজা-উদ্দৌলা নজীব-উদ্দৌলার দিকে চাহিয়া বলিলেন : মেহেরবান ভ্রাতঃ! ব্যাপার বড়ই গুরুতর। আমি মারাঠাদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ আছি। এক্ষণে কেমন করে আহমদ শাহ্ আবদালীর পক্ষাবলম্বন করি। মারাঠিগণ মুসলমানের শত্রু, তা আমি স্বীকার করি; কিন্তু মারাঠিগণ আজ পর্যন্ত আমার রাজ্যে কোনও উৎপাত ও লুণ্ঠন করে নাই। তাদের

সহিত সন্ধি ভঙ্গ করলে তারা অতঃপর জাতক্রোধ হয়ে অমিত অগ্নিমুখে আমার রাজ্য ছারখার করবে। হায়! তখন কে আমাকে রক্ষা করবে?

নজীব : যাতে আর ছারখার করতে না পারে, বরং তাঁরাই ছারেখারে যায়, সেই জন্যই তো এই ভীষণ জেহাদের বন্দোবস্ত। সেই জন্যই তো এত সাধনা, সেধে দোররানী শাহ্‌কে হিন্দুস্তানে আনয়ন।

সুজা : তিনি যে বিপুল সৈন্যবল, অস্ত্র ও অর্থবলসম্পন্ন মারাঠীদিগকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবেন, তার নিশ্চয়তা কি? জয়ী হলে মারাঠীরা আরও বেপরওয়াভাবে মুসলমানদিগের প্রতি দস্তদারাজী শুরু করবে। তখন সে জুলুম ও অত্যাচারে একান্তই অসহনীয় এবং মারাত্মক হয়ে পড়বে। তখন কে রক্ষা করবে?

তাহের : নবাব বাহাদুর! আফগানের বলদৃপ্ত সশস্ত্র বাহু হতে মারাঠী দস্যু আর বাঁচতে পারে না। তাদের মত জালেম জাতি আর টিকতে পারে না। আহ্‌মদ শাহ্‌ তাদিগকে ধ্বংস না করে দেশে ফিরবেন না। আমরা ভারতীয় মুসলমান-শক্তির ভরসা অতি সামান্যই রাখি। তবে আপনি মুসলমান, এই জন্য আপনার পুণ্য সাধনোদ্দেশ্যেই এবং আপনার ভাবী মঙ্গলের জন্যই ইস্‌লামের এবং মুসলমানের হামদর্দ হবার জন্য মাত্র আপনাকে আহ্বান করছি। আপনার যদি মুসলমানের প্রাণ থাকে, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। নতুবা ইচ্ছা করলে আপনি মারাঠীদিগের সঙ্গেও যোগদান করতে পারেন। তাতে আমাদের কোনও ভয় বা দুঃখ নাই। তবে, যে ব্যক্তি কাফেরের সঙ্গে যোগদান করবে, তাকে কাফেরের মতই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে হবে!

সুজার স্ত্রী : সেনাপতে! আপনার কথা নিতান্তই কর্কশ! কর্কশ বাক্য দৌত্যগিরীর অনুকূল নহে।

নজীব : তা নিশ্চয়! কিন্তু পূর্বে অনেকবারই মধুবর্ষিণী রসনারও অনেক ব্যবহার হয়েছে। ইস্‌লামের প্রতি আপনাদের কোনও হামদর্দির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। নবাব বাহাদুর মারাঠীর ভয়ে নিত্য কম্পিত! এবার সেই কম্পন-ভীতি হতে রক্ষা করবার জন্যই সিংহবিক্রান্ত মহাবীর আহ্‌মদ শাহ্‌ দোররানীকে আহ্বান করা হয়েছে। তিনিও সমাগত। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ অবস্থাতেও নবাব বাহাদুর ভীত এবং সঙ্কুচিত হচ্ছেন! এই কি বীরত্ব এবং পুরুষকার! অযোধ্যার এমন পতন স্মরণ করতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

নবাব : ভুল! ভুল! মহাভুল! আমি যুদ্ধের নামে কম্পিত নহি। সকল কার্যেই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে যোগদান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ এহেন দারুণ সময়ে। এ সময়ে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটা তো বিচিত্র নয়। আহ্‌মদ শাহ্‌ বিজয়ী হলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যে স্বদেশে ফিরে যাবেন, এমন তো মনে হয় না। ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করবার জন্য তখন তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। সে চেষ্টার ভীষণ ঝটিকায় আমাদের স্বাধীনতার তরু কি সমূলে উৎপাটিত হবে না?

তাহের : নিশ্চয়ই না। আহ্‌মদ শাহ্ ভারত জয় করলেও, বন্ধুর রাজ্য কখনও অপহরণ করবেন না। কিন্তু আপনি যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ান, তা হলে আপনাকে তিনি সমূলে ধ্বংস না করে ছাড়বেন না। বীরপুরুষ বন্ধুর প্রতি যেমন দয়াশীল, শত্রুর প্রতি তেমন কঠোর-হস্ত।

নবাব : আহ্‌মদ শাহ্ মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরূপে মারাঠীদিগের ৪/৫ লক্ষ বল বিনাশে সমর্থ হবেন, তা বুঝতে পারছি না।

নজীব : আমরা যখন ভারত জয় করেছিলাম, তখন কত সৈন্য নিয়ে এসেছিলাম? কাফেরদিগের অপেক্ষা কোন্ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল? কিন্তু জয়লাভ করেছে কারা? সুতরাং, চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তনে কিসে ভয়? ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতিগত স্বার্থের মূলে বলিদান না দিলে কোন্ দিন কোন্ জাতি ত্রাণ পেয়েছে? ভারতের অন্যান্য নবাবগণ তো এ যুদ্ধে যোগ দিতে আপনার ন্যায় এরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই। তবে আপনারই বা এত দ্বিধা কেন?

নবাব-মাতা : বৎস সুজা-উদ্দৌলা? আর ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য—সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য সমর-সাগরে যথার্থ বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়াই কর্তব্য। অধর্মাচারী নৃশংস প্রকৃতি মারাঠী দস্যুগণকে নির্যাতন এবং নির্মূল করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তুমি অবিলম্বে রণসজ্জা করে দোররানী শাহের পতাকামূলে সমবেত হও। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, এই যুদ্ধে যোগদান করে স্বকীয় বাহুর দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় দিয়ে কালের পটে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর। বৎস! যুদ্ধই বীরপুরুষের একমাত্র কাম্য। সমর-স্পৃহায় তোমার প্রাণ নেচে উঠুক! শোণিত-তরঙ্গের বিশাল প্রবাহে তোমাদের নামর্দমীসূচক বিলাসব্যসন ভেসে যাক। বৎস! যে-বাহু শত্রুদলনে অক্ষম, সে বাহু রাজদণ্ড ধারণে উপযুক্ত এবং শোভন নহে।

বেগম : জাহাঁপনা! খাওন্দ! আমারও বলবতী ইচ্ছা যে, আপনি এই ভীষণ আহবে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আপনার তরবারি কাফের রক্তপাতে উষ্ণ ধরণীর তৃষ্ণাজ্বালা নিবারণ করুক। আপনার ভুজবিক্রমে মারাঠী দস্যুগণ বিপর্যস্ত এবং বিদলিত হোক। মারাঠি দস্যু দমনের গৌরব-আলোকে আপনার নাম উজ্জ্বল হোক। স্বামিন্! আমার ইচ্ছা যে, আমিও সমরক্ষেত্রে আপনার সঙ্গিনী হয়ে তৃপ্তি ও গৌরব অনুভব করি। কীর্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভের এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কখনও ঘটবে না। জাহাঁপনা! আপনি এই মুহূর্তেই সমরের বিপুল আয়োজনে লিপ্ত হোন। এ দাসী সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

সভাসীন সকলেই নবাব-মাতা এবং নবাব-বেগমের কথায় উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ-প্লুত কণ্ঠে 'মারহাবা!' 'মারহাবা!' বলিয়া উঠিলেন। নজীব-উদ্দৌলা বলিলেন, "আর আমার ভাবনা নাই। যে জাতির গৃহে এমন বীর্যবতী তেজস্বিনী রমণী এখনও বিরাজমানা, নিশ্চয়ই সে জাতির মৃত্যু নাই। অচিরে তারা জড়তার

আবরণ ভেদ করে ভারত-বক্ষে নবজীবনের সূচনা করবে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তাদের চরণতলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।"

সুজা : বেশ কথা। এর অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। আমি এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ প্রদান করছি। রাজকোষের জওয়াহেরাত বিক্রয় করবার আবশ্যক হলেও তা বিক্রয় করে যুদ্ধের ইন্তিজাম করতে হবে।

নবাব-মাতা : বৎস! আমার নিজের যে ১১ লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা আছে, তা আমি যুদ্ধের জন্য অর্পণ করলাম। জওয়াহেরাত বিক্রয় করবার কোনো আবশ্যক নাই।

বেগম : আমার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং সমস্ত জওয়াহেরাত সামরিক তহবিলে প্রদান করছি। অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করা হোক।

আবার সভাসীন বীর পুরুষদিগের মধ্যে 'ধন্য' 'ধন্য' এবং 'সাবাস' 'সাবাস' রব পড়িয়া গেল।

সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতেই অবিরাম তোপ গর্জন এবং বাদ্য-ধ্বনিসহ সমরোদ্‌যোগের আদেশ গভীর রবে ঘোষিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবোদিত সূর্যের হৈমকিরণচ্ছটা শাহ্-ডেরাস্থিত তাম্বুর চূড়ায় পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আহ্‌মদ শাহ্, দোররানীর বিশাল তাম্বুতে দরবার বসিয়াছে। দোর্দণ্ড প্রতাপ আহ্‌মদ শাহ্, তেজস্বী শাহ্ আলম, উজীর সফদরজঙ্গ, নবাব সুজা-উদ্দৌলা, মুলতানের সুলতান আসফ্‌জাহ্, রোহিলা সরদার নেয়ামতউল্লাহ্, সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ মির্জা নাসরজঙ্গ, ভাওয়ালপুরের নবাব রোকন উদ্দৌলা, আফগান সেনাপতি তাহের খান, আব্বাস মির্জা, মাহমুদ খান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ও নেতৃগণ এবং আরও বহু সংখ্যক আলেম ও পণ্ডিতগণ দরবারে সমাসীন। দরবার নীরব ও নিস্তব্ধ। এমন সময় আফগান-রাজকবি আহ্‌মদুল্লাহ খান দরবারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে সকলেই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে বিপুল সম্মান ও সংবর্ধনার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর সকলেই স্ব-স্ব আসন পরিগ্রহণ করিবার পরে দোররানী শাহ্ তাঁহাকে তৎ-রচিত সামরিক কবিতাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কবিবর আহ্‌মদুল্লাহ্ খান সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পারস্য ভাষায় রচিত উদ্দীপনাপূর্ণ এক অপূর্ব কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

আমরা বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম :

(১)

জাগ মুসলমান ত্যজি' ঘুমঘোর
নিশা অবসান হইয়াছে তোর
চৌদিকে জাগিছে জীবনের শোর
রহিও না আর শয়নে!

নয়ন মেলিয়া দেখ একবার
কি অধঃপতন হয়েছে তোমার!
সকলেই করে ঘৃণা তিরস্কার—
সকলেই দলে চরণে!

(২)

বিপুল প্রতাপে অতুল সম্ভ্রমে
সপ্তশত বর্ষ যে ভারত-ভূমে
ছিলে অধিষ্ঠিত রাজ-সিংহাসনে
অহো! তথা এই দুর্গতি!

ভুবন-বিজয়ী বীর মুসলমান
সিংহের সমান সদা দৃপ্তপ্রাণ!
সারা বিশ্বে যার অতুল সম্মান!
আজি তার আহা! এ হেন গতি!

(৩)

অসভ্য মারাঠী দস্যু দুরাচার
দাস যারা ছিল তোমা সবাকার
তারাই করিছে শত অত্যাচার
সহিছ সে সব নীরবে!

হারায়ে একতা জাতীয় বন্ধন
হারাইয়া হায়! বীর পরাক্রম
হারাইয়া হায়! স্বাধীনতা ধন
এ হেন দুর্দশা কার হয় ভবে!

(৪)

কোথা রে তোদের সেই পরাক্রম
কাঁপিত যাহাতে মহী সিন্ধু ব্যোম
কোথা রে তোদের সম্মান সম্ভ্রম
কোথা রে তোদের বীর্য নিরুপম
সকলই কি হায় হইল ছাই!

ভুলি' স্বাধীনতা স্বর্ণ-সিংহাসন
ভুলি' বীর-ধর্ম অপার্থিব ধন
ভুলি' শাহীতাজ চিররুচি ধন
কেমনে জীবন যাপিছ তাই!

(৫)

যে সকল জাতি বসি পদতলে.
আহরিল জ্ঞান মনোকুতূহলে
সেবিল চরণ ভক্তি-পুষ্পদলে,
তোমাদের কাছে সভ্যতা শিখিয়া
উঠেছে যাহারা গৌরবে মাতিয়া
দেখ তারা আজি মস্তক 'পরে।

হের তা'রা আজি কিবা সমুন্নত!
শাসিছে তোদেরে হরষে নিয়ত
বীর্য শৌর্য জ্ঞানে কিবা বিমণ্ডিত
কাঁপিছে অবনী বিক্রমভরে!

(৬)

কিন্তু হায়! তোরা আঁধারে পড়িয়া
বিপথে কুপথে চলেছ ছুটিয়া
জাতীয় উত্থান বিস্মৃত হইয়া
হীন স্বার্থ-পঙ্কে মরিছ ডুবিয়া
মরণের খাত কাটি' স্ব-করে!

প্রভুত্ব স্বামীত্ব সব হারাইয়া
অকূল পাথারে মরিছ ডুবিয়া!
মূর্খতা-কুহকে হয়ে জড়ীভূত!
নিজ দেশে আজি পর-বশীভূত!
দুরবস্থা হেরি প্রাণ বিদরে!

(৭)

যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,
বীর-দাপে যার ভুবন কাঁপিল,
জগৎ যাদের চরণে লুটিল
তারা হিন্দুস্তানে আজি হতমান!

যাও দিকে দিকে কর দরশন
আছে কত কীর্তি ধরণী-শোভন।
মীনার মসজিদ প্রাসাদ ভবন
দুর্গ গড়খাই সেতু উপবন
কত বিদ্যালয় কত শিল্পশালা
দীঘি সরোবর কত খাল নালা
হইয়াছে এবে ভগ্ন জীর্ণ ম্লান!

(৮)

জগতের তাজ সে তাজমহল
এখনো ছড়ায় কিরণ উজ্জ্বল
এখনো প্রকাশে মহিমা বিমল
এখনো কুতুব মস্তক তুলিয়া
নীলাকাশ-অঙ্গ আছে পরশিয়া
নীরবে গাহিয়া গৌরব গান।

কোথা গেল সেই আত্ম-অভিমান
কোথা গেল সেই বিপুল সম্মান
কোথা গেল সেই চরিত্র মহান
কোথা গেল সেই স্বজাতির টান।

(৯)

কোথায় তোদের বিজয়ী বাহিনী
কোথায় তোদের গৌরব-কাহিনী
সমাগত এবে আঁধার যামিনী
দেখি না গৌরব-আলোক-রেখা!

তরলাগ্নি-সম পাঠান-বীরত্ব
সহসা কি হায়! হইল বিলুপ্ত?
কোথা মোগলের প্রতাপ প্রচণ্ড?
কোথায় তাহার সভ্যতা-মার্তণ্ড?
কিছুই যে আর যায় না দেখা!

(১০)

কোথা দর্শনের তত্ত্ব-আলোচনা?
কোথা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গবেষণা?
চিকিৎসা-বিদ্যার কোথা সে সাধনা?
সকলি কি সেই অতীত গরভে?

কোথা হায়! সেই শিল্প-নিপুণতা
কোথা হায়! সেই সমর-দক্ষতা?
কোথা শক্রপাতে ঘোর প্রমত্ততা।
বাণিজ্য-গৌরব কোথায় এবে?

(১১)

ঐশ্বর্য সাম্রাজ্য বীরত্বের গর্ব
সকলি কি হায় হয়ে গেল খর্ব?
বিলুপ্ত কি হায়! ইস্‌লামের দর্প?
কোন্ সাধে তবে ধরিস্ জীবন!

তোদের গৌরব প্রশংসা-কাহিনী
ছেয়েছিল এই বিশাল অবনী,
তোরাই ছিলি রে জগতের মণি,
ছিল রে তোদের শিখি-সিংহাসন।

(১২)

সবাই তোদের পূজিত চরণ
সবাই করিত মহিমা কীর্তন!
ছিল আজ্ঞাবহ ভারত ভুবন
ব্যস্ত ছিল সবে তোদের কাজে।

কিন্তু এবে হায়! তোদের অখ্যাতি
কীর্তন করিছে সবে দিবা রাতি,
বিশাল জগতে ঘৃণা টিট্‌কারী
উথলি উঠিছে দিগন্ত ঠিকরি'!
ফাটে এ হৃদয় বিষম লাজে!

(১৩)

যে সকল জাতি ছিল রে গোলাম
তাদের কাছেও আজি হতমান,
ভূ-নত জানুতে অবনত শিরে
থাকিত যাহারা তোদের হুজুরে
তোরাই আজি রে তাহাদের দ্বারে
দাঁড়াইয়া দীন ভিখারী সাজে!

সহস্র লাঞ্ছনা অযুত গঞ্জনা
কত যে অবজ্ঞা কত যে পীড়না
দিতেছে এ প্রাণে বিষম বেদনা!
হৃদয় ফাটিছে বিষম লাজে!

(১৪)

কোন্ সাধে তবে — ধরিস জীবন!
নাহি কি তোদের — সরম সম্ভ্রম?
নাহি কি তোদের — বিন্দু উদ্বোধন?
নাহি কি তোদের — বিক্রম চেতন?
নাহি কি শিরায় — শোণিতের ধার?
নাহি কি রে ঘৃণা — ক্রোধ অহঙ্কার?
যদি থাকে তবে — জাগ একবার
জাগ সিংহ-সম নয়ন মেলে'।

সহে না সহে না — সহে না রে আর
এহেন ঘৃণিত — পরাজয়-ভার,
সহে না রে আর — হেন টিট্‌কার!
তপ্ত ঘৃত যেন দেয় রে ঢেলে'!

(১৫)

সিংহের ঔরসে — লভিয়া জনম
হয়েছিস্ হায়! — শৃগাল অধম!
মারাঠীর কাছে — বিনত বদন
ভাসে সদা আঁখি নয়ন-জলে।

কোথা রে তোদের — সে যশঃ-সৌরভ?
কোথা রে তোদের — সে ধন-বৈভব?
কোথা রে তোদের — ধর্মের গৌরব?
সকলি কি হায় গেল রসাতলে!

(১৬)

কোথা হায়! সেই — বিজ্ঞানের প্রভা?
কোথা হায়! সেই — বিজয়ের আভা?
কোথা হায়! সেই — মহিমার বিভা?
সকলি কি হায়? নিভিয়া গেল?

কোথা রে তোদের — সে বাণিজ্য-তরী?
কোথা চর্ম বর্ম? — কোথা তরবারি?
কোথা সিংহাসন? — কোথা সৌধ-সারি?
সকলি কি হায় মিটিয়া গেল?

(১৭)

কোথা রে তোদের দুশ্ছেদ্য একতা?
কোথা রে তোদের সাহস-শীলতা?
কোথা রে তোদের মহা জাতীয়তা,
কোথা রে তোদের অদম্য উৎসাহ?

কোথা রে তোদের রণ-উত্তেজনা?
কোথা রে তোদের উন্নত কামনা?
কোথা শত্রুজয়ে অদম্য বাসনা?
কোথা রে প্রখর তেজের প্রবাহ?

(১৮)

এ বিশ্বসংসারে বল কিসে, হায়!
তোদের মতন আপনা হারায়?
তোদের তুলনা বিশাল ধরায়
কিছুই তো নাহি করি দরশন!

হারায় কি অগ্নি দহন-শকতি?
হারায় বিক্রম কবে পশুপতি?
হারায় কি বিষ কভু বক্রগতি?
হারায় কি বজ্র গভীর গর্জ্জন?

(১৯)

জাগ তবে সবে জাগ একবার
গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
আলস্য জড়তা করি' পরিহার
বীরবেশে সবে সাজ আরবার,
ধর পাণিতলে অসি খরধার,
কর্ত্তব্য সাধনে ধাও রে সবে।

দেখুক জগৎ বিস্ময়ে চাহিয়া,
সুষুপ্ত মোস্‌লেম শয়ন ত্যজিয়া,
উঠিল যুগল নয়ন মেলিয়া,
রাখিল প্রাধান্য আবার ভবে।

(২০)

আবার ভারতে মুস্‌লিম পতাকা
উড়িবে গৌরবে অর্ধচন্দ্র আঁকা!

বহিবে পবন মধু-গন্ধ মাখা,
রোগ-শোক-তাপ কিছু না রবে।

জাগ তবে সবে বীর মুসলমান,
খোল তেজ-দীপ্ত ভীষণ কৃপাণ,
কাট শত্রুদলে করি' খান্ খান্,
ঘোষ জয়ধ্বনি পুনঃ ঘোর রবে।

(২১)

বীরত্বে হউক জগৎ কম্পিত,
হুঙ্কারে হউক দিগন্ত ধ্বনিত,
অনল-প্রতাপে অবনী শঙ্কিত,
তবে তো তোমরা সত্য মুসলমান।

এখনো তোমরা হইলে একত্র
উৎপাটিতে পার আকাশ-নক্ষত্র,
পার শাসিবারে ধরা একচ্ছত্র,
ফিরাইতে পার গত যশঃ মান।

(২২)

জাগ তবে বীর মুস্‌লিম সন্তান,
'আল্লাহ্ আকবর' রবে কাঁপাও বিমান,
ভারত উদ্ধারে সঁপি' আজি প্রাণ
শোণিত-তরঙ্গে হয়ে ভাসমান
পরো শিরে পুনঃ বাদশাহী তাজ।

মারাঠী-শোণিতে কলঙ্ক-কালিমা
বিধৌত করিয়া লও হে গরিমা,
প্রকাশ আবার ইসলাম মহিমা
স্থাপিয়া ভারতে মুস্‌লিম-রাজ।

এই জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ সামরিক কবিতা শ্রবণে সকলেই মহা উত্তেজনায় উত্তেজিত ও সাহস-শৌর্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। জ্বালাময়ী ভাষা, ভাব ও রচনানৈপুণ্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। আহ্‌মদ শাহ্ দোররানী তৎক্ষণাৎ এই অপূর্ব উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনার জন্য রাজকবি আহ্‌মদুল্লাহ্ খানকে এক লক্ষ টাকা এবং সুবর্ণনির্মিত একখানি তরবারি পুরস্কার প্রদান করিলেন। দিল্লীশ্বর শাহ্ আলম ২৫ হাজার, উজীর সফদরজঙ্গ ৫ হাজার, নবাব সুজা-উদ্দৌলা ২০

হাজার, রোহিলা সর্দার ৫ হাজার, এবং অন্যান্য সর্দার ও নবাবগণ দুই এক হাজার করিয়া টাকা উপহার প্রদান করিলেন। আহমদুল্লাহ্ খান সর্বশুদ্ধ দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন। আহমদুল্লাহ্ এই দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার সহিত নিজ হইতে আরো ৫ হাজার টাকা সম্মিলিত করিয়া একুনে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা সামরিক তহবিলে দান করিলেন। কবিপ্রবর আহমদুল্লাহ্ খানের এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং মহানুভবতায় চতুর্দিকে 'ধন্য' 'ধন্য' ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

মহাবীর আহমদ শাহ্ এই জাতীয় কবিতার ৫ লক্ষ কাপি নকল করিয়া ভারতময় সর্বত্র বিতরণ করিবার আদেশ দিলেন। ৭ শত কাতেব (কেরানী) এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া কাপি প্রস্তুত করিয়া মফস্বলের সর্বত্র পাঠাইয়া দিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হৈমাম্বুদ-কিরীটিনী পুষ্পকুন্তলা উষার মৃদু হাসি-রেখা পূর্বাকাশ-প্রান্তে সমুদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাণিপথ-প্রান্তরে ভীষণ শব্দে কামান গর্জন করিয়া উঠিল। মুস্‌লিম ও মারাঠা সৈনিকশ্রেণী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্যূহবিন্যাসপূর্বক বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। মুস্‌লিম সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সেই মহাপ্রান্তরেই ফজরের নামাজ সম্পন্ন করিয়া ঐক্যকণ্ঠে 'আল্লাহ্ আকবর' নিনাদে জল, স্থল, ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। তক্‌বীর ধ্বনিতে মুসলিম-ধমনীতে রক্তস্রোত তরতর্ করিয়া প্রবাহিত হইল। সামরিক উন্মাদনায় সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন।

আহমদ শাহ্ আবদালী, নজীব-উদ্দৌলা, উজীর সফদরজঙ্গ, মীর্জা নসিরজঙ্গ প্রভৃতি মুস্‌লিম পক্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান বীরপুরুষ বিশেষ কৌশল ও দৃঢ়তা সহকারে সৈন্য পরিচালনায় বদ্ধপরিকর হইলেন। তিন লক্ষাধিক সৈন্য এবং তিন শতের অধিক কামানের বিপক্ষে আহমদ শাহ্ মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য এবং ৬০টি কামান লইয়া দুর্জয়-বিক্রমে এবং অতুল-সাহসে সমর-তরঙ্গে ভাসমান হইলেন।

বিশ্বলোচন সবিতাদেব পূর্বাকাশে সমুদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়পক্ষ হইতে প্রলয়কালীন বজ্রের ন্যায় ভীষণ শেল সকল বর্ষিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বন্দুকের সাঁই সাঁই শব্দে ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উচ্ছ্বাস-তর্জন পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল! অশ্ব-গজ-সেনা পদভারে ধরণী কম্পিত এবং ধূলিরাশি চঞ্চল হইয়া দিগন্তল আবৃত করিল।

রবিকরজাল সম্পাতে সৈনিকদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সকল দামিনীবিকাশের ন্যায় দীপ্তিমান হইতে লাগিল। অশ্বারোহী মুস্‌লিম সেনার সংখ্যা অল্প থাকায় মারাঠী অশ্বারোহিগণ সদাশিব রাওয়ের নেতৃত্বে উত্তাল সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গের ন্যায়

তাহাদিগের গতি অবরুদ্ধপ্রায় করিয়া ফেলিল। কিন্তু এমন সময় মুসলিম গোলন্দাজদিগের অবাধ নিশানায় সদাশিব রাওয়ের পরিচালিত অশ্বারোহী সৈনিকবৃন্দ তরল পারদের ন্যায় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল! এ সময় একদল রোহিলা গাজী মুক্ত কৃপাণকরে সদাশিব রাওয়ের বিভ্রান্ত সাদীগণের উপরে সহসা আপতিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। ৫০ জন গাজী প্রায় ৮ শত মারাঠী সাদীকে নিপাত করিয়া নিজেরা মাত্র ১৫ জন শহীদ হন। ইহারা দীর্ঘ দু'ধারবিশিষ্ট তরবারি এমন বিদ্যুদ্বেগে ঘুরাইতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, বন্দুকের গুলী এবং তীর ইহাদের তরবারিতে প্রতিহত হইয়া ছিটকিয়া পড়িত। সদাশিব রাও হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণতেজা গাজীদিগের দুর্বিসহ পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা একদল বর্শাধারী সৈন্য লইয়া মারাঠী পদাতিকদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ভীষণভাবে যুদ্ধদান করায় যেন প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল। বর্শাধারী মুসলিম বীরগণ মারাঠী পদাতিকদিগকে বহুলভাবে হত্যা করিয়াও সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। নজীব-উদ্দৌলা এবং মহাদেব পাণ্ডের মধ্যে ভয়ানক দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বর্শাযুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের বর্শাই ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর তরবারি লইয়া মারাঠী ও মুসলিম বীরদ্বয় শৌর্যবীর্যের বিপুল পরিচয় প্রদান করিলেন।

ভীষণ তরবারি অনবরত লৌহ-ঢালে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হওয়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মহাদেব পাণ্ডে ক্রুদ্ধ মহিষের ন্যায় নিতান্ত উত্তেজিত এবং অধীর হইয়া নজীব-উদ্দৌলার স্কন্ধ-লক্ষ্যে অসি প্রহার করিলেন। কিন্তু বীরকুলোত্তম নজীব-উদ্দৌলা সুকৌশলে বিপুল শক্তিতে সে আঘাত ঢালে উড়াইয়া দিলেন। মহাদেব পাণ্ডের তরবারি প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল।

মারাঠী সেনাপতি তরবারিহীন হইয়া নিতান্ত পেরেশান হইয়া পড়িলেন, কারণ পাণ্ডের কাছে আর দ্বিতীয় তরবারি ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেরেশান দেখিয়া নজীব-উদ্দৌলা স্বকীয় অশ্বজিন-বদ্ধ আর একখানি তরবারি লইয়া পাণ্ডেকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "মারাঠী-বীর, ব্যস্ত হবেন না! অস্ত্রহীন শত্রুকে মুসলমান কখনও আক্রমণ করে না। আপনার যুদ্ধসাধ থাকলে আপনি এই তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন।"

শত্রুর মহানুভবতা দেখিয়া মহাদেব পাণ্ডে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন। কৃতজ্ঞতাজড়িত বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি ধন্য, আপনার ন্যায় বীর ও মহানুভব পুরুষ-প্রবরের সাথে যুদ্ধ করে জন্ম ও জীবন সার্থক হল। আর দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। নিজ নিজ সৈন্যবল নিয়ে যুদ্ধ করাই সঙ্গত। আপনি আমাকে মেহেরবানী করে আপনার অযোগ্য দোস্ত বলেই মনে রাখবেন। সুযোগ পেলে এ উদারতার কৃতজ্ঞতা দানে কুণ্ঠিত হব না।"

অতঃপর উভয়ে দ্বৈরথ সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কর্তব্যানুরোধে নিজ নিজ বাহিনীকে সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন। অপরাহ্নকালে উজীর সফদরজঙ্গ দিল্লীর বাহিনী লইয়া একদল মারাঠী-বাহিনী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহী বাহিনীর সৈন্যদল বিলক্ষণ প্রতাপ ও ভুজবীর্য প্রদর্শন করিলেও শত্রুদিগের বিশাল চমূর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মাত্র দশ হাজার রোহিলা সৈন্য লইয়া সত্তর হাজার মারাঠী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে মহাবীর সফদরজঙ্গ নিতান্ত বিপন্ন ও হয়রান হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বকীয় অসাধারণ পরাক্রম ও নৈপুণ্যবলে পঞ্চ সহস্র শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াও তাহাদিগের উন্মত্ত ও উদ্দাম আক্রমণ ক্ষুণ্ন করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। সহসা একদল মারাঠী অশ্বারোহী তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া মুষলধারায় বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বীরপুঙ্গব সফদরজঙ্গ দুই হাতে দুইখানি প্রচণ্ড তরবারি ঘুরাইয়া একা প্রায় আড়াই শত দুশ্‌মনকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তিনি নানাস্থানে আহত হইয়াও সিংহবিক্রমে লড়াই করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীন আরব যোদ্ধাগণের ন্যায় কোষ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মুক্ত তলোয়ার লইয়াই মাতোয়ারাভাবে যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক শহীদ হইলেন।

জাঠকুল-গৌরব রাজা ছত্রসিংহ উজীরকে বিপন্ন দেখিয়া সত্বর পাঁচ হাজার বিক্রান্ত জাঠ সৈন্যসহ আসিয়া শত্রুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে বিপুল মারাঠী-বল ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হইলেও, আবার বিপুল তেজে বহু সংখ্যক আসিয়া প্রতি-আক্রমণে দিল্লী এবং ভরতপুর বাহিনীকে পর্যুদস্ত-প্রায় করিয়া তুলিল। স্বয়ং মারাঠী সেনাপতি মহাপরাক্রান্ত সদাশিব রাও, রঘুজী ভোঁসলাকে লইয়া উজীরকে বেষ্টন করিবার জন্য বিষম প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ছত্রসিংহ বিষম যুদ্ধ করিয়া যার-পর-নাই আহত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সফদরজঙ্গ ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় প্রচণ্ড তেজে শেষ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের দুইখানি তরবারি এবং একটি বর্শা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তোফাঙ্গ (পিস্তল) চালাইয়া দুই জনকে বধ করিলেন। সেকালের গাদা পিস্তল আজকালের মত সুবিধাজনক ছিল না। দু'নালা তোফাঙ্গে মাত্র দুইটি গুলীই ছিল। গুলী দুইটি নিঃশেষ হইবার পরে একজন মারাঠী সৈন্যের তরবারি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করায় সদাশিব রাও শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বেগে আসিয়া উজীরকে তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, উজীর চরম শক্তিতে নির্ভর করিয়া সদাশিবের পেশানি (কপাল) লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িয়া মারিলেন। ভীমবলে নিক্ষিপ্ত পিস্তলের বিষম আঘাতে সদাশিবের কপাল কাটিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল।

সদাশিব ভূপতিত হইবামাত্রই রঘুজী ভোঁস্‌লা এক লম্ফে আসিয়া উজীরের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। সহস্রাধিক বলবান মারাঠী যোদ্ধা উজীরের উপর সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ভীমবলে পতিত হইয়া

তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। উজীর এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী সিপাহী প্রাণপণ ঝাপটা-ঝাপটি এবং ধস্তাধস্তি করিয়াও সাংঘাতিকরূপে আহত এবং বন্দী হইয়া পড়িলেন।

মারাঠীদলে তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু এমন সময়ে পুরীকুলশিরোমণি তেজস্বিনী বামা ফিরোজা বেগম প্রকাণ্ড আরব্য তাজীপৃষ্ঠে তীব্রবেগে শত সংখ্যক শত্রুসংহারিণী রোহিলা-ভামিনী সহ তীক্ষ্ণ অস্ত্র হস্তে রঘুজী ভোঁসলার সৈন্যদলের উপর শত বজ্রের ন্যায় আপতিত হইলেন। ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় দুর্বিষহ পরাক্রমে বামাদল শত্রুকুলকে আকুল ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। প্রচণ্ডতেজা মহাবাহু ফিরোজা বেগম ক্ষিপ্রবেগে বর্শা প্রহারে রঘুজী ভোঁসলাকে বন্য বরাহের ন্যায় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রঘুজী ভোঁসলাকে বিদ্ধ করিয়াই মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার শিরশ্ছেদন-পূর্বক বর্শাগ্রে গাঁথিয়া উঁচু করিয়া সকলকে প্রদর্শন করায়, মারাঠী সৈন্যগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। উজীর সফদরজঙ্গ শত্রু-হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। মারাঠী সৈন্যগণ বিচলিত হইবামাত্র অরিনিসূদনী মহিলাবৃন্দ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বহু সংখ্যক কাফেরকে মালেকুল্ মওতে'র হস্তে হাওলা করিলেন। বর্মচর্মমণ্ডিত এই কামিনীবাহিনীর উগ্র পরাক্রম ও শস্ত্রকোবিদতা সন্দর্শনে আহত সদাশিব দুঃখ ও ক্ষোভে ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। উন্মত্ত ও রুক্ষকণ্ঠে সৈন্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে নরাধম কাপুরুষগণ! আজ অল্প সংখ্যক রমণীদিগের সঙ্গে যুদ্ধেও তোরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলি! ধিক্! শত ধিক্ তোদের জন্ম ও জীবনে! রে ভীরুগণ! আজ বিজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাও তোরা হীনবীর্য এবং সাহসশূন্য! এই বর্মমণ্ডিত যোদ্ধৃগণের সকলেই মহিলা! সাহসপূর্বক তোরা ফিরে দাঁড়িয়ে এদের বন্দী করবার চেষ্টা কর! এরা পরমাসুন্দরী! যে যাকে বন্দী করবে, সেই তাকে পাবে। রমণীর সঙ্গেও যুদ্ধে আঁটতে না পারলে হতভাগাগণ সিন্ধু-সলিলে ডুবে মর্।"

সদাশিবের ভীষণ তর্জন-গর্জন এবং রোষে সকলেই ফিরিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর্যন্ত মারাঠিগণ বুঝিয়াছিল না যে, এই আগন্তুক বাহিনী রমণী। তাহারা ভাবিয়াছিল, ইহারা বিশেষ নির্বাচিত পুরুষ সৈনিক। তাই তাহারা বীরত্ব এবং কৌশল দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সদাশিবের কথায় যখন তাহারা সূক্ষ্মভাবে নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিয়া সত্যই বুঝিল যে, তাহারা রমণী, তখন তাহারা "হর হর মহাদেও" রবে বিকট চীৎকারে আকাশ কম্পিত করিয়া ভীষণভাবে মহিলাদিগের প্রতি রুখিয়া দাঁড়াইল। ফিরোজা বেগম আরও উত্তেজিত হইয়া রমণীবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগ্নীগণ! সকলে আল্লার নামে দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ কর। এই সমস্ত অস্পৃশ্য কাফেরদিগকে নিতান্ত হিংস্র এবং দুশমন জ্ঞানে প্রচণ্ড প্রহারে হত্যা কর। তোমাদের বাহুতে বাহুতে শক্তি,

মানসে মানসে সাহস, শিরায় শিরায় বীর্য প্রবাহিত হোক। কাফিরের সংখ্যাধিক্য দেখে কিছুমাত্র ভীত বা চঞ্চল হইও না। তোমরা পূর্বকালের আরব ও তুর্কী মহিলাদিগের ন্যায় শত্রুর প্রতি একান্ত প্রচণ্ড ও শক্তপ হয়ে আক্রমণ কর। শত্রুদলন করে তোমরা বিজয়পতাকা উড়িয়ে দাও! ভগ্নীগণ! মনে রেখো, আল্লাহ্‌তালা নিশ্চয়ই তোমাদের সহায় আছেন। তিনি ধৈর্যশীল এবং কষ্টসহিষ্ণুদিগকেই প্রেম করেন।"

ফিরোজা বেগমের সন্দীপনী বাণী শ্রবণে বামাবৃন্দ সকলেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীর্ঘ বল্লম প্রহারে শত্রু নিপাত করিতে লাগিলেন। পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় রমণীবৃন্দ একান্ত দৃঢ়তা-সহকারে শত্রুদিগকে সংহত করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ করিলেন। মহিলাদের ভীমতেজে শত্রুব্যূহ আবার বিদীর্ণ, বিশীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মুসলমানগণ 'আল্লাহ্ আকবর' নাদে গগন-পবন মুখরিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। রমণীদিগের ভাস্বর বল্লম এবং সৈনিকদিগের দীপ্ত তরবারি শত্রুসৈন্যরূপ জলদশ্রেণীতে বিদ্যুদ্বৎ বিভাসিত হইতে লাগিল।

মারাঠীদিগের বহুসংখ্যক তোপ থাকায় তাহারা এক্ষণে অজস্রভাবে ভীষণ শেলপুঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল।

অবিশ্রাম গোলা বর্ষণে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া গোলন্দাজ সেনাপতি শম্‌শের জঙ্গ 'জাহাঁকোষা' 'আফগান,' 'জবরদস্ত,' 'আলফাতেহ' প্রভৃতি নামধেয় নবনির্মিত বিরাট আয়তনবিশিষ্ট সাতটি তোপে আগুন দিলেন। এই কয়েকটি তোপ আহ্‌মদ শাহ্ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তোপ টানিতে একশত অশ্ব যোজিত হইত। জবরদস্তে ২০ মণ এবং আলফাতেহে ২৫ মণ বারুদ ঠাসা হইত। অন্যান্যগুলিতে ১৫ মণ করিয়া বারুদ লাগিত। ৫ হইতে ১০ মণ ওজনের গোলা ব্যবহৃত হইত। শম্‌শেরজঙ্গ এই সমস্ত নবনির্মিত তোপে আগুন দিলে, তাহার প্রলয়ঙ্কর শ্রবণবিদারী আওয়াজে যুদ্ধস্থল কম্পিত এবং যোদ্ধৃগণ চমকিত হইয়া উঠিল। মারাঠী তোপখানার উপর এই সমস্ত তোপের প্রকাণ্ডাকার ভয়াবহ শেল পড়ায় তাহাদের অনেক কামান ভগ্ন এবং কতকগুলির নল চেপ্টা হইয়া গেল।

পাঠান গোলন্দাজদিগের অব্যর্থ লক্ষ্যে মারাঠীদিগের বহু গোলন্দাজ সৈন্য তোপের মুখে উড়িয়া গেল। দ্বিপ্রহরের মধ্যে মারাঠীদিগের তোপখানা অকর্মণ্য এবং নগণ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু মারাঠী গোলন্দাজগণ নূতন নূতন তোপ আনিয়া অভাব পূরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপে পাণিপথ-প্রান্তরে সপ্তাহকালব্যাপী ভীষণভাবে সমর-তরঙ্গ উত্থিত হইল। মুস্‌লিম বিক্রমে মারাঠী-চমূ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। বীরকেশরী আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী আপনার নিমকোটী নামক অপরাজেয় বিক্রমশালী সেনাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য বর্গী সেনাকে শমনসদনে প্রেরণ

করিলেন।

আহ্‌মদ শাহের কালান্তক কালসদৃশ পরাক্রম এবং সৈন্য চালনার অদ্ভুত কূটকৌশলে সকলেই বিস্ময় গণিলেন। সপ্তম দিবসে আহ্‌মদ শাহ্‌ যখন ভীম বিক্রমে কাফের দলন করিতেছিলেন, তখন সহসা একটি গোলা আসিয়া আহ্‌মদ শাহের সম্মুখে পতিত হইল। শেল এই মুহূর্তেই ফাটিয়া প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিবে। হায়! মুহূর্তের মধ্যেই মুসলমানের সমস্ত জয়াশাই বিলীন হইবে। শেল ফাটিয়া এখনই আহ্‌মদ শাহ্‌কে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! শেলের মুখের আগুন জ্বলিতেছে! এখনই ফাটিবে! আর রক্ষা নাই!

বীরকুলসিংহ আহ্‌মদ শাহের অন্তঃকরণও কাঁপিয়া উঠিল। এই কঠিন মুহূর্তে সকলেই বিস্মিতভাবে দেখিল যে, বিদ্যুদ্‌গতিকেও লজ্জা দিয়া বীর্যবতী ফিরোজা বেগম অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক চক্ষুর পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে শেলটিকে দক্ষিণ হস্তে লইয়া বেগে শত্রুপক্ষে নিক্ষেপ করিলেন! কিন্তু হায়! শেল নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিদীর্ণ হইল। আর তৎক্ষণাৎ ফিরোজা বেগমের দক্ষিণ হস্তখানির কনুই পর্যন্ত উড়িয়া গেল! মুহূর্তের জন্য সকলের মুখে করুণ চীৎকার উত্থিত হইল। ফিরোজা গর্জন করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমার জন্য ভয় নাই। আমার কিছুই হয় নাই। শত্রুদলকে পরাস্ত কর।"

এই বলিয়া বাম হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া সদাশিব রাওয়ের দিকে ব্যাঘ্রীর ন্যায় তীব্র গতিতে অভিদ্রুত হইলেন। সদাশিব ফিরোজাকে দেখিয়া মনের ভিতরে প্রথমে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুহূর্ত পরে ফিরোজার রুধিরাক্ত বাহু এবং অন্য দিকে ভীষণ সংহারিণী মূর্তি দেখিয়া সদাশিব আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সদাশিব ভাবিলেন, এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা এবং হস্ত ধ্বংস হইবার অসহনীয় যাতনায় ফিরোজা আকুল ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এই মনে করিয়া বলিলেন, "সুন্দরী বেগম! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এস, এস, হস্ত বাঁধিয়া দি! আহা! কিসে এমন হইল? তোমার ঐ সুরসুন্দরীগঞ্জন, ত্রিলোকললামদেহে এ সমরসজ্জা যার-পর-নাই বিশ্রী ও বেখাপ্পা দেখাইতেছে! এস হৃদয়হারিণি! এস, তোমার চরণ-সেবা করিয়া ধন্য হই।"

ফিরোজা সদাশিবের বাক্যে অগ্নিশিখার ন্যায় একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'ওরে পাপাত্মা নারী-চোর! কথা রাখ। অস্ত্র ধারণ কর। আমি তোর মাথা কাটবার জন্যই এসেছি। পাপাত্মা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ!"

এই বলিয়াই তরবারি আস্ফালন করিলেন। সদাশিব তাহা ঢালে উড়াইয়া লইয়া বেগমকে বন্দী করিবার জন্য বাম হস্তে চাপিয়া ধরিবার কৌশল করায় বেগম সম্প্রসারিত তরবারির ওয়ারে ঘোড়ার দুই পা সহসা কাটিয়া ফেলিলেন। ঘোড়ার সম্মুখের দুইখানি পা কর্তন করায় ঘোড়া সহসা উবু হইয়া পড়ায় সদাশিব

আসনচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মুহূর্তের অবসর না দিয়া ফিরোজা বেগম চকিত আঘাতে সদাশিবের মস্তক কাটিয়া তরবারি অগ্রে বিদ্ধ করত: ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিলেন। মুসলিম-বাহিনী "আল্লাহ্ আকবার" নাদে প্রমত্ত তেজে গর্জন করিয়া কাফের সংহারে মাতোয়ারা হইলেন। সদাশিবের শিরশ্ছেদনে বর্গী-সৈন্য জলস্রোতঃ-প্রহত বেতস-লতিকার ন্যায় কম্পিত কলেবরে ঘূর্ণিব্যাত্যা-তাড়িত তুলারাশির ন্যায় দিগ্বিদিকে পলায়নপর হইল। আফগান বাহিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া ফেলিল।

এই পানিপথের ভীষণ যুদ্ধেই মারাঠীদিগের উপচীয়মান বিরাট শক্তি একেবারেই চুরমার হইয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষ আবার মুসলিম বীর্য-পরাক্রমের বিজয়-লাভে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ওঠে। মারাঠীদিগের ঘরে ঘরে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয়। পেশোয়া মনোদুঃখে ভগ্ন অন্তঃকরণে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতের গৃহে গৃহে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে আবার আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয়।

উপসংহার

পানিপথের ভীষণ যুদ্ধে মারাঠী-শক্তি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবার পরে বীরকুল-দুর্বার আহ্‌মদ শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ভারতের শাসনে সুবন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। ফিরোজা বেগমকে রাজকীয় সম্মান, খেলাত এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের বিস্তৃত জায়গীর প্রদত্ত হইল। বিশেষ দরবার আহ্বান করিয়া তাঁহাকে "ফখরুল হেন্দ" অর্থাৎ 'হিন্দুস্তানের গৌরব' এই উপাধি প্রদত্ত হইল। তাঁহার কর্তিত হস্তখানি দেশভক্তি এবং স্বজাতি-প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে আরকে ডুবাইয়া কাচপাত্রে বিশেষ যত্নে একটি রমণীয় মন্দিরে স্বর্ণ-বেদিকার উপরে সর্বসাধারণের দর্শনার্থ সংস্থাপিত হইল। মিম্বরের গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল :

"স্বদেশ-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল আত্মোৎসর্গ।"

নজীব-উদ্দৌলা এবং ফিরোজা বেগম দীর্ঘকাল পরে প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মুরলাকে একজন সম্ভ্রান্ত সেনাপতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। দিল্লীর প্রভুত্বকে অখণ্ড এবং মজবুত করিয়া ভারতব্যাপী বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য সংগঠনের জন্য আহ্‌মদ শাহ্‌ যখন কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, ঠিক এমন সময় আফগানিস্তানে রাজপরিবারে ঘোরতর বিপ্লব ঘটায় আহ্‌মদ শাহ্‌ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লী ত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিয়া অল্পকাল পরেই মহাবীর আহ্‌মদ শাহ্‌ হঠাৎ পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের মুসলমান শক্তি-সকল আবার বিচ্ছিন্ন এবং ম্লান হইয়া পড়ে। আত্মবিরোধ আবার মস্তকোত্তোলন করে। বাদশাহ্‌ এবং উজীরগণ আবার মারাঠীদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া পড়েন। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বার বিজিত হইয়াও মুসলমান-ভাগ্যে তাহার ফলভোগ ঘটিল না। বিধাতার ইচ্ছায় উদ্যমশীল ইংরেজ জাতি ফল-ভোগের অধিকারী হইলেন।

— — —

নূরউদ্দীন

ফজর হইয়াছে। তরুণ রবির অরুণ কিরণ আঁধার ভুবন আলোকিত করিয়াছে। পাখী ডাকিতেছে। ফুল ফুটিতেছে। বায়ু বহিতেছে। আকাশ-সাগরে রঞ্জিত মেঘ ধীরে ধীরে যেন হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছে। নবীন জীবন, নবীন আনন্দ সারা ভুবন ব্যাপিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ভুবনে ভুবনে, গগনে গগনে, পবনে পবনে শান্তি, প্রীতি এবং আলোকের ধারা ফুটিয়া উঠিতেছে।

এহেন মধুর ও সুন্দর প্রাতঃকালে চিতোরের রাজ-উদ্যানে দুইটি সুন্দর বালক-বালিকা মনোহর জলকুসুমদাম-শোভিত সরোবর-তীরে একটি হরিণশিশু লইয়া খেলা করিতেছে। বালক এবং বালিকার কালো কালো গুচ্ছ গুচ্ছ কেশকলাপ লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে প্রভাত-পবন নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বালারুণের হৈমচ্ছটা দুইজনের মুখের উপর পড়িয়া এক অনির্বচনীয় শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

সুবর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ হরিণশিশুটিকে লইয়া দুইজনে সরোবর-তীরে গালিচার ন্যায় শ্যামল ঘাসের উপরে ভ্রমণ এবং ধাবন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাগানে নানা জাতীয় মনোহর ফুল ফুটিয়া অপূর্ব শোভার বাজার খুলিয়া বসিয়াছে। বালক-বালিকা এ-গাছের ফুল তুলিয়া, ও-গাছের ফুল শুঁকিয়া, সে-গাছের ফুল ছিঁড়িয়া, হরিণ নাচাইয়া সুন্দর প্রাতঃকালে এই সুন্দর বাগানের সুন্দর দৃশ্যকে আরও সুন্দর ও মনোহর করিয়া তুলিল।

এই শিশু দুইটি পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব তীরে যাইয়া উপস্থিত হইবার ক্ষণপরেই, উদ্যান-তোরণ উদ্ঘাটিত হইল। চিতোরের রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং মালবের বেগম আর্জুমন্দ বানু কতিপয় সখী ও রক্ষিণী সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ উপলক্ষে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রানী ও বেগম উভয়েই সমবয়সী। উভয়েই সুন্দরী, আমোদপ্রিয়া এবং রসরঙ্গিনী। কেবল পরিচ্ছদের পার্থক্যে উভয়কে ভিন্নজাতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, নতুবা সহোদরা ভগ্নীযুগল বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইত।

বেগম ও রানী উভয়েই ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। সখীগণ নানা জাতীয় ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিতে লাগিল। বেগম ও রানী দুইজনে কত ফুল, কত পাখীর গল্প করিতে লাগিলেন। উভয়েই পূর্ণ যুবতী, রসবতী এবং লীলাবতী, উভয়েই মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী এবং খঞ্জনগামিনী। উভয়ের স্মিত মধুরহাস্যে,

গুঞ্জনবৎ থাকে এবং রূপের ছটায় বাগানের কুসুমাবলী যেন আরও হাস্যময় ও সৌন্দর্যশালী হইয়া উঠির।

বেগম বলিলেন ঃ রানী! আপনার বাগানটি দেখে খুশী হলেম। চলুন এক্ষণে একবার সরোবরে নৌ-বিহার করা যাক।

রানী বলিলেন ঃ চলুন, নৌকা প্রস্তুতই আছে।

দুইজনে নৌকায় আরোহণ করিলেন। সখীরা বাহিতে লাগিল। পুরু গালিচার উপরে দুইখানি রত্নখচিত কুর্সী সংরক্ষিত হইয়াছিল। রানী ও বেগম তদুপরি বসিয়া রুটির টুক্রা জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর অমনি শত শত নানা জাতীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৎস্য ধাবন, কূর্দন, সন্তরণ ও উল্লম্ফন করিয়া সেই সমস্ত রুটি খাইবার জন্য এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল।

সরোবরের নীলাভ স্বচ্ছ জলে মৃদু তরঙ্গ উঠিতেছিল। মাছের কূর্দনে সে তরঙ্গে আরও কত রঙ্গবিভঙ্গ হইল। মাছের খেলা দেখিয়া কুমার-কুমারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল ঃ আম্মা, আমরা নৌকায় উঠব।

বেগমের ইঙ্গিতে পরিচারিকারা বালক-বালিকাদ্বয়কে নৌকায় উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে সখীরা নানা ফুলের মাথা গাঁথিয়া বেগম ও রানী এবং কুমার ও কুমারীর গলে পরাইয়া দিল।

নারীমণি এবং ফুলমণিদিগের একত্র সম্মিলনে রূপের খনি যেন উথলিয়া উঠিল। কুমারের একগাছি মালা বড় সুন্দর ও লম্বা ছিল। কুমার তাহা গলা হইতে খুলিয়া কুমারীর গলায় পরাইয়া দিল। কুমারী তৎপরিবর্তে আর এক গাছি বেলা ও গোলাপ-গ্রথিত মালা হাসিতে হাসিতে কুমারের গলায় পরাইয়া দিল।

রানী হাসিয়া বলিলেন ঃ বেগম দেখুন, আপনার কুমারের কাণ্ড দেখুন।

বেগম ঃ আপনার কুমারী অদলের বদল করেছে।

রানী ঃ কুমারই তো আগে বদল করেছে। সুতরাং কুমার আমার কন্যার সৌন্দর্যের ফাঁদে পড়েছে।

বেগম ঃ তা তো বটেই, অমন সুন্দরী মেয়েকে দেখে ভুলবার কথাই তো বটে।

বেগম ও রানীর কথা শুনিয়া তরলমতি বালক-বালিকাদ্বয় মৃদু মৃদু হাসিয়া উভয়েই নিজ নিজ মায়ের মুখের দিকে চাহিল; সে চাহনিতে কেবলই পবিত্রতা ও নির্মলতা।

পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমাদের এই কুমার ও কুমারীর নাম যথাক্রমে নূরউদ্দীন ও রুক্মিণীবাঈ। মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন এবং চিতোরের রাণা উদয়সিংহের মধ্যে মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বেগমকে নিমন্ত্রণ করিয়া চিতোরে আনা হইয়াছে। বিশ্ববিজয়ী মুসলমান

এবং ভারতের একমাত্র বীর-জাতি রাজপুতের মধ্যে এক যুগে যেমন ভীষণ সমর-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে মিলনের মলয়-মারুতও তেমনি প্রবাহিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুজরাটে বিপুল প্রতাপে সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ দরবারে বসিয়া রাজকার্যের পর্যালোচনা করিতেছেন। বিশাল ত্রিগম্বুজ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দরবারগৃহ। শুভ্র মর্মরপ্রস্তরের নয়ন-মোহন কারুকার্যময় অতীব রমণীয় হর্ম্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামগুলির গায়ে সুবর্ণের লতাপাতার চারু অঙ্কন অপূর্ব সুষমা প্রকাশ করিতেছে। সুবর্ণনির্মিত বিবিধ জাতীয় মণিখচিত একটি আশ্চর্য শিল্পকৌশলজড়িত অনতি-বৃহৎ চন্দ্রাতপ নিম্নে শাহী তখ্‌ত্ সংস্থাপিত। ছাদ হইতে দোলায়মান বহুসংখ্যক সুবর্ণশৃঙ্খলের প্রত্যেকটিতে ফুলের গুচ্ছ ঝুলিতেছে।

সিংহাসনখানি একখানি রৌপ্যনির্মিত চৌকির উপরে সংস্থাপিত। চারিটি সুবর্ণনির্মিত সিংহের মস্তকোপরি তখ্‌ত্‌খানি সংস্থাপিত। তখ্‌তের পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ প্রজাপতির গঠন। এই প্রজাপতিটি তেইশ রকমের মণি-মুক্তায় গঠিত। জমরুদ, ইয়াকুত, লাল, বদখশান, ফিরোজা, পোখ্‌রাজ, চুণী, পান্না, মোতি, হীরক প্রভৃতি নানাজাতীয় পাথরের কৌশলজনক সংস্থাপনে প্রজাপতিটি যার-পর-নাই মনোহর ছিল বলিয়া, এই সিংহাসন "প্রজাপতি সিংহাসন" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ পার্শ্বে যুবরাজ এবং বাম পার্শ্বে উজীর সমাসীন। তাঁহাদের দুই পার্শ্বে আমীর-ওমরার আসন। পেশকার সিংহাসনের নীচে রৌপ্য-কুর্সীতে সমাসীন। দরজার দুই পার্শ্বে মুক্ত-করবালকরে দুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান। সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে আরও দুইজন প্রহরী উলঙ্গ করবালকরে দণ্ডায়মান। সিংহাসন-বেদিকার নিম্ন-ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে ফরিয়াদী এবং বাম পার্শ্বে আসামীগণ দণ্ডায়মান। তৎপর সম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দের স্থান। তৎপর সাধারণ দর্শকদিগের জায়গা।

সভাস্থল নীরব নিস্পন্দ। কাহার নিঃশ্বাসও পতিত হইতেছে না। দরবারগৃহের বারান্দায় আটটি গোলাপের উৎস উৎসারিত হওয়ায় সমস্ত গৃহ সুগন্ধে ভুরভুর করিতেছে। জাঁকজমক, গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য দিল্লীর দরবারের সমস্পর্ধী।

একটি বিষয়ের মীমাংসা শেষ হওয়া মাত্রই প্রহরী আসিয়া নিবেদন করিল :

চিতোরের একজন মুসলমান হুজুরের খেদমতে হাজির হতে চায়। তার বিশেষ কিছু নিবেদন আছে।

সুলতান সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক খোশ-চেহারা ঠাণ্ডা মেজাজ ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া যথারীতি কুর্নিশ করিয়া সুলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সুলতান স্মিতমুখে তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিতে বলিলেন।

আগন্তুক বলিতে লাগিলেন ঃ আমি চিতোর রাজ্যের একজন বণিক। আমার নাম আহমদ রেজা খান। আজ পনেরো বছর হতে চিতোরে বাস করে আসছি। বিগত ঈদুল-আজহা উপলক্ষে আমি একটি গো-কোরবানী করি। অবশ্য রাজ-দণ্ডভয়ে আমি নিভৃতেই কোরবানী করেছিলাম। কিন্তু কোতোয়াল, বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে তা অবগত হয়ে রাজার কর্ণগোচর করে। রাজা এই অপরাধে আমার একমাত্র পুত্রকে কালীর মন্দিরে বলিদান করেন। আমার সহধর্মিনী পুত্রশোকে উন্মাদিনী হয়ে তিন দিন পর্যন্ত অনবরত ভীষণ বিলাপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন।

সুলতান ঃ কি লোমহর্ষক ব্যাপার! এ কি কখনও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর? কি আশ্চর্য! উদয়সিংহ কি এতই নিষ্ঠুর এবং পাষণ্ড?

উজীর ঃ হিন্দুরা পরধর্মে ঘোরতর বিদ্বেষী। গো-হত্যার নামে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

সুলতান ঃ কি আশ্চর্য! তারা গরুর তুল্য উপকারী সহস্র সহস্র মহিষ বলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না, বিশেষতঃ গো-হত্যা তাদের ধর্মে সিদ্ধ, তবে বর্তমানে দেশীয় সংস্কারবিরুদ্ধ। মুসলমান গো-হত্যা করলেই তারা অস্থির হয়ে ওঠে। এমন বিচারহীন বিদ্বেষী রাজার হস্তে রাজদণ্ড কদাপি শোভা পায় না।

উজীর ঃ বিধাতা সেজন্য তাদের হস্ত হতে রাজদণ্ড বহু সহস্র বছর পূর্বে কেড়ে নিয়েছেন। সহস্র সহস্র বছর হতেই তারা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। পারসিক, চীন, শক, হূন, মৈসরী, এরাকী, গ্রীক প্রভৃতি নানা জাতি কর্তৃক হিন্দুরা শাসিত হয়ে আসছে।

সুলতান আহমদ শাহ্ আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ তুমি যা' যা' বলছ সবই বর্ণে বর্ণে সত্য?

অশ্রুসিক্ত নয়নে শোকাবরুদ্ধ কণ্ঠে আগন্তুক বলিল ঃ জাহাঁপনা! আমি যা বলেছি, সবই সত্য; একবর্ণও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়।

সুলতান কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ঃ আমাকে কি করতে বল?

আগন্তুক ঃ হুজুর, বাদশাহ্ নানদারকে গোলাক কি করতে বলবে! আমি

বিচার-প্রার্থী।

সুলতান : চিতোর স্বাধীন রাজ্য, তার রাণাও প্রবল প্রতাপশালী। আমি কেমন করে তার বিচার করব?

আগন্তুক : কেমন করে বিচার করবেন, আমি কেমন করে বলব! আমার দুঃখ ও শোক নিবেদন করেছি; এক্ষণে আপনার কর্তব্য আপনি স্থির করুন।

উজীর : এমন পাষণ্ড দমন না করলে আল্লাহের কাছে নিশ্চয়ই দায়ী হতে হবে। এমন পাষণ্ডকে সমূলে উৎসাদিত না করতে পারলে আমাদের রাজশক্তির গৌরব একেবারে বৃথা!

সুলতান : নিশ্চিত কথা! গুপ্তচর পাঠিয়ে সকল অবগত হওয়া আবশ্যক।

এই বলিয়া বাদশাহ্ আগন্তুক লোকটিকে মোসাফেরখানায় থাকিবার জন্য হুকুম দিলেন। জেব খরচের জন্য আগন্তুককে এক শত টাকা দান করিলেন।

আহ্‌মদ রেজা খান দরবার হইতে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী আসিয়া একখানি পত্র পেশ করিলেন। পত্রখানি সুলতান আহমদ শাহের চিতোরস্থ দূতের লিখিত। পত্র খুলিয়া পাঠ করা হইল। পত্রখানিতে লিখিত হইয়াছিল :

মহামান্য বাদশাহ্ নামদার,

সালাম ও তস্‌লিম বাদ আরজ এই যে, এখানে বিগত বকর-ঈদ পর্ব উপলক্ষে আহ্‌মদ রেজা খান নামক একজন মুসলমানের উপর ভীষণতম নিষ্ঠুর ও নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে। সে একটি গরু কোরবানী করিয়াছিল বলিয়া রাণা উদয়সিংহ তাঁহার কুলগুরুর আদেশ ও উপদেশে বেচারা মুসলমানের একমাত্র শিশু পুত্রকে কালী-মূর্তির সম্মুখে বলিদান করিয়াছে। শিশুটির মাতা উন্মাদিনী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পিতাও উন্মত্ত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হুজুরের বিদিতার্থে এই সংবাদ পেশ করিলাম।

একান্ত বিনীত ভৃত্য—
আবু ইউসুফ সাইফউদ্দীন

পত্র পাঠ করিবার পর দরবারের সকলেই বলিয়া উঠিলেন : ঘটনা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। এই নৃশংসতম দানবীয় ব্যাপারের প্রতিকার করজ হয়ে পড়েছে।

সুলতান কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন : যতদিন পর্যন্ত এর উপযুক্ত প্রতিফল না দিতে পারব, ততদিন সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ আমার জন্য হারাম!

সুলতানের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া এবং মুখমণ্ডলে ক্রোধের আরক্তিম বিকাশ দেখিয়া

সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন।

সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ যখন যে প্রতিজ্ঞা করিতেন, তখন তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতেন। প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া তখনই যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ অচিরে লক্ষাধিক পদাতিক এবং বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ চিতোর আক্রমণ অভিযান করিলেন।

রাণা উদয়সিংহ পরাক্রান্ত যোদ্ধা এবং উপযুক্ত বল-সম্পন্ন ছিলেন। চিতোর গড় সমগ্র হিন্দুস্থানে দুর্ভেদ্য এবং অত্যুচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আজও প্রবাদ আছে ঃ

তালাবত ভূপালকা আর সব তালিয়,
গড় তো চিতোরকা আর সব গাঁড়িয়া।

অর্থাৎ ভূপালের সরোবরই সরোবর, আর সমস্ত ডোবা, আর চিতোরের গড়ই গড়, আর সব স্তূপ।

চিতোরের দুর্গ-প্রাচীর চল্লিশ গজ উচ্চ ছিল। এই প্রাচীরের বাহিরে সুবিস্তৃত এবং গভীর পরিখার কৃষ্ণ-জলরাশি বায়ু-হিল্লোলে থৈ থৈ করিয়া নাচিত।

পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সৈন্য চিতোর-কেল্লায় সর্বদা বীরদর্পে বিচরণ করিত। চিতোর-রাজ উদয়সিংহ রুমী খান নামক একজন তুর্কী বীর-পুরুষের নেতৃত্বে একদল পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নূতন ধরনের বৃহদায়তনের তোপ নির্মাণ করিয়া প্রাচীরের উপরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। চিতোর দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ বলিয়া সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রুমী খানের তত্ত্বাবধানে চিতোর সামরিক শক্তিতে নূতন বল ও তেজঃ লাভ করিয়াছিল।

সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ স্বকীয় সৈন্যদলকে অতীব গোপনে পরিচালনা করিয়া চিতোরের নিকটবর্তী হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের হস্তে প্রেরিত পত্রে লিখিত হইল যে, নির্দোষ মোসলেম শিশুর খুনের পরিবর্তে সমস্ত চিতোর রাজ্যে অবাধ গো-কোরবানীর প্রচলনের প্রথা জারি করিতে এবং আহ্‌মদ রেজা খানকে লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দিতে হইবে। চিতোর রাজধানীতে তাঁহার নিজের তরফ হইতে একটি জামে মসজিদ স্থাপন করিবার জন্য জায়গা ও জায়গীর দিতে হইবে।

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য গুজরাটের কুড়ি হাজার সৈন্যকে চিতোরের স্বতন্ত্র দুর্গে থাকিতে দিতে হইবে। মুসলমানদিগের বিচারের জন্য মুসলমান কাজী ও মুফতি নিযুক্ত হইবে। মুসলমানের মোকদ্দমা কাজী এবং মুফতি সাহেবের নিকট সম্পন্ন হইবে, প্রভৃতি শর্ত সাত দিবসের মধ্যে কবুল না করিলে গুজরাট সরকার সমর ঘোষণা করিবেন; ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন।

গুজরাট-অধীশ্বর সুলতান আহ্‌মদ শাহের পত্র পাইয়া উদয়সিংহ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দূতকে অবমানিত করিয়া বিনা উত্তরে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদ করায় রাণা উদয়সিংহ তাঁহাকেও কটূক্তি করিলেন। গুজরাটের দূত মোস্তফা খলিল অপমানিত হইয়া বিনা উত্তরে সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ সমীপে ফিরিয়া আসিলে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মহাবীর সুলতান লাঙ্গুলাহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। সেনাপতি তাহার বেগকে ডাকিয়া চিতোর আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে পরদিবস গুজরাট-বাহিনী বিপুল বিক্রমে চিতোর-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া ফেলিল। মোসলেম সৈন্যবাহিনী অজয়গড় নামক সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র কেল্লা দখল করিয়া লইবার পরে চিতোরের চমূ আসিয়া গুজরাটের সৈন্যদলের গতিরোধ করিল। তাহের বেগের অশ্বারোহী সৈন্যের বিপুল পরাক্রমে চিতোরের সৈন্যদল বিষমরূপে রাস্ত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল।

আহ্‌মদ শাহ্ যাইয়া একেবারে চিতোর অবরোধ করিলেন। চিতোরের প্রাচীরের উপরে চতুর্দিকে পঞ্চশতাধিক বৃহৎ বৃহৎ কামান সুবিন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত কামানের শেল প্রহারে গুজরাটের সৈন্যদল বিশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

দশদিনের যুদ্ধে গুজরাটের অন্ততঃ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রাণা উদয়সিংহ এবং সেনাপতি রুমী খান ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ গুজরাট হইতে আরও নূতন নূতন তোপ আনিয়া চিতোর দুর্গের একাংশ ধ্বংস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কয়েকদিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। উভয় দলেই সহস্র সহস্র বীরপুরুষ অকালে সমর-সাগরে প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল।

একদা রজনীকালে সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ বহুসংখ্যক ফানুসে দাহ্যমান পদার্থ ঝুলাইয়া উড়াইয়া দিলেন। ফানুসগুলি প্রবল পবনবেগে বিদ্যুৎগতিতে কেল্লার উপরে যাইয়া দাহ্যমান পদার্থের গুরুভারনিবন্ধন এবং অন্যদিকে গ্যাসের তৈল নির্বাপিত হওয়ায়, দুম্ দুম্ শব্দে নানাস্থানে পতিত হইয়া চারিদিকে আগুন

লাগাইয়া দিল। ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সৈন্য ও প্রহরিগণ জাগ্রত হইয়া অগ্নি নির্বাপণে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু এইসময় আরও বহু সংখ্যক বোমা-বিশিষ্ট দাহ্যমান ফানুস জেলখানার উপরে যাইয়া বায়ু বেগে পতিত হওয়ায় অসংখ্য বোমা একসঙ্গে ফাটিয়া জেলখানার ছাদ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিল।

ছাদ চূর্ণ হইবার পরে কতিপয় ফানুসের বোমা জেলখানায় পতিত হওয়ায় বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়া যায়। ত্রিশ হাজার মণ বারুদের বস্তা সহসা ভীষণ শব্দে আকাশস্পর্শী শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। ভীষণ শব্দে সমস্ত চিতোরবাসী কম্পিত এবং চমকিত হইয়া ওঠে। কেল্লায় অধিকাংশ অট্টালিকা ভীষণ কম্পনে চূর্ণ হইয়া যায়। বহু সংখ্যক নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত এবং সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। রুমী খান ছাদ পড়িয়া বিশেষরূপে আহত হন। একখানি হস্ত ভাঙ্গিয়া যায় এবং মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে চিতোরের ঘরে ঘরে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হয়। রাণী লক্ষ্মীবাঈ, কুমারী রুক্মিণীবাঈ, রাণার বিধবা ভগ্নী হীরাবাঈ, জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণবাঈ, রাণা এবং রাণার পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী সৈন্যগণ কেহই সৌভাগ্যক্রমে আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। কেল্লা উড়িয়া যাওয়ায়, বারুদের বিশাল ভাণ্ডার একেবারে নষ্ট হওয়ায় এবং সেনাপতি আহত হওয়ায় রাণা উদয়সিংহ শশব্যস্তে সন্ধির প্রস্তাবের জন্য দশদিন সময় প্রার্থনা করিলেন।

রাণার ঘোরতর বিপদে আপনার বিজয়লাভ দর্শনেও সুলতান মনে মনে নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। মানবের, বিশেষতঃ রাজা-বাদশাহ্‌দিগের ভাগ্যচক্রের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিষয় চিন্তা করিয়া সুলতান বিনা-বাক্যব্যয়ে দশদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রুমী খানের ন্যায় বিখ্যাত প্রভুভক্ত বীর-সেনাপতি আহত হওয়ায় সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আহত ব্যক্তিদিগের অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য পঞ্চান্ন জন হাকিমকে ঔষধপত্র এবং দুই শত সেবক-সহ রাণার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। সুলতানের মহত্ত্ব এবং পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাইয়া চিতোরবাসী সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরের একটি রমণীয় প্রশস্ত কক্ষে রুমী খাঁ একখানি আবলুস কাষ্ঠনির্মিত ঝিনুকের রমণীয় কারুকার্যকরা পালঙ্কে শায়িত। রুমী খানের তদ্বির ও সেবা-শুশ্রূষার সুবিধার জন্যই রাজপুরীতে স্থান দান করা হইয়াছে। কেল্লা এবং রুমী

খানের বাটী বিনষ্ট হওয়ায় রাজপুরী ব্যতীত তাঁহাকে আর স্থান দান করিবারই বা স্থান কোথায়?

রুমী খাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফররোখ আফেন্দী। তিনি তুরস্কের রাজবংশজ পুরুষ। রাজনৈতিক কুটিল চক্রান্তে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি সমরবিদ্যাবিশারদ তেজস্বী ও দেবকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার বন্ধু চিতোরের রাণা উদয়সিংহের নিকট তাঁহার তোপখানার তত্ত্বাবধানের কার্যে পাঠাইয়া দেন। রাণা ক্রমশঃ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া প্রধান সেনাপতির পদ পর্যন্ত অর্পণ করেন। তিনি রুম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ্যে রুমী খান নামে অভিহিত হন।

রুমী খাঁ যেমন সুশ্রী সুঠাম কান্তিমান্ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইত। রুমী খাঁ চিতোর সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার পর হইতে চিতোরের সামরিক বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ বাহুবলে জয় করিয়া চিতোরের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। দুর্গ, পরিখা, তোপখানা, শেলখানা—সকলই নূতনভাবে সংস্কৃত, বর্ধিত এবং সমুন্নত হইয়াছিল। রুমী খাঁ আহত না হইলে সুলতান আহ্‌মদ শাহের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হইত কিনা, সন্দেহের বিষয়।

রাণা উদয়সিংহ রুমী খাঁকে প্রিয়তম হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ভালোবাসিতেন। রুমী খাঁর সাংঘাতিক জখমে রাণা নিতান্তই দুঃখিত এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-চিকিৎসক ভিষক-প্রবর সনৎকুমার সেন চিকিৎসা-বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। রাণা তাঁহাকেই রুমী খাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। সনৎকুমার ইউনানী এবং আয়ুর্বেদ উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়পুরের বিখ্যাত বৈদ্য হরকুমার সেনের নিকট আয়ুর্বেদের সমস্ত শাখায় জ্ঞানলাভ করিয়া, দিল্লীর ফিরোজ শাহের স্থাপিত তিব্বিয়া মদ্রাসায় ভর্তি হইয়া শেষ পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সনদ লাভ করিয়াছিলেন।

সনৎকুমার একখানি কুর্সীতে বসিয়া রুমী খাঁর হাতের পট্টি খুলিতেছেন। কুমারী স্বর্ণবাঈ এবং হীরা ঔষধ-পত্র ও গরম পানি লইয়া হস্তের ঘা ধৌত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। হীরাবাঈ বাল-বিধবা। পরিধানে শুভ্র পট্টবস্ত্র। হস্তে দুইগাছি মাত্র স্বর্ণকঙ্কণ। বিধবা বলিয়া অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। তবে রাজদুহিতা বলিয়া হস্তে স্বর্ণবলয় ধারণ দোষাবহ ছিল না। হীরাবাঈ-এর গঠন দোহারা এবং কমনীয়। কান্তি উজ্জ্বল এবং মধুর। বর্ণ দুগ্ধমিশ্রিত আলতার ন্যায়।

হীরাবাঈ-এর চোখ-মুখ হইতে যৌবনের প্রভাব ও বিলাসভাব প্রকাশিত হইতেছে। যুবতী বহু সাধনায় যৌবনের জোয়ারতরঙ্গ রোধ করিতেছে। বর্ষার উদ্বেলিত খরধার গঙ্গার ন্যায় যুবতীর সর্বাঙ্গে যৌবনের খরপ্রভা প্রবাহিত হইতেছে। প্রাবৃটের নদীর ন্যায় তাঁহার চালচলন, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার কিছু অনিয়মিত বা উচ্ছৃঙ্খল। যুবতী সুপক্ক আঙুরের ন্যায় একান্ত রসবতী।

স্বর্ণবাঈ রাণার জ্যেষ্ঠা পুত্রী। বয়ঃক্রম চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে! কান্তি ছুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষুর এক প্রান্তে লালসা বিদ্যুৎ দীপিয়া উঠিতেছে, অন্য প্রান্তে লজ্জা অবগুণ্ঠন টানিতেছে। অঙ্কিত ভ্রূ-সমন্বিত ললাটের দুই পার্শ্বে চূর্ণ-কুন্তল কৃষ্ণ-ভুজঙ্গের ন্যায় দুলিতেছে। চক্ষু পদ্মদলের ন্যায় প্রশস্ত দীর্ঘ এবং ভাসমান। চক্ষুর দৃষ্টি মেঘনির্মুক্ত শারদীয় আকাশের প্রশান্ত নীলিমার ন্যায় মনোহর। কুসুমের মৌন-তৃপ্তির ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টি মৌন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বর্ষণমুক্ত মেঘাঙ্গে দামিনী-বিকাশের ন্যায় মৃদু কটাক্ষ পূর্ণ। তাহাতে লালসার অগ্নি নাই, কিন্তু প্রেমের জ্যোতিঃ আছে। উভয়ে সুন্দরী। আমি কাহাকে সরস এবং কাহাকে নীরস বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

পাঠক-পাঠিকা বলুন দেখি, গোলাপ এবং পদ্মের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আঙুর এবং আম্রের মধ্যে কোনটি সরস? সাঁঝের শোভা অধিক রমণীয়, কিংবা শরতের শোভা অধিক কমনীয়? পাপিয়ার 'পিউ'-তান এবং কোকিলের 'কুহু' গান, কোনটি অধিক মিষ্ট? বকুলের ঘ্রাণ ভালো, কি কামিনীর ঘ্রাণ ভালো? ডালিমের বর্ণ বেশী মনোহর, কিংবা সিঁদুরে আমের বর্ণ বেশী সুন্দর? প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়াই বেশী পছন্দ, কিংবা সন্ধ্যার শীতল সমীরণ বেশী পছন্দ? বেলফুলের মালা চাই, কিংবা যুঁইফুলের মালা চাই? নলিনী অধিক সুন্দর, কিংবা কুমুদ অধিক সুন্দর? রাগিণীর ভিতরে ঠুংরি সুন্দর, কিংবা খেমটা সুন্দর? বেহাগ ভালো, না ভৈরবী ভালো? আর কত দৃষ্টান্ত দিব! যাহা দিলাম, অগ্রে তাহার মীমাংসা করুন। কই, কিছু মীমাংসা হইল কি? একেলা মীমাংসা করিলে চলিবে না। পাঁচ-সাত জনে মিলিয়া মীমাংসা করুন। দেখি, কেমন করিয়া একমত হইতে পারেন?

আর পাঠক-পাঠিকা উভয় যদি দম্পতি হন, তাহা হইলে দুইজনে মিলিয়া মীমাংসা করুন তো? আপনারা দুইজনে বলুন তো, নারী বেশী সুন্দরী, কি পুরুষ বেশী সুন্দর? আপনাদের দুইজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহার ফলে বিরহের সৃষ্টি করিতে চাই না। আপনাদের মধ্যে কে অধিক রসিক এবং রসিকা, কে অধিক প্রেমিক এবং প্রেমিকা, তাহাও জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু আমার উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর এক হইয়া মীমাংসা করুন। সুতরাং হীরাবাঈ এবং স্বর্ণবাঈ, কে অধিক সুন্দরী,

আপনারা কাহাকে পছন্দ করেন, সে ভার আপনাদের উপরেই মীমাংসার জন্য ন্যস্ত রহিল।

রুমী খাঁর দক্ষিণ হস্ত পাথর-চাপা পড়িয়া যেখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেখানের হাড় ক্রমশঃ জোড়া লাগিতেছিল। সনৎকুমার ঘা ধুইয়া, ঔষধ লাগাইয়া পট্টি বাঁধিয়া চলিয়া যাইবার পরে হীরাবাঈ এবং স্বর্ণ দুইজনে মিলিয়া রুমী খাঁকে ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এইরূপ প্রত্যহই হইত। রুমী খাঁর কন্দর্পনিন্দিত অথবা ইউসুফ-নিন্দিত রূপরাশি, শারীরিক গঠনের মোহিনী ভঙ্গিমা, বীর্যপুষ্টকান্তি, ঈষৎ দীর্ঘ নধর দেহ, মিষ্ট স্পষ্ট এবং সরস বাক্যাবলী ক্রমশঃ হীরাবাঈ এবং স্বর্ণবাঈ-এর প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হীরা প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াও ভাবিত যে, খাঁ সাহেবের সেবা বুঝি কিছুই হইল না; পাছে বা অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন। আর স্বর্ণবাঈও প্রাণ ভরিয়া সেবা করে, কিন্তু সর্বদা আশঙ্কা, খাঁ সাহেবের কষ্টের বুঝি লাঘব হইল না। দুইজনের ভাবে এইটুকু পার্থক্য। প্রথম প্রথম হীরাবাঈ স্বর্ণকে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিত; কিন্তু নদীতে যখন বান ডাকে, তখন পাড়ের উচ্চতা দেখিলে চলে কি? বাঁধ বা পাড় যতই উঁচু হোক না কেন, দুই-চার আঙ্গুল করিয়া তাহাকে ডুবাইতে ডুবাইতে অবশেষে একেবারেই ডুবাইয়া দুইকূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলে। প্রেমেও তাই, ধীরে ধীরে প্রাণের এক কোণে জাগিয়া ওঠে। সেখানে জাগিতে জাগিতে চোখের কোণে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু তখনও অবগুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত থাকে। শেষে অবগুণ্ঠন ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক দেখিয়া প্রাণকান্ত বা কান্তার দিকে দুই একবার করিয়া তাহার অসাক্ষাতে নজরে নজরে প্রেমকে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিতে করিতে তাক্ ঠিক হইলে একদম তাহার চোখের উপরেই প্রেমের বাণ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চোখের উপর ছোঁড়ার পরেই শিকার লাভ ঘটে। যতক্ষণ চোখের উপরে প্রেমের বাণ না ছোড়া যায়, ততক্ষণ হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

হৃদয়ে প্রবেশ না করিবার কারণ এই যে, শরীরের সর্বাঙ্গই অল্পাধিক কঠিন; চক্ষুই হইতেছে একমাত্র কোমল পদার্থ। অন্য দিকে প্রেমও কোমল পদার্থ। প্রেমের এই কোমল বাণ, তাই চক্ষু ব্যতীত অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই চক্ষুই হইতেছে প্রেম-পাখী ধরিবার চমৎকার ফাঁদ! চক্ষুর ফাঁদ না থাকিলে দুনিয়াতে প্রেম-পাখী ধরা যাইত কি-না, এবং প্রেমের ব্যবসা চলিত কি-না, গভীর সন্দেহ।

চোখ আছে বলিয়া যেমন আকাশ পাতালের সবকিছু—অন্ততঃ অনেক কিছু দেখিতে পাই, তেমনি চোখ আছে বলিয়াই প্রেম, ভালোবাসা, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহস্র নির্ঝর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমি তুল্য অনন্ত

দুঃখ-ক্লেশ এবং তাপময় সংসার-ক্ষেত্রকে কতক পরিমাণে সরস এবং স্নিগ্ধ করিয়াছে। তবে নদী থাকিলেই তাহাতে যেমন দুই একজন ডুবিয়া মরে, তেমনই প্রেমের নদীতেও দুই একজন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ডুবিয়া মরে। নদী থাকলেই তাহাতে লোক ডুবিবে। তা' প্রেমের নদীই হউক, আর জলের নদীই হউক। তবে জলের নদীতে ডুবিয়া মরিলে পচিয়া গলিয়া যায়, আর প্রেমের নদীতে ডুবিয়া মরিলে সে পবিত্র, মহান, সুন্দর, অমৃত এবং অক্ষয় হয়। জলের নদীতে ডুবিয়া মরিলে দুর্গন্ধের ভয়ে অনেকে তাহার কাছে যাইতে চায় না; কিন্তু প্রেমের নদীতে ডুবিয়া মরিলে, কবির বীণায়, প্রেমিকের হৃদয়ে, ইতিহাসের বর্ণনায় চিরকাল ঝংকৃত, পূজিত এবং কীর্তিত হয়।

পৃথিবীতে লায়লী এবং মজনু, শিরি এবং ফরহাদ, রোমিও এবং জুলিয়েট, নল এবং দময়ন্তী, সাবিত্রী এবং সত্যবান, রাম এবং সীতা, ইউসুফ এবং জুলেখার ন্যায় কত লক্ষ নরনারী ছাই-ভস্ম হইয়া উড়িয়া গিয়াছে বা মাটিতে মিশিয়াছে; কিন্তু উপরোক্ত প্রেমিক-প্রেমিকাগণ আজও স্মরণীয় এবং বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নামে নিত্য নিত্য প্রেমের বাঁশরী এবং স্মৃতি বীণা প্রাতঃসন্ধ্যা বাজিতেছে।

একই দ্রব্যের একাধিক প্রার্থী হইলেই প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা পরের দিনই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইবে। ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষ এই ধর্ম কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। বারুদ আর অগ্নি একত্র হইলেই আগুন জ্বলিবে। ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল নারী বা নর লইয়া, আ'শেক বা মা'শুক লইয়া নহে। ব্যবসায় বল, বাণিজ্য বল, তালুক বল, মুলুক বল, প্রতিপত্তি বল, পশার বল, খেলা বল, ধূলা বল, যাহা কিছু বল—কিবা বৃহৎ কিবা ক্ষুদ্র, প্রত্যেক পদার্থ লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মামলা-মোকদ্দমা এবং হত্যা-খুন। মানবের মধ্যে যিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিবাদ ত্যাগের জন্যে নিজের স্বার্থ ভুলিয়া পরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন তিনিই মহাপুরুষ। তিনি আমাদের আদর্শ। আর এই জন্য পরার্থপর হওয়া এবং নিজের স্বার্থে বলি দেওয়াই হইতেছে মানবের পরম ধর্ম এবং চরম কর্ম। ইহার উপরে কোনও ধর্ম নাই, কোনও কর্ম নাই। হীরাবাঈ এবং স্বর্ণবাঈ-এর মধ্যে প্রেমের প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল। হীরাবাঈ এবং স্বর্ণ বিষম হিংসায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীবাঈ পরে এই সমস্ত জানিতে পারিয়া লক্ষ্মা এবং কন্যা উভয়কেই যথেষ্ট তিরস্কার এবং শাসন করিলেন। রুমী খাঁর সেবা-শুশ্রূষা এবং তত্ত্বাবধান হইতে উভয়কেই বঞ্চিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পরেই মালবের (মালওয়ার) সুলতান রোকনউদ্দীন মসজিদ হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বেগম আর্জুমন্দ বানু অন্তঃপুরের দিলখোশ বাগে উপাসনান্তে সখীগণ-সঙ্গে হাওয়া খাইতেছিলেন। বাদশাহ্কে অন্তঃপুরের দিকে আসিতে দেখিয়া একটু দ্রুত আসিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন : আজ যে বড় সকাল সকাল শুভাগমন! রাজকার্য কিছু কম পড়েছে নাকি?

বাদশাহ্ : রাজকার্য কম পড়া দূরে থাক, দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আবার এক নূতন ব্যাপার উপস্থিত। তা'তে তোমার পরামর্শের আবশ্যক আছে বলেই সকাল সকাল এসেছি। পরামর্শের পরে আবার রাতেই দরবার বসবে।

বেগম : তাই তো। গরজ বড় বালাই!—এই বলিয়া প্রসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইজনে আসন পরিগ্রহ করিলেন। আসন পরিগ্রহ করিবার পরে বেগম বলিলেন : আজকার বিশেষ ঘটনাটা কি?

বাদশাহ্ : চিতোরের রানী লক্ষ্মীবাঈ আমাকে রাখী* পাঠিয়েছিল। আহ্‌মদ শাহের আক্রমণে চিতোর-বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

বেগম : বিষম সমস্যা। একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে বন্ধুতা। রাণা উদয়সিংহ বেচারা আহ্‌মদ রেজা খাঁর প্রতি যে ভীষণ ও লোমহর্ষণ অত্যাচার করেছে, তা' স্মরণ করলেও প্রতি লোমকূপ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। আহা! বেচারার শিশুপুত্রটিকে বলি দিয়েছে। বেঈমান কাফেরের দেল্ একেবারে দয়া-মায়াশূন্য! এমন "হজ্জদেল্" পাষণ্ড যে খোদার দুনিয়াতে আছে, তা চিন্তারও অগোচর ছিল। আহ্‌মদ শাহ্ উপযুক্ত কর্মই করেছেন।

শাহ্ : আহ্‌মদ শাহ্ উপযুক্ত কর্ম করেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু রানী আমাকে রাখী পাঠিয়েছেন। রাখীর সম্মান না রাখলে সমগ্র রাজপুতের শ্রদ্ধা হারাতে হবে। রানী আমাকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে একান্ত বিশ্বাস করে এই স্বর্ণখচিত রাখী পাঠিয়েছেন।

রাখী—স্বর্ণ বা সূত্র-নির্মিত বলয়ী বিশেষ। দক্ষিণ হস্তের কব্জায় পরিতে হয়। যাহাকে রাখী পাঠান হয়, তাহার সহিত ধর্ম-ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক হয়। রাখীর সম্মান রক্ষা না করা রাজপুতদিগের মধ্যে নিতান্ত কলঙ্কজনক বলিয়া বোধ হইত। রাখী পাঠাইলে, ভ্রাতাকে ভগ্নীর রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুতদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও রাখীর সম্মান রক্ষা করিতেন।

বেগম : তবে কি আপনি আহ্‌মদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন? তার পরিণাম কি ভালো হবে? আর আহ্‌মদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কি ধর্মসঙ্গত হবে?

শাহ্‌ : কখনই নয়। অসম্ভব ব্যাপার! একদিকে ধর্ম, অন্য দিকে বন্ধুতা! আমি মহা-সঙ্কটে পতিত।

বেগম : আমি গুপ্তচর-মুখে সন্ধান পেলাম যে, চিতোরের বারুদখানা উড়ে গেছে এবং কেল্লা ভেঙ্গে পড়েছে। সেনাপতি এবং বহু লোকজন আহত ও নিহত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাণা আর যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না।

শাহ্‌ : কি আশ্চর্য, এ সংবাদ আমি এখনও প্রাপ্ত হই নাই।

বেগম : আমার গুপ্তচর আপনার গুপ্তচর অপেক্ষা কার্যপটু এবং ক্ষিপ্রগতি। সুতরাং আপনি অগ্রে কিরূপে জানবেন? পররাষ্ট্র ব্যাপারে কোন দিনও আপনি আমার অপেক্ষা অগ্রে সংবাদ রাখতে পারেন না।

শাহ্‌ : বটে! তবে তো সিংহাসনে তোমারই বসা উচিত।

বেগম : সিংহাসনে বসলেই ক্ষমতা বেশী প্রকাশ পায় নাকি?

শাহ্‌ : তা' পায়ই তো বটে!

বেগম : তবে সিংহাসনে যে রস, তা'র উপরে যে প্রভুত্ব করে, তা'র আসন কোথায়?

শাহ্‌ : তা'র আসন সিংহাসনেরও উপরের সিংহাসনে।

বেগম : সিংহাসনের উপরের সিংহাসন কোথায়?

শাহ্‌ : কেন পিয়ারি? তা' কি অবগত নও?—বাদশাহ্‌ এই বলিয়া বেগমকে গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন : সে সিংহাসন, এই হৃদয়-সিংহাসন।

বেগম তার প্রতিদান দিয়া বলিলেন : এখন আর সিংহাসনে বসবার সময় নাই। সামান্য-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চিতোরে গিয়ে সন্ধি করে দিয়ে আসুন। রাণার যাতে উপযুক্ত শিক্ষা হয়, অথচ রাজ্যটিও একেবারে না যায়, এমন ব্যবস্থা করবেন। আহ্‌মদ শাহের সহিতও কোন শত্রুভাব না হয়। তাঁর সাথে মিত্রতা করবার জন্যই চেষ্টা করবেন। চিতোরে কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করে মুসলমানদের বিচারের সুবিধা করবেন। রাজধানীতে মালব (মালওয়া) সুলতানের পক্ষ হতে একটি মস্‌জিদ স্থাপন করবেন। হতভাগ্য আহ্‌মদ রেজা খাঁর জন্য বিস্তৃত জায়গীরের বন্দোবস্ত করবেন।

শাহ্‌ : বেশ, উত্তম যুক্তি। কিন্তু আমার মতে এমন ধর্মান্ধ রাণাকে সিংহাসনচ্যুত করাই কর্তব্য।

বেগম : সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে যা বিহিত হয় তা'ই করুন।

শাহ : যা হুকুম! আদেশ শিরোধার্য করলাম।

বেগম : রাণী লক্ষীবাঈ এবং শ্রীমতী রুক্মিণীর জন্য আমার তরফ হতে আমার প্রেরিত ফর্দ-দৃষ্টে ভেট্-ঘাট নিতে যেন ত্রুটি না হয়।

শাহ্ : নিশ্চয়ই না।

শাহ্ রোকনউদ্দীন অতঃপর চিতোর যাইবার বন্দোবস্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে ধাঁ ধাঁ করিয়া অবসরের দশদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একাদশ দিবস প্রাতঃকালে সন্ধির কথাবার্তার জন্য দরবার বসিল। আহ্‌মদ শাহ্ অর্ধ চিতোর রাজ্য এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসিলেন।

রাণা সম্পূর্ণ টাকা দিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু রাজ্য দিতে অস্বীকৃত হইলেন। অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক কথা-কাটাকাটি হইল। কিন্তু পরস্পরের শর্ত কেহই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন না। মালবের (মালওয়ার) সুলতান রোকনউদ্দীন বহু চেষ্টা এবং যত্ন করিয়া রাণাকে আহ্‌মদ রেজা খাঁর জায়গীরের জন্য দুইটি পরগণা এবং গুজরাটের পক্ষ হইতে চিতোরে মস্‌জিদ নির্মাণের জন্য স্থান এবং জায়গীর দানের বিষয়ে রাণাকে স্বীকৃত করাইতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু রাজ্যাংশ ত্যাগ করিতে মহারাণা একেবারেই অস্বীকৃত হইলেন। এ দিকে আহ্‌মদ শাহ্ অর্ধরাজ্য না পাইলে সন্ধি করিবেন না বলিয়া জেদ্ করিয়া বসিলেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। মহারানী লক্ষীবাঈ প্রমাদ গণিলেন। রুমী খাঁ রাণাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রাণা রাজ্য ত্যাগ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাই মঙ্গল মনে করিলেন।

আহ্‌মদ শাহ্ চিতোর পুনরাক্রমণ করিলেন। রাজভক্ত ৭০ হাজার রাজপুত যোদ্ধা তরবারি হস্তে ভীষণ আহবে প্রমত্ত হইল। রণক্ষেত্র শোণিত-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া গেল। মোস্‌লেম ও রাজপুতের পদভরে পৃথিবী কম্পিতা এবং রণ-হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল।

গুজরাট পক্ষে ২০ হাজার এবং চিতোর পক্ষে ৫০ হাজার সৈন্য নিপাতেরী

পরে রাণা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিলেন। চিতোর নগরী সম্পূর্ণ সেনাপতি তাহের বেগ কর্তৃক অধিকৃত হইল। মালবের সুলতানের অনুরোধে রাজপুরী লুণ্ঠিত হইল না। রাণা সাংঘাতিক রূপে আহত এবং শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। রাণার সমস্ত দম্ভ এবং গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল।

আহ্‌মদ শাহ্ সমস্ত চিতোর রাজ্য দখল এবং রাণার প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, রাজপুরীতে আর্তনাদ উত্থিত হইল। রানী লক্ষ্মীবাঈ শিবিকা-আরোহণে সুলতান-সমীপে করিয়া রুক্মিণীবাঈকে সুলতানের চরণে নিক্ষেপ করিয়া দয়াপ্রার্থী হইলেন।

পরমা-সুন্দরী রমণীয় কান্তি কমনীয় দেহ অল্পবয়স্কা রুক্মিণীবাঈ-এর নেত্রকুবলয়ে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া মহানুভব সুলতান মমতা এবং করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাণার প্রাণদণ্ড মৌকুফ এবং অর্ধরাজ্য মহারানীকে প্রদান করিলেন। মহারানী লক্ষ্মীবাঈ গুজরাট-পতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ কাল পরম সমাদরে ভোজ দান করিলেন। গুজরাটেশ্বরীর জন্য এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা এবং এক জোড়া হীরক-কঙ্কণ উপহার প্রদান করিলেন।

অতঃপর রানী রাখী দান করিয়া আহ্‌মদ শাহ্‌কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। সুলতান আহ্‌মদ শাহের মহানুভবতা দর্শনে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এরূপভাবে শত্রুরাজ্য জয় করিয়া অর্ধাংশ দান করা সাধারণ উদারতার দৃষ্টান্ত নহে।

গুজরাট সরকারের পক্ষ হইতে চিতোরে একটি রমণীয় জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠা করা হইল। লক্ষ টাকা আয়ের একটি পরগণা আহ্‌মদ রেজা খাঁকে প্রদত্ত হইল। চিতোরের সর্বত্র অবাধে গো-কোরবানীর আদেশ প্রচারিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্নাজালে ধরাতল, খ-মণ্ডল ও দিগঞ্চল আলোকিত হইয়াছে। মেদুর সমীরণ ঝিরঝির করিয়া বৃক্ষের পল্লবাবলী এবং রমণীদিগের চেলাঞ্চল আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গুজরাটের উপকূলবর্তী নির্মলনীলিম সাগর-সলিলে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। মনে হয়, কে যেন দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে তরল কাঞ্চনধারা ঢালিয়া দিতেছে। নীল আকাশের ভালে নির্মল চন্দ্রের শোভা আর সাগর-সলিলে তার কনক-আভা দিগঞ্চলে তার বিমল-বিভা মৃদু পবনে নীরধির

জলরাশিতে মৃদু মৃদু তরঙ্গ উঠিয়াছে।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নোজ্জ্বল নীল গগনের নীচে মুক্ত বারিধির স্বর্ণোজ্জ্বল বক্ষে একখানি স্বর্ণভূষাভূষিত রাজকীয় বিহার-তরণী ভাসিতেছে। এই বিহার-তরণীতে বেগম আর্জুমন্দ বানু এবং রানী লক্ষ্মীবাঈ সখীগণ-সহ আনন্দরসে মাতোয়ারা। বেগম ও রানী উভয়েই কবি-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যে বিমল আনন্দরস ভোগে সমর্থা ছিলেন।

নীল সাগরের মুক্ত দৃশ্য, মৃদু সমীরের মুক্ত-প্রবাহ, চন্দ্রমার মুক্ত শোভা, আকাশের মুক্ত আভা সকলের মানসদ্বারকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সাগরবক্ষে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের জ্যোৎস্না-লহরীর মন-মাতানো প্রাণ-জুড়ানো দৃশ্য যে দেখে নাই, সে এই রমণীয় শোভার চারুতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। লহরে লহরে বায়ু বহিতেছে—লহরে লহরে ঢেউ উঠিতেছে, আর তার সঙ্গে সিন্ধুবক্ষে সহস্র চন্দ্রভঙ্গ হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তরণী দুলিতেছে—হেলিতেছে এবং নাচিতেছে। সেই দোলনে রমণীদিগের কর্ণের ও নাসার হীরককুণ্ডলী দুলিতেছে। ছাদের উপরে বহু মূল্যবান্ গালিচার উপর বেগম, রানী, স্বর্ণবাঈ, রুক্মিণী এবং নূরউদ্দীন পায়চারি করিতেছেন। পূর্ণিমার মধুময় শোভা সন্দর্শন করিয়া বেগম আর্জুমন্দ বানু সখীগণকে নাচ-গানের অনুমতি দিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ বাদিকা জোহরা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিল। মরি! মরি! কি চমৎকার সেতার বাদন! সেতারের তারগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া করুণ-মধুরে গমকে গমকে মূর্ছনায় সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেতার যখন মাতিয়া উঠিল, তখন সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা জাহান-জান্ তাহার অলঙ্কারনিন্দিত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়া উঠিল :

সখি রে!

এ নব বসন্তে আজি
পরান আকুলি ধায়,
কুসুম-সুরভি মাখি
মলয়া বহিয়া যায়!
ফুলগুলি দুলে দুলে
গায়ে গায়ে পড়ে হেলে,
সে পীরিতি-লীলা হেরি
মানস অধীর, হায়!

কাহার মূরতি বাঁকা
মানস-আকাশে ফুটে,

মনোলোভা কার শোভা
আজি রে রাঙিয়া উঠে।

আঁধার কালিমা টুটে
ললিত লাবণি ফুটে
পরান ধায় রে ছুটে
কাহার সে রাঙা পায়।

গান শুনিয়া সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আবার আর একটি গাহিতে বলিলেন। আহান্-জান্ আবার মধুর কণ্ঠে গাহিল ঃ

সুখদ পূর্ণিমা তিথি
মধুর মধুর নিশি!
কনক জোছনাজালে
হাসিতেছে দশদিশি!
নীলিম গগন-কোলে
চাঁদ হাসে ঢলে ঢলে;
উছলে সাগরজলে
মরি কি রূপের হাসি!
শীতলতা মাখি' গায়
সমীর বহিয়া যায়,
জুড়াইয়া নীল কায়
নাচাইয়া ঢেউরাশি!

কার হাসি লয়ে আজি
হাসিতেছে শশধর!
কাহার সৌন্দর্য মাখি
চাঁদ এত মনোহর।

সে যে এই বিশ্ব-বঁধু
সে যে পরাণের মধু
সে যে গো বিধুর বিধু—
স্মর তারে দিবানিশি।

গায়িকা জাহান-আরা আবার কিছুক্ষণ থামিয়া গাহিলেন,—

মাখাইয়া দাও প্রেমের পরাগ
বুলাইয়া দাও স্নেহের সোহাগ
বাজাও প্রাণের রাগিণী বেহাগ
ওহে আমার স্বামি!
দিয়াছ হে ভাষা, দাও তবে তান
দিয়াছ ছন্দ, দাও লয়-মান
পরান-বীণায় তোমারই গান
বাজুক দিবস-যামি।

শশী তপন হউক মগ্ন
তোমার চরণ-তলে.
দাঁড়াও তুমি হইয়া নগ্ন
হৃদয়-পদ্ম-দলে!
টানিয়া লও হে বুকের মাঝে
টুটিয়া সকল শরম লাজে,
লাগাও তোমার সেবার কাজে
যদিও অধম আমি।

জাহান-আরার মধুর কণ্ঠের সুধারাগিণীর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ এবং প্রীত হইলেন। অতঃপর সখীগণ নানা শ্রেণীর সঙ্গীত ও নৃত্যে বেগম ও রানীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ চন্দ্রকর-ফুল্লরজনীতে সঙ্গীতের রাগিনী যেন উর্মিমালার সঙ্গে সারা সিন্ধুবক্ষে এবং পবন-প্রবাহে গগন-কক্ষে ধীরে ধীরে বাজিতে লাগিল।

রুক্মিণী এবং নূরউদ্দীন পায়চারি করিতে করিতে নীচের তলায় নামিয়া গেল। জাহাজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমুদ্র-তরঙ্গ জোছনা মাখিয়া কেমন নৃত্য করিতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিল। দুইজনেই এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। উভয় হৃদয়ই এখন প্রথম প্রভাত-সমীর-চুম্বিত পদ্মের ন্যায় স্ফুটনোন্মুখ। প্রেম-সৌরভে উভয় হৃদয় ক্রমশঃ মাতিয়া উঠিতেছে। তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গগুলি কেমন করিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, মৎস্যগুলি চাঁদের আলোকে পরম পুলকে কেমন করিয়া খেলা করিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া মাতিয়া উঠিল।

রুক্মিণী চাঁদের শোভা দেখিতেছে আর চাঁদের কনক আভা তাহার গোলাপী-চাঁপা বর্ণবিশিষ্ট কোমল মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। চঞ্চল সমীর সোনালী

অঞ্চলযুক্ত ওড়না উড়াইয়া কেশ দোলাইয়া ফুরফুর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কুমারী চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অপূর্ব ভঙ্গিমা সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা কুমারের দৃষ্টি সেই চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত মুখের উপরে পতিত হইল। কুমার দেখিল রুক্মিণীর মুখখানি কি অতুলনীয় মনোহর! চাঁদ বা কমল কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

আয়ত লোচনযুগলের দৃষ্টিতে কি প্রশান্ত প্রেম পরিপূর্ণ! সে-দৃষ্টিতে কেবল অমিয়-স্নিগ্ধ-কোমল-দীপ্তি এবং মৌন পরিতৃপ্তি বর্ষিত হইতেছে। সে দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু প্রখরতা নাই; মদিরা আছে, কিন্তু মাদকতা নাই; ভাবুকতা আছে, কিন্তু কামুকতা নাই, তাহা যেন অপার্থিব—তাহার সহিত এ মর-জগতের কোন ক্ষুদ্রতা ও কুটিলতার সংস্রব নাই।

নূরউদ্দীন দেখিয়া দেখিয়া ভাবে মজিল এবং প্রণয়-রসে ডুবিয়া গেল। সে দেখিল—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিল—এই দৃষ্টির মধ্যেই যেন তাহার নিজের দৃষ্টি সংবদ্ধ রহিয়াছে। মনে হইল, জগতে আসিবার পূর্বে তাহারা যেন স্বর্গের নন্দনকাননে একবৃন্তে যুগ্ম পারিজাত রূপে ফুটিয়াছিল।

নূরউদ্দীন যখন এইরূপ বিভোরভাবে রুক্মিণীকে দেখিতেছিল, সহসা সেই সময় বাতাসে রুক্মিণীর বক্ষের অঞ্চল উড়িয়া যাওয়ায় চকিত হইয়া উঠিল। সহসা সেই চকিত-দৃষ্টি নূরউদ্দীনের চোখে পড়ায় নূরউদ্দীন সলজ্জভাবে শিশিরভারাবনত-মস্তক-পুষ্পকলিকার ন্যায় অবনত-মুখ হইয়া পড়িল। কুমারীও নূরউদ্দীনের সলজ্জভাবে ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া পড়িল। এই লজ্জাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের হৃদয়ের পরতে পরতে প্রেমের স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কুমার কুমারীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল : খোদা তোমাকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন!

রুক্মিণী : কেন, আপনিও তো পরম সুন্দর। আপনার ন্যায় এমন সুশ্রী সুঠাম সুন্দর পুরুষ আর একটিও তো দেখা যায় না।

নূরউদ্দীন : হতে পারে, আমি তোমার চেয়ে পরম সুন্দর; কিন্তু বস্তুতঃ সে তোমার চোখের গুণ।

রুক্মিণী : তা হলে আপনি যে আমাকে পরমা সুন্দরী দেখে থাকেন, সেও আপনার চোখের গুণ।

নূরউদ্দীন : যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে সুন্দর দেখে; তার প্রত্যেক কার্যই মনোরম বলে বোধ হয়। তার চলনটি সুন্দর, কথাটি মিষ্ট, তার মূর্তি মনোহারিণী, ভঙ্গিমা প্রাণভোলিনী, সে হাসলে জ্যোৎস্না বর্ষে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে।

সুতরাং আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে সুন্দর দেখি।

রুক্মিণী : নিশ্চয়ই।

নূরউদ্দীন : তবে তুমি আদতে সুন্দরী নও!

রুক্মিণী : তা আপনি নিজেই বলতে পারেন। আমি সুন্দরী কি অসুন্দরী, আমি নিজে তা কেমন করে বলব।

নূরউদ্দীন : আমাকে যে পরম সুন্দর বলে বোধ কর, তাও তবে নিশ্চয়ই ভালোবাসার জন্য?

রুক্মিণী এবার লজ্জায় অবনতমুখী হইল। তাহার মনোহর গণ্ডদ্বয় বসরাই আনারের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিল। নূরউদ্দীন তদ্দর্শনে বলিলেন : কি ব্যাপার! এবার যে চুপ করে রইলে? তবে বুঝি আমাকে ভালোবাস না?

কুমারী রুক্মিণী তথাপি কোন কথা না বলিয়া মুখের উপর অঞ্চল ঈষৎ টানিয়া মুখ আবৃত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অন্তরের হাসি মুখে ফুটিয়া পড়িল, মুখখানি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই ঔজ্জ্বল্যেই কুমারের হৃদয়ে প্রণয়ের সৌদামিনী সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কুমার দুই বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কুমারীর অধরে অধর স্থাপন করিলেন। উভয়ের হৃদয়ের স্তরে স্তরে মধুরে মধুরে সুধা-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয় এক হইল। কুমারীও প্রতিদান দিয়া কুমারকে প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর এই প্রেম যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া আর কাহাকেও পাণিদান করিবেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং রাণা উদয়সিংহ নিভৃত কক্ষে বসিয়া কথোপকথনে ব্রত। একটি মখমলমণ্ডিত সোফায় উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়াছেন।

রানী বলিলেন : বড় বিষম প্রমাদ। একই সময়ে জয়পুর এবং মালওয়া হতে রুক্মিণীর জন্য দূত এসেছে। এক্ষণ কি উপায় অবলম্বন করা যায়? আমি তো নূরউদ্দীনকেই কন্যা দিব বলে বেগম আর্জুমন্দ বানুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। নূরউদ্দীনকে আমার নিজের পুত্র-তুল্য বরাবর স্নেহ করে আসছি। এক্ষণে জয়পুরের রাজকুমার অরুণসিংহকে কিরূপে কন্যা দান করা যেতে পারে?

রাণা : জয়পুরের রাজকুমার অরুণসিংহের সাথে স্বর্ণবাঈ-এর বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করে কৃতকার্য হই নাই। জয়পুরেশ্বর রুক্মিণীবাঈ-এর সাথেই পুত্রের

বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। এদিকে মালবপতিও নূরউদ্দীনের জন্য রুক্মিণীর প্রার্থী। আমি তাঁকেও বুঝিয়ে পত্র লিখেছি। কিন্তু তিনি তো আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে বোধ হয় না।

রাণী : রুক্মিণীকে নিয়ে বিষম বিপদ দেখছি। এ সূত্রে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে। এদিকে স্বর্ণময়ীকে আর গৃহে রাখা যায় না। সেনাপতি রুমী খাঁকেই আর কতদিন স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রাখা যায়।

রানী : সেনাপতিকে কন্যাদান করলে, রাজপুত রাজাদিগের নিকট শিশোদীয় কূলের উন্নত মস্তক অবনত হবে না কি?

রানী : আমার মতে মস্তক অবনত না হয়ে উন্নতই হবে। রাজপুতানার কোন্ রাজা আছেন, যিনি মুসলমানকে কন্যা দান করেন নাই? মালবের সুলতান-বংশে কন্যাদান করলে যদি কলঙ্ক না হয়, তবে পরাক্রান্ত ও বিপুল প্রতিষ্ঠশালী তুর্কী রাজবংশোদ্ভব বীরকুলর্ষভ রুমী খাঁকে কন্যাদান করলে অগৌরব হবে কেন?

রাণা : অগৌরব না হতে পারে, কিন্তু অন্য আশঙ্কার কারণও আছে।

রানী : কি আশঙ্কা?

রাণা : অবশ্য তা শুধু আমার মনের সন্দেহ। রুমী খাঁ যেরূপ সুদক্ষ ও তেজস্বী পুরুষ, তাতে পরিশেষে এ রাজ্যগ্রাসে উদ্যত হওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নহে।

রানী : পুত্রাদি না জন্মিলে কন্যাই তো রাজ্যাধিকারিণী হবে, তাতে দুঃখ করবার কি আছে?

রাণা : কন্যার হস্তে রাজ্য গেলে, কার্যতঃ তা রুমী খাঁর হস্তেই পতিত হবে। রুমী খাঁ মুসলমান ; তার প্রভাবে এ রাজপুরীতে হিন্দুয়ানীর কোনও প্রভাব থাকবে কি?

রানী : নাই বা থাকল, আমাদের জীবদ্দশায় তো আর ঘটবে না। আর যে অবস্থা দেখছি, তাতে সমস্ত দেশের লোকই যে ক্রমশঃ ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রানা : তা ভবিষ্যতের বিষয়। উপস্থিত বর্তমান দেখেই সমস্ত কার্য করতে হবে।

রানী. : এটা ঠিক নয়। ভবিষ্যৎ ভেবেই সমস্ত কার্য করা উচিত। আর রুমী খাঁকে কন্যাদান করলে, বর্তমানেও শত্রুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। রুমী খাঁ রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

রাণা : তবে রুক্মিণী ও স্বর্ণবাঈ-এর বিবাহ এক সঙ্গেই সমাধা করা কর্তব্য। কিন্তু রুক্মিণীকে মুসলমান-গৃহে দান করতে আমার আদৌ রুচি নাই। রুক্মিণীকে

অরুণসিংহের করেই সমর্পণ করব। আশা করি, অন্তত তুমি বিরোধী হবে না। আমি যখন তোমার অনুরোধে স্বর্ণবাঈকে রুমী খাঁর হস্তে দান করতে স্বীকৃত হচ্ছি, তুমিও তখন আমার অনুরোধে রুক্মিণীকে জয়পুরের যুবরাজ-করে অর্পণ করতে সম্মত হও।

রানী : সোলতান রোকনউদ্দীন যদি এতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন, তবে বড়ই প্রমাদ। জয়পুর অপেক্ষা মালবপতির সহিত মিত্রতা রক্ষা করাই অধিকতর মঙ্গলজনক।

রাণা : সে যা হোক, তর্ক-বিতর্ক করে তোমার সাথে জিতবার শক্তি নাই। তবে আমার অনুরোধ যে, তুমি এ বিষয়ে আমার মতেই মত দাও।

রানী : আচ্ছা, তোমার মতেই মত দিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যাপার নিয়েই আবার একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে, এই ভাবনায় আমি অস্থির হচ্ছি।

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রাজকীয় আড়ম্বর ও ধুমধামের সহিত স্বর্ণবাঈ-এর সঙ্গে রুমী খাঁর এবং রুক্মিণীবাঈ-এর সঙ্গে জয়পুরের যুবরাজ অরুণসিংহের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রুক্মিণীবাঈ অরুণসিংহকে বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, কলা-কৌশল খাটাইয়া রুক্মিণীবাঈকে কোনও রূপে জোর-জবরদস্তিপূর্বক জয়পুরের রাজকীয় বাহনে তুলিয়া দেওয়া হইল। রুক্মিণীর মনোবিকার দেখিয়া রাণা ও রানী উভয়ে নিতান্ত বিচলিত হইলেন। আতসবাজী পোড়াইতে পোড়াইতে, তোপ ও বন্দুক ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অরুণসিংহ রুক্মিণীবাঈকে লইয়া জয়পুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বিবাহের সমস্ত উৎসবই রুক্মিণীবাঈ-এর চক্ষে একান্ত বিষময় ও পীড়াদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সখীগণ এবং ধাত্রীমাতা রুক্মিণীকে নানারূপ প্রবোধবচনে বুঝাইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের সেই সমস্ত উপদেশের এক বাক্যও রুক্মিণীর কর্ণে প্রবেশ করিল বলিয়া বোধ হইল না। জয়পুরের রাজ-অন্তঃপুরে রুক্মিণীর মনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রকারের রঙ্গরস ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হইল। সখীরা প্রাণপণ যত্ন এবং চেষ্টায় রুক্মিণীবাঈ-এর মনের গতি ফিরাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল।

পান-বাদ্য আমোদ-আহলাদ এবং নানা প্রকারের তামাসার আয়োজন হইতে লাগিল। উদ্যান-বিহার, নৌ-বিহার এবং বন-বিহারের নূতন নূতন ধরনের আয়োজন হইতে লাগিল। অরুণসিংহ কুমারী রুক্মিণীবাঈ-এর মনোরঞ্জনের জন্য

অহরহঃ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যুবতীকে যৌবনের সরস-বিলাস সম্ভোগে মাতোয়ারা করিবার জন্য অনেক কাণ্ড-কারখানা করা হইল।

কিন্তু হায়! সমস্তই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইল। রুক্মিণীবাঈ দিন দিন আরও গম্ভীর এবং নিঃসঙ্গ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী ধাত্রীমাতা মঞ্জুলিকা বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দিবারাত্র রুক্মিণীকে নূরউদ্দীনকে ভুলিবার জন্য নানা উপদেশ দিতে এবং অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! ফল ক্রমশঃই বিপরিত ফলিত লাগিল। নূরউদ্দীন ব্যতীত রুক্মিণীর আর কোনও ধ্যান-জ্ঞান রহিল না। ধাত্রী মঞ্জুলিকা ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া উদয় সিংহ এবং রানী লক্ষ্মীবাঈকে বলিয়া কন্যা-জামাতাকে চিতোরে আনয়ন করিলেন। চিতোরে আসিবার পরে লক্ষ্মীবাঈ কন্যাকে অনেক প্রকারে প্রবোধিত করিলেন। কিন্তু রুক্মিণীর একই কথা, "একটি প্রাণ কয় জনকে দিব? নূরউদ্দীনকে যে হৃদয় ধর্ম সাক্ষী করে দান করেছি, সে-হৃদয় অন্যাকে কেমন করে সমর্পণ করব?"

কন্যার উত্তর শুনিয়া রাণা ও রানী উভয়ই হতবুদ্ধি এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি রুক্মিণীর মন পরিবর্তনের জন্য অনেক পূজা এবং হোম করা হইল। কত রকম মন্ত্র-তন্ত্র ছিটে-ফোটার যে শ্রাদ্ধ হইল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু রুক্মিণীর মতি-গতির কিছুমাত্রও পরিবর্তন ঘটিল না। রুক্মিণী সূর্যমুখীর ন্যায় একনিষ্ঠ এবং নলিনীর ন্যায় ঐকৈকচিত্তই রহিল। যৌবনের খর চাঞ্চল্য, ভোগের কামনা, বিলাস-বাসনা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, গুরুজনদিগের গুরু গঞ্জনা, পরিচালিকাদিগের নিন্দা-ঘৃণা কিছুতেই তাহাকে নূরউদ্দীনের প্রেম হইতে একবিন্দুও টলাইতে পারিল না।

রুক্মিণী দেবপূজার ধ্যানে এবং পুস্তকপাঠে তাহার জীবনের ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন দিনগুলিকে ক্রমশঃ ধীর ও সংযতভাবে কাটাইতে লাগিল। বাহিরের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ হৃদয়ের কোণে জমাট বাঁধিতে লাগিল। তরুণী তারুণ্যকে গাম্ভীর্য দিয়া কতকটা ঢাকিয়া ফেলিলেন। সকলেই বুঝিল, ধর্ম-চর্চা এবং ব্রহ্মচর্য করিয়া রুক্মিণী জীবন-বেলা কাটাইয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পাইতেছেন। রুক্মিণীর এই ধর্ম-চর্চা এবং গম্ভীর ভাব দেখিয়া রাণা এবং রানী উভয়েই দারুণ অন্তর্দাহকর দুঃখের অন্ত মধ্যেও একটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। সূর্যমণ্ডল রক্তরাগ ধারণ করিয়াছে। সোনালী কিরণে আকাশের গায় মেঘের অঙ্গে কত রং-বেরঙ্গের চিত্র সৃষ্টি হইতেছে। সারাদিন উষ্ণ

বায়ু-প্রবাহের পরে সন্ধ্যার ঈষৎ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সুলতান রোকনউদ্দীন এই প্রকার মধুর সন্ধ্যায় সারাদিনের রাজকার্যের গুরু পরিশ্রমের পরে দেহ-মনের শ্রান্তিদূর-মানসে আরামবাগ নামক প্রাসাদ-সংলগ্ন রমণীর উদ্যানে বায়ু সেবনে বেগম-সহ নির্গত হইয়াছেন।

উদ্যানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া পবন-প্রবাহে গন্ধ ঢালিতেছিল। সরোবরের নির্মল টলটল জলে মৎস্যগুলি দলে দলে উল্লম্ফনপূর্বক বিচরণ করিতেছিল। সুলতান ও বেগম দু'জনে সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন এবং মৎস্যরাজির ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু ঠাণ্ডা হইবার পরে সুলতান বলিলেন ঃ বেগম! নূরউদ্দীনের বিবাহের আয়োজন সমস্তই পণ্ড হতে চলল। বিবাহের জন্য আর কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

বেগম ঃ কি যে করা যাবে, এই-ই তো সমস্যা! কমবখত কাফের কথা দিয়ে শেষে কথা রক্ষা করল না।

সুলতান ঃ ছেলেটি রুক্মিণীর রূপের নেশায় একেবারে মেতে গিয়েছে।

বেগম ঃ মাতবার তো কথাই। এত মেশামেশি এবং ভালোবাসাবাসি, তার উপর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর আপনা হতে কন্যাদানের কামনা। এতে যুবক ছেলের পক্ষে আর বিশেষ দোষ কি? তখন এতটা ঘনিষ্ঠতা না করলেই দোষ ঘটত না।

সুলতান ঃ সে কথা তো ঠিক। কিন্তু মানুষ তো অন্তর্যামী নয়। রাণা যে এরূপ বেঈমানী করবে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। কাফেরকে কখনও বিশ্বাস করতে নাই। কথায় বলে—'উঝড়ী নয় গোশ্‌ত আর হিন্দু নয় দোস্ত।'

বেগম ঃ মেয়েটি কিন্তু ঠিক।

সুলতান ঃ সে নাকি আর জয়পুরে যায় নাই। এখন নাকি ব্রহ্মচারিণীর বেশে সর্বদাই তপ-জপে দিন কাটায়। কি বিষম ব্যাপার!

বেগম ঃ নূরুউদ্দীন এবং রুক্মিণী উভয়ের সংকল্প এবং প্রতিজ্ঞা একই রূপের।

সুলতান ঃ কারাগারে দিয়ে তো অনেক পীড়ন করা হল; এবার তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে অনুরোধ-উপরোধ করে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করবার চেষ্টা দেখ।

বেগম ঃ তা কি আর কম করছি! কিন্তু তা'র দুর্জয় সংকল্প যে কিছুতেই টলে না!

সুলতান ঃ যে-রূপেই হোক টলাতে হবে। নতুবা রাজ্য-সিংহাসন সমস্তই বৃথা। আর বিবাহ না করলে বংশই বা থাকবে কিরূপে?

বেগম ঃ আমার জীবনে আর কোনও আরাম নেই। নূরউদ্দীনের ভাবনাই আমাকে কবরে নিয়ে যাবে।

সুলতান ঃ তুমি পূর্বে ভাবলে এখন আর ভাবতে হতো না।

বেগম ঃ কৈ? আপনিও তো ভাবেন নাই। একেবার সাবধান করে দিলেও তো আজ তার শোক্‌রানা আদায় কর্‌তাম।

সুলতান ঃ সেটাই তো মস্ত ভুল। সে যা হোক, সুলতান আহ্‌মদ শাহের কন্যা নূরন্নেহারের কাছে রুক্মিণী দাঁড়াইতেই পারে না। নূরকে যদি একবার দেখান যেত, তা হলে বোধহয় রুক্মিণীর নেশা ছুটে যেত।

বেগম ঃ ওগো! এ তো নেশা নয়, এ যে প্রতিজ্ঞা পালন। উভয়ে উভয়কে নাকি ধর্মসাক্ষী করে মনোনয়ন করেছিল।

সুলতান ঃ ও সব রেখে দাও। চোখে ভালো এবং মনে মিঠা লাগাই সমস্ত প্রতিজ্ঞার মূল প্রতিজ্ঞা। যৌবনে রূপজ মোহের প্রভাব বড্ড বেশী।

বেগম ঃ আমার কিন্তু মনে হয়, রূপজ মোহ অপেক্ষা এখানে প্রতিজ্ঞার মোহই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। নর্তকী বিলাসিনী এবং কত রূপবতী ছুকরীদের দ্বারা নূরকে তো আর কম পরীক্ষা করিনি। পয়গাম্বর হজরত ইউছুফ (আঃ)-ও এরূপ কঠিন পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন না। তাঁকে শুধু এক জোলেখার হাতে পড়্‌তে হয়েছিল; আর নূরুকে কত জোলেখা, কত মোহিনী এবং কত রতি দ্বারাই ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছেন, তা একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন। কিন্তু বাছা আমার সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছে! কেউই তার চরিত্র নষ্ট করা দূরে থাক, মলিন পর্যন্ত কর্‌তে পারেনি।

সুলতান ঃ তবে কি নূরুর এ দুর্জয় সংকল্প টল্‌বে না? রুক্মিণী ব্যতীত সমস্ত নারীই তার পক্ষে হারাম বলে জ্বলন্ত বিশ্বাস। তবে উপায় কি?

বেগম ঃ খোদা কি বিষম সঙ্কটেই ঠেকিয়েছেন!

এই পর্যন্ত কথোপকথনের পরেই বেলা ডুবিল। মসজিদের উচ্চ মিনার হইতে আজান-ধ্বনি উত্থিত হইয়া পার্থিব-মোহমগ্ন মানবকে চিরজীবনের পথে ডাকিতে লাগিল। সুতরাং সুলতান ও বেগম মগরেবের নামাজের জন্য অজু করিতে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তোরে আজ হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত। কুমার অরুণসিংহ বিপুল লোক-লস্কর সহ রুক্মিণীকে নিজ বাটিতে লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। রাজবাটিতে বাহিরে বাহিরে জামাতার আদর অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়! ভিতরে ভিতরে রাজা ও রানী এবং রাজ-পরিবারের

আত্মীয়-স্বজন-গণের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া গিয়াছে। রানী লক্ষ্মীবাঈ কপালে হাত দিয়া গৃহকোণে ভাবিতেছেন, জামাই আসিয়াছেন, পরম সুখের বিষয়। কিন্তু হায়! কন্যা যে জামাইয়ের নাম শুনিয়াই যার-পর-নাই ম্লান ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে!

রুক্মিণী প্রাণান্তেও জয়পুরে যাইতে রাজী নয়। সখীরা এবং রানী অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু রুক্মিণীর সেই একই কথা! সে ধর্ম ও সতীত্ব নাশ করিতে পারিবে না। নূরউদ্দীনই তাহার একমাত্র স্বামী। প্রাণান্তেও সে অপর পুরুষের মুখ দর্শন করিবে না। একান্ত বাড়াবাড়ি করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। কি বিষম ব্যাপার! কি ভয়ানক অবস্থা!

তিন দিন পর্যন্ত অরুণসিংহ চিতোরে অবস্থান করিলেন। রাণা উদয়সিংহ জামাতাকে আদর-অভ্যর্থনায়, যত্ন ও সমাদরে প্রাণপণে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলেন। কিন্তু অরুণসিংহের সংকল্প টলিল না। তিনি রুক্মিণীকে না লইয়া বাটি ফিরিবেন না। স্বেচ্ছায় রুক্মিণীকে দান না করিলে, যুদ্ধ করিয়া জবরদস্তিপূর্বক তাহাকে লইয়া যাইবেন। জামাতার সংকল্পে উদয়সিংহ নিতান্ত বিচলিত হইলেন। জামাতার সহিত যুদ্ধ হইলে কলঙ্কে দুনিয়া ভরিবে। রাণা উদয়সিংহ দুঃখে ক্ষোভে যার-পর-নাই মর্মাহত এবং ব্যাকুল হইলেন। পিতা আত্মহত্যায় প্রস্তুত দেখিয়া অবশেষে জয়পুরে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন।

জয়পুর-রাজকুমার, যথাসময়ে রুক্মিণীবাঈকে লইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। রুক্মিণীর সঙ্গে তাহার সখী অপর্ণা পাঁচজন দাসী সঙ্গে লইয়া গমন করিল। রুমী খাঁর জয়পুর রাজধানী দেখিবার জন্য নিজের আগ্রহ ছিল। এক্ষণে জয়পুরপতি, জয়পুরের কেল্লা ও সৈন্য পরিদর্শনের জন্য তাঁহাকে সাদর আহ্বান করায়, এই সঙ্গে তিনিও গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন গুজরাটপতি সুলতান আহ্‌মদ শাহের কন্যার সঙ্গে নূরউদ্দীনের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নূরউদ্দীন তাঁহার কার্যে কিছুতেই অসম্মত হইবে না। বিশেষতঃ, গুজরাটের শাহ্‌জাদী যেরূপ বে-মেছাল খুবসুরত এবং আকেলমন্দ, তাহাতে তাহাকে বিবাহ করিতে কুমার কখনই ওজর করিবেন না। কিন্তু কুমার নূরউদ্দীন যখন একেবারেই কঠোরভাবে

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, তখন সুলতান রোকনউদ্দীন যার-পর-নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

মন্ত্রীবৃন্দ, কুমারের শিক্ষকগণ এবং বয়স্য সকলে নানারূপে কুমারকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শাহাজাদার মতের পরিবর্তন হইল না। রাগান্ধ হইয়া কুমারকে কারাগারে কয়েদ করিয়া সাধারণ কয়েদীদিগের ন্যায় কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রহরিগণ যাহাতে কোনও রূপে শাহজাদার প্রতি গোপনে বা প্রকাশ্যে অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে, সেজন্য প্রহরীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিয়া দেওয়া হইল।

হায়! যে শাহজাদার সেবার জন্য শত শত দাসদাসী নিযুক্ত এবং ব্যস্ত থাকিত, আজ তিনি চোর-দস্যুর ন্যায় অতি কঠিন ও ক্লেশময় জীবন নিতান্ত হীনভাবে যাপন করিতে লাগিলেন। সুকোমল ও মূল্যবান্ রেশমী জামার পরিবর্তে নিতান্ত স্থূল কম্বলের জামা পরিতে দেওয়া হইল! সে জামা কুমারের অঙ্গে হুলের ন্যায় ফুটিতে লাগিল। যাঁহার মাথায় মণিমুক্তা খচিত মূল্যবান টুপি শোভা পাইত, তাঁহার মস্তকে স্থূল বস্ত্রের অতি সামান্য টুপি পরাইয়া দেওয়া হইল। নানা প্রকার নজিজ ও নফিছ খানা যাঁহার বর্তনে গড়াগড়ি যাইত, তাঁহার জন্য কেবলমাত্র যৎসামান্য গোশ্‌ত দিবার ব্যবস্থা হইল।

যে রাজকুমার কখনও নীচ কর্মে হস্তার্পণ করেন নাই এক্ষণে, রোজ সকালে এবং বিকালে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তাঁহাকে দস্তুরমত মাটি কাটিতে প্রবৃত্ত করা হইল। কুমারের দারুণ দুর্দশায় এবং কঠোর শাস্তিতে রাজপুরী, এমন কি রাজধানীর অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ শোকের হাহাকার পড়িয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই কুমারের মূর্তি যার-পর-নাই মলিন এবং শীর্ণ হইয়া পড়িল। কোমল কুসুম বৈশাখের খর রৌদ্রে মলিন না হইয়া কতক্ষণ থাকে? বোঁটাছেঁড়া পদ্ম কতক্ষণ অম্লান থাকে? কুমারের ক্লেশ ও দুঃখে মন্ত্রী ও আমীরগণ অশ্রুসিক্তনেত্রে সুলতানের নিকট কুমারের জন্য করুণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সুলতান রোকনউদ্দীনের চিত্ত কিছুতেই দ্রবীভূত হইল না। সুলতান স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, নূরউদ্দীন যতদিন বিবাহে সম্মত না হইবে, ততদিন কিছুতেই তাঁহার কারামুক্তি ঘটিবে না। যে ব্যক্তি এই অবাধ্য এবং দুর্মতিগ্রস্ত শাহ্‌জাদার কারামুক্তির প্রার্থনা করিবে, তাহাকেও কুমারের সহগামী হইতে হইবে।

সুলতানের কঠোরতা এবং দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। কিন্তু কুমারের নিদারুণ ক্লেশে রাজপুরীর গোলাম, বাঁদী, চাকর-নওকর, খোজা ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিষণ্ন এবং ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। রাজ্ঞী আর্জমন্দ বানুর চক্ষে শ্রাবণের ধারা যখন তখন বহিতে লাগিল। যে রাজপুরী অষ্টপ্রহর আনন্দ-কোলাহলে এবং

রঙ্গরসে উজ্জ্বল নাট্যশালাসম প্রতীয়মান হইত, এখন তাহা নীরস ও নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গোলাম-বাঁদীদিগেরও কাজকর্মে উৎসাহ ও স্ফূর্তি নাই। প্রাতঃসন্ধ্যা নহবতে এখনও বাজনা বাজে; কিন্তু তাহা কেবল করুণ রসই প্রকাশ করে। পূর্বে যে শাহানার সুরে প্রাণের পর্দায় পর্দায় অমিয়ধারা বহিত, এখন সে-সুর কেবল শোকের বিষ ঢালিয়া দেয়! ফুলের বাগানে এখনও ফুল ফুটে—গন্ধ ছুটে, ভ্রমর লুটে—কিন্তু সে-ফোটনে যেন শোভা নাই, সে-গন্ধে যেন মাদকতা নাই, সে-লোটনে যেন সৌন্দর্য নাই! ফলতঃ, দিবানিশি কেবল হারেমে রাজপুত্রের কারাক্লেশের কথার আলোচনা, তাহারই আলাপনা এবং তাহারই আন্দোলন!

কেহ যদি বলে, রাজপুত্র মলিন হইয়া গিয়াছেন, অমনি আর একজন বলে, শুধু মলিন কেন, হায়! তাঁহার চক্ষু দুটিও কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে! কেহ বা বলে—আহা! বাছার দুইটি গণ্ড বসিয়া গিয়াছে! এইরূপ সমালোচনায় শোকের তরঙ্গ ক্রমাগত বাড়িতেই থাকে। সরোবর-জলে লোষ্ট্রের পরে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন ঢেউ-এর উপর ঢেউ খেলিতে থাকে, তেমনি দাসী-বাঁদী এবং সখা-সখীদের মুখে কুমারের ক্লেশের ক্রম-আলোচনায় বেগমের মনে কেবল গম্ভীর তুফান বহিতে থাকে! পরে সে গম্ভীর তুফানে সকলের হৃদয়-তরণী তোলপাড় হইতে থাকে।

ক্রমাগত ছয় মাস কাটিয়া গেল। কুমারের কাঁচা সোনার মত বর্ণে কালিমার ছাপ পড়িতে লাগিল। প্রভাতের নির্মল পদ্মের মত বদনখানি কীটদষ্ট হিম-পীড়িত পদ্মের মত মলিন ও বিশ্রী হইয়া পড়িল। গণ্ডের লালিমা, চোখের ঔজ্জ্বল্য, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, দেহের লাবণ্য অনেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল! একদিন রাজধানীর বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারী ব্যথিত চিত্তে সুলতানের চরণ ধারণ করিয়া মুক্তি-প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সুলতান কঠোরভাবে সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। অগত্যা সকলে মিলিয়া কারাগারে যাইয়া কুমারকে বিবাহের জন্য নানারূপে বুঝাইলেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর রমণীবৃন্দ বুকভরা মায়ের মমতা লইয়া কুমারকে নানারূপ বুঝাইলেন। কাকুতি-মিনতি, স্নেহ-ভালোবাসা, উপদেশ-অনুরোধ সমস্তই যে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু হায়! কুমারের সঙ্কল্প টলিল না। সকলেই চমৎকৃত এবং বিস্মিত হইয়া পড়িল! অনেকেই বিরক্ত হইয়া বেওকুফ এবং বে-আক্কেল বলিয়া মনের দুঃখে সমালোচনা করিতে লাগিল! কেহ কেহ বলিল, চিতোরের কুমারী কি যাদু-ই করিয়াছে! কদাচিৎ দুইএকজন—যাঁহারা প্রেমরাজ্যের বিচিত্র ব্যাপার অবগত ছিলেন, তাঁহারাই কেবল এই একনিষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য মুক্তকণ্ঠে কুমারের তারিফ করিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ

কেহ বলিলেন, বোধ হয় মজনুঁ বা ফরহাদ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ তাহার উত্তরে গাহিল, তবে রুক্মিণীবাঈ বোধহয় পূর্বজন্মে লায়লা কিম্বা শিরি ছিলেন। রাজকুমারের দুঃখ-দুর্দশার জন্য সকলে মর্মান্তিক কষ্টবোধ করিলেও কুমার কখনও একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসও ত্যাগ করেন নাই। নীরবে কারাক্লেশ বহন করিয়া যৌবনের দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয়পুররাজ অরুণ সিংহ রুক্মিণীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। ক্রমাগত তিন দিন যাইবার পরে শিপ্রা নদীর তটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শিপ্রার তটে বিশাল কানন। সে-কাননে শত শত মৃগ বিচরণ করে। নানাজাতীয় ময়ূর, কুক্কুট, রিশাল এবং ধনেশপক্ষীও যথেষ্ট। শিপ্রাতে মৎস্য-শিকারেরও বিশেষ সুবিধা। সুতরাং অরুণ সিংহ এই বনে শিকারের জন্য রুমী খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিপ্রা-তটে এক মনোহর ভূখণ্ডে তাম্বু ফেলিলেন।

এই বনবিহার এবং মৃগয়ার পরমানন্দে দুইদনি কাটিয়া গেল। রাজপুত্র, রুমী খাঁ এবং সঙ্গের অন্যান্য শিকারী এবং সৈনিকগণ পরম উৎসাহে এবং আনন্দে দুই দিন কাটাইলেন। কত জাতীয় মৃগ, পক্ষী এবং মৎস্য শিকার করিয়া বীরপুরুষগণ চিত্তের আনন্দ বিধান করিলেন।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যা-সমাগমে সহসা মেঘের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে নির্মল নীলাকাশ, নীলাভ মেঘপুঞ্জে ছাইয়া গেল। সকলেই বুঝিল খুব বৃষ্টি হইবে। কেহ কেহ ভাবিল ঝড়-তুফান হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং তাম্বুরক্ষিগণ খুঁটি ও দড়ি দিয়া তাম্বুগুলি মজবুত করিয়া বসাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে চটাপট্ বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া মুষলধারায় বারিপাত আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্চভূমি হইতে জলস্রোত নিম্নে কল কল করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে বাতাস বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাতাস ভীষণ আকার ধারণ করিয়া গাছের ডালপালা ভাঙ্গিতে লাগিল। সেই দুর্যোগময়ী অন্ধকার যামিনীতে মনে হইতে লাগিল—যেন শত শত হস্তী বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদি উৎপাটন এবং শাখা-প্রশাখা ভগ্ন করিতেছে। পবনের হুঙ্কারে এবং ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এক প্রলয়কাণ্ডের সূচনা হইল। তাম্বুগুলির অধিকাংশ প্রদীপই নিভিয়া গেল। সাঁ করিয়া খুঁটি উপড়াইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া নদীতীরবর্তী তাম্বুগুলিকে

খণ্ড খণ্ড করিয়া ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল। লোকজনের মধ্যে মহা-শোরগোল এবং মহামারী কাণ্ড পড়িয়া গেল। এদিকে ক্ষুদ্রকায়া শিপ্রা নদী প্রবল বারিধারায় পূর্ণগর্ভা হইয়া তটদেশ বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। রাজকুমারের তাম্বু সহসা জলপ্লাবনে উৎপাটিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। রাজকুমার জলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। আর্ত চীৎকার শুনিয়া রুমী খাঁ বহুকষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

রাজকুমারী রুক্মিণীর তাম্বুতেও ভীষণ বেগে জলস্রোত প্রবেশ করিল! জিনিসপত্রসহ তাম্বুটি মুহূর্তমধ্যে জলসাৎ হইয়া ভাসিয়া গেল। ভৃত্য ও নওকরগণ তাম্বু রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও তীব্র স্রোতে ভাসিয়া গেল। কুমার এবং রুমী খাঁ সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে রুক্মিণীর তত্ত্ব লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুক্মিণীর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। বিষম আশঙ্কা-উদ্বেগ এবং দুর্যোগের মধ্যে ক্রমশ রজনী প্রভাত হইল। অশান্ত প্রকৃতির উদ্দাম আস্ফালনের পরে-তাহার প্রশান্ত নীল গগন-ভালো উষার শুভ্র আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। গাছে গাছে পাখীরা গাড় ঝাড়া দিয়া ডাকিয়া উঠিল।

উষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীবাঈয়ের জন্য মহা খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীর তীর ধরিয়া অনেক দূর অনুসন্ধান করা হইল। কত লোকের লাশ পাওয়া গেল, কত অর্ধমৃত জীবন্মৃত লোককে টানিয়া তুলিয়া উদ্ধার করা হইল; কিন্তু হায়! হতভাগিনী রুক্মিণীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অরুণ সিংহ এবং রুমী খাঁ যার-পর-নাই মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। কোন্ মুখে কি বলিয়া তাঁহারা মুখ দেখাইবেন? স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে পত্নীকে জলস্রোত ভাসাইয়া লইয়া গেল! বীর সেনাপতি জীবিত থাকিতে, প্রভু-কন্যা জলে নিমজ্জিত হইয়া ভাসিয়া গেল! এ লজ্জা, এ কাপুরুষতা, এ কলঙ্কের যে কিছু ইয়ত্তা নাই! যে শুনিবে সেই বলিবে, "কাপুরুষেরা নিজের জীবন লইয়াই ব্যস্ত ছিল! নারী-পত্নী-রাজকন্যা—প্রভু-কন্যাকে রক্ষা করিতে পারে নাই, করিবার কোনও চেষ্টা করে নাই!" পুরুষের পক্ষে, বিশেষতঃ বীরের পক্ষে ইহার অধিক কলঙ্ক আর কি আছে? এ কলঙ্ক অপেক্ষা মৃত্যু যে শতগুণে শ্রেয়ঃ। নিজের জীবনপাত করিয়াও রাজকুমারীকে বাঁচাইতে পারিলেও জীবন ধন্য হইত। হায়! কি ভীষণ অনর্থই সংঘটিত হইল!

ইত্যাকার চিন্তায় কুমার ও সেনাপতি এবং সহকারিগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং মলিন হইলেন।

কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামান্তে রুমী খাঁ এবং অরুণ সিংহ আবার ব্যাকুল চিত্তে

নদীর দুই তীর ধরিয়া বহুদূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কোথাও রুক্মিণীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তথাপি তাঁহারা অনুসন্ধানে ক্ষান্ত না হইয়া পাঁতি পাঁতি করিয়া নদীতট এবং নদীতীরস্থ বনভূমি তালাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্গের অনুচরগণও প্রাণপণ যত্নে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। নিশায় এক স্থানে কোনও রূপে তাম্বু পাতিয়া উদ্বেগের মধ্যে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হইতে আবার সকলে মিলিয়া রুক্মিণীর অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। কিন্তু হায়! বৃথা পরিশ্রম! বৃথা আশা!

অরুণ সিংহ হতাশ হৃদয়ে দেশে ফিরিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু রুমী খাঁর ঐকান্তিক অনুরোধে তৃতীয় দিবসও বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেন। চতুর্থ দিবস প্রাতে অরুণ সিংহ লোকজন-সহ স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। রুমী খাঁ সঙ্গের তিনজন ভৃত্য, পাঁচজন অনুচর এবং সাতজন দেহরক্ষী সহ রুক্মিণীর অনুসন্ধানে সেই শিপ্রা-তটে রহিয়া গেলেন। জয়পুর-যুবরাজ তাঁহাকে তৎসঙ্গে জয়পুরে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। 'রুক্মিণী নদীগর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছে, সুতরাং তাহাকে তালাশ করা বৃথা।'—সকলে দৃঢ়তার সহিত এইরূপ নৈরাশ্যজনক বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলেও রুমী খাঁর রুক্মিণীর প্রাপ্তি-আশা কিছুতেই লুপ্ত হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "রুক্মিণী নিশ্চয়ই ডুবে মরে নাই। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রুক্মিণীকে জীবন্মৃত অবস্থায় কেউ পেয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। আরও কিছুদিন অনুসন্ধান না করে আমি চিতোরে ফিরব না।"

রুমী খাঁকে অনুসন্ধানে বিরত করিতে না পারিয়া অরুণ সিংহ অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। রুমী খাঁ অনুচরগণসহ বনে বনে নদীতটে আরও কয়েক দিন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শিপ্রাতটে সেই ভীষণ ঝটিকাসঙ্কুল রাত্রিতে প্রবল প্লাবনে রুক্মিণী ভাসিয়া গিয়াছিল। ভাসিবার উপক্রমেই সৌভাগ্যবশতঃ রুক্মিণী একখণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাতাসের জোরে, ঢেউয়ের তোড়ে এবং স্রোতের ধারে রুক্মিণী তীরের মত বেগে ভাসিয়া চলিল। রুক্মিণী আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিলেও ঝটিকার উন্মত্ত তাণ্ডব এবং হুঙ্কারের মধ্যে কেহ তাহা শুনিতে পাইল না। যখন রুক্মিণীর অনুসন্ধান হইল, তখন সে পাঁচ মাইল দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি এইরূপে ভাসিতে হইবে ভাবিয়া রুক্মিণী কাষ্ঠের সহিত নিজের

শরীরটি বস্ত্র দ্বারা ভালোরূপে বাঁধিয়া হতাশ হৃদয়ে স্রোতে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ নদী-স্রোতের ভীষণ গর্জনে, তরঙ্গের ভীম তাড়নে, স্রোতের প্রবল ঘূর্ণনে ও ঝটিকার তর্জনে যে কিরূপ চমকিত, বিস্মিত এবং কম্পিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

দারুণ শীতে এবং আতঙ্কে রুক্মিণী ক্রমশঃ সংজ্ঞাশূন্যবৎ হইয়া পড়িল। নদীর প্রবল স্রোত এক রাত্রির ভিতরেই তাহাকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে লইয়া গেল। প্রত্যূষে একটি নিমজ্জমান বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় অবলম্বনের কাষ্ঠখণ্ড আটকাইয়া গেল।

একজন সন্ন্যাসী প্রাতঃস্নান করিতে আসিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপরে বালারুণ কিরণরঞ্জিত এক অপরূপ সুন্দরীর দেহ দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী সাঁতার কাটিয়া কাষ্ঠখণ্ড তটে তুলিয়া আনিয়া দেখিলেন, সুন্দরী মৃতবৎ অচেতন। তাড়াতাড়ি কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া রুক্মিণীকে সেক দিতে থাকেন। অর্ধঘণ্টা সেক দিবার পরেই রুক্মিণী চৈতন্য লাভ করে। সন্ন্যাসী অতঃপর তাহাকে বহু কষ্টে নিজের আশ্রয়ে লইয়া যাইয়া দুগ্ধ এবং ফলাদি সেবন ও আহার করাইয়া বিছানায় শায়িত করিয়া রাখেন। সমস্ত দিবারজনী নিদ্রার পর, রুক্মিণী অনেকটা সুস্থ এবং প্রফুল্ল হইয়া ওঠে।

সন্ন্যাসী রুক্মিণীকে সুস্থ হইতে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। রুক্মিণীর সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার জন্য সন্ন্যাসী বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর স্নেহ এবং যত্নে রুক্মিণী বেশ প্রশান্তভাবে সুস্থ দেহে দিন কাটাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর আশ্রমটি একটি সুন্দর হ্রদের তীরে অবস্থিত ছিল। বিশাল বিজন অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্যে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবর; সেই সরোবরতটে বহুদিনের একটি কালী-মন্দির। মন্দিরটি পুরাতন হইলেও তখন প্রায় অক্ষত এবং মজবুত ছিল।

এ বিজন-বনে কে কবে কি উদ্দেশ্যে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা কেহই ঠিক জানিত না। অনেকে বলিত যে, রঘুনন্দন বলিয়া একজন ডাকাতের সর্দারই মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। সে নাকি তাহার লোক-লস্কর লইয়া এই বনেই বাস করিত। তাহার ভয়ে তখন এ অঞ্চল দিয়া মানুষ দূরে থাকুক, পক্ষীও আকাশ-পথে উড্ডীন হইত না। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি রমণীয়। নানা জাতীয় বৃক্ষ-লতার শ্যামল শোভায় এবং ফুল্ল ফুলকুলের বিমল আভায় আশ্রমটি মুনিজনমনোহর সৌন্দর্যশালী ছিল। সরোবরের জল অতীব স্বচ্ছ বলিয়া কৃষ্ণাভ বোধ হয়। নানা জাতীয় শ্বেত, রক্ত, নীল কমল, কুমুদ, কহ্লার, কুটিয়া হ্রদের

শোভা মনোহারিণী করিয়া রাখিয়াছে। চারি পাশে সবুজ ঘাস—তাহার কোমলতা মখমলকেও নিন্দা করে।

সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য একখানি কুটীর। কুটীরখানি নিতান্ত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং গোময় ও মৃত্তিকার অনুলিপ্ত হইত বলিয়া বেশ খট্‌খটে এবং ধূলিশূন্য। সন্ন্যাসীর পাঁচ জন শিষ্য ছিল। তাহারাই সন্ন্যাসীর আহার্য প্রস্তুত করিত। প্রতি অমাবস্যায় এই মন্দিরে সমারোহের সহিত পূজা হইত। দূরবর্তী রাজা, জমিদার এবং সর্দারগণও এই সময় বলির জন্য এখানে মহিষ এবং পাঁটা পাঠাইতেন। সাধারণ লোকেও অনেক বলি পাঠাইত। সন্ন্যাসীর জন্য অর্থ, ফল-মূল, ঘৃত এবং ময়দাও প্রচুর আসিত। সুতরাং সন্ন্যাসী হইলেও, অনেক অবস্থাশালী গৃহী অপেক্ষা সম্পন্ন ছিলেন। মন্দিরের ভিত্তিতলে বহু টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাপালিক সন্ন্যাসীরা বাস্তবিকপক্ষে সন্ন্যাসের নামগন্ধেরও ধার ধারে না। তাহারা আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারী। ইন্দ্রিয় এবং উদর সেবাই বামাচারীদিগের পরম ধর্ম। কুমারী পূজা, ভগবতী পূজার ছলে অনেকেই ব্যভিচারেরই উপাসনা করিয়া থাকে। বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামশাস্ত্রের সূত্র এবং দুর্নীতিগুলি অনেকেরই জীবনের কাম্য। সুখের বিষয়, আমাদের সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামী সেরূপ ধরনের সন্ন্যাসী ছিলেন না। আহারে-বিহারে তিনি সংযত এবং মিতাচারীই ছিলেন। তিনি তেজস্বী এবং ধর্মান্ধ ছিলেন। কালিকা দেবী 'বলি'তে নিতান্ত প্রীত এবং সন্তুষ্ট হন, এ-বিশ্বাস তাঁহার খুব প্রবল ছিল। পশু-বলি অপেক্ষা নর-বলিতে যে কালিকা দেবী অধিক প্রীতা, ইহাও তাঁহার ধারণা ছিল।

পশু রক্ত অপেক্ষা মানব-রক্তে যে কালিকার অধিক লালসা ও আনন্দ হয়, এ বিশ্বাস আজ কালীমূর্তি-উপাসক শাক্তদিগের মধ্যে অনেক স্থলেই প্রবল রহিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু রাজারা নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা, পুত্রের রোগারোগ্য কামনা, দীর্ঘিকা বা সরোবর খননে সর্বদাই নরবলি দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য সুস্থ এবং নিখুঁত নরনারী নির্বাচিত হইত। বলির পাত্র অবিবাহিত সুন্দর এবং নিখুঁত (সর্বাঙ্গ অক্ষত) হইলেই সর্বোত্তম বলি হইত। এই সব বলির পাত্র কখনও বলপূর্বক, কখনও চুরি করিয়া, কখনও ছলনা করিয়া, কখনও অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া আনা হইত। মহাত্মা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে এই বর্বর প্রথা ভারতবর্ষ হইতে একবার প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল না, তাহারাও 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই সর্বলোকমান্য মত গ্রহণ করায় এই নৃশংস ও জঘন্য জীবহত্যা-প্রথা, বিশেষতঃ নরবলি প্রথা ভারতবর্ষ হইতে অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টের অভ্যুদয়ে হিন্দু ধর্মের পুনঃ

প্রতিষ্ঠায় আবার নরবলি-প্রথা ধীরে ধীরে প্রবল হইতে থাকে। অবশেষে বৌদ্ধদিগের বিনাশে এবং বৌদ্ধদিগের বিলুপ্তিতে* তান্ত্রিক ধর্ম যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন নরবলি, পশুবলি এবং ব্যভিচার-ধর্মের এক নিগূঢ় রহস্যজনক অনুষ্ঠান হইয়া পড়িল। মুসলমানগণের ভারত-বিজয় এবং ভারত-শাসনে নরবলি-প্রথা উৎপাটিত হয়। মুসলমান শাসনকর্তাগণকে এজন্য দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। তথাপি নরবলির প্রচ্ছন্নভাব অদ্যাপি একশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যার খান্দ জাতির মধ্যে সে দিন পর্যন্তও নরবলি প্রথা বিরাজমান ছিল। ভারতের অনেক স্থানে নরবলি-প্রথা নিবারণের জন্য বৃটিশ গবর্নমেন্টকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছে।

এক্ষণে উপাখ্যানের কথা এই যে, আমাদের সর্বানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল হইতে নরবলি দিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। রুক্মিণীকে মুমূর্ষু অবস্থায় পাইয়া প্রথমতঃ সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ ও সেবার ভাব জাগিয়া উঠে। তৎপর রুক্মিণী যতই সুস্থ এবং প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সন্ন্যাসী ক্রমশঃ ততই রুক্মিণীর অসাধারণ সৌন্দর্য এবং কোমল ও সরল ব্যবহারে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নির্মল ও পবিত্র ভালোবাসায় সন্ন্যাসী রুক্মিণীকে কন্যার ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মতলব ছিল যে, কোনও সুযোগে রুক্মিণীকে চিতোরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু রুক্মিণী এই আশ্রমের রমণীয় দৃশ্যে এবং শান্তিময় নির্জন-নিবাসে থাকিয়া ধর্মালোচনা এবং দেবী-পূজায় জীবনের দিন কাটাইতে সংকল্পারূঢ় হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে একেবারেই অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, সন্ন্যাসী আর তাহাকে বাটী যাইবার জন্য পীড়ন করিলেন না। রুক্মিণী পবিত্র ভাবে শুদ্ধাচারে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল।

সূর্যরশ্মি এবং বায়ু যেমন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করিয়াও গৃহে প্রবেশ করে, পাপ তদপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য মানুষ কেবল পাপকার্য হইতে বিরত থাকিলেই পাপ হইতে বাঁচিতে পারে না। পাপকার্য করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধাগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যাহাতে পাপ-চিন্তা মনে আসিতে পারে, এমন দৃশ্য, এমন কল্পনা, এমন জিনিসের ধারেও যাইতে নাই।

---

* কুমারিল বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে হিন্দু, বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিবে না, তাহাকেও তিনি বধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন। ফলে, বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষিত হয়। সাত কোটি বৌদ্ধ নরনারী নিহত এবং অবশিষ্ট হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। বৌদ্ধদিগের যাবতীয় ধর্মমন্দির, সঙ্ঘারাম এবং তীর্থস্থান চূর্ণীকৃত, ভস্মীভূত বা হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ জিঘাংসার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। অতীতকালে নেবুকাদনাজার কর্তৃক ইহুদীদিগের প্রতি এবং উত্তরকালে স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড কর্তৃক মুসলমানদিগের প্রতি এই শ্রেণীর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

একদা বৈশাখ-প্রত্যূষে রুক্মিণীবাঈ যখন উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছিল, সেই সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর হঠাৎ তাহাকে সে-অবস্থায় দেখিয়া কামজ-মোহে মুগ্ধ হন। পৃথিবীতে পুরুষের পক্ষে যুবতী যৌবনের ন্যায় মারাত্মক জিনিস আর কিছুই নাই। যুবতী-যৌবনের মোহচক্রে পড়িয়া কত মহাত্মাই যে নরাধম সাজিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সর্বানন্দ স্বামী প্রথমতঃ স্বকীয় অন্তরের দুর্বলতা দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও পাপ মোহের কালিমা হইতে অন্তঃকরণকে নির্মল ও পূর্ববৎ পরিশুদ্ধ করিতে পারিলেন না। লালসা-বিবেক ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিল। স্বামীজি জিতেন্দ্রিয় এবং বিবেকবান্ লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রুক্মিণীর যৌবনই তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যা মাটি করিবার উপক্রম করিতেছে।

তাঁহার মত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর মনেই যখন এই নারীর যৌবন চাঞ্চল্য জন্মাইয়া দিয়াছে, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের সর্বনাশ সাধন অনিবার্য। সন্ন্যাসী ঠাকুর আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ইতিমধ্যেই শিষ্যদিগের কাহারও কাহারও মনে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং তিনি নিজের শিষ্যদিগের এবং শিষ্যা রুক্মিণীর কল্যাণের জন্য এবং কালীর বর লাভার্থ রুক্মিণীকে বলি দিবার জন্য সমুদ্যত হইলেন। সম্মুখের কালবৈশাখী-অমাবস্যায় বিরাট ঘটায় দেবীর পূজা হইবে। আর সেই রাত্রিই মহাকালীর মহাপূজায় মহাজীবের মহাবলি দ্বারা মহাপুণ্য সঞ্চয় এবং ডাকিনী-যোগিনীদিগকে বশ করিবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুর অতুল শক্তি লাভ করিবেন। অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস এবং কুসংস্কার চিরকালই মানুষকে যার-পর-নাই মূঢ় করিয়া তোলে। বিচারশক্তি একেবারেই নির্মূল করিয়া দেয়। এই জন্য বড় বড় ধর্মপ্রাণ পুরুষদিগের মধ্যেও নানাবিধ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা এবং মহানুভবতা সম্মিলিত না হইলে, ধর্মবিশ্বাস মানুষকে অনেক সময়ই অধর্মের গভীর অন্ধকারেই টানিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই জগতের সার্বভৌমিক এবং সার্বজনীন মহাপয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্ম লাভের সঙ্গে শিক্ষা লাভের জন্য কঠোর আদেশ করিয়াছেন। সুশিক্ষার 'হলে' হৃদয়ভূমি কর্ষিত না হইলে, ধর্মের বীজ কখনও অঙ্কুরিত এবং যথাযথভাবে পুষ্পিত ও ফলিত হয় না। ধর্ম লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সর্বানন্দ ঠাকুর সন্ন্যাসী হইলেও, বিশ্বাসগত কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নারীহত্যারূপ মহাপাতকের জন্য সম্যক প্রস্তুত হইলেন।

হায়! করুণাময় মঙ্গল-কারণ বিশ্ববিধাতা যে, কোনও জীব-হত্যায় সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং কোনও জীব-জন্তুকে পীড়ন করিলে, সে পীড়ন যে

তাঁহাকেই পীড়ন করে, এই ধারণা মানব-সমাজে কবে প্রবলতা লাভ করিবে? যেদিন এই বিশ্বাস ও ধারণা মানব-প্রাণে জাগিয়া উঠিবে, সেই দিনই পৃথিবীতে বেহেশ্‌তের হাওয়া প্রবাহিত হইবে।

পৃথিবীতে যদি কোনও ধর্ম থাকে, তাহা জীবনের সেবা করা, জীবের দুঃখ দূর করা। আর পাপ যদি কিছু থাকে, তাহা জীবকে কষ্ট দেওয়া। ফলতঃ, দয়ার উপরে ধর্ম নাই, আর হিংসার বড় পাপ নাই। ইস্‌লামের কথায় কথায় এই মহাশিক্ষা ছড়ানে রহিয়াছে। কোরআনের পাতায় পাতায় এই মহাশিক্ষার পুণ্য আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। এই জন্য কোরআনের ধর্মের নামই হইতেছে—"ইস্‌লাম" অর্থা কল্যাণ; আর তাহার প্রচারক মহামানব মোহাম্মদ (দঃ)-র উপাধি রহমতুল-লিল্‌-আলামীন্‌ অর্থাৎ 'বিশ্বজনীন দয়া'।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সারা রাত্রি বিশ্রাম ও নীরবতার পরে পাখীরা যখন মধুর স্বরে প্রভাতী গাহিয়া উঠিল, তখন ফুলবালারা সে-ডাক শুনিয়া ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল। উষা তাহার স্মিতহাস্যে অন্ধকাররাশিকে চঞ্চল ও তরল করিয়া মধুর কটাক্ষে শিশিরসিক্ত ফুলদল লইয়া প্রাণপতি তরুণ অরুণকে অভ্যর্থনা করিতে সজ্জিতা হইল। প্রভাতের সুখ-স্পর্শ-সমীরণ-শ্রান্তি-ক্লান্তি হরণ করিয়া জীবমণ্ডলীকে নূতন শক্তি ও নূতন স্ফূর্তি দান করিবার জন্য প্রবাহিত হইল। ধীরে ধীরে সুপ্ত ও লুপ্ত চেতন ধরণী-বক্ষে নবীন জীবনের সঞ্চার হইল।

উষা-সমাগমে রুমী খাঁও তৃণ-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া শিপ্রা-সলিলে যাইয়া অজু করিয়া তৃণের উপর জায়নামাজ বিছাইয়া ফজরের নামাজ সম্পন্ন করতঃ মোনাজাত করিতে লাগিলেন। তিনি মোনাজাত করিলেন, "হে আল্লাহ্‌! হে দাতা ও দয়ালু পিতা! তুমি সকলকে আশীর্বাদ কর। হে প্রভু! তোমার করুণার শীতল ধারায় সকল প্রাণীকে অভিষিক্ত কর। কে প্রভু! তোমার করুণার শীতল ধারায় সকল পাণীকে অভিষিক্ত কর। হে প্রভু! তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর। তুমি পাহাড়কে দরিয়া এবং দরিয়াকে পাহাড় করিতে সমর্থ। হে করুণাময় স্বামীন' তুমি রুক্মিণীকে মিলাইয়া দাও। হে প্রভু! আমাকে লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা কর। তোমার দয়া এবং অনুগ্রহে সকলই সম্ভবপর।"—এইরূপে গম্ভীরভাবে দীর্ঘকাল প্রার্থনা করিয়া রুমী খাঁ লোকজন-সহ গভীর বনের একটি ক্ষুদ্র পথালম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে দ্বিপ্রহর সমাগমে

একটি ঝিলের তীরে যাইয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে যখন রুমী খাঁ একটি বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া আরাম করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একটি গৈরিকবাস পরিহিত নবীন বয়স্ক ফকিরও সেই সরোবর-তটে উপস্থিত হইয়া পানি পান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

রুমী খাঁ দেখিলেন, ফকির যেমনি তরুণবয়স্ক তেমনি সুশ্রী ও খোশ্‌নমা চেহারা। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি কোমল অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সর্বাঙ্গ সুগঠিত! তাঁহার চেহারা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, তিনি নিতান্ত সম্ভ্রান্তবংশীয়। কৌতূহল এবং স্নেহের বশবর্তী হইয়া রুমী খাঁ লোক পাঠাইয়া সম্মানের সহিত যুবককে আহ্বান করিলেন। ফকীর ধীরপদবিক্ষেপে রুমী খাঁর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকীরের সালামের উত্তর দিয়া রুমী খাঁ সবিনয়ে ফকিরকে নিজের গালিচার পার্শ্বে বসিতে দিলেন। রুমী খাঁ বুঝিতে পারিলেন, যুবক নিতান্ত ক্ষুধার্ত, সুতরাং নিজ হস্তে রুটী, হালুয়া এবং ফল-মূল যাহা সঙ্গে ছিল, আহারের জন্য ফকিরের সম্মুখে শ্রদ্ধার সহিত উপস্থিত করিলেন :

নবীন ফকির রুমী খাঁকে ধন্যবাদ দান করতঃ সে-সমস্ত খাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণপূর্বক পরিতৃপ্ত হইলেন। আহারান্তে ফকির কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে রুমী খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আপনার নাম-ধাম জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি এই তরুণ বয়সে বৈরাগ্যের খের্কা পরিধান করেছেন কেন? আপনাকে দেখে বোধ হচ্ছে যে, আপনি সুপণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত যুবক। আপনার অঙ্গে এ বেশ কিছুতেই শোভা পাচ্ছে না।"

ফকির : আমি সংসার ছেড়ে ফকির হয়েছি। ফকিরের আর কি পরিচয় থাকবে? কোনও কামেল দরবেশের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে দুরদৃষ্টক্রমে তেমন কোনও উপযুক্ত পীর জুটছে না।

রুমী খাঁ : মুসলমানের পক্ষে সংসারাশ্রম ত্যাগ করা তো বিধেয় নহে। ইসলাম সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যের ধর্ম নহে। ইসলামে সংসার আঁকড়িয়ে থেকেই ধর্ম লাভ করতে হয়। বরং বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসমূলক ধর্মমতগুলি বিনাশ করবার জন্যই কর্মমূলক ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। মানুষ সংসারের জীব, সমাজের জীব, সুতরাং তাহাকে সংসারে ও সমাজে থেকেই ধর্মজীবন লাভ করতে হবে। দুঃখ, বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে তাকে অটল ও উন্নত থাকতে হবে। খোদাকে মঙ্গলময় করুণাময় বলে বিশ্বাস করে ধর্মানুষ্ঠানে চরিত্রকে নির্মল, রুচিকে মার্জিত, বিবেককে পবিত্র এবং হৃদয়কে উদার করতে হবে।

ফকির : আপনি যথার্থ বলেছেন। মহামানব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্পষ্টই সন্ন্যাস আশ্রমকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, "লা রহ্‌বানিয়াতা

ফিল্ ইস্‌লাম"—অর্থাৎ "ইস্‌লামে সন্ন্যাস নাই।" তবে আমি যে ফকির হয়েছি, তা কেবল কোনও কামেল দরবেশকে লাভ করবার জন্য এবং কিছুদিন দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণপূর্বক পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল নদী-নালা শহর-বাজার দেখে আল্লাহ্‌তালার কুদরত উপলব্ধি ও নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধনার্থ।

রুমী খাঁ ঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ। ভূতভাবন করুণানিদান আল্লাহ্ আপনার সহায় হউন।

ফকির ঃ এক্ষণে আপনার পরিচয় লাভ করলে সুখী হব।

রুমী খাঁ ঃ আমি একজন শিকারী। বনে আমাদের একটি লোক হারিয়ে গেছে; তাই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফকির ঃ আমি পরিচয় দেই নাই বলেই, আপনিও কি পরিচয় দিবেন না? আপনাকে দেখে তো একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার বলেই বোধ হচ্ছে।

রুমী খাঁ ঃ বাবা! আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি একজন সর্দারই বটে! আমার নিবাস চিতোরে।

ফকির ঃ ঠিক কথা! আপনাকে মহানুভব সেনাপতি রুমী খাঁ বলেই বোধ হচ্ছে!

রুমী খাঁ হঠাৎ ফকিরের মুখে নিজের পরিচয়-প্রাপ্ত হইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ আপনার অনুমান যথার্থ।

ফকির ঃ আপনি এত দূরে গুজরাটের এলাকায় এই বনে ঘুরছেন কিসের জন্য?

রুমী খাঁ আর কিছু গোপন করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া বলিলেন ঃ বাবা! আমি বড় পেরেশান আছি। চিতোর-রাজকুমারী রুক্মিণীবাঈ তাঁর স্বামী জয়পুর-রাজকুমার অরুণ সিংহের সাথে জয়পুরে যাচ্ছিলেন। পথে শিপ্রা নদীর তটে শিকারের জন্য তাম্বু খাটান হয়। হঠাৎ এক রাত্রিতে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে নদী উদ্বেলিত হয়। আমাদের অনেক লোকজন এবং জিনিসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে রুক্মিণীবাঈও ভেসে যায়। পরে বহু অনুসন্ধানেও কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। রাজকুমার হতাশ হয়ে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু আমি এখনও তাঁর অনুসন্ধানে শিপ্রার তটে তটে বনে বনে পরিভ্রমণ করছি।"

এতটুকু শুনিতে শুনিতেই ফকির, "আহ্!" শব্দ উচ্চারণপূর্বক মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রুমী খাঁ এবং তাঁহার অনুচরগণ শীতল জল সিঞ্চন এবং বায়ু-ব্যজন করিয়া ফকিরের মূর্ছা ভঙ্গ করিলেন।

রুমী খাঁ বলিলেন ঃ আপনি আশ্বস্ত হউন্। রাজকুমারী জলমগ্ন হয়ে মরেন

নাই। তা হলে তাঁর লাশ পাওয়া যেত।

ফকির অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "তা' হোক, আমার সহিত রাজকুমারীর কি সম্পর্ক? আমার মৃগী রোগ আছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মূর্ছা যাই।"

রুমী খাঁ বলিলেন ঃ কুমার! আর আত্মগোপন নিষ্প্রয়োজন। আপনি শাহ্‌জাদা নূরউদ্দীন! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি শৈশবে আপনাকে দেখেছিলাম, কাজেই এত দীর্ঘকাল পরে এইরূপ ফকিরের বেশে দেখে সহসা চিনতে না পারলেও মনে মনে সন্দেহ ছিল।

এই বলিয়া রুমী খাঁ ফকিরবেশী শাহ্‌জাদা নূরউদ্দীনকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইলেন। কুমারও, রুমী খাঁর বক্ষসংলগ্ন হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই করুণ দৃশ্যে সকলের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। রুমী খাঁ নানাবিধ প্রবোধবাক্যে কুমারকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর বিশুদ্ধ প্রেমের একনিষ্ঠ সাধনার কথা তুলিয়া বলিলেন ঃ "সেই দুর্যোগময়ী রজনীতে অরুণ সিংহের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য কুমারীর পক্ষে পলায়ন করাও অসম্ভব নহে। সুতরাং রুক্মিণীর সম্বন্ধে মৃত্যুর ধারণা করা কদাপি সঙ্গত নহে। আমার প্রবল বিশ্বাস, কুমারী জীবিতা আছেন—নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন।"

নূরউদ্দীন বলিলেন ঃ "হায় সেনাপতি! রুক্মিণীর জন্য আমার উপর দিয়ে যে কি বিপদের ঝঞ্ঝাই প্রবাহিত হচ্ছে, তা' ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা নাই। পিতা আমাকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সুলতান আহ্‌মদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় কঠোর নির্যাতন করেছেন। আমার শরীর-মন ভেঙ্গে পড়েছে। মাতা দয়াপরবশ হয়ে নিজের মস্তকে রাজদণ্ড ও রাজরোষের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কারামুক্ত করে দিয়েছেন। আমি রুক্মিণীর শোকে দিওয়ানা বনে গিয়েছি। হৃদয়ের কণায় কণায় কি তীব্র দাহন। অন্তরের অন্তরে কি তীব্র আকর্ষণ! মৃত্যুর পরপারেও বোধহয় এর উপশম নাই।

সেনাপতি বলিলেন ঃ রাজকুমারীর অবস্থাও তথৈবচ। তিনিও আপনার প্রেমে উন্মাদিনী কাঙ্গালিনী। জয়পুরে এবং চিতোরে তাঁর প্রতি বহু অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয়েছে। অরুণসিংহের প্রতি অনুরক্ত করবার জন্য কত হোম, কত পূজা, কত গীতবাদ্য, কাম-উত্তেজক ঔষধ, কত মন্ত্র-তন্ত্র, কত কাণ্ডকারখানা, কত কারসাজি যে করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ধন্য রাজকুমারীর একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা! কিছুতেই আপনার প্রতি প্রেমের তপশ্চর্যা হতে বিন্দু পরিমাণেও কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে নাই। তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমের কথা

চিতোর এবং জয়পুরের ঘরে ঘরে কীর্তিত হচ্ছে। তিনি পুণ্যশীলা তপস্বিনী। তাঁর একনিষ্ঠ ধৈর্য এবং ত্যাগ সর্বতোভাবে কীর্তনীয়। খোদা তাঁকে রহম করুন!

কুমার : আমরা না-জেনে-শুনে যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এক্ষণে তারই কঠোর ফলভোগ করছি। রাজকুমারী যদি অরুণসিংহকে স্বামিত্বে বরণ করে নিয়ে দাম্পত্য-ধর্মে মন দিতেন, তা হলে হতভাগাকে আর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত না। তাঁর একনিষ্ঠতা এবং ব্রতপরায়ণতা দেখে আমিও তাঁকেই একমাত্র কাম্য করে তুলেছি। কিন্তু হায়! আমাদের কামনা, আমাদের ব্রত সমস্তই বিফল হল। হায়! আর একবার যদি রুক্মিণীকে দেখেও মরতে পারতাম, তা হলেও শান্তিলাভ হতো। এ দগ্ধ-হৃদয় শীতল হতো! তাঁর পুণ্য-দৃষ্টিতে এ দগ্ধ জীবন-কমলও প্রস্ফুটিত হতো।

অতঃপর সেনাপতি রুমী খাঁ কুমারকে নানা আশায় আশ্বস্ত এবং মধুর কথায় প্রশান্ত করিয়া কুমারী রুক্মিণীর অনুসন্ধানের জন্য শিপ্রাতটে বনে বনে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পুণ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র, পঞ্চবটি বনে আদর্শ সতী নারীকুলসত্তমা সীতা দেবীকে হারাইয়া যেরূপ আকুল অন্তরে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শাহজাদা এবং রুমী খাঁ, উভয়ে মিলিয়া সেইরূপে শ্রীমতী রুক্মিণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর সর্বানন্দ স্বামী রূপসীকুলরানী রুক্মিণীকে মহামায়ার নিকট বলি দিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া পঞ্চ শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

সর্বানন্দ স্বামী অত্যন্ত উগ্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিত। মুকুন্দ ও অক্ষয় অযোধ্যাবাসী এবং পরস্পর আত্মীয় ছিল বলিয়া তাহাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। গণপৎ ও মুধলকর উভয়েই মারাঠী; এজন্য তাহারাও পরস্পর বন্ধু ছিল। পঞ্চ শিষ্য দেবকীনন্দন বাঙ্গালী ছিল। সকলের সহিতই তাহার সদ্ভাব ছিল। তবে সে কোনও দলভুক্ত ছিল না। সন্ন্যাসীর প্রস্তাব শুনিয়া দেবকীনন্দন ব্যতীত আর সকলেই শিহরিয়া উঠিল। হরকুমার বলিল, "পরে যদি এ ঘটনা প্রকাশ পায়, তা হলে বিলাসপুরের ফৌজদার প্রাণদণ্ড করবেন।"

সন্ন্যাসী : তোমরা না বললে কোনও জনপ্রাণীই এ বলির সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারবে না। এই নিবিড় বনে দ্বিপ্রহর রাত্রে কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, অন্যে তা কেমন করে জানবে?

শিষ্যগণ : তা তো ঠিক! এক্ষণে আপনার ইচ্ছা তবে পূর্ণ হোক।

মুকুন্দ বলিল : তাঁকে শিষ্যা করে ডামর বা ভৈরবী মন্ত্রে দীক্ষা দিলেই তো ভালো হতো।

সন্ন্যাসী : তোর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কি আমার চেয়ে বেশী? এই অসাধারণ সুন্দরীর রূপের ফাঁদে মানুষ তো তুচ্ছ কথা, দেবতাদিগকেও পতিত হয়ে হাবুডুবু খেতে হবে। একে বলি না দিলে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য শেষে সকলকেই বলি হতে হবে। মহামায়াকে এই সুন্দর মহাজীবনের বলি হতে বঞ্চিত করলে তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচবার কোনও উপায় থাকবে না। মহামায়া তার রক্ত পানাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়েছেন। আজ কয়েক রাত্রি হতে গভীর নিশীথে আমি শুনতে পাচ্ছি যে, "মায় ভুখা হোঁ", "মায় ভুখা হোঁ।" সুতরাং রুক্মিণীকে বলিদান ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

গুরুর দৃঢ়তা এবং ক্রোধ দেখিয়া আর কেহ কোনও আপত্তি না করিয়া সকলেই একবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। সর্বানন্দ স্বামী শিষ্যদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, রুক্মিণী যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

বলির এখনও তিনদিন বাকী আছে। দেবকীনন্দন গুরুর প্রস্তাবে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'রমণীকে বলিদান কিছুতেই বৈধ নহে, কিন্তু কি আশ্চর্য! সর্বানন্দ স্বামী এই নির্দোষ পরমা সুন্দরী যুবতীকে কোন্ প্রাণে বলি দিতে উদ্যত হইলেন! এমন অপূর্ব সুন্দরী, এমন রমণীয় এবং কমনীয় নারীদেহে মহাপাষণ্ডও অস্ত্রাঘাত করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ নারী বলিদানে যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম আর কি আছে? যাহা হউক, এই নারীকে বাঁচাইতে হইবে। তাহাতে যদি অধর্ম হয়, হউক। গুরুর কোপানলে পড়িতে হয়, পড়িব। দেহে প্রাণ থাকিতে রমণীকে বাঁচাইতেই হইবে।" মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ-পাতাল অনেক চিন্তা করিল। একাকী কিরূপে সকলের হাত হইতে রমণীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহার কোনও পন্থা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল যে, আর দুই একটি সতীর্থকে মতে আনিতে না পারিলে, রমণীকে উদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং দেবকীনন্দন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মুকুন্দলালকে নিভৃতে ডাকিয়া অনেক বুঝাইল।

মুকুন্দলাল দেবকীনন্দনের কথা শুনিয়া বলিল যে, কাজটি যে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুদেবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে

তাহার সাহস হয় না। গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে যদি রুক্মিণীকে কোনওরূপে কৌশলক্রমে সরান যায়; তাহা হইলে তাহাতে তাহার মত আছে।

দেবকীনন্দন অত্যন্ত সতর্কভাবে রুক্মিণীর সহিত দেখা করিয়া সন্ন্যাসীর ভীষণ সংকল্পের কথা অভিব্যক্ত করিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রুক্মিণী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। যে সন্ন্যাসী তাহাকে এত ভালোবাসেন এবং যত্ন করেন, তিনি যে তাহাকে দেবীর কাছে বলি দিবেন, তাহা কিছুতেই সে প্রত্যয় করিল না। কিন্তু দেবকীনন্দন যখন পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলির কথা বলিতে লাগিল, তখনও বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিল : দেবকী! ভাই, যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে সত্য সত্যই মহামায়ার সম্মুখে বলিদান করেন, তা' আমার সন্তপ্ত ও জ্বালাময় জীবনের পক্ষে এক পরম শান্তির কারণ হবে। আহা! এ হৃদয়ে যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, তা' যদি তুমি বুঝতে, তা হলে আমার বলির সম্বন্ধে বিচলিত না হয়ে সুখী ও সন্তুষ্টই হতে। আমরা অফুরন্ত দুঃখের কথা বলবার নয়। আমার দগ্ধ-জীবন জুড়াবার স্থান বসুধায় নাই। সুতরাং, প্রিয় ভ্রাতঃ! এমন হতভাগিনীর মৃত্যুর পথে কণ্টক না হয়ে তার সহায় হলেই পুণ্যলাভ হবে।

দেবকীনন্দন রুক্মিণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল যে, রুক্মিণী অত্যন্ত দুঃখিনী—একান্ত বিরহিণী এবং শোকানলে বিদগ্ধা! রুক্মিণীর জীবন গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ; রুক্মিণী নিজের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা যথার্থ নহে। এই রমণী নিশ্চয়ই অভিজাতবংশীয়া। সামান্য-কুলোদ্ভব নারীতে এত সৌন্দর্য, এত সাহস, এত ধীরতা, এত গাম্ভীর্য কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু হায়! সন্ন্যাসীর খ হইতে ইঁহাকে বাঁচান অসম্ভব। নিজের জীবনের প্রতি যে এত নির্মম, তাঁহাকে রক্ষা করা কঠিন। এই রূপ চিন্তা করিয়া দেবকীনন্দন নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গভীর অন্ধকার রাত্রি। তারাদল ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। কিন্তু সহসা মেঘসঞ্চারে তাহাও ডুবিয়া গেল। দুইদিকে গভীর বন। মধ্য দিয়া একটি পথ সীমান্তের ন্যায় সরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। অদ্য প্রত্যুষে একটি ভীল-সর্দারের কাছে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, মহামায়ার মন্দিরে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী সন্ন্যাসিনীর আগমন হইয়াছে; তাই সেনাপতি রুমী খাঁ এবং কুমার নূরউদ্দীন

সঙ্গের লোকজন লইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। একটি ভীল যুবক তাঁহাদের পথপ্রদর্শক-রূপে সেই অন্ধকারের মধ্যে মশাল জ্বালাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। পদব্রজে পরিভ্রমণ করায় সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্রাম করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও আজ কুমার নূরউদ্দীন এবং রুমী খাঁর মন যেন মহামায়ার মন্দির পানে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে। সেখানে গেলেই যেন রুক্মিণীকে পাওয়া যাইবে, মনের ভিতরে এই আশা ধুকধুক করিতেছে। বীরপুঙ্গব রুমী খাঁ এবং কুমার-নূরউদ্দীন এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, সঙ্গের লোক বহু কষ্টেও তাঁহাদের সঙ্গ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। রাত্রি যতই বেশী হইতে লাগিল, ততই যেন কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় নূরউদ্দীনের হৃদয় আকুল হইতে লাগিল। উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় নূরউদ্দীন ক্রমাগতই বলিতে লাগিল, "আর কত দূরে? আর কত দূরে?"

পথপ্রদর্শক ভীল বলিতে লাগিল, "আর বেশী দূর নয়।"

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময় দূরে হতাশের আশার ন্যায় প্রদীপরশ্মি দেখা গেল। ভীল-যুবক আনন্দে এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে।"

আলোক দর্শন করিয়া নূরউদ্দীন এবং রুমী খাঁর নৈরাশ্যের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার হইল! বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। পা যেন উড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা নক্ষত্রবেগে মন্দির-প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী হইলেন। নিকটবর্তী হইয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রথমতঃ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং ভাল করিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু মুছিয়া আবার নিপুণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু হায়! হায় খোদা। একি ভীষণ নৃশংস কাণ্ড! রক্তবস্ত্রপরিহিতা রক্ততিলকভূষিতা একটি রমণীকে মহামায়ার সম্মুখে বলি দিবার জন্য যূপকাষ্ঠের মধ্যে গলা আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপালিক সন্ন্যাসী মালকোঁচা মারিয়া ভীষণ খ উর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ গ্রীবাচ্ছেদনে উদ্যত। হায়! এক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইবে। সর্বনাশ! মহাসর্বনাশ! হায়! রুক্মিণীকে পাইয়াও বুঝি পাওয়া গেল না।

রুমী খাঁ ভীষণ চীৎকার করিয়া উন্মত্ত শার্দূলের ন্যায় অসিহস্তে সন্ন্যাসীর উপর সহসা লাফাইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী বিকট চীৎকার করিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। হাতের খখানি খন্ খন্ করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর পতিত হইল। শিষ্যগণও ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল! একজন সৈনিক দেবকীনন্দন এবং মুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিল।

নূরউদ্দীন রুক্মিণীকে যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে বুকে চাপিয়া

ধরিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুর বান ডাকিল। রুক্মিণীও প্রাণকান্তকে মৃত্যুর মধ্যে অচিন্ত্যের রূপে জীবনস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া অবিরাম কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দনে উভয়ের চোখে যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিতে লাগিল। লঙ্কায় পতিত আদি পিতা আদম বহু অনুসন্ধানে জেদ্দায় হাওয়া মাতাকে পাইয়া বোধহয় এইরূপ করিয়াই ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সে ক্রন্দনের সুরে কত যুগ-যুগান্তের, কত অতীত স্মৃতির, কত পুরাতন গাছের, উদাস করুণ সুরের রাগিণী বাজিতে লাগিল! সে রাগিনী—ঝঙ্কারে কত সুখ, কত আনন্দ, কত সম্মিলন, কত আশা ও কত ভাষার মূর্ছনা জাগিয়া উঠিল। সেই নিস্তব্ধ অমারজনীতে ক্রন্দনের সুরে বিশ্বের বুকে বুকে, আকাশের কক্ষে কক্ষে, তারকামালার বক্ষে বক্ষে, ফুটন্ত ফুলের সুরভি নিঃশ্বাসে, পত্রের মর্মগাথায়, নদ-নদীর কলতানে, কি যেন এক অব্যক্ত প্রেমের সঞ্জীবনী মাদকতা ছড়াইয়া দিল।

সে মাদকতায় চৌদিকে কেবল প্রাণের তন্ত্রীগুলিই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে ক্রন্দনের অশ্রুধারায় শান্তির শীথল ধারাই যেন বর্ষিত হইতেছিল। নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণীর সে-ক্রন্দনে রুমী খাঁ এবং তৎসঙ্গীয় লোকজন সকলেরই চোখ ছলছল করিতে লাগিল। রুমী খাঁ বন্দী সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, রুক্মিণী তাঁহাকে মার্জনা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রাণঘাতক নৃশংস-স্বভাব দস্যুর প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও বিরক্ত হইল।

রুমী খাঁ বলিলেন ঃ রাজকুমারী, মাফ করুন। এমন পাষণ্ড দস্যুকে ক্ষমা করলে মহাপাতকে পতিত হতে হবে।

রুক্মিণী ঃ ইনি দস্যু নহেন, সন্ন্যাসী। অধিকন্তু আমার প্রাণদাতা। জীবন্মৃত, লুপ্তচৈতন্য অবস্থায় আমাকে নদী হতে উত্তোলন করে বহু কষ্টে সেবা করে রক্ষা করেছেন। আমাকে কন্যার ন্যায় ভালোবেসেছেন। আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতদূর সম্ভব যত্ন করেছেন। আমাকে বাটী পঁহুছিয়ে দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন; কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হই নাই। অবশ্য সন্ন্যাসীকে আমার যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলাম না। আমার সন্তপ্ত অভিশপ্ত জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি এই আশ্রমের শান্ত-শীতল ছায়ায় কাটাতে ইচ্ছুক ছিলাম। মহামায়ার পূজার ফুল তুলে, দেবমন্দির ধৌত করে এবং অবশিষ্ট সময় শাস্ত্রালোচনা করে দিন যাপন করছিলাম। সন্ন্যাসীর যত্নে এখানে আমার কোনও ক্লেশ ও দুঃখ ছিল না। সন্ন্যাসী যে পরে আমাকে মহামায়ার সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা শত্রুতা বা অসদুদ্দেশ্যে নয়। সন্ন্যাসী ঘোর কাপালিক। নরবলি দেওয়া মহাপুণ্য কার্য বলে এঁদের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মহাপুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে আমাকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলির পরে

আমার দেহে আসীন হয়ে শব-সাধনা করবার সংকল্প ছিল। বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে এই শব-সাধনাই হচ্ছে চরম সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে ডাকিনী, নাগিনী এবং প্রেতিনীর উপর অধিকার লাভ হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর এই ধর্মবিশ্বাসের বশীভূত হয়েই বলিদানে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি এটা পূর্বে জানতে পেরেও আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা করি নাই। বলির সময়ও আমি আকার-ইঙ্গিতে কোনও অনিচ্ছা প্রকাশ করি নাই।

রুমী খাঁ : এত কঠিন প্রাণ হবার কারণ কি? কুমার নূরউদ্দীনের কথা তখন কি ভুলে গিয়েছিলেন?

কুমারী : সেনাপতে! নূরউদ্দীনের কারাদণ্ড হতে মুক্তিলাভের জন্যই আত্মবলিতে সম্মত ছিলাম। আমার মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলে কুমার মুক্তিলাভ করতেন!

রুমী খাঁ : খোদা যা' করেন, তা ভালোর জন্যই। আজ আমাদের মনও অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বিগ্ন ছিল। ভীল-সর্দারের কাছে 'একটি যুবতী রমণীকে মহামায়ার মন্দিরে দেখেছি'—এই কথা মাত্র শুনেই আমরা যেন উন্মত্ত ও অধীর হয়ে পড়লাম। যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ততই যেন চৌম্বক আকর্ষণে আমরা আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। এখন বুঝেছি, আত্মার তীব্র আকর্ষণই আপনাদের উভয়কে এবং তৎসঙ্গে এ অধমকেও রক্ষা করেছে। আপনার বলি হলে কুমারও প্রাণ ত্যাগ করতেন। আর আপনাদের উভয়ের এই ভীষণ পরিণামে আমিও শোক-বাণবিদ্ধ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তাম। খোদা জানেন, আপনার অনুসন্ধানের জন্য আমি কি ভীষণ কষ্টই স্বীকার করেছি। আজ প্রায় দুই মাস কাল আমি অনিদ্রায় অনাহারে, অন্ধকারে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, শিপ্রার কূলে কূলে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেছি। খোদাতালাকে হাজার ধন্যবাদ যে, আজ আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আজ আপনাদের সুখ-সম্মিলন দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কুমারী : আমি যে ডুবে মরি নাই, তা কিরূপে জানতে পেরেছিলেন?

রুমী খাঁ : সে শুধু আমার ধারণা। আপনি ডুবে মরেছেন এটা কখনও মন বিশ্বাস করত না। শুধু মনের ধারণার উপর নির্ভর করেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

অতঃপর দস্তুরমত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া, সকলে সেই মন্দির-সংলগ্ন গৃহেই রাত্রিযাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

রুমী খাঁ, কুমারীর অনুরোধে সন্ন্যাসীর প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। কিন্তু মন্দিরস্থ মহামায়ার মূর্তিটি দণ্ডাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিলেন, "ওয়াজা আল্‌হাক্কো ওয়া জাহাকাল বাতিলু ইন্নাল্ বাতিলা কানা জাহুকা"—অর্থাৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল এবং মিথ্যা লোপ পাইল। (মহা কোরআন)

মূর্তি চূর্ণ করায় সেনাপতির কোনও বিপদ ঘটিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামীর জীবনব্যাপী ভ্রম দূর হইল। তাহার ধর্ম সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি সে ধর্ম সম্বন্ধে নানা চিন্তা করিয়া কাটাইল। পরদিন প্রত্যূষে সন্ন্যাসী অনুতপ্ত চিত্তে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্" পাঠ করিয়া সেনাপতি সাহেবের হস্তে ইস্লামে দীক্ষিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর ইস্লাম গ্রহণে শিষ্যগণও মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিল। মহামায়ার মূর্তি চূর্ণ হওয়ায় কত শত মানব-প্রাণ যে পৈশাচিক হত্যা হইতে বাঁচিয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের সুখে কুমার-কুমারীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত! দুই হৃদয়ের প্রেমের জোয়ার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী বিরহশীতের অবসানে বসন্ত সমুপস্থিত হইয়াছে। উভয়েই রাজ-সন্তান! কিন্তু উভয়ই আজি পথের ফকির। শত শত দাসদাসী যাহাদের সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিত, আজ তাহাদের সেবার জন্য একটি লোকও বিদ্যমান নাই। মণিমুক্তাবিজড়িত কারুকার্যখচিত পোষাক-পরিচ্ছদ যাহাদের শরীরের শোভা বর্ধন করিত, আজ সামান্য গৈরিক বাস কোনওরূপে তাহাদের দেহের নগ্নতা নিবারণ করিতেছে। কালের কি কুটিল ও বিচিত্র গতি! কালচক্রে মানুষ কোন মুহূর্তে কোন্ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কুমার এবং কুমারীকে লোকালয়ে ফিরিবার জন্য রুমী খাঁ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু উভয়েই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কুমার নূরউদ্দীন বলিলেন : "সেনাপতে! এ অবস্থায় দেশে ফিরলে পিতা হয় তো প্রাণদণ্ড করবেন। মাতা আমাকে নিজের দায়িত্বে গোপনে ষড়যন্ত্র করে কারাগারে হতে মুক্তি দিয়েছেন। জানি না, কারারক্ষক এবং মাতা কিরূপ রাজরোষেই বা পতিত হয়েছেন! সুলতান নিতান্তই দৃঢ়চেতা পুরুষ। রাজধানীর যাবতীয় নর-নারীর অনুরোধেও আমাকে কারামুক্ত করেন নাই। সুতরাং এক্ষণে আমি রুক্মিণীকে নিয়ে কোন্ সাহসে এবং কোন্ মুখে মালবে ফিরব! দেশের লোক আমাকে 'প্রেম-পাগলা' বলে তাচ্ছিল্যের ভাবে নিরীক্ষণ করে। সুতরাং দেশে ফেরা দূরের কথা, অন্য কোথাও লোকালয়ে বা জনসমাজে যাবারও প্রবৃত্তি নাই! মানুষ হৃদয়ের ব্যথা দেখে না! প্রেমের ধর্ম বোঝে না! মানুষ স্বার্থের দাস! জনসমাজের অশান্তিপূর্ণ কোলাহল অপেক্ষাবনের নিবিড় শান্তিই ভালো বোধ হয়। বনের পশু-পক্ষী দেখলে আমার প্রাণে যে

আনন্দের সঞ্চার হয়, মানুষ দেখলে তা হয় না। রুক্মিণীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে ব্যতীত কাকেও বিবাহ করব না। সেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিল। ঘটনাচক্রে রুক্মিণীর পিতা জবরদস্তী করে রুক্মিণীকে অরুণসিংহের সহিত বিবাহ দিলেন। রুক্মিণী দুর্বলা নারী হয়ে অসহনীয় গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ধর্মের সম্মান রক্ষা করলেন। রুক্মিণীর ব্রত পালনে অসাধারণ তাপসীদৃঢ়তা দেখে আমিও আর বিয়ে করব না বলে মত প্রকাশ করলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তাতে আমি প্রশংসিত না হয়ে কেবল নিন্দিতই হলাম! আমি যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে মনুষ্যত্ব ও ধর্মের সম্মান বজায় রাখলাম, একটি লোকও তা দেখল না। সেনাপতে! আগে বুঝি নাই যে, সংসারের লোক এত অন্ধ! এত মূর্খ! ধর্ম যে শুধু লৌকিকতায়, পূর্বে তা' বুঝি নাই। ধর্ম যে হৃদয়ের জিনিস, সত্যের জিনিস, দুনিয়ার লোক এখনও এ পরম তত্ত্ব বুঝতে পারে নাই! ত্যাগ স্বীকারে, স্বার্থ ত্যাগে, পরের বেদনা অনুভূতিতে, পরের চোখের জল মুছাতে, নিজকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, এমন কি হাসি মুখে নিজের জীবনকে বলি দিয়ে অন্যকে রক্ষা করাতেই যে ধর্ম, এ তত্ত্ব এখনও জগতে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সংসারে যত লোক ধর্ম ধর্ম করে ছুটাছুটি করছে; তাদের অধিকাংশই দেখছি স্বার্থলাভের জন্যই ধর্ম ধর্ম করে ধর্মের আড়ালে অধর্মের জাল পেতেছে। পান হতে চুন খসলেই এদের ধর্মবিশ্বাস উড়ে যায়। আমি এই জঘন্য ধর্ম চাই না। আমি সত্যিকার ধর্ম চাই—হৃদয়ের ধর্ম চাই! তাতে যদি সুখ না হয়ে কেবল দুঃখই হয়, তা-ই আমার কাম্য। সেই দুঃখেই আমার শান্তি। সেনাপতে! আমার ঐকান্তিক বাসনা যে, বনে-পর্বতে মুক্ত-বাতাসে মুক্ত-গগনের নীচে মুক্ত-হৃদয় লয়ে বাস করি। মুক্ত হৃদয়ের মুক্ত ভাবে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেই। ভণ্ডামি এবং ছলনার বিষাক্ত বায়ু যেন জীবন-তরুকে স্পর্শও করতে না পারে!'

নূরউদ্দীনের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগজড়িত মহতী বাণী শ্রবণে কুমারী রুক্মিণী বলিলেন : "সেনাপতে! শাহজাদার এবং আমার প্রাণের সুর ও ঝঙ্কার অবিকল একই ধরনের। লোকালয়ে লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং ধর্মচিন্তায় যে বিকৃত সঙ্কীর্ণ ও দূষিত পরিচয় পেয়েছি, তাতে বোধহয় বিজন-বিপিনে-বিরলে বাসই বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত। মানুষের মনে মনে কেবল কুটিলতা এবং জটিলতা; কিন্তু বনের ফুলে ফুলে কেবল সরলতা এবং সরসতা। সমাজের লোকের কথায় কথায় কেবল স্বার্থের ছলনা, আর বনের পাখীর শাখায় শাখায় কেবল প্রেমের মূর্ছনা! বনের বৃক্ষচ্ছায়া কেমন শান্তিপ্রদ ও শীতল, আর সমসাজে লোকের আশ্রয় কত বিপদের অনল। বিশেষতঃ, লোক-বিচারে কলঙ্কিত ও আহমক আমাদের মত কোনও স্থানই নাই! আমার ইচ্ছা সন্ন্যাসীর বেশে নূরুদ্দীনের চরণ-সেবা

করতে করতে নিবিড়-বনের স্নিগ্ধ ও মৌন শ্যাম শোভা, সমুদ্রের চঞ্চল উদ্দাম তরঙ্গলীলা, গিরিমালার মেঘ-কিরীটী তুঙ্গ-শৃঙ্গ, উপত্যকার শ্যামল-শাদ্বলের কোমল দৃশ্য অবলোকন ও নিরীক্ষণ করে বিশ্বপিতার বিশ্বধামের বিনোদ-বিপুল বিচিত্র সৌন্দর্য ও বৈভবের বিশদ ব্যঞ্জনায় নিমগ্ন হয়ে যাই! তাঁর প্রেম-সাগরের অমৃত পানে বিহ্বল হয়ে থাকি! সেনাপতে! আপনি জানেন, আপনি রাজকন্যা হলেও দাসকন্যা অপেক্ষাও হতভাগিনী! আমার প্রাণের প্রতি, হৃদয়ের প্রতি, আমার ধর্মের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, আপনি তাও অবগত আছেন। যে কুমারের জন্য আমি উদাসিনী এবং বিরহিণী সেজেছি, আজ তাঁকে পেয়ে আর সংসারী সাজবার ইচ্ছা নাই। যাঁকে বনে পেয়েছি, তাঁকে নিয়ে বনে থাকতেই বাসনা। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে, বোধহয় লোকে তাও থাকতে দিবে না!

সেনাপতি ঃ শাহ্জাদা এবং রাজকুমারি! আপনারা যা বললেন, তা আপনাদের প্রেমপ্রবণ ভাবপূর্ণ হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বনে বাস করতে হলে সংসার পেতে বাস করা কি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কষ্টকর হবে না? এখানে খাদ্যাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই বা জুটবে কোথা হতে?

কুমার ঃ যে খোদা পাথরের মধ্যস্থ কীটকেও আহার দেন, তিনিই আমাদিগকে আহার দিবেন। খোদা কি আমাদের জন্য বন্য ফল-মূলেরও ব্যবস্থা করবেন না?

রুমী খাঁ অতঃপর আরও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রাজকুমার ও রাজকুমারী আপনাদের মত হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। রুমী খাঁ অবশেষে বিলাসপুরের বিশাল কাননাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে একটি স্বচ্ছতোয়া সরোবর-কূলে রমণীয় এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে একখানি মৃৎ-কুটীর নির্মাণ, একটি সবজী ক্ষেত্রের আবাদ, একটি ফলের বাগানের পত্তন করাইয়া দিলেন। দুইটি ভীল যুবক ও একটি যুবতীকে ভৃত্যস্বরূপ রাখিয়া যথাসময়ে কুমার এবং কুমারীর নিকট হইতে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রুমী খাঁ যাইবার সময় নিজের সঙ্গে যে টাকা ছিল, তাহা হইতে পাথেয় রাখিয়া অবশিষ্ট তিন শত মুদ্রা কুমার নূরউদ্দীনকে উপহার-স্বরূপ দান করিলেন।

সেনাপতি তাঁহাদের অবস্থান-স্থান গোপন রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি আপনা হইতে অঙ্গীকার করিলেন যে, মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহাদের খবর লইবেন। রুমী খাঁ পুত্রহারা জনকের হৃদয়, প্রভুশূন্য ভৃত্যের মন, বন্ধুহারা বন্ধুর উদ্বেগ এবং প্রিয়জনবিসর্জন-বিরহের বিধুর চিত্ত লইয়া চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বিলাসপুরের মনোহর কাননে নূরউদ্দীন ও রুক্মিণী নির্জনে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রুমী খাঁ বিদায় লইবার পূর্বে রুক্মিণীকে বিশ্বাসের পবিত্র কলেমা পড়াইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতঃ যথারীতি 'ইজাব-কবুল' লইয়া সঙ্গীয় অনুচরগণ সাক্ষাতে উভয়কে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। দীক্ষার সময় রুক্মিণীর নাম পরিবর্তন করিয়া সখিনা রাখা হইয়াছিল বিজন বনে বিলাসিতার কোনও উপকরণ ছিল না এবং প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং পবিত্রচেতা দরবেশের ন্যায় দম্পতি যুগল শুভ্র-শান্ত, সহজ সরল জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন।

ফজরের নমাজের পরে নূরউদ্দীন ও রুক্মিণী সরোবর-তটের ক্ষেত্রে যাইয়া বৃক্ষলতা গুল্মগুলির যত্ন লইতেন। কোনটির মূল খুঁড়িয়া দিতেন, কোনটির গোড়ায় পানি ঢালিতেন, কোনটির শাখা ছাঁটিয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই বাগানটি ফল-ফুলে সজ্জিত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। স্বহস্ত রোপিত বাগানের ফল-ফুল এবং শাক-সব্জীতে যে আনন্দ ও মিষ্টতা বোধ হইতে লাগিল, চিত্তোর এবং মালবের শাহী-বাগানের ফলমূলেও সে স্বাদ মিষ্টতা ছিল না। পূর্বে দাস-দাসীরাই তাঁহাদের সেবা করিত। এক গ্লাস পানিও তাঁহাদিগকে ঢালিয়া খাইতে হইত না। তাহাতেই সুখ বলিয়া তখন ধারণা ছিল। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, নিজের কাজ নিজের ইচ্ছায় নিজের হাতে করায় কত সুখ, কত স্ফূর্তি! দুইটি ভীলকে কিছু জমি আবাদের কাজে প্রথম হইতেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহা হইতে যে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল।

সরোবরের নির্মল জলে নূরউদ্দীন ও রুক্মিণী অবগাহন করিয়া স্নান করিতেন, সাঁতার কাটিতেন, কমল ফুল তুলিলেন। কখনও কখনও জাল লইয়া মৎস্য ধরিতেন। তাহাতে কত আনন্দ! কত স্ফূর্তি! কত সুখ! রাজপুরীতে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। প্রত্যহ বিকালে মাছের জন্য কিছু খাদ্য সরোবরের নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করিতেন। যথাসময়ে দলে দলে মৎস্য সেই স্থানে সমবেত হইয়া ধাবন-কূর্দন এবং উল্লম্ফনে এক আনন্দবাজার বসাইতো। মাছের ক্রীড়া দেখিয়া নবীন-দম্পতি যে নবীন ও সরস আনন্দ লাভ করিতেন, রাজবাড়ীর বিশাল সরোবরে মাছের খেলা দেখিয়া সে আনন্দ লাভ কখনও অদৃষ্টে ঘটিয়া ওঠে নাই। ময়ূর

এবং ময়ূরীগুলি প্রতিদিন সকালে আশ্রমে আহারের জন্য আগমন করিত, শস্যের দানা খাইয়া তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত। তাহাদিগকে ভালোবাসিতে বাসিতে তাহারা এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই তাহারা বিচিত্র পুচ্ছ মেলিয়া নৃত্য করিত। সে নৃত্যের শোভা কত মনোলোভা! সরোবরতটের মখমলনিন্দিত উজ্জ্বল কোমল শ্যামল ঘাসের উপরে দলে দলে ময়ূর-ময়ূরী মোরগ-মুরগী ও কপোত-কপোতী বিচরণ করিয়া, ডাকিয়া ডাকিয়া আনন্দের হাট—শোভার বাজার খুলিয়া দিত, সরোবরের ঈষৎ কৃষ্ণাভ জলরাশি পবন-হিল্লোলে যখন থৈ থৈ করিয়া নাচিত, সে-নাচার সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙের জলজ পুষ্পরাশি শোভা ছড়াইত, গন্ধ লুটাইত এবং নাচিয়া নাচিয়া গায়ে গায়ে ঢলাঢলি করিত। সে-শোভা দেখিয়া দম্পতি-হৃদয় মুগ্ধ হইত, চক্ষু তৃপ্ত হইত, আত্মা আনন্দ পাইত।

প্রভাতে মধুর কণ্ঠে পাখীর সুধামাখা তানে, দম্পতিযুগল জাগিয়া উঠিয়া সরোবরস্নাত স্নিগ্ধ-সমীর সেবনে স্ফূর্তি লাভ করিতেন। অজু করিয়া নামাজ শেষে মধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতেন। কোরআনের সেই মধুরস্বরে বনভূমি যেন পবিত্রতায় এবং সরসতায় ছাইয়া যাইত। ভীল যুবক-যুবতীরা অর্থ না বুঝিলেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিত। প্রভাত-রবির প্রথম রশ্মিজাল যখন আশ্রমের উদ্যান, সরোবর এবং প্রাঙ্গণ লোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন পত্রাবলী এবং দূর্বাদলের শিশিরবিন্দুগুলি লক্ষ লক্ষ মুক্তাফলের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিত। বনজ ফুলের কোমল মধুর গন্ধ বহিয়া প্রভাত-পবন যখন সখিনার অঞ্চল উড়াইয়া বহিয়া যাইত, যখন তরুণ অরণিমা পাতে তাহার মুখখানি আরও রমণীয় হইয়া উঠিত, তখন নূরউদ্দীনের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠিত। রুক্মিণী যখন স্বহস্তরোপিত পুষ্প-বৃক্ষ হইতে ফুল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া নূরউদ্দীনের গলায় পরাইয়া দিত, তখন নূরউদ্দীনের চেহারায় নূর আরও জ্বলিয়া উঠিত। সে নূরের দীপনায় সখিনার হৃদয় আরও দীপ্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ সুখ ও আনন্দের মধ্যে তৃপ্তি ও প্রীতির সহিত উভয়ের মুক্ত-জীবনের ধারা অবাধ নির্ঝর ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। লতা যেমন লতার গায়ে মিশিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া আঁকড়াইয়া এক হইয়া বাড়িতে থাকে, নূরউদ্দীন ও সখিনার হৃদয় দুইটি তেমনি ভাবের কল্পনায়, রসের আল্পনায়, প্রেমের বন্ধনে, অন্তরের আকর্ষণে এক হইয়া গেল। দুই প্রাণের তারে একই ঝঙ্কার দুই হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। দুই হৃদয়-বাগে একই ভাবপুষ্প পুষ্পিত হইতে লাগিল। দুই হৃদয়-নদীতে একই চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইল। দুইটি হৃদয় প্রভাতপদ্মের ন্যায় নিতান্ত নির্মল। উভয় হৃদয়ে কেবল আনন্দ—কেবল রস—

কেবল পুণ্য ও প্রীতির ধারা উছলিয়া বহিতে লাগিল। ক্রমশঃ আশ্রম বাসে যতই অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন, ততই শাহজাদা ও রাজকুমারী রাজপুরীর কথা ভুলিতে লাগিলেন। রাজপুরীর জীবনযাত্রা ততই কুটিল আড়ম্বরপূর্ণ ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ-বাসের প্রতি বিরক্ত এবং বনের নির্জন ও শান্ত-শীতল জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জমাট বাঁধিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গুজরাটপতি সুলতান আহ্‌মদ শাহ্ নিতান্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। প্রতি বৎসর বসন্তকালে বিপুল ঘটায় শিকারে বাহির হইতেন। আমরা যে বৎসরের ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সে বৎসর তিনি বিলাসপুরের নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও ভল্লুক শিকারে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী কায়সরজাহাঁ বেগমও মৃগয়াপটু ছিলেন। তিনিও প্রতি বৎসর স্বামীর সঙ্গে মৃগয়ার্থে বহির্গত হইতেন। তীরন্দাজীতে তাঁহার বেশ হাতযশও ছিল। তাঁহার শাণিত শায়কসন্ধানে শত শত শ্বাপদ সদ্য সদ্য শমনসদনে প্রেরিত হইত।

সুলতান শিকার করিতে করিতে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। বহু পরিশ্রমে তিনটি ভল্লুক ও দুইটি বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করিয়া তিনি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবেন, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড হরিণ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে অশ্ব ধাবিত করিলেন। হরিণটি ক্রমশঃ অক্রবক্র গতিতে অনেক দূরে যাইয়া নিবিড় বনের মধ্যভাগে প্রবেশ করিলে, সুলতানও সেই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলতান শায়ক সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বদেশের ঝোপ হইতে একটি বিরাট ব্যাঘ্র সুলতানের অশ্বের মস্তকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া কামড়াইয়া ধরিল। ঘোড়াটি ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়া উল্লম্ফন করায় সুলতান সহসা ভূপতিত হইলেন। ঘোড়াটি ব্যাঘ্রের আক্রমণে মাটীতে পড়িয়া গেল। সুলতান মাটীতে পতিত হইয়া তরবারির ভীষণ আঘাতে ব্যাঘ্রটিকে নিহত করিবার উপক্রমে, বাঘিনীটাও সুলতানকে আক্রমণ করিল। যুগপৎ ব্যাঘ্র-দম্পতি কর্তৃক আহ্‌মদ শাহ্ আক্রান্ত হওয়ায় গুরুতররূপে জখম হইয়া পড়িলেন। ব্যাঘ্রটিকে নিহত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও মাত্র সে আহত হইল। আহ্‌মদ শাহের ঘোড়াটি আরব-জাত ছিল। সে জখম হইয়াও পলায়ন না করিয়া প্রভুর বিপদে উচ্চকণ্ঠে হিন্ হিন্ করিয়া ডাকিতে এবং ব্যাঘ্রটিকে পদাঘাত করিতে লাগিল। যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থান নূরউদ্দীনের আশ্রম

হইতে বেশী দূরে ছিল না। নূরউদ্দীন ঘটনা-স্থানের অদূরেই কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য একটি ভীল ভৃত্যকে লইয়া শুষ্ক বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন। সহসা অচিন্তিত এবং অশ্রুতপূর্ব ভাবে ঘোড়ার আর্ত-কণ্ঠস্বর শুনিয়া কুঠার-হস্তে দ্রুতবেগে আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ব্যাঘ্রটি শিকারীর দক্ষিণ বাহু ভীষণভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। শিকারী বাম হস্তে কেবল ধনুকের দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে বৃথা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। নূরউদ্দীন কুঠার উত্তোন মাত্র বাঘিনীটি তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। বাঘিনীটি লাফাইয়া পড়া মাত্র নূরউদ্দীন তাহার মস্তকে কুঠারের এমন নিদারুণ আঘাত করিলেন যে, বাঘিনীর মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর বাঘটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়ায় সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের ভিতরে পলায়ন করিল। ভীল যুবক গাছ কাটিবার গুরুভার দা লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুলতান গুরুতররূপে আহত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নূরউদ্দীন স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে বহন করতঃ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। ভীল যুবক তাড়াতাড়ি অশ্বটির মস্তকে পটি বাঁধিয়া তাহাকেও আশ্রমে টানিয়া আনিল।

নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণী প্রাণপণে সুলতানের সেবা করিতে লাগিলেন। পটি বাঁধিয়া এক জাতীয় বন্যলতা ছেঁচিয়া তাহার রসে পটি ভিজাইয়া দিলেন। দীর্ঘকাল জল সিঞ্চন এবং বায়ু ব্যজন করিবার পরে সুলতান ঈষৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দারুণ যন্ত্রণায় আবার মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। সখিনা গোশ্‌তের শুরুয়া রন্ধন করিয়া পুনঃ পুনঃ একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

এক দিন পরে রোরুদ্যমানা বেগম কয়সরজাহাঁ লোকজন লইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে নূরউদ্দীনের আশ্রমে আসিয়া সুলতানের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নূরউদ্দীন ও রুক্মিণী পূর্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা যাঁহার সেবা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং সুলতান আহমদ শাহ্। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বেগমকে তাঁহারা নিতান্ত বিনয় ও সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া কুটীরতলে মৃগচর্ম পাতিয়া আসন দান করিলেন। লোকজন বাহিরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তৃতীয় দিনে সুলতান চৈতন্য-প্রাপ্ত হইয়া দুগ্ধপানের অভিপ্রায় জানাইলেন। নূরউদ্দীন পূর্বেই সুলতানের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুলতান দুগ্ধ পান করিয়া উঠিয়া বসিলেন। নূরউদ্দীন যেরূপ সহসা উপস্থিত হইয়া ভীষণ বিক্রমে ব্যাঘ্র নিধন করিয়া তাঁহার জীবন বাঁচাইয়াছিলেন, তাহা বেগম ও অনুচরদিগের নিকট আগ্রহের সহিত বর্ণনা

করিলেন। বেগম নিজের অঙ্গের যাবতীয় মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া আগ্রহভরে উপহারস্বরূপ দান করতঃ স্বহস্তে রুক্মিণীর অঙ্গে পরাইয়া দিতে চাহিলেন।

রাজ্ঞীর মহানুভবতার জন্য রুক্মিণী পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া উপহার প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু বেগম নাছোড়বান্দা! রুক্মিণীকে গহনা না পরাইয়া ছাড়িবেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পরে রুক্মিণী বলিলেন ঃ "মা! আমরা বনবাসী ফকির। গহনা নিয়ে কি করব! আমাদের নিকট ঐ সমস্ত হীরা-মণিমুক্তার কোনও আদর নেই। উহা আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকি। লোকালয়ে উহার আবশ্যকতা থাকতে পারে, কিন্তু এই কাননাশ্রমে উহার কোনও কদর নেই!"

রাজ্ঞী ঃ অন্ততঃ আমার চক্ষু বিনোদন এবং প্রাণের শান্তির জন্য তোমাকে পরতেই হবে। আমরা চলে যাবার পরে না হয়, ফেলে রেখো।

রুক্মিণী ঃ আমি পরতে রাজি আছি, কিন্তু যাবার সময় নিয়ে যেতে হবে।

রাজ্ঞী ঃ মা! যা' তোমার অঙ্গে পরাব, তা আবার কেমন করে গা হতে কেড়ে—গাত্র হতে উন্মোচন করে নিয়ে যাব! তা কখনই হবে না!

রুক্মিণী ঃ তবে আমি পরতে পারব না।

অগত্যা রানী রুক্মিণীর শর্তেই স্বীকৃত হইয়া সমস্ত অলঙ্কার রুক্মিণীকে পরাইয়া দিলেন। রুক্মিণী সেই সমস্ত ঘর-আলো-করা গহনা পরিয়া রমণীয় মূর্তি ধারণ করিলেন। রাজ্ঞী হাস্য-বিস্ফুরিত অধরে বলিলেন ঃ "মা! এইবার তোমাকে মহীয়সী রাজরানীর ন্যায় দেখাচ্ছে! আমার সাধ যে, তোমার ঐ ভুবনমোহিনী মূর্তি নয়ন ভরে দেখি।"

অল্প সময়ের মধ্যেই রানী এবং রুক্মিণীর মধ্যে গভীর সদ্‌ভাব ও আত্মীয়তার সূচনা হইল। রাজ্ঞী তাঁহাকে ধর্মকন্যা বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সুলতান আরও তিনদিন আশ্রমে অবস্থান করিলেন। নূরউদ্দীনের বীরত্বে এবং সৌজন্যে সুলতান একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ, নবীন তাপস-দম্পতির রাজ সন্তাননিন্দিত অপরূপ সৌন্দর্য, বিনয়-নম্র ব্যবহার, মধুর সরল ভাষা এবং উদার ভাবে সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, এমনকি চোখের দৃষ্টিতেও এক মহান সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশ পাইত। সাধারণ বংশীয় ব্যক্তিদিগের সে মহত্ত্ব এবং সম্ভ্রমের ভাব একান্ত দুর্লভ। সুলতান এবং সুলতানা উভয়েই নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণীর প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নূরউদ্দীন হাত যোড় করিয়া বলিলেন ঃ "জাহাঁপনা! অপরাধ মার্জনা হোক। ফকির কখনও নিজের পরিচয় দিতে পারে না। আর ফকিরের পরিচয় লাভেও কোনও লাভ নেই।" সুতরাং তাপস-দম্পতির পরিচয় সুলতান ও সুলতানার কাছে অব্যক্তই রহিল।

সুলতান কুমারকে নগদ অর্থ এবং বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি জায়গীর দিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু নূরউদ্দীন তাহা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন।

সুলতান ও সুলতানা উভয়েই যানবাহন পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে একবার রাজপুরীতে লইবার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাপস-দম্পতি তাহাও অস্বীকার করিলেন। অগত্যা সুলতান বছর বছর মৃগয়ার সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইবেন বলিয়া, নূরউদ্দীনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; শেষ পর্যন্ত নূরউদ্দীন তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

সপ্তম দিবস প্রাতে সুলতান এবং বেগম যথাক্রমে নূরউদ্দীন এবং সখিনাকে আলিঙ্গন ও উভয়ে গভীর স্নেহে মস্তক চুম্বন করিয়া সাশ্রু নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুলতান এবং সুলতানা যাইবার সময় বেশ অনুভব করিলেন যে, আশ্রমের প্রত্যেকটি তৃণাঙ্কুর যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আশ্রমভূমি যেন কত কালের সুপরিচিত এবং প্রিয়ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে ঠাঁই লাভ করিয়াছে। যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেমের মুক্ত প্রকাশ, সেখানের ভূমি এবং তরুলতা পর্যন্ত মানুষকে প্রীতির বন্ধনে এমনি করিয়াই আকর্ষণ করে। সেখানের বাতাস জীবনকে স্নিগ্ধ উল্লাস দান করে। সেখানের রূপ-রসে গন্ধ-স্পর্শে কেবল প্রেমের ধারাই বহিয়া থাকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গুরু সর্বানন্দ স্বামীর দৃষ্টান্তে ভয়াতুর হইয়া মুকুন্দ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেনাপতি রুমী খাঁ মহাপূজ্য মহামায়ার প্রতিমা ভঙ্গ করায়—যাহা সে জাগ্রত জীবন্ত এবং বরাভয়দাতা বলিয়া মনে করিত—মুকুন্দ একান্তই ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ওঠে।

সর্বানন্দ স্বামী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব, আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য রুমী খাঁ যখন পত্রসহ গুজরাটের শেখ উল্ ইসলাম বাহারুল্-উলুম শাহসুল-ওলামা হোসেনউদ্দীন শিরাজীর নিকট প্রেরণ করেন, তখন পথিমধ্য হইতে মুকুন্দ পলায়ন করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হয়। জয়পুরে যাইয়া যুবরাজ অরুণ সিংহের সহিত দেখা করিয়া রুক্মিণী, নূরউদ্দীন ও রুমী খাঁর সমস্ত কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে। রুমী খাঁই যে শিপ্রাতটে জলপ্লাবনের দিবস সঙ্গীয় লোকজনের সাহায্যে রুক্মিণীকে কৌশলক্রমে সরাইয়া ফেলিয়া, পরে নূরউদ্দীনের সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই কথাই দৃঢ়তা

সহকারে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে।

মুকুন্দ কয়েকদিন সঙ্গে থাকিয়া নূরউদ্দীন, রুমী খাঁ এবং রুক্মিণীর কথোপকথন হইতে রুক্মিণী যে জয়পুর যুবরাজ অরুণ সিংহের পত্নী এই সমস্ত তথ্য বুঝিতে পারিয়াছিল।

অরুণ সিংহ, মুকুন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মুকুন্দের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। সর্বোপরি নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণীর সম্মিলনই তাঁহার মর্মে মর্মে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ঢালিয়া দিল। অরুণ সিংহ মনে মনে ভাবিলেন, "কি ভয়ানক এবং অসহ্য ব্যাপার! আমার বিবাহিতা পত্নী হইয়া আমাকে পায়ে ঠেলিয়া পরপুরুষের সহিত পীরিতি ভুঞ্জিতে নিবিড় বনে বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছে! এমন কুলটাকে তুষানলে দগ্ধ করিলেও মনের ক্ষোভ মিটিতে পারে না!"

রুমী খাঁ এই কার্যের সহায়ক বলিয়া তাঁহার প্রতিও হিংসার আগুন বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। আর নূরউদ্দীন তাঁহার পত্নীকে ভুলাইয়া যে রস বিলাসে প্রেমোল্লাসে বিজনবাসে যৌবনের মজা লুটিতেছে, তাহাকে তো কাঁচা চিবাইয়া খাইলেও মনের জ্বালা নিবারণ হয় না।

অরুণ সিংহ অনুতাপে এবং প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নিজ রাজ্যের এলাকা হইলে—সেই মুহূর্তেই উড়িয়া যাইয়া তাহার পরম শত্রু, প্রেম পথের কণ্টক, নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণীকে ধরিয়া আনিয়া তিল তিল করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেন।

যে বিলাসপুরের বনে তাহারা বাস করিতেছে, তাহা গুজরাটের এলাকায় অবস্থিত, সুতরাং সেখানে প্রকাশ্যে অভিযান চলিবে না।

অরুণ সিংহ অনুচর, বয়স্য এবং সেনাপতি লছমন্ সিংহের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, গুপ্তভাবে যাইয়া হঠাৎ আক্রমণপূর্বক পাপিষ্ঠ ব্যভিচারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইবে। প্রকাশ্যে আক্রমণ করিতে গেলে গুজরাট এবং মালবপতির ক্রোধভাজন হইতে হইবে। সুতরাং গুপ্ত আক্রমণের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ পঞ্চাশজন রাজপুত যোদ্ধা সহ ছদ্মবেশে ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী-রূপে যাইবার প্রস্তাব নির্ধারিত হইল।

অবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। বেলা ডুবু ডুবু প্রায়। পশ্চিমাকাশে অরুণরাগে রঞ্জিত নানা বর্ণ হাল্কা মেঘের মেলা বসিয়াছে। মেঘগুলি মুহুর্মুহু আকৃতি পরিবর্তন করিয়া

নূতন নূতন শোভার সৃষ্টি ও দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে।

বিলাসপুরের কানন-আশ্রমে সন্ধ্যার বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সে ফুরফুরে হাওয়ায় কামিনী ও বকুলের ফুলগুলি ঝুরঝুর করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। আম্রবৃক্ষ হইতে ছোট ছোট আমগুলি টপ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। কোকিল-কোকিলা ঝঙ্কার দিয়া স্ফূর্তিভরে ডাকিয়া ডাকিয়া বনভূমি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। রুক্মিণী এহেন সময়ে আশ্রমের সম্মুখস্থ বাগিচার মধ্যে স্বহস্তরোপিত বৃক্ষ-লতাগুলির প্রতি মমতাপূর্ণ চক্ষু ফিরাইয়া এবং স্নেহকোমল হাত বুলাইয়া বেড়াইতেছিলেন। আর আবশ্যকবোধে কাহারও কাহারও মূলে স্নেহধারারূপ শীতল সলিলধারা ঢালিয়া দিতেছিলেন। অস্তমান রবির কিরণজাল মেঘের গায়ে ঠেকিয়া তাহার লাল বর্ণ আভা পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রুক্মিণীর ফুটন্ত কমল-নিন্দিত কমনীয় কান্তিময় রমণীয় মুখমণ্ডলের উপর সে নীলিমা পড়িয়া মণিজনমনোহর শোভা হইয়াছিল। চতুর্দিকে দূরে শ্যাম শোভাসম্পন্ন সমুন্নত তরুশ্রেণীর বিনোদ দৃশ্য। মধ্যে স্বচ্ছ সলিল পরিপূর্ণ সরোবরের ঢল ঢল শোভা! তাহার তটে সবুজ তৃণক্ষেত্রের মধ্যে ফুল্ল-ফুল-কুল-সমাকুল মনোহর কুঞ্জ-বীথিকা! আর তাহার মধ্যে উদ্ভিন্নযৌবনা সমুজ্জ্বলকান্তি ভুবন-মোহিনী সুন্দরী রুক্মিণীর রূপের ছটা। মরি! মরি! কি চমৎকার চিত্তবিনোদন দৃশ্য! মনোহারিণী শোভার বাহার!

অরুণসিংহ নিবিড় অন্তরালে থাকিয়া তীক্ষ্ণ এবং তীব্র দৃষ্টিতে সুন্দরীকুল-ললামভূতা রুক্মিণীর সৌন্দর্য দেখিয়া দেখিয়া জ্বলিতে লাগিলেন। হায়! এমন নিরুপমা রূপসী তরুণীর যৌবনের তরুণ প্রেমসম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না! ইচ্ছা হইতেছিল, এই নির্মম সৌন্দর্যের বিমল প্রতিমার চরণতলে আছড়াইয়া পড়িয়া একবার তাহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু হায়! সে চেষ্টা তো অনেকবার হইয়াছে। সে যে কিছুতেই ভুলিবার পাত্রী নহে। সে যে প্রাণান্তেও তাহাকে চাহে না! সে যে নূরউদ্দীন গতপ্রাণা! সে যে নূরউদ্দীনের নেশায় মাতোয়ারা, তাহার সেবায় আত্মহারা—তাহার প্রেমে বিবশা! তাহার চিন্তায় সরসা। তবে—তবে আর কিসের সাধনা? এইবার প্রতিহিংসার সাধনা! বিষদিগ্ধ শাণিত ছুরিকার সাধনা! বিষের জ্বালায় দগ্ধ করিয়া করিয়া ঐ পাপ হৃদয় ভস্ম করিতে হইবে। কঠোর দণ্ডে এই মোহ ও কামবিকারের নেশা চূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অরুণ সিংহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তের মধ্যে শার্দূলের ন্যায় বেগে রুক্মিণীর প্রতি ধাবিত হইলেন। রুক্মিণী একটি গাছের মূলে পানি দিতেছিলেন। সহসা পদ-শব্দে চকিত হইয়া দেখিলেন অরুণ সিংহ তাঁহার দিকে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ব্যাঘ্র-দর্শনে মৃগী যেমন চকিত এবং

কম্পিত হইয়া উঠে, রুক্মিণীও তেমনি ভীত ও কম্পিত হইয়া পড়িলেন; মুহূর্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, অরুণ সিংহ আজ প্রতিহিংসা-পরায়ণ। অরুণ সিংহের চোখ মুখ হইতে ভীষণ জিঘাংসার ক্রূরতা প্রকাশ পাইতেছে।

সখিনা মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। পুরুষকণ্ঠে বলিলেন, "অরুণ সিংহ, সাবধান! আর এক পদ অগ্রসর হলে, এই প্রস্তরখণ্ডে মস্তক চূর্ণ করব।"—এই বলিয়া উদ্যানতল হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হস্তে উত্তোলন করিলেন। এমন সময় অরুণ সিংহের সহচরগণ চতুর্দিক হইতে যুবতীকে ঘিরিয়া লইয়া বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রুক্মিণী তখন ভূমিতল হইতে প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া বেগে আততায়ীদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন। ভীষণ প্রস্তরাঘাতে দুইজন রাজপুত চূর্ণমস্তক হইয়া ভূপতিত হইল। এদিকে অরুণসিংহ যাইয়া রুক্মিণীর কেশাকর্ষণ করিয়া ভূপাতিত-প্রায় করিলেন। এমন সময় নূরউদ্দীন একটি ভীল যুবকসহ মৃগয়া হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। দস্যুগণ কর্তৃক রুক্মিণীকে আক্রান্ত দেখিয়া বীর কুমার ভীষণ গর্জন করিয়া তরবারি হস্তে দস্যুদলের প্রতি বিদ্যুদ্বেগে ধাবমান হইলেন।

দস্যুগণও ভীষণভাবে কুমারকে আক্রমণ করিয়া বসিল। অরুণ সিংহ যুবতীকে বধ করিবার জন্য তরবারি প্রহারে উদ্যত হইলে ভীল যুবক পশ্চাদ্দেশ হইতে ভীষণ লাঠি প্রহারে তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। নূরউদ্দীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বেঈমান কাফের! নারীর প্রতি আক্রমণ কেন? পুরুষ হও তো এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"—এই বলিয়া অরুণ সিংহের সমীপবর্তী হইলেন। অরুণ সিংহ আসন্ন বিপদ দেখিয়া রুক্মিণীর কেশপাশ ত্যাগ করিয়া শাহ্‌জাদার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহ্‌জাদা ভীষণভাবে মরিয়া হইয়া অরুণ সিংহকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। শাহ্‌জাদার প্রচণ্ড প্রতাপে রাজকুমার কিছু বিপন্ন হওয়া মাত্রই রাজপুতগণ আসিয়া নূরউদ্দীনকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। নূরউদ্দীন হস্তিযুথ-আক্রান্ত সিংহের ন্যায়, সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, দৈত্যবেষ্টিত রোস্তমের ন্যায় চরম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে একদল দস্যু রুক্মিণীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত অপেক্ষাও রুক্মিণীর বন্ধন এবং অপহরণ শাহ্‌জাদার নিকট যার পর নাই কঠিনতম এবং ভীষণতম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভীল ভৃত্যযুগল কুমারের জন্য যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়া পূর্বেই ভূপাতিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে একখানি তরবারি দিবারও লোক ছিল না। নূরউদ্দীন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া "আল্লাহু আকবর" রবে বনভূমি কম্পিত করতঃ সেই ভগ্ন তরবারি সাহায্যে অরুণ সিংহকে হামলা করিলেন। অরুণ সিংহ কৌশলে নূরউদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া

মহাতেজে তাঁহাকে তরবারি প্রহার করিলেন। নূরউদ্দীন ক্রমশঃই শত্রুদিগের আক্রমণে আহত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভগ্ন তরবারি আক্রমণের পক্ষে একেবারেই অকর্মণ্য হইয়াছিল। অস্ত্রহীন অবস্থায় কাফেরের হাতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, এই অনুতাপে তাঁহার শরীরের শিরা অণুশিরাগুলির মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। এমন সময়ে দূরে "আল্লাহু আকবর" রব গভীর গর্জনে ধ্বনিত হইল। তৎসঙ্গে পাষাণ পৃষ্ঠে অশ্বের পদাঘাত শব্দ শ্রুত হইল। রাজপুতগণ চকিত ও ভীত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে এক প্রকাণ্ডবপুঃ তেজস্বী মুস্‌লিম বীর বজ্রবেগে আসিয়া অরুণ সিংহের উপর আপতিত হইলেন। একই আঘাতে তিনি রাজকুমারকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া ভূপাতিত করিয়া বন্দী করিলেন।

অপরাপর রাজপুত ব্যাঘ্রতাড়িত জম্বুকবৎ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিল। অতঃপর সেনাপতি রুমী খাঁ শাহ্‌জাদা নূরউদ্দীনকে আলিঙ্গন দানে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "শাহ্‌জাদা! খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিন। কোনও ভয় নেই! রুক্মিণীকে উদ্ধার করেছি। আমার লোকেরা তাকে নিয়ে আসছে। আমি আপনাদের তত্ত্ব নিবার উদ্দেশ্যে আসছিলাম। পথে দস্যুদিগের সহিত হঠাৎ দেখা হয়। রুক্মিণীকে মুক্ত করেই তার মুখে আপনার বিপদের কথা শুনে দ্রুত অশ্ব চালিয়ে এসেছি। খোদাতালার হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে আপনার রক্ষায় জয়যুক্ত করেছেন।"

অতঃপর সেনাপতি নূরউদ্দীনের ক্ষতস্থানগুলি আপনার বসন ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি সাহেবের লোকজন রুক্মিণী এবং বন্দী দস্যুগণকে লইয়া তথায় হাজির হইল। আগত এবং অচৈতন্য অরুণ সিংহেরও যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। নূরউদ্দীন নিজে আহত হইয়াও জয়পুর-রাজকুমারের চিকিৎসা এবং সেবায় যথেষ্ট যত্ন লইতে লাগিলেন। রাজকুমার নূরউদ্দীনের মহানুভবতা দেখিয়া বিস্মিত এবং লজ্জিত হইলেন।

রুমী খাঁর আগমনের দুই দিবস পরে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সুলতান আহমদ শাহ্‌ ও বেগম কয়সরজাহাঁ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমে এক মহা আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। সুলতান, চিতোর সেনাপতি রুমী খাঁকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত এবং জয়পুর-রাজকুমার ও নূরউদ্দীনকে আহত দেখিয়া দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলেন। সুলতানের কৌতূহল দেখিয়া রুমী খাঁ সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদরূপে বয়ান করিলেন।

সুলতান ও সুলতানা নূরউদ্দীন এবং রুক্মিণীর পরিচয় পাইয়া সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। অতঃপর সুলতান সকলকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী

আহমদনগরে প্রত্যাবর্তন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কানমাশ্রম ত্যাগ করিতে তাপস-দম্পতি ঘোরতর আপত্তি করিলেও সুলতান তাহাকে কর্ণপাত করিলেন না। রুমী খাঁও সুলতানের মতই দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সুলতান নিজে দায়িত্ব স্বীকার করায় প্রেমিক-প্রেমিকা আহমদনগরে যাইতে সম্মত হইলেন। নূরউদ্দীন মহত্ত্ব প্রকাশপূর্বক অরুণ সিংহকে ক্ষমা করিয়া দেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর যথাসময়ে সুলতান আহমদনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতানের আদেশে দম্পতিযুগলের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আলোক, পুষ্প পল্লবসজ্জা ও বাদ্যোদ্যমে রাজধানী সজ্জিত, শোভিত ও মুখরিত হইল। মন্ত্রী ও শাহজাদাগণ আসিয়া দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর নির্দিষ্ট দিবসে এক বিশেষ দরবারের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সুলতান এই দরবারে মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন এবং চিতোরের রাণা উদয় সিংহ উভয়কেই সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিপুল আড়ম্বরে এক মহাদরবারের অনুষ্ঠান হইল। সুলতান আহমদ শাহ্ এই দরবার রত্নখচিত সমুজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত করতঃ নূরউদ্দীন এবং সখিনাকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের পরিচয়ও একনিষ্ঠ প্রেমের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা কীর্তনপূর্বক নূরউদ্দীন যেরূপভাবে তাঁহাকে ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বীরত্ব ও সাহসের সহিত রক্ষা করিয়া সেবা-শুশ্রূষায় মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। বিরাট সভায় 'ধন্য ধন্য' এবং 'সাবাস' 'সাবাস' রব পড়িয়া গেল।

অতঃপর রাজকবি মীর্জা ফররোখ্, আহ্মদ মুলতানী, কুমার ও কুমারীর একনিষ্ঠ জ্বলন্ত প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিয়া একটি সুললিত ও সারগর্ভ কবিতা পাঠে সকলকে পুলকিত করিলেন। অনন্তর রাজকীয় প্রসিদ্ধ বক্তা আবদুল গফুর শিস্তানী অতুলনীয় বাগ্মিতা ও অলঙ্কারঘটাপূর্ণ এক সুললিত বক্তৃতায় কুমার ও কুমারীর একনিষ্ঠ প্রেম (এশ্‌কে সাদেকী), মহানুভবতা ও উদারতার সরস বর্ণনায় সকলের প্রীতি বিধান করিলেন। অতঃপর শেখ উল ইস্‌লাম হোসেন উদ্দীন শিরাজী দম্পতি-যুগলের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন! সর্বশেষে সুলতান আহ্মদ শাহ্ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সম্মানিত নবাব, রাজন্যবৃন্দ ও সভ্যগণ! শাহজাদা নূরউদ্দীন এবং রাজকুমারী রুক্মিণী আমাকে যেরূপভাবে রক্ষা করে পরম যত্নে সেবা করেছিলেন, তার জন্য এবং তাদের নির্মল প্রেম ও আদর্শ চরিত্রের জন্য চিতোরেশ্বরের যে অর্ধরাজ্য আমি পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে জয় করে নিয়েছিলাম, তা এক্ষণে চিতোরেশ্বরের কন্যা সখিনা বেগম ও তাঁর জামাতা নূরউদ্দীনকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করলাম।"

মহানুভব সুলতান আহ্‌মদ শাহের এই বিস্ময়কর দানবার্তা শ্রবণে সভাস্থলে মহা-আনন্দ কলরোল উত্থিত হইল। পনের মিনিট পর্যন্ত 'মারহাবা' 'মারহাবা', 'সাবাস' 'সাবাস' ধ্বনিতে সভাস্থল আলোড়িত হইতে লাগিল। অতঃপর বিপুল জনতা সুলতান আহ্‌মদ শাহের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সমস্ত ভারতভূমি সুলতানের অতুল দান এবং মহত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপসংহার

যথাসময়ে নূরউদ্দীন সুলতান নূরউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া নবরাজ্য নূরগড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুলতান শাহ্ ধুমধামে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেনাপতি রুমী খাঁ চিতোরের সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া নূরউদ্দীনের আগ্রহে তাঁহার মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। সুলতান রোকনউদ্দীন মালবের সাতটি পরগণাও পুত্রকে দান করিয়া নূরগড়ের বিস্তার সাধন করিলেন। রাণা উদয় সিংহ জামাতাকে কুড়ি লক্ষ টাকার জওয়াহেরাত, সিংহাসন এবং আসবাবপত্র দান করিলেন। সুলতান নূরউদ্দীন নিতান্ত ন্যায়-পরায়ণতার সহিত প্রজাপালন করিয়া অল্প সময়েই প্রজামণ্ডলী কর্তৃক 'সালেহ' উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিক্ষার জন্য সমস্ত রাজ্যে ১৮০টি সাধারণ বিদ্যালয় এবং একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্প সময় মধ্যে ধন-সম্পদ এবং সুখ-শান্তিতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের আদর্শ স্থান লাভ করিলেন। সুবিচার, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সুশাসনে প্রজাকূল এমনি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা প্রাতঃসন্ধ্যা মঙ্গলময় আল্লাহ্‌তালার দরবারে নূরউদ্দীন ও সখিনার মঙ্গল কামনা করিতে ভুলিত না।

— — —

বঙ্গ ও বিহার বিজয়

[সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২০শে শ্রাবণ সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে মাত্র ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদের সম্পাদিত মাসিক 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী-কথা 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' ধারাবাহিকরূপে লিখিতে শুরু করেন।

"৩য় বর্ষ ইসলাম-প্রচারকের সূচীপত্রে" দেখা যায় যে, সেই বর্ষের পত্রিকায় ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে উপন্যাসখানির প্রথম অংশ ও ৬৮ পৃষ্ঠা হইতে তাহার দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, মুতাবিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ৩য় বর্ষের ৭ম-৮ম সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' উপন্যাসখানির তৃতীয় অংশ প্রকাশিত হয়। তাহার নীচে 'ক্রমশঃ' কথাটি মুদ্রিত আছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে ৩য় বর্ষের ৯ম-১০ম সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজী সাহেবের লেখা 'মালাবারে ইসলাম-প্রচার' (প্রসিদ্ধ পারস্য ইতিহাস 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' হইতে অনূদিত) প্রবন্ধের প্রথমাংশ এবং 'উদ্গাথা' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' কাহিনীর পরবর্তী পরিচ্ছেদ তাহাতে ছিল না। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মে, মুতাবিক ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ তারিখের ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজী সাহেবের লেখা 'শোক-লহরী' শীর্ষক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত সুদীর্ঘ কবিতা এবং 'মালাবারে ইসলাম প্রচার' প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়। তাহাতেও 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' কাহিনীর কোনো অধ্যায় ছিল না। তিনি এই ঐতিহাসিক কাহিনী আদৌ সমাপ্ত করিয়াছিলেন কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই রচনাটির সংস্কৃতবহুল পদ-বিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহার তৃতীয় অংশের নীচে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, তিনি হয়ত এই রচনাটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ দানের পরিকল্পনাই প্রথমে করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার 'রায়-নন্দিনী' 'তারাবাঈ', 'ফিরোজা বেগম', 'নূরউদ্দীন' প্রভৃতিও ঐতিহাসিক উপন্যাস।—সম্পাদক]

। ১ ।

দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা হজরত ওমর ফারুকের (রাঃ) রাজত্বকালে ইসলামের পূর্ণ প্রভাব। অমিততেজাঃ সিংহ-বিক্রান্ত, ধর্মপ্রাণ, সদ্বিচারক মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) খলিফির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, যেরূপ প্রচণ্ড ইরম্মদবেগে রাজ্য-জয় এবং ইসলাম-প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পর আর কোনও বীরপুরুষ তাদৃশ রাজ্য-জয় এবং ইসলাম-প্রচার করিতে অদ্যাপি সক্ষম হন নাই। তাঁহার রাজত্বের দশ বৎসর তিন মাস মধ্যেই তদীয় বিক্রান্ত সেনাপতিগণ কর্তৃক এরাক, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, কুর্দিস্তান, পারস্য, খোরাসান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মিসর

প্রভৃতি রাজ্য বিজিত এবং অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। খলিফা ওমরের রাজত্ব যেরূপ ইসলাম-আলোকে সমুদ্ভাসিত, এরূপ আর কোন রাজত্বই নহে। বীরত্ব-যশমণ্ডিত ধর্মগতপ্রাণ খলিফা হজরত ওমর একদিন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাসহকারে সগর্বে বলিয়াছিলেন : "জগতের যাবতীয় অলীক ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, একমাত্র সত্য সনাতন আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট ইসলাম ধর্মই অক্ষত থাকিবে।" বাস্তবিকপক্ষে তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলেই এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত হইত। এই খলিফা ওমরের রাজত্বকালে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহালিব-বিন-আবিছৌফ (রাঃ) নামক একজন আরব্য সেনাপতি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করতঃ, ভারত-গগনে সুনির্মল অর্ধচন্দ্র এবং পূর্ণ-তারকা লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। হিন্দুগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয় এবং অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু এই অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না। খলিফা ওমরের মৃত্যুর পরেই ইহা আরবের অধীনতা পাশচ্ছেদন করে। অতঃপর দামেস্কের উম্মিয়া বংশীয় খলিফা ওলীদের রাজত্বকালে, ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে উক্ত প্রদেশ পুনরায় আক্রান্ত এবং আরবদিগের অধিকৃত হয়। তদন্তর গজনীপতি সুবক্তগীন এবং তৎপুত্র প্রখ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী সম্রাট সুলতান মাহমুদ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতঃ সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিয়া ইসলাম ধর্মের বিমল প্রভা বিকীর্ণ করেন। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তদীয় আর কোনও উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অবসর পান নাই। কিছুকাল পর 'ঘোর' রাজ্যের সহিত গজনী রাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় গজনীর প্রভাব চূর্ণীকৃত হয় এবং 'ঘোর' রাজ্য ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। এই ঘোর-রাজ্যেশ্বর সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা মহাবীর সুলতান মাআজ উদ্দীন বিন বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ ছাম (প্রকাশ্য—শাহাব উদ্দীন ঘোরী) ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিরোরী ক্ষেত্রে, হিন্দুস্থানের যাবতীয় হিন্দু নৃপতির সম্মিলিত প্রচণ্ড বাহিনীকে ভীষণ প্রতাপে পরাজিত, নিহত এবং বিতাড়িত করতঃ সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া, দিল্লী নগরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবককে স্বকীয় প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া যান। কিন্তু একাল পর্যন্ত কোনও মুসলমান সেনাপতি বঙ্গ বা বিহার প্রদেশ আক্রমণ বা অধিকার করেন নাই। ইহা সর্বপ্রথমে মহাবীর মোহাম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক বিজিত হয়। ইহা যেরূপভাবে অধিকৃত হয়, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত আমরা সুপ্রসিদ্ধ পারস্য-ইতিহাস "তারিখ ই-ফিরিশ্‌তা" অবলম্বনে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলিজী "ঘোর এবং গ্রাম সায়ার" রাজ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ ছামের রাজত্বকালে তিনি গজনীতে আগমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি হিন্দুস্থানে উপস্থিত হন, এবং দিল্লী দরবারের অন্যতম প্রধান ওমরাহ্ মলক মাজম হিশাম উদ্দীন বল্‌বকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই হিশামউদ্দীন বল্‌বকের চেষ্টা ও যত্নে মোহাম্মদ বখতিয়ার গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এবং গঙ্গার অপর তীরস্থ কতিপয় পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎপর ক্রমশঃ যখন তাঁহার শৌর্য-বীর্যের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন 'কাম্পেলা' এবং 'বেতারি' নামক প্রদেশদ্বয়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর কলেবর অসাধারণত্ব হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাঁহার ভূজদণ্ড আজানুলম্বিত ছিল। তিনি বিহার এবং 'মনেয়ার' প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে দ্রুত আক্রমণের সংকল্প করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর সৈন্য এবং যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। ঘোর, গজনী এবং খোরাসান হইতে যে-সমস্ত মুসলমান হিন্দুস্থানে আগমন করতঃ বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা বখতিয়ার খিলিজীর ঔদার্যে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীশ্বর কুতবউদ্দীন আইবক বখতিয়ার খিলিজীর বিহার আক্রমণের উদ্‌যোগ-বার্তা লোকপরম্পরায় শ্রুত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত উপহারাদি প্রেরণ করতঃ অধিকতর উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বখতিয়ার স্বকীয় দলবলসহ বিহার প্রদেশ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়া শীত ঋতুতে হিমানী-বায়ু সংস্পর্শে পত্র-পল্লব-শূন্য ফল-মূল-বিহীন উদ্যানের ন্যায়, নির্জনতার শান্তশীল ক্রীড়া-ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। বখতিয়ার বিহারের দুর্গ সমভূমি করিয়া ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত গোঁফ শ্মশ্রু শূন্য মুণ্ডিত-মস্তক, আর্ক ফলাধারী অধিবাসীবর্গ ও তাহাদের ধর্মযাজক স্বরূপ বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া ধরিত্রীর ভার হ্রাস করেন। বখতিয়ার এই স্থলে হিন্দুদিগের হস্তলিখিত ভূজপত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে ইহা পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে। বখতিয়ার অধিবাসীদিগের কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, এ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিষ্য এবং দুর্গ-বেষ্টিত নগরের অধিবাসীরা তাহাদের শিক্ষক ছিল। "বেহার" শব্দের অর্থ বিদ্যালয়। এ জন্য এই স্থান বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রভূমি থাকায় বেহার নামে অভিহিত হইত। যাহা হউক, মোহাম্মদ বখতিয়ার এইরূপে বেহার প্রদেশে ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতঃ প্রচুর ধনৈশ্বর্য সহকারে আনন্দোচ্ছাসিত হৃদয়ে সম্রাট কুতবউদ্দীনের সাক্ষাৎকার মানসে দিল্লীতে

উপস্থিত হইলেন। সুলতান কুতবউদ্দীন তাঁহার বেহার বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

বখতিয়ারের ঈদৃশ পদোন্নতি দেখিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সহযোগী ওমরাহমণ্ডলী তৎপ্রতি অযথা বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া সর্বদাই রাজসভায় বখতিয়ারের বিরুদ্ধে এমন সমস্ত কথার উত্থাপন করিতেন, যাহাতে সম্রাট তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদগৌরব হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে একদিন সকলে মিলিয়া সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিল যে, রাজকীয় শ্বেতবর্ণ-মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে বখতিয়ার একান্ত উৎসুক। কিন্তু সম্রাট কুতুবউদ্দীন বখতিয়ারের প্রাণহানি ভয়ে প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সভাসদগণ পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ে অনুরুদ্ধ এবং উত্তেজিত করায় অবশেষে সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর এক দিবস প্রকাশ্য রাজ-দরবারে দুর্মদ মত্ত মাতঙ্গবর আনীত হইলে, সম্রাট বলিলেন, "সমস্ত হিন্দুস্থানে এমন কোন হস্তী নাই যে এই হস্তীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে পারে।" তৎপর বখতিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সম্মুখে গোলক (বল) এবং সুপ্রশস্ত মাঠ রহিয়াছে; যদি ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে খেলিতে পার।" বীর বখতিয়ার সেই গিরিচূড়াসদৃশ অমিত-বিক্রম মত্ত মাতঙ্গ দর্শনে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া তন্মুহূর্তে সভা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ ভীম গদা হস্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

। ২ ।

বখতিয়ার অসীম বিক্রমে প্রীত প্রফুল্ল মুখে হস্তীর সম্মুখীন হইয়া দন্তীবরের দন্তযুগলের মধ্যস্থান লক্ষ্য করতঃ শুণ্ডের উপরিভাগে তৎপরতা-সহ স্বীয় সমগ্র শক্তির সহিত এমন ভীষণবেগে মুদ্গর প্রহার করিলেন যে, মাতঙ্গ প্রবর দন্তমূলে নিদারুণ আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করতঃ বখতিয়ারের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পূর্বেই রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে বখতিয়ারকে মহাকায় দুর্ধর্ষ-বিক্রম প্রমত্ত কুঞ্জর-যুদ্ধে অচিন্ত্যরূপে জয়লাভ করিতে দেখিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলী অধিকন্তু তাঁহার শত্রুগণও বিস্ময়ে করাঙ্গুল দংশন এবং সোল্লাসে বখতিয়ারকে প্রশংসাপূর্ণ জয়ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। বখতিয়ারের ঈদৃশ অসাধারণ বীর্যবত্তা এবং সাহসিকতা দর্শনে সম্রাট কুতবউদ্দীন অতি মাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই প্রকাশ্য রাজ-দরবারেই সর্বজন সমক্ষে বর্ণনাতীত রজত-কাঞ্চন এবং মণি-মুক্তা উপহার প্রদান করিলেন।

উন্নতমনা বীরবর বখতিয়ার তৎসমস্তই রাজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদানে অশেষ প্রশংসোভাজন ও যশের অধিকারী হইলেন। ফলতঃ, মোহাম্মদ বখতিয়ারের এই বদান্যতায় শত্রুগণ মুগ্ধ এবং মিত্রকুল অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

পরদিবস দিল্লীর রাজ-দরবার হইতে একটা লোহিতবর্ণ তাম্বু, একটি রণডঙ্কা এবং একটি সামরিক পতাকা-সহ বেহার এবং লক্ষ্মণাবতী প্রদেশে আধিপত্য স্থাপনের ভার মোহাম্মদ বখতিয়ারকে প্রদত্ত হইল। কেহ কেহ বলেন, সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত গৌড় এবং বঙ্গদেশের নামই লক্ষ্মণাবতী, আবার কেহ কেহ বলেন, গৌড় হইতে বেহারের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতী এবং গৌড়ের অপর প্রান্ত হইতে বেনারস এবং সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-ভাগকে 'বাঙ্গলা' বলে। প্রকৃতপক্ষে, শেষোক্ত বিভাগই তৎকালে বাঙ্গলা বলিয়া কথিত হইত। যাহা হউক, এই বাঙ্গালা এবং লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ রাজা লক্ষ্মণরায়ের পুত্র লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্য ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, নদীয়ায় লক্ষ্মণ রায়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজা লক্ষ্মণের স্ত্রী অত্যন্ত গুণমতী ছিলেন। ইনি প্রসবকাল উপস্থিত-প্রায় হইলে, রাজ্যের খ্যাতনামা জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করতঃ প্রসব-সময়ের ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্বিদেরা গণনা-পূর্বক রানীকে অবগত করান, "যদি সন্তান এক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়, তা হলে নানারূপ কষ্ট এবং বিপদে পতিত হবে। আর যদি দু'দণ্ড পরে জন্মগ্রহণ করে, তা হলে পরম সুখে চিরদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।" রানী এতচ্ছ্রবণে দাসীদিগকে আদেশ করিলেন, "যে-পর্যন্ত জ্যোতিষীদিগের কথিত শুভলগ্ন উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত আমার পদযুগল উত্তমরূপে বন্ধনকরতঃ আমাকে অধোমুখ করে রাখ।"

দাসীরা তৎক্ষণাৎ আদেশানুযায়ী কার্য করিল। ক্রমে জ্যোতিষীদিগের কথিত শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। রানী বন্ধন-মুক্ত হইলেন, এবং সন্তানও তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু রানী প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করতঃ অধোমুখে প্রসবোপযোগী সন্তানকে উদরে রক্ষা করার যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণ এবং তদীয় সচিববৃন্দ নবপ্রসূত সন্তানের নাম পিতার নামানুসারে লাক্ষ্মণেয় রাখিয়া প্রতিপালনার্থ জনৈক ধাত্রীর নিকট সমর্পণ করিলেন। লাক্ষ্মণেয় ধাত্রীর প্রযত্নে দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন, এবং যথাসময়ে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর রাজা লক্ষ্মণ রায়ের মৃত্যুর পর, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় লাক্ষ্মণেয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

রাজা লাক্ষ্মণেয় অশীতি বৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। তিনি অত্যন্ত

প্রজাবৎসল এবং উদার চরিত্র নরপতি ছিলেন। তিনি ঈদৃশ্য বদান্য ছিলেন যে, লক্ষ টাকার ন্যূনে কাহাকেও পুরস্কার প্রদান করিতেন না। বিজ্ঞ ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজ-উস্-সিরাজ জুরজানী বলেন যে, একদা রাজ্যের প্রধান প্রধান জ্যোতিষী, পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণগণ রাজা লাক্ষ্মণেয়কে রাজসভায় অবগত করান যে, প্রাচীন গ্রন্থ সকলে বর্ণিত আছে, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে এই রাজ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া তুর্কীদিগের হস্তে পতিত হইবে। রাজন! ঐ সময় উপস্থিত হইলে, নৃপতি আমাদিগের সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া তুর্কীদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই রাজ্য ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করিবেন। রাজা লাক্ষ্মণেয় এই বিবরণ শ্রবণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন : "যিনি সেই আক্রমণকারী মুসলমানদিগের সেনাপতি হবেন, শাস্ত্রে কি তাঁর কোন বিশেষত্ব বর্ণিত আছে, যদ্দারা তাঁকে চিনতে পারা যাবে?"

।৩।

পণ্ডিতবর্গ তদুত্তরে রাজাকে নিবেদন করিল : "হাঁ, শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনি যখন দণ্ডায়মান হবেন, তখন তাঁর করাঙ্গুলি জানুদেশের নিম্ন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।" রাজা লাক্ষ্মণেয় এতচ্ছ্রবণে বিশ্বস্ত অনুসন্ধাননিপুণ গুপ্তচরদিগকে রাজ্যের চতুর্দিকে তাদৃশ কথিত লক্ষণাক্রান্ত বীরপুরুষের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। চরবৃন্দ বহু অনুসন্ধানের পর, বিহার-বিজয়ী মোহাম্মদ বখতিয়ারকে তৎলক্ষণ বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়া সত্বর রাজা লাক্ষ্মণেয়কে অবগত করাইল। রাজ্যমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, পণ্ডিতকুল এবং প্রধানবর্গের মধ্যে এক বিষম ভীতিসঙ্কুল মহা-হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সভাসদ ব্রাহ্মণগণ অতীব সত্বরতা-সহকারে জন্মভূমি পরিহার পূর্বক, স্ব স্ব ধন-সম্পত্তি এবং পরিবার-পরিজন লইয়া কামরূপ, জগন্নাথ ও পূর্ববঙ্গের দূরবর্তী স্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয়, দিগন্ত-বিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী পৈতৃক-রাজ্য এবং প্রিয়তম জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি স্বীয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, স্বকীয় দাস-দাসী, কতিপয় মাত্র নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং সৈনিকবৃন্দসহ রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়দ্দিন পরেই মহাসামন্ত বখতিয়ার, বিহার প্রদেশের প্রান্তসীমা হইতে সপ্তদশ জন মাত্র অশ্বসাদী-সহ, বাঙ্গলার রাজধানী নদীয়া অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালিত করিলেন। বীরবর বখতিয়ার এরূপ ভীষণ বিক্রম এবং ভীষণ বেগে বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, প্রান্তপাল সৈনিকবৃন্দ তাঁহার গতিবেগন-

সংবাদ রাজধানীতে উপস্থিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সময় পাইয়াছিল না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বখ্‌তিয়ার নদীয়ায় প্রবেশ করিলেন। অশ্বপদ-শব্দে নাগরিকগণ চমকিত চিত্তে রাজপথে বাহির হইয়া দেখিল যে, তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ সমুজ্জ্বল কান্তি-বিশিষ্ট বীর-বপুঃশালী অষ্টাদশ সংখ্যক পাঠান, রবি-কর-প্রদ্যোতিত সুশাণিত ভয়াবহ উলঙ্গ করবাল করে, প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া, ঝঞ্ঝাবেগে রাজপুরী অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। নগরবাসিগণ পলকে প্রলয় গণিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু পুনঃ চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগকে আর দৃষ্টি-রেখার ভিতরে দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত মধ্যে বীরেন্দ্রবর্গ রাজপুরীর তোরণ-দ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বার-রক্ষকগণ অতর্কিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। তাহারা অস্ত্র-বিন্যাস করিবার উপক্রমেই শূরেন্দ্রকুলের নিশিত অসি তাহাদের শিরচ্ছেদন-পূর্বক ভূ-চুম্বন করিল। সিংহদ্বারে এই ভীষণ প্রলয়পাতে অন্তঃপুরস্থ দাস-দাসিগণ ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্তে যেন সমস্ত পুরী প্রলয়ে প্রকম্পনে কম্পিত হইল। পলিতকেশ হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা মাধ্যাহ্নিক আহারে কেবলমাত্র উপবেশন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রবণ-বিদারী ভীতি-বিহ্বল আর্তনাদ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে রাজার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। অন্তঃপুরের ভীষণ কোলাহল এবং পুরবাসীদিগের ইতস্ততঃ সন্ত্রস্ত-পলায়ন দর্শনে বৃদ্ধ রাজা প্রাণভয়ে প্রাবৃটের প্লাবন-স্রোত-প্রহৃত বেতস-লতিকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। ভূমিতে পতিত হইবেন, এমন সময় পতিপ্রাণা রাজ্ঞী আসিয়া ত্রস্ততার সহিত রাজার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন, "ভয় কি মহারাজ! চিন্তা দূর করুন, তরী প্রস্তুত, শীঘ্র আসুন"। এই বলিয়া রানী স্বামীর হস্ত ধারণ করতঃ খিড়কি-দ্বার দিয়া পলায়ন পূর্বক নৌকায় আরোহণ করিলেন।

তরী পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। বাহকগণ প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য বেগে তরী চালাইয়া স্বল্পক্ষণ মধ্যেই অনেক দূরে চলিয়া গেল। কয়েক দিবস গমনের পরে রাজা লাঞ্ছণেয় জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় মৃত্তিকার নিম্নে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া, হতাশ জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৃতকর্মা বখ্‌তিয়ার রাজধানী অধিকার করণান্তর উহা সম্পূর্ণরূপে ভূমিস্মাৎ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর লক্ষ্মণাবতী এবং বঙ্গের বহু পরগণা হস্তগত করিয়া "খোৎবা" পাঠের অনুজ্ঞা এবং জাজনগর, বেহার, দেবকোট ও নবাধিকৃত প্রদেশে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিলেন। বখ্‌তিয়ার নদীয়ার পরিবর্তে রংপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করতঃ, বিধর্মিদিগের ঘৃণিত প্রতিমূর্তি পূর্ণ মন্দিরের স্থানে, পবিত্রতম একেশ্বরোপাসনার বহুসংখ্যক মনোহর মসজিদ, অভ্র-ভেদী বিজয়-স্তম্ভ,

সুদৃঢ় দুর্গ, বহুল বিদ্যাগার, পান্থশালা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য রাজকীয় অট্টালিকাদি নির্মাণপূর্বক, রাজধানী এবং রাজ্য সুশোভিত করিলেন। অনন্তর বিজয়ী বখ্‌তিয়ার, বঙ্গ রাজ্য অধিকার কালে যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্বীয় প্রভু দিল্লীশ্বর কুতুব উদ্দীন আইবককে উপঢৌকন প্রেরণে, আপনাকে অধিকতর বিশ্বস্ত এবং প্রীতিভাজন করিয়া তুলিলেন। মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার স্বীয় ভুজ-বিক্রমে এবং শাসন-দক্ষতা-বলে কতিপয় বৎসর মধ্যে রাজ্যের যাবতীয় প্রজা, জমিদার এবং প্রধানবর্গকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় বাধ্য ও অনুগত করিয়া তুলিলেন।

[অসমাপ্ত]

জাহানারা

[শিরাজী সাহেবের 'বাণীকুঞ্জে' নানা কাগজ-পত্রের স্তূপের মধ্যে একটি খাতায় তাঁহার হাতে লেখা এই রচনাটি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, শেষ বয়সে তিনি এই উপন্যাসখানি রচনায় হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের পর আর অগ্রসর হন নাই।—সম্পাদক।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভরা বর্ষা। বিপুল জল-প্রবাহে উচ্ছ্বসিত গঙ্গা দুইকূল বিপ্লাবিত করিয়া সর্ববিঘ্ন বিমর্দিনী গতিতে কলকলনাদে বায়ুপ্রবাহে বক্ষে রাশি রাশি বিচিমালা ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়া যাইতেছে।

তখন সন্ধ্যাকাল। পশ্চিমাকাশে নানা বর্ণানুরঞ্জিত জলদমালা বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিয়া চিত্ত-বিমোহন নানা দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল। অস্তমান অংশুমালীর রক্তিমচ্ছটায় বহু দূর পর্যন্ত গগনমণ্ডল আরক্ত হইয়াছিল। রক্তিমার প্রান্তে একপার্শ্বে উজ্জ্বল নীলিমায় এবং অন্যদিকে পিঙ্গলবর্ণের বিচিত্র বিন্যাসে অপূর্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আকাশের শোভা ধরণী-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া গঙ্গাকেও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। এমনি মনোহর মধুর সন্ধ্যায় বর্ষার বিপুল জল-প্রবাহে গঙ্গাবক্ষে একখানি পিনিষ নৌকা তরঙ্গ-তালে দুলিতে দুলিতে মুর্শিদাবাদের নীচ দিয়া যাইতেছিল। প্রকৃতির মনোমোহন দৃশ্য দর্শনে নৌকারোহী শওকত আলী চৌধুরীর মনে সঙ্গীতানুরাগ জাগিয়া উঠিল। তিনি এস্‌রাজের বাক্‌স খুলিয়া মৃদুমন্দ বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী তবলচি ওসমান গনি এস্‌রাজের সঙ্গে তবলের তাল দিতে লাগিলেন। সেই মধুর সন্ধ্যায় পাল-বাহিত নৌকার স্বচ্ছন্দ অবাধগতির সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টমনে শওকত আলী তাঁহার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন।

গান শুনিয়া সকলেই বিশুদ্ধ আনন্দ ও নির্মল ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। গান থামিলে পক্ককেশ খোন্দকার মোল্লা আফসার উদ্দীন বলিয়া উঠিলেন, "জনাব শওকত আলী সাহেব! আপনি আলেম মানুষ এবং 'ফখরুল মুহদ্দিসীন' উপাধি পেয়েও এস্‌রাজ বাজিয়ে গান গাহেন, এটা একান্তই দুঃখ ও আফসোসের বিষয়। আপনার পক্ষে এটা নিতান্ত অন্যায়।"

শওকত আলী : কেন, খোন্দকার সাহেব? কি অপরাধ হল?

খোন্দকার : গান কি ইসলামে হারাম নহে?

শওকত আলী : মোটেই নয়। কখনও না। সঙ্গীতই বিশ্বের প্রাণ, সঙ্গীত ভক্তিলাভের প্রধানতম উপায়। ওলী-আল্লাহ্‌ এবং সূফীদিগের সাধনার চরম সহায় হচ্ছে সঙ্গীত। ইসলাম সঙ্গীতকে সর্ববিষয়েই প্রাধান্য দিয়েছে। রুদ, সরোদ, এস্‌রাজ, সারঙ্গ, সেতার, তাম্বুরা, তবল, প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বাদ্যযন্ত্র এবং অসংখ্য সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর অধিকাংশই মুসলমানদের সৃষ্ট।

খোন্দকার : সৃষ্ট হলেই যে বিধিসঙ্গত হবে, তার তো কোন অর্থ নাই।

শওকত : শুধু সৃষ্টই নয়। সঙ্গীতের প্রশংসা ও সমর্থনসূচক চল্লিশটি হাদিস মৌজুদ আছে। ইসলামের গোড়াতেই সঙ্গীত। কোরআন শরীফের কেরাত শুনেছেন তো? এটা সঙ্গীত ব্যতীত আর কি? সঙ্গীত নিষিদ্ধ বা হারাম হলে কেরাত করে কোরআন শরীফ পড়াও হারাম হতো। আজানও দীর্ঘ ও প্লুত কণ্ঠে দিতে হয়। এতে যতটা রাগিণী টানতে হয়, কোনো সঙ্গীতে ততটা রাগিণী টানতে হয় না।

খোন্দকার : মোল্লারা বলেন, আজান ও কোরআন পাঠের জন্যে উহা জায়েজ, অন্যত্র নহে।

শওকত : তাঁরা মিথ্যা বলেন। তাঁরা সুর করে দরূদপাঠ করেন কেন? মোল্লারা তো ওয়াজ-নসিহত করতেও সুর ধরে করেন। গজল তো সর্বদাই তাদের মুখে লেগেই আছে।

খোন্দকার : গজল গাওয়ায় দোষ নাই।

শওকত : চমৎকার বুদ্ধি! ফার্সীতে যাকে 'গজল' বলে, বাঙ্গলায় তাকেই 'গান' বলে। যার নাম 'গুল্‌' তারই নাম 'ফুল'। নাম লয়ে মারামারি করা চরম মূর্খতার পরিচায়ক।

খোন্দকার : আমার মনে হয়, গান না করাই ভালো। গজল অনেকেই বোঝে না। গান সকলেই বোঝে।

শওকত : তবে আপনি না-বোঝাটাই ভালো মনে করেন! বোঝাটাই দোষ? সঙ্গীতের অর্থ না বুঝলে সে-সঙ্গীত শুনে কোন লাভ নাই। আপনার-বুদ্ধির বালাই লয়ে মরি! না বুঝলে ভাব জাগবে কিসে? আর ভাব না জাগলে ভক্তিনিষ্ঠা বা প্রেম

আসবে কোথা হতে? যে মানুষের প্রাণে সঙ্গীত-রাগিণী সর্বদা বাজে না, সে কখনও খোদা-প্রেমিক হতে পারে না। মানুষের প্রাণ-বীণায় ভাবের ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তালা প্রকৃতির মর্মে মর্মে সঙ্গীতের সুধাধারা ঢেলে দিয়েছেন। নদীর জল-প্রবাহে মধুর কল্লোল! সমীরণের গতি-প্রবাহে স্বন স্বন স্বর। পাখীর মধুরকণ্ঠে সুললিত তান। ভ্রমরের পক্ষসঞ্চালনে মধুর গুঞ্জন! ঝিঁঝি পোকার তালে সর্বদা তানপুরা বাজছে। অগ্নির প্রজ্বলনেও শোঁ শোঁ সুরে সুর বাজছে। তারায় তারায় চাঁদের জ্যোছনায়—উষার হাসিতেও সুরের মেলা। এই বিশ্বের অণু-পরমাণু প্রতি পদার্থ সুরে গাঁথা, সুরে বাঁধা এবং সুরেই জীবন। এ জন্যই কোরআন শরীফ বলেছে, 'সব্বাহা লিল্লাহে মাফিস্ সমাওয়াতি ওয়ামা ফিল্ আরদি ওয়া হুয়াল্ আজীজুল হাকীম" অর্থাৎ আকাশ ও ধরিত্রীর প্রতি পদার্থ পরমেশ্বরের সর্বোপরি ক্ষমতাশালী শাসক এবং সৃষ্টির চরম ও পরম বন্ধু বলে তাঁর গুণকীর্তন করছে। এই যে সৃষ্টির গুণকীর্তন, এটা বিশ্বব্যাপী এক মহাসঙ্গীতের মহাতান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধকের কাছে এটাই 'জেক্‌রে আস্‌লী'। এটাই হিন্দু-শাস্ত্রের 'প্রণব' বা 'ওঙ্কার'। এটাই বাবা নানক সাহেবের "অনাহূত শব্দ বাজত ভেরি।" সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে ওলী-আল্লারা এই জেকরে আস্‌লী সর্বদা শুনতে পান। এটা আমাদের অন্তঃকরণেও সর্বদা উদ্গাত হচ্ছে। আপনারা যাকে palpitation of hearts বলেন, সাধকের কাছে তাই palpitation of thoughts নামে অভিহিত এবং vibration মূলতঃ একই জিনিস। পৃথিবীর প্রতি পদার্থেরই এই vibration আছে। এই vibration-এর সাহায্যে নিখিল বিশ্ব জুড়ে মহাসঙ্গীতের সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞান এখনও অত দূরে পৌঁছতে পারে নাই। কিন্তু সাধকেরা এটা প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং বুঝছেন সঙ্গীত হারাম বললে, সমস্ত বিশ্বই হারাম হয়ে যায়। তবে হিংসামূলক বা ব্যভিচারমূলক সঙ্গীত, যা বর্বরযুগে আরবেরা কীর্তন করতে ভালোবাসতো, তাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধকালে হিংসামূলক সঙ্গীত কীর্তন জায়েজ।

খোন্দকার : তা হলেই তো বোঝা গেল যে, সমস্ত সঙ্গীতই জায়েজ নহে। সঙ্গীতেও হারাম আছে।

শওকত : হারাম তো প্রত্যেক বিষয়েই আছে। নমাজে পর্যন্ত আছে।

খোন্দকার : নমাজে হারাম?

শওকত : লোক দেখান বা অন্য প্রকারের প্রার্থনা বা ধ্যান-ধারণা, কোন লোকের অনিষ্টের জন্য নমাজ পড়া বা বন্দেগী করাও হারাম। এরূপ নমাজিদিগের জন্য, এরূপ শ্রেণীর আবেদদিগের জন্য আল্লাহ্‌তালা "ওয়াইল" নামক মহাদোজখের সৃষ্টি করেছেন।

খোন্দকার : বিষম সমস্যা। তা হলে অভক্ত বা অসাধকের জন্য সঙ্গীত চর্চাও তো হারাম। তাকেও দোজখগামী হতে হবে?

শওকত : নিশ্চয়ই নহে। সঙ্গীত গাইতে গেলেই অভক্ত অসাধককেও অনেকটা অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। যারা শ্রবণ করে, তারা অশিক্ষিত অভাবুক হলেও সঙ্গীতের মোহন সুরে অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হয়ে পড়বেই পড়বে। কাজেই সঙ্গীত জিনিসটা শুধু লোকদেখান হতে পারে না। ভাবের সঙ্গে সর্বদাই তার কিছু না কিছু যোগ আছে। কিন্তু নমাজের বেলায় সর্বদা তা ঘটে না। সেখানে ভণ্ডামির আশঙ্কা আছে। কাজেই ওয়াইল দোজখের দুয়ার লোক-দেখান বা হিংসাপরায়ণ মানুষদিগের জন্য খোলা রয়েছে।

খোন্দকার : তা হলে সঙ্গীত ধর্ম-সাধনার চরম ও পরম সহায় এবং বিধাতার শ্রেষ্ঠতম দান।

শওকত : নিশ্চয়ই। আজমীর শরীফে যেয়ে দেখুন, মগরেব এবং এশার নমাজ বাদে সঙ্গীতের কি মহাধুম! ভাবে বিভোর হয়ে কত পাষণ্ড ব্যক্তি সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মানব-হৃদয়ের উপরে সঙ্গীতের মত কোন পদার্থই কার্যকরী নহে।

খোন্দকার : তবে মোল্লারা সঙ্গীতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে কেন?

শওকত : মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্তমান মোল্লা-মৌলবীদিগের মধ্যে ইসলামের খবর খুব কম লোকই রাখেন।

খোন্দকার : অনেকে বলেন, সঙ্গীত হারাম নহে, বাজনাটাই হারাম।

শওকত : বাজনা সঙ্গীতের এবং গায়কের সহায়ক। সঙ্গীত জায়েজ হলে বাজনাও জায়েজ।

খোন্দকার : মোল্লারা বলে, একতালা দফ্ বাজান জায়েজ।

শওকত : দফ্ প্রাচীন বর্বরযুগের বাজনা। এটা দফ্ দফ্ শব্দে বাজে বলেই এর নাম দফ্ হয়েছে। দফের মত নিরস বাজনা জায়েজ হলে, হারমনিয়াম, ফ্লুট রবাব, সেতার, সারেঙ্গ, সরোদ, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যে মহাজায়েজ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

খোন্দকার : তবে মোল্লারা সমর্থন করে না কেন? ঐ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র পরে সৃষ্ট হয়েছে বলে মোল্লারা নাজায়েজ বলে থাকে। তবে উহা কি জায়েজ হবে?

শওকত : নিশ্চয়ই। মোটা ভাত জায়েজ হলে সরু ভাত জায়েজ হবে না কেন? অপারগপক্ষে পান্তাভাত যেখানে জায়েজ, পারগপক্ষে পোলাও সেখানে জায়েজ হবে না কেন?

খোন্দকার : বুঝলাম। অনেক আলোক পেলাম। এত দিন তো এ-সব মহাপাপ বলে মনে করতাম।

শওকত : আরে মিঞা! পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা কি, তাই তো মোল্লারা অবগত নয়। তাদের আবার ফতোয়া দিবার অধিকার কি?

খোন্দকার : সে কি রকম?

শওকত : বল দেখি পাপ কাকে বলে? আর পুণ্য কাকে বলে?

খোন্দকার : আল্লা যা নিষেধ করেছেন, তাই পাপ; আর যা করতে বলেছেন, তাই পুণ্য।

শওকত : আল্লা তো সব বিষয় বলে দেন নাই। নূতন নূতন বিষয়ে তবে পাপ পুণ্য বুঝবে কি করে?

খোন্দকার : আপনি বলুন। আপনি বিদ্যার দরিয়া। মোল্লারা এসব বলতে পারেন না।

শওকত : যে-সব কাজের দ্বারা নিজের বা পরের শারীরিক, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার লাভ হয়, তারই নাম পুণ্য। তাই করা কর্তব্য। আর যে কাজের দ্বারা নিজের বা পরের কোন প্রকারের শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তার নাম পাপ। তা করা অকর্তব্য।

খোন্দকার : হুজুর ঠিক বলেছেন। ওঃ! কি গভীর তত্ত্বকথা। এ তো কোন আলেমের কাছে শুনি নাই। এতদিনে আসল বুঝ পেলাম।
এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন করিতে করিতে মগরেবের নমাজের ওয়াক্ত সমাগত দেখিয়া সকলে সান্ধ্যোপাসনায় নিরত হইলেন।

পরিশিষ্ট

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

[জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি]

[১৮৭৯—১৯৩১]

আবদুল কাদির

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় নব-জাগরণ এই উপ-মহাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, বাঙলার সে-দিনের সত্যানুসন্ধান, ভাবোন্মত্ততা ও কর্মচাঞ্চল্য সমসাময়িক বাঙালী মুসলমানদের জীবনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদবধ' ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এবং হেমচন্দ্রের শেষ কাব্য 'দশমহাবিদ্যা' ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে কেউ কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য বা উপন্যাস রচনা করেছেন কি না আমাদের জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তার ১০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২৯১ সালে) মীর মশাররফ হোসেনের সুপ্রসিদ্ধ 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'মহরম পর্ব' প্রকাশিত হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু' ঐতিহাসিক উপন্যাস; এই 'বিষাদ-সিন্ধু' থেকেই একালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সত্যিকার সূত্রপাত। যে উগ্র জাতীয়তা বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাঙালী মুসলমানদের রচনায় তার প্রথম স্ফুরণ দেখা যায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে—ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রথম কাব্য 'অনল-প্রবাহে'। হেমচন্দ্রের যেমন 'ভারত-সঙ্গীত', শিরাজীর তেমনই 'অনল-প্রবাহ'। উভয়েই চারণের মত নির্জীব জাতির কানে ঘুম-ভাঙানিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। সেকালে কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হক প্রায় একই সুরে জাগরণী-গান গেয়েছেন বটে, কিন্তু শিরাজীর কণ্ঠ দূর-পল্লীর আপামর-সাধারণের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর উদাত্ত আহ্বানে বাঙালী মুসলমানের জীবনে জেগেছে সাড়া। বিংশ শতাব্দীর ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালী মুসলমানের কানে তিনি শুনিয়েছেন অভয় জীবন-মন্ত্র। অজ্ঞানতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে জ্বালিয়েছেন আশার অম্লান আলোকবর্তিকা। আত্মা যে অজেয়, জীবন যে চিরজয়ী, এই প্রাণপ্রদ বাণী বিঘোষিত হয় তাঁর অনলবর্ষী লেখনীতে। বাঙলার প্রতি পল্লী ও নগরীতে তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রভাব অনুভূত হয়। এদেশের মুসলমানকে সকল মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নানা সদনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'নূর' ও সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় সাহিত্য-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের স্বপ্ন রূপ লাভ করে। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা-গুণে আপামর-সাধারণের মনে হীনম্মন্যতা-বোধ দূরীভূত হয়ে প্রবল কর্মৈষণার সৃষ্টি হয়।

মহাকবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, পর্যটক, সাংবাদিক, সাধক ও বাগ্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২০ শে শ্রাবণ মুতাবিক ১৮৭৯

খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতামহ বাবু খান ও মাতামহী গোলাপ বানু নবজাত শিশুর নামকরণ করেন যথাক্রমে 'রুস্তম' ও 'সেরাজুদ্দীন'; কিন্তু তাঁর মাতা নূরজাহান খানমের প্রদত্ত 'ইসমাইল হোসেন' নামেই তিনি অভিহিত হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতামহের বাটীর অদূরস্থিত সাহেবউদ্দীন পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁর হাতে-খড়ি হয়। তিনি যখন স্থানীয় জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্র, তখনই তাঁর মধ্যে কবিত্ব-শক্তি ও বাগ্মিতার প্রাথমিক স্ফুরণ দেখা যায়। স্কুলের জ্ঞানদায়িনী ছাত্র-সমিতির বিতর্ক-সভায় ও রচনা-প্রতিযোগিতায়, তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাতেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাইনর স্কুলের শিক্ষা সমাপনের পর তিনি সিরাজগঞ্জ বনোয়ারীলাল হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII-এ) ভর্তি হন। সে-সময় পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ মাশ্‌হাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক'[1] পুস্তকখানি তাঁর হস্তগত হয়; তাঁতে প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফ্‌ঘানীর ঘটনা-বহুল অসামান্য জীবন ও স্বাধীন 'সর্বতন্ত্র-বাদের' আদর্শ যেরূপ বলিষ্ঠ ও অগ্নিময়ী ভাষায় বিবৃত হয়েছে, তা কিশোর শিরাজীর মনে অপরিমাণ উন্মাদনার সৃষ্টি করে। তাঁর ধারণা হয় যে, এদেশে শিক্ষালাভ করে প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া যাবে না; তাই তিনি তুরস্ক গমনের সংকল্প করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে গোপনে গৃহত্যাগ করে একজন বন্ধু-সহ তিনি কলকাতার ৯ নং কড়েয়া গোরস্থান লেনে 'ইসলাম-প্রচারক'[2] অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন। মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ কিশোর শিরাজীর সংকল্প দেখে বিস্ময়বোধ করেন; কিন্তু তাঁদের তুরস্কে প্রেরণ তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অতঃপর শিরাজী কয়েকস্থানে সাহায্য লাভের চেষ্টা করে বিফল-মনোরথ হয়ে ৪২ দিন পরে গৃহে ফিরে আসেন, এবং পুনরায় পড়া শোনায় মনোনিবেশ করেন।

---

১. 'সমাজ ও সংস্কারক' ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'বক্তব্য ও উদ্দেশ্য' শীর্ষক ভূমিকায় ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকার বলেন : "এই প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র পাঠকবর্গের নিকট স্নেহ-মসৃণ দৃষ্টিলাভ করিয়াছিল।" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে পর তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার 'সমাজ ও সংস্কারক' বাজেয়াপ্ত করেন।

২. ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে 'ইসলাম-প্রচারক' প্রথম বের হয়। সে-বছর আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণে ১ম বর্ষের আর মাত্র তিন সংখ্যা এবং ১২৯৯ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে ২য় বর্ষের তিন সংখ্যা বের হয়। তারপর প্রায় সাত বছর বন্ধ থেকে ১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসে তার ৩য় বর্ষ আরম্ভ হয়। ৩য় বর্ষের প্রথম চার সংখ্যা মাসিক রূপে ও পরিবর্তী সংখ্যাগুলি দ্বি-মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাখানি অনিয়মিতভাবে ১৩১০ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

তিনি যখন যশোহরের জিলা স্কুলে নবম শ্রেণীর (Class IX-এর) ছাত্র, সে-সময় যশোর ছাতিয়ানতলার বনামখ্যাত ধর্মবক্তা মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুউল্লাহ্ সিরাজগঞ্জের বড়ইতলী মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন; সে সভায় তরুণ শিরাজী পাঠ করেন 'অনল-প্রবাহ' নামে একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা। কবিতাটি শুনে' মুনশী মেহেরউল্লাহ্ এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে ১৩০৬ সালে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে ৩য় বর্ষের 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজীর 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' প্রকাশিত হয়; তাঁর প্রথম জীবনের এই রচনাটির সংস্কৃতবহুল পদবিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ১৩০৬-০৭ সালে তাঁর 'কাজীর বিচার', 'মালাবারে ইসলাম-প্রচার', 'আইয়ুব নবীর স্ত্রী', 'সুলতান মাহমুদ' প্রভৃতি গদ্য রচনা এবং 'শোকোচ্ছ্বাস', 'অতীত-কাহিনী', 'উদ্গাথা', 'শোক-লহরী', 'আরব', 'আত্মা', 'চোখ গেল' প্রভৃতি কবিতা 'ইসলাম-প্রচারকে' এবং সূফী মধুমিয়া-সম্পাদিত 'প্রচারকে' প্রকাশিত হয়েছিল। এ-সকল রচনার চিন্তাদর্শ ও ভাবৈশ্বর্য দেখে' দেশবাসী তাঁর প্রতিভার শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ১৩০৭ সালে (১) অনল-প্রবাহ, (২) তূর্যধ্বনি, (৩) মূর্ছনা, (৪) বীরপূজা, (৫) অভিভাষণ : ছাত্রগণের প্রতি, (৬) মরক্কো-সঙ্কটে, (৭) আমীর-আগমনে, (৮) দীপনা ও (৯) আমীর-অভ্যর্থনা, এই ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৩] শিরাজী দেশের নব্য যুবকগণকে লক্ষ্য করে বলেন :

আবার উত্থান-লক্ষ্যে
বহাও জগৎ-বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ-প্লাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াও মুক্তির হেতু,
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।

'অনল-প্রবাহ' কাব্যের এই অগ্নিবাণী ভাবের তীব্রতা ও ভাষার ওজস্বিতাগুণে সমাজের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

---

৩. ১৩০৭ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখের (৩য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা) 'ইসলাম-প্রচারকে' কাব্যখানির নিম্নোদ্ধৃত 'সমালোচনা' প্রকাশিত হয় :
অনল-প্রবাহ—মুনশী মোহাম্মদ এস্‌মাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত। ইসলাম-প্রচারকের পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারের কবিতামালা অপরিচিত নহে; সমালোচ্য কবিতা-পুস্তকখানি তাঁহারই কল্পনা-নিঃসৃত। কবিতাগুলি মহা-ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদিগের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়ী, পাঠ করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পুস্তকখানির আকার ডিমাই ১২ পেজী ৩১ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ১০ আনা মাত্র। প্রত্যেক মুসলমানের এই পুস্তক এক একখানি গ্রহণ করা উচিত।

কবিতার ভাবরসে জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলা হতো আদিযুগে। সেই যুগ-প্রেরণা অন্তর্হিত হতে চলেছে। অধুনা মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে উপন্যাস। বিপ্রদাস পিপিলাইর 'মনসা-মঙ্গল', মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' বা ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা-মঙ্গল,' এরূপ বৃহদাকার কাব্যও এ-যুগে বিরচিত হয় না। একটা যুগের সমাজ-মানস ও জীবন-ধারার সামগ্রিক পরিচয় মধ্যযুগের এ-সকল কাহিনী-কাব্যে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু মধুসূদন হতে বাংলা কাব্যে যে নূতন ধারার সূত্রপাত হলো, তাতে প্রাচীন কালের এপিকের সকল লক্ষণ সম্যক্ পরিব্যক্ত নয়। শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের 'ইসফ-জলিখা' বা আলাওলের 'পদ্মাবতী' একটা যুগের সুবিশাল চিত্র মেলে ধরে; কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' বা যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' কাব্য পাঠকের সেই বিশাল সৌন্দর্য-ক্ষুধা তৃপ্ত করতে পারে কৈ? এ-সকল কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের ততখানি পার্থক্য, একটি বড় গল্পের সঙ্গে একটি উপন্যাসের যতখানি পার্থক্য। এটি লক্ষ্য করেই সে-সময় কায়কোবাদ ও শিরাজী মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্যের প্রথমাংশ ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাস (১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা) থেকে 'কোহিনূর' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। আর ১৩১১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম-২য় সংখ্যক 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজীর 'মহাশিক্ষা' কাব্যের 'বন্দনা'-অংশ ও 'মন্ত্রণা' নামক প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। 'বন্দনা'-র কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বীরেন্দ্র-কুলকেশরী রাজর্ষি হোসেন
(মহানবী মোস্তফার নন্দিনী-নন্দন,
বীরেশ-কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ)
ধর্মের মর্যাদা আর স্বাধীনতা-হেতু
দেখাইলা যেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ,
যে ভীষণ বীরধর্ম, কঠোর প্রতিজ্ঞা,
সত্যে অবিচল নিষ্ঠা, ন্যায়ের গৌরব,
বিশ্বাসের মহাতেজঃ, অতুল সাধনা,
অক্লান্ত অসীম ধৈর্য, তীব্র উন্মাদনা
অতুল অক্ষয় তাহা—কবীন্দ্র-কুলের
চির-অভিরাম ধন। চিরকাল তাহা
গাইবে ত্রিদিবে সুর, নরলোকে নর
ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠে ভাসি' নেত্র-নীরে।
শত শত বর্ষ হতে যে পবিত্র নীতি
করিয়াছে উন্মাদিতী মোস্‌লেম-জগতে,

হায়! যে করুণ দৃশ্য, দৃপ্ত বীর-মূর্ত্তি
মুহূর্তে মুহূর্তে জাগে মোসলেম-অন্তরে—
হে বিভো! সে গাথা আজি গাহিতে বাসনা
গম্ভীরে জীমূত-মন্দ্রে, সে বীর-মূরতি
আঁকিতে বাসনা আজি কল্প-তুলিকায়।

* * *

হে এলাহি! দয়া-বারি করি' বরিষণ
মানস-উদ্যান-জাত কবিত্ব-তরুরে
করহ সরস এবে শ্যামল শোভন,
পত্র পুষ্পে সমাবৃত। বড় সাধ মনে
সে কবিত্ব-তরু হতে চারু ফুলদল
অবচয়ি গাঁথিবারে কাব্যের মালিকা
কল্পনার সূক্ষ্ম-সূত্রে মনের মতন।

যেখানে মহাকবি হোমার তাঁর ILIAD কাব্যের প্রারম্ভে বলেছেন ঃ 'heavenly goddess, sing!' এবং মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রারম্ভে বলেছেন ঃ "কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী!" সেখানে শিরাজী সর্বশক্তিদাতা আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে ভাব-প্রকাশের ছন্দোময় কবি-ভাষা যাচ্‌ঞা করছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা সাতিশয় পল্লবিত, তার গাঁথুনি সর্বত্র আশানুরূপ আঁটসাঁট নয়, ফলে বর্ণনা অনেক স্থানেই আবেগ-উচ্ছল ও আড়ম্বর-বহুল হয়েছে।

১৩১৪ সালে (১) বোধন-গীতি, (২) এই কি সেই দেশ, (৩) কল্য ও অদ্য, (৪) অতীত-কাহিনী, (৫) বিলাপ, (৬) স্বাধীনতা-বন্দনা, (৭) চাঁদ সুলতানা, (৮) মিসরের অভ্যুত্থান, (৯) উন্মেষণা, (১০) স্পেনের প্রতি, (১১) বজ্রধ্বনি ও (১২) আরব, এই ১২টি কবিতা নিয়ে তাঁর 'উদ্বোধন' কাব্য প্রকাশিত হয়। তিনি 'বোধন-গীতি'তে বলেন ঃ

জাতীয় উন্নতি-হেতু সহিবারে দুঃখ-তাপ
বিমুখ যে, পশু সেই, তারে শত অভিশাপ।

সুদানের মহাবীর মোহাম্মদ আহমদ মেহদী যে আরবী 'কাফিয়া'য় উদ্দীপন-রসে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করেছিলেন, 'স্বাধীনতা-বন্দনা' কবিতাটি তারই মর্মানুবাদ। কিন্তু সেদিন এই উপ-মহাদেশের জন্যও এই মুক্তির আহ্বান ছিল অপরিমাণ প্রেরণাময়—

পতিত জাতির উদ্ধার-হেতু
উড়াও আকাশে রক্তিম কেতু,

জাগুক্ মাতুক্ ছুটুক দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।
জয় জয় জয় স্বাধীনতা!!

সে-বছরেই জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'নব-উদ্দীপনা' প্রকাশিত হয়। তাতে 'হিন্দুর প্রতি', 'মুসলমানের প্রতি', দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা', 'আহ্বান', 'বন্দনা' প্রভৃতি কবিতা স্থান লাভ করে। এই কাব্যখানির প্রধান কথা দেশাত্মবোধ ও মানবিকতা। জনগণের জাগরণ ভিন্ন যে দেশ-মুক্তি সম্ভব নয়, এই মূল্যবান কথাটি ব্যক্ত করেন এরূপ তীর্যক ভাষায় ঃ

কিছুতেই হবে না সাধন,
যতই কেন বল না ভাই 'বন্দে মাতরম্'!
কামার কুমার চাষী তাঁতি
যতদিন না ওঠে মাতি',
যতদিন না করে তারা নেত্র উন্মীলন!
ও ভাই! যতদিন না উঠে জ্বলে,
মাকু হাতুড়ি লাঙ্গলের ফালে
ভ্রাতৃপ্রেম আর দেশভক্তির অনল ভীষণ!

তাঁর 'উচ্ছ্বাস' (১৩১৪) ৮ সর্গে সমাপ্ত। এটি 'মুসাদ্দাসে-হালী'র ধরনে রচিত জাতীয় কাব্য। তিনি জাতিকে তার অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহিমার মধ্যে জাগরিত হতে আহ্বান করেন। তিনি উপদেশ দেন জ্ঞানকে করতে পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ঃ

জ্ঞানই শকতি, জ্ঞানই ধরম,
জ্ঞানই বিশ্বাস, জ্ঞানই মরম,
জ্ঞান ভক্তি মুক্তি, জ্ঞানই করম,
এই মহামন্ত্র করহ সার।
—[অষ্টম সর্গ]

১৩১৫ সালে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি) 'অনল-প্রবাহ' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন বাংলা সরকার 'অনল-প্রবাহ' বাজেয়াফত্ করেন ১২৪(ক), ১৫৩ ও ১১৭ ধারা-অনুসারে গ্রন্থকারের প্রতি গ্রেফ্তারী পরোয়ানা জারি করেন। শিরাজী তখন 'ছোলতান'—সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সঙ্গে উত্তর-বঙ্গে প্রচার-কার্যে লিপ্ত ছিলেন; সংবাদপত্রে পরোয়ানার খবর পেয়ে তিনি অবিলম্বে কলকাতা রওয়ানা হন। তাঁর সাধের 'মহাশিক্ষা-কাব্য' ততদিনে অর্ধেক মাত্র বিরচিত হয়েছে; এই অবস্থায় কারাগারে গেলে কাব্যখানির অবশিষ্টাংশ রচনার মেজাজ (mood) হয়ত জীবনে আর পাওয়া যাবে না। তাই তিনি কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে থেকে কাব্যখানি সমাপ্ত করাই

সমীচীন মনে করলেন। তিনি বৃটিশ-এলাকার বাহিরে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে গিয়ে দীর্ঘ আট মাস আত্মগোপন করলেন। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বাংলা সরকার ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন; কিন্তু গোয়েন্দাদের সকল কারসাজি ব্যর্থ করে শিরাজী ১৩১৭ সালের ২১শে আষাঢ় তারিখে মহাশিক্ষ-কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি কাব্যখানির 'উপসংহার' করেন এভাবে—

এজিদের মহাবল ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে
পলাইল প্রাণ-ভয়ে ছুটিয়া চৌদিকে;
হায়! বনে যূথপতি বিনষ্ট হেরিয়া
পলায় মাতঙ্গ-কুল সিংহ-ভয়ে যথা।
কত জন অসি-সহ বাঁধিয়া স্বকর
কৈল আত্মসমর্পণ হানিফার পদে।
অনন্তর মহাশূর বিজয়ী হানিফা
বিজয়-রাগ-প্রদীপ্ত বদন-মণ্ডলে,
দ্রুত অশ্ব ধাওয়াইয়া, রক্ত অসি করে
মহাহর্ষে পুনঃ পুনঃ ঘোষিয়া তক্‌বীর
পশিলা তোরণ-পথে রাজধানী মাঝে।
লক্ষ লক্ষ নাগরিক লয়ে নানা ভেট
অভ্যর্থিলা হানিফারে জয়ধ্বনি করি'।
মিষ্ট বাক্যে সকলেরে অভয় প্রদানি'
নগরীর শান্তিরক্ষা—ব্যবস্থা করিয়া,
সর্বাগ্রে কারায় পশি' বন্দিনী-নিচয়ে
বিমুক্তিলা আলীজাদা। পুনঃ অশ্রুধারা
প্রবাহিল সকলের নেত্র-নীলোৎপলে!

* * *

দামেস্কের সিংহাসনে জয়নাল-আবদিনে
করি' সুখে অভিষিক্ত, দরিদ্র বিধবা
অনাথ পীড়িত আর আহত সৈনিকে
মুক্ত হস্তে বহু অর্থ করিলা প্রদান।

* * *

অনন্তর আলী-জাদা সুশৃঙ্খল করি'
বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের, বিপুল ঘটায়

জয়নাল নগিনা দোঁহে আনন্দ-উল্লাসে
বাঁধি' পরিণয়-পাশে, ফিরিলা স্বরাজ্যে
ভাসিয়া আঁখির নীরে 'হা হোসেন' বলি।

অভাগা বঙ্গের কবি শোকার্ত্ত শিরাজী
অনাহারে অনিদ্রায় সহি' নানা ক্লেশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে, বিধি-কৃপাবশে
এই খানে মহাশিক্ষা করিলেক শেষ।

অতঃপর তিনি কলকাতায় গিয়ে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইন হো-র আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতে তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি। কিন্তু বিচারে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তাঁর প্রতি দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অর্থাভাবে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে, দীর্ঘ দণ্ডভোগের পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে তিনি কারামুক্ত হন। তাঁর 'কারা-কাহিনী' পরবর্তী কালে মাসিক 'সাধনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর বল্কানের ক্ষুদ্র শক্তি-চতুষ্টয় রাশিয়া ও বৃটেনের প্ররোচনায় তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্কের সেই বিপদে ডাক্তার মোখতার আহ্‌মদ আন্‌সারীর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রিসেন্ট গঠিত হয় এবং তুরস্কে 'অল্ ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। সেই মিশনের বঙ্গীয় প্রতিনিধি-রূপে শিরাজী ২রা ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ হতে রওনা হন। বোম্বাই হতে জাহাজ-যোগে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে সমুদ্র দর্শন করে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তা উপভোগ্য। সেই সমুদ্র-স্তোত্র থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি :

হে অসীম নীল সিন্ধু! হে অনন্ত লীলার আকর!
কার-প্রেম আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত তোমার অন্তর!
অসীম নীলাম্বু মাঝে তরঙ্গের মরি কী নর্ত্তন!
কী মহা বিচিত্র লীলা, মরি! কিবা ভীম আস্ফালন!
কতকাল হতে জুটি' গাহিতেছ সঙ্গীত মহান,
কী গভীর ভাবপূর্ণ, মুগ্ধ যাহে কবির পরাণ।

(তুরস্ক-ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, ২৫ পৃঃ)

জাহাজ ২৭শে ডিসেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে। তাঁর 'তুরস্ক-ভ্রমণ (১৯১৩) পুস্তকে তিনি সেই সফর কাহিনী সরস ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বল্কান শক্তিপুঞ্জের অত্যাচার, তুর্ক বাহিনীর বিপর্যয়,

রণক্ষেত্রের অবস্থা, নব্য তুর্কীদলের জয়লাভ প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি বলেন :

"মুসলমানের জাতীয়তা (Nationality) 'মুসলমান' ব্যতীত আর কিছুই হইবে না ; সমস্ত জগতের মুসলমান এক, ধর্ম এক, স্বার্থ এক, চিন্তা এক, কর্ম এক, ইসলামের এই মহা-ঐক্যের বন্ধনে সমস্ত নবীন যুবককে প্রমত্ত করিতে হইবে।"

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তিনি ভূমধ্যসাগরের পথে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেশে ফিরে তিনি পূর্ণোদ্যমে সমাজের ও সাহিত্যের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর 'স্পেন-বিজয় কাব্য' প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যে রয়েছে তাঁর বিশাল হৃদয়ের ছায়াপাত। তাঁর কল্পনার প্রসার প্রশংসনীয়, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা হৃদয়স্পর্শী। তাঁর কাব্যের ভাষা শুধু বলিষ্ঠ নয়, স্থানে স্থানে তেজোব্যঞ্জকও বটে। তিনি 'স্পেন-বিজয়' কাব্যের 'বন্দনা'য় বলেছেন—

গাবো সে অতীত কথা, গৌরব-কাহিনী,
নাচাইতে মোস্‌লেমের নিস্পন্দ ধমনী।
গাবো সে দুর্মদ বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা,
কৃপা করি' অগ্নিময়ী করো এ রসনা!

বাস্তবিকই তাঁর বীরবাণী শ্রবণ করে বাঙলার সম্বিৎহারা মুসলমানের স্নায়ুতে জেগেছিল বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্য। তাঁর 'স্পেন-বিজয়' ঐতিহাসিক কাব্য; কিন্তু ইতিহাস-উদ্যানের 'ঘটনা-কুসুম' কল্পনার হেমসূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হননি। তাঁর ভাষা যথেষ্ট অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত হলেও তার গতি অস্বাভাবিকভাবে মন্থর হয়নি। কাব্যের আরম্ভে আছে—

এস গো কল্পনে সখি অমিয়ভাষিণী!
কুসুম-ভূষণা দেবী হসিত-আননা,
লয়ে সঙ্গে মনোরঙ্গে বিজলী-গঞ্জিনী
অপার সৌন্দর্যময়ী কবিত্ব-ললনা;
দু'জনে মিলিয়া আজি গাঁথি' চারুহার—
পরাইয়া দেই গলে বাঙলা ভাষার।

এই 'স্পেন-বিজয়' কাব্যখানি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুসরণে রচিত, এ-কথা বললে ভুল বলা হয় না। স্পেন-রাজ রডারিকের অন্তঃপুরে ধর্ষিতা ফ্লোরিণ্ডার বন্দিনী-দশা, সমুদ্র পার হয়ে তারেকের স্পেন অভিযান, জুলিয়াসের মুর-দলে যোগদান, যুদ্ধে যুবরাজ মহীলকের পতন, রাজসভায় সম্রাজ্ঞী ঈগিকার ভর্ৎসনা, পুত্রশোকে রডারিকের বিলাপ, সুন্দরী সোফিয়ার খেদোক্তি, মহীলকের সমাধি, পুত্রশোকোন্মত্ত রডারিকের রণযাত্রা, এ-সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে অপহৃতা সীতার লঙ্কায় অবস্থান, সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামের সিংহল আক্রমণ, বিভীষণের

কপি-দলে যোগদান, যুদ্ধে বীরবাহুর পতন, রানী মন্দোদরীর গঞ্জনা, পুত্রশোকে রাবণের বিলাপ, প্রমীলার খেদ, মেঘনাদের চিতারোহণ, পুত্রশোকাতুর রাবণের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) হা পিতঃ! দেখ হে আসি,' ক্লোরিণ্ডা তোমার
কি শোক-সাগরে আজি ভাসে একাকিনী!
কে আছে এ পাপ-পুরে রক্ষিতে আমার
দানবের হস্ত হতে! —(২৬ পৃঃ)

(২) ছিল আশা সিংহাসনে বসাইয়া তোমা
জুড়াব এ পোড়া আঁখি। নিষ্ঠুর বিধাতা
সে আশা-তরুর মূলে ভীষণ কুঠার
হানিল অকালে, হায়! মম ভাগ্যদোষে
তোমা হেন পুত্ররত্নে হারাইনু আমি।
—(১২২ পৃঃ)

(৩) পূর্বাশার দ্বার খুলি' ঊষা-সুমোহিনী
চাহিলী মহীর পানে প্রসন্ন নয়নে।
—(১২৩ পৃঃ)

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সুস্পষ্ট অনুসরণ সত্ত্বেও শিরাজীর হাতে স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে :

এ দেহ-মৃণাল হতে পাষণ্ড পিশাচ
সতীত্ব-কমল যদি কৈল উৎপাটন,
কি ফল জীবনে তবে? এ দেহ-মৃণালে
নিশ্চয় ডুবা তবেব কাল-সিন্ধু-নীরে।

শিরাজী মহাকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তু কায়কোবাদের মত ততখানি সফলতাও কেন অর্জন করতে পারলেন না তা ভাবৃবার বিষয়। সৌন্দর্য-কল্পনা ও ভাব-প্রকাশের কিছু দৈন্য ছিল বটে; কিন্তু মনে হয়, ধ্যানীর প্রসন্ন নিরাসক্তি ও স্থিরচিত্ততা তাঁর ততখানি ছিল না এবং প্রধানতঃ ধর্ম-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই চরম সাফল্যলাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। অবশ্য উদার ধর্মভাব কোনোদিনই কবি-প্রতিভার প্রতিবন্ধক নয়। কবি-কল্পনার পশ্চাতে রয়েছে বিশাল ভাব ও সৌন্দর্যের প্রগাঢ় অনুভূতি; সেজন্যই শিক্ষামূলক কাব্য তত হৃদয়গ্রাহী হয় না।

শিরাজীর মহাশিক্ষা কাব্যকে শেলীর ভাষায় বলা যেতে পারে didactic poetry; ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি কাব্যের মঞ্জুষায় পরিবেশন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেছেন ইসলামের তৌহিদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র—

হারাইয়া স্বাধীনতা অপার্থিব ধন,
হারাইয়া সুভকরী প্রজাতন্ত্র-প্রথা
বাঁচে যে—নারকী সেই নরকুলাধম।
—[মহাশিক্ষা-কাব্য, পঞ্চম সর্গ]

অবশ্য এই মহাশিক্ষা-কাব্যেও মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কারবালা-কাহিনীর পটভূমিকায় এই কাব্যখানি বিরচিত; ইসলামের সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার উদ্দেশ্য হলেও স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফূরণ বেশ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠেছে। মনে হয়, যে-সব স্তবকে মধুসূদনের অনুকরণ করেছেন, সেখানেই বর্ণনা অধিকতর চিত্তহারী হয়েছে। 'মন্ত্রণা' নামক প্রথম সর্গ থেকে একটু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কিংবা যদি আজ্ঞা হয় মদীনা নগরী
লোহিত সাগর জলে পারি ভাসাইতে।
কিবা শঙ্কা, হে রাজেন্দ্র! মৃগেন্দ্র কখন
ডরে কি কুরঙ্গে বিশ্বে? দাবানল-শিখা
পরাঙ্মুখ পুড়াইতে কবে শুষ্ক তরু?

বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দের বিশুদ্ধ ভঙ্গী শিরাজীর কাব্যে আঁটসাঁট রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় তিনি অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর 'সঙ্গীত-সঞ্জীবনী', 'প্রেমাঞ্জলি', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি পুস্তকের গীতিকবিতাগুলি পড়লেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'সঙ্গীত-সঞ্জীবনী' প্রকাশিত হয়। তাতে ৩৩টি গান স্থান পেয়েছে। তার 'মুখবন্ধ'—

চাহ যদি সবে জাতীয় কল্যাণ,
জাতীয় সঙ্গীত করো তবে গান।
চিত্ত-উন্মাদিনী সঙ্গীত-রাগিণী
ঢালিবে হৃদয়ে মৃতসঞ্জীবনী।।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'প্রেমাঞ্জলি'; তাতে ১২৮টি গীতিকবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুসরণে তিনি 'প্রেমাঞ্জলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু নিঃসঙ্গতা-রসিক রবীন্দ্রনাথের অতুলন বাণী-রূপ ও সুর-সম্পদ তাঁর সঙ্গীতে নেই। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ স্বানুভূতি ও আনন্দময় সমর্পিতচিত্ততা শিরাজীর গানের প্রধান উপজীব্য। সেজন্যই গীতিকবিতা হিসাবে সেগুলি বিশেষ সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিযোগী হিসাবে তিনি 'প্রেমাঞ্জলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি

সে-প্রমাণ প্রচুর জড়ো করা যেতে পারে। 'প্রেমাঞ্জলি'তে আছে—

তোমার রাগিণী উঠেছে বাজিয়া
আজি গো জীবন-কুঞ্জে।
মলয় সমীর বহিছে কুটিরে
লুটায়ে কুসুম-পুঞ্জে।
—(১১৪ পৃষ্ঠা)

এই ভক্তিভাব ও বাণীবিন্যাস যে রবীন্দ্রনাথের, তা বাঙালী পাঠকের অবিদিত নেই।

শুধু ইসমাইল হোসেন শিরাজী নন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক প্রভৃতিও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-কল্পনা ও রূপকর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারেননি। অগত্যা কায়কোবাদ বিশেষতঃ নবীনচন্দ্রের, মোজাম্মেল হক প্রধানতঃ হেমচন্দ্রের এবং শিরাজী প্রত্যক্ষতঃ মধুসূদনের অনুসারী হয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজেছিলেন। তবে শিরাজীর বিশেষ মর্যাদা এ-জন্য যে, তিনি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র পাল্টা হিসাবে তিনি 'রায়-নন্দিনী' লিখেছিলেন। 'তারাবাঈ', 'ফিরোজা বেগম' ও 'নূরুদ্দীন' উপন্যাসেও তাঁর স্বসমাজ-প্রীতি সুপ্রকট। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তিনি কেন 'বজ্রমুখ লেখনী ধারণ' করেন, তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ 'রায়-নন্দিনী'র উপক্রমণিকা পঠিতব্য।

বারো-ভূঞার আমলের বাঙলার সামাজিক ছবি 'রায়-নন্দিনী'তে বেশ ফুটেছে। চাঁদ রায়, কেদার রায়, স্বর্ণমণি ও ঈশা খাঁর চরিত্র এমন বলিষ্ঠ হাতে অঙ্কিত হয়েছে যে, বাস্তবাশ্রয়ী ইতিহাস হয়েছে রসাশ্রয়ী উপাখ্যান। তবে চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতেই তিনি সমধিক তৎপর হয়েছেন; ফলে শিল্পশ্রীর হয়ত কিঞ্চিৎ অপহ্নব ঘটেছে।

তাঁর 'তারাবাঈ' উপন্যাসে মালেকা আমিনা বানু ও আফজাল খাঁর বীরত্ব, 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসে মারাঠা সর্দার সদাশিব রাও ও ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচার-কাহিনী এবং 'নূরুদ্দীন' উপন্যাসে মালবের সুলতানের সাথে চিতোরের রাণার যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে। তাঁর এ-সব উপন্যাসে পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাজাত্যাভিমান ও স্বধর্মপ্রীতি, কুসংস্কার ও প্রথানুগত্যের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে মনুষ্যত্ববোধ ও প্রেমনিষ্ঠা। ভাষার ওজস্ ও বর্ণনার মনোহারিতা তাঁর সব উপন্যাসেই স্বকীয়তার হেতু হয়েছে।

তাঁর গদ্যের ভঙ্গী বাস্তবিকই সাবলীল। তাঁর 'স্ত্রী-শিক্ষা', 'তুরস্ক-ভ্রমণ,' 'তুর্কী নারী-জীবন,' 'আদব-কায়দা শিক্ষা,' 'সুচিন্তা,' 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা'

প্রভৃতি পুস্তকে গদ্যের ধরন বেশ প্রাঞ্জল অথচ প্রাণবন্ত। তাঁর রচিত সাহিত্যে নিরপেক্ষ রসবিচারে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা হয়ত ধরা পড়বে; কিন্তু তাঁর রচনার শক্তির জন্যই তিনি দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু সাহিত্যের ইতিবৃত্তেই তাঁর গৌরবান্বিত আসন লাভ হবে না, দেশের জাগরণের ইতিহাসেও তাঁর উল্লেখ হবে সম্ভ্রমময়। স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন; সেই দুর্লভ শক্তির আবেগ-দীপ্ত প্রকাশ রয়েছে তাঁর বিপুল সাহিত্যে। সেই বীর্যবান পুরুষের জীবনবাণী মূর্ত রয়েছে বলেই তাঁর সাহিত্য কালস্রোতে বহুদিন ম্লান হবে না।

তিনি তাঁর 'স্ত্রী-শিক্ষা' পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের 'ভূমিকা'য় বলেছিলেন : "চিন্তার বিস্ফুরণকারিণী শিক্ষা এবং স্বাধীনতাই হইতেছে মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র উপায়।" এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা দেশের সকল শ্রেণীর নারী লাভ না করলে সমাজের ও সংসারের অভীপ্সিত উন্নতি ও কল্যাণ নাই, এ-কথা তিনি বহু অকাট্য যুক্তি ও প্রামাণ্য নজির দিয়ে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন। তাঁর সেই সারগর্ভ ভাষণ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। বাঙলার মুসলমান সমাজে শিরাজী হচ্ছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' ও 'স্ত্রীজাতীয় স্বাধীনতা' আন্দোলনের সম্মানিত পুরোধা।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১) 'ইসলামের মূল শক্তি', (২) 'সাহিত্য-শক্তি ও জাতি-সংগঠন', (৩) 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি,' (৪) 'অভিভাষণ,' (৫) 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা,' (৬) 'ইসলামের ভবিষ্যৎ', (৭) 'সাহিত্য ও জাতীয় জীবন', (৮) 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা', এই ৮টি সুনির্বাচিত নিবন্ধ নিয়ে তাঁর 'সুচিন্তা' প্রকাশিত হয়। প্রথম নিবন্ধে বলা হয় যে, "ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যভাব হইয়াছে শক্তির উৎস।" দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই বলেন যে, "বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত" করতে হলে "ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের" ভিতরে থেকে সাহিত্য-সেবা' করতে হবে। তৃতীয় নিবন্ধে তিনি বলেন :

"মাতৃভাষা ব্যতীত কোনো জাতিই উন্নতিলাভ করতে পারে নাই। ...বাঙলা না জানায় শুধু আরবী-পারসী-পড়া মৌলবী সাহেবদিগের সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনুদিন ক্ষতি ও অবনতির মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। ... বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না। ...হে মাদ্রাসার তালেব-এলেমগণ! মাতৃভাষা বাঙলাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সযত্ন হও।"

তিনি 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা' নিবন্ধে দুঃখ-সহকারে বলেন :

"সমাজে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই; তাই আজি বঙ্গীয় মুসলমানের এহেন দুর্দশা দর্শন করিতেছি।"

তিনি 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' নিবন্ধে নির্দেশ দেন যে, "অতীতের আলোক ধরিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গন্তব্যপথকে আলোকিত করিতে হইবে।" কিন্তু

অতীতের আলোক" বলতে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতীতের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাই বুঝিয়েছেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' পুস্তকে বলেছেন ঃ

"বিজ্ঞান যে মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই যে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, স্পেনীয় মোসলেমগণই এই মহাসত্য বর্বর ইউরোপীয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। হায় মুসলমান! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে?"

--(৮৮ পৃঃ)

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাসিক 'নূর' বের করেন। তাতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রথম জীবনে রচিত ছোট-গল্প 'মেহের-নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' ও 'রিক্তের বেদন' প্রকাশিত হয়েছিল। 'নূর' পত্রিকায় মহাশিক্ষা-কাব্যের কয়েকটি সর্গ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। 'মহাশিক্ষা' এক বিপুলকায় মহাকাব্য; বাঙলা ভাষায় এত বড় কাহিনী-কাব্য এ-যুগে বিরচিত হয়নি। এই মহামূল্য কাব্যটি গ্রন্থবদ্ধ হলে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার যেমন পরিপুষ্ট হবে, তেমনি বাঙলা সাহিত্যে শিরাজীর বিপুল অবদানের সম্যক্ মূল্যায়নও সম্ভবপর হবে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর যুগ্ম-সম্পাদনায় নব-পর্যায় সাপ্তাহিক 'ছোলতান' প্রকাশিত হয়। তাতে শিরাজী 'আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি,' 'জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন', 'ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য,' 'ইসলাম ও আত্মোৎসর্গ,' 'স্বজাতি-প্রেম,' 'বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয়,' 'শিল্প-সংগঠন ও জাতীয় জীবন,' 'নারীশক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন,' 'ইতিহাস-চর্চার আবশ্যকতা,' 'প্রাণের মূর্চ্ছনা' প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এ-সকল সন্দর্ভে তাঁর সামাজিক সাম্য, আর্থনীতিক উন্নয়ন ও রাজনীতিক অধিকারের আদর্শ প্রত্যয়ের আগুনে দীপ্তিমান। 'জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন' প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে মন কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। জাতি স্বাধীন না হইলে তাহার চিন্তাশক্তিও স্বাধীন এবং বলবতী হইতে পারে না।"

—(ছোলতান, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০)

কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাই মেহনতী মানুষের জীবন-বিকাশের প্রয়োজনে—কায়েমী স্বার্থের পরিপোষকদের ভোগের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য নয়। তিনি 'প্রাণের মূর্চ্ছনা' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

"স্বরাজের ও স্বাধীনতার আমি ঘোর পক্ষপাতী। ...কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছি যে, স্বরাজের জন্য আমার মুসলমান ভাইকে, আমার চাষী ভাইকে আমি কিছুতেই জবাই করিতে পারিব না। স্বরাজের জন্যই আমার চাষী ভাইকে বাঁচাইতে হইবে। চাষাই এদেশের জীবন ও যৌবন। চাষার রক্তশোষণ করিয়াই জমিদার, মহাজন ও উকিল-মোক্তারদিগের বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। চাষার টাকাতে তাঁহাদের দালান-কোঠা ও মোটর-

গাড়ি। ...সুতরাং চাষাকে বাঁচানো এবং চাষীকে ত..পানই হইতেছে স্বরাজের প্রধানতম সাধনা।"

—(সোলতান, ৬ই চৈত্র, ১৩৩০)

১৩০৯ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর'-এ শিরাজী 'জাতীয় মহাসমিতি' স্থাপনার আহ্বান তারস্বরে প্রচার করেছিলেন। তার প্রায় দুই দশক পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন :

"মুসলমানদিগকে স্বরাজ-সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য। ...আমাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত আবশ্যক।"

(ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৩১)

এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার লাভের জন্য সেদিন শিরাজী যে-পথনির্দেশ করেছিলেন, সে-পথই প্রশস্ত বলে তাঁর স্বসমাজের লোকেরা কালক্রমে বুঝতে পারে এবং সে-পথে অগ্রসর হয়েই তারা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু শিরাজী চেয়েছিলেন ইসলাম-সম্মত প্রজাতন্ত্র-প্রথা এবং জ্ঞানালোকিত মুক্ত চিত্ত; তিনি তাতেই দেখেছিলেন মুক্তির পূর্ণতা ও মনুষ্যত্বের মহিমার স্বপ্ন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ মুতাবিক ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই এই বীরকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু তাঁর স্বপ্ন তাঁর অমর সাহিত্য-কীর্তির মাধ্যমে দেশবাসীকে চিরদিন দিবে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা।

— — —